দুই পলাশী দুই মীরজাফর

কে এম আমিনুল হক

"তোমাদের কি হলো যে, তোমরা সংগ্রাম করবে না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য? যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! এ জনপদ যার অধিবাসী জালিম, তা হতে আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও; তোমার নিকট থেকে কাউকে আমাদের অভিভাবক করো এবং তোমার নিকট থেকে কাউকে আমাদের সহায় করো।" (সূরা নিসা : ৭৫)

প্রকাশক **কে এম আমিনুল হক**
সাবিয়ানগর, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ

সর্বস্বত্ব প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ ৪ মে ২০০৭

দ্বিতীয় প্রকাশ শুক্রবার ১৫ আগস্ট ২০০৮
৩১ শ্রাবণ ১৪১৫ বাংলা
১৩ শাবান ১৪২৯ হিজরী

তৃতীয় প্রকাশ ১৫ আগস্ট ২০০৯

Dui Polasi Dui Mirzafar
Written and Published by K M Aminul Hoque
Sabianagar, Austagram, Kishorganj
3rd Edition : August 2009

eBook Published by
www.storyofbangladesh.com

আওলাদে রাসূল (সাঃ)
শহীদ সাইয়েদ মাহমুদ মোস্তফা আল মাদানী (রঃ)
সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর
শহীদ আব্দুল মোনয়েম খান এইচ পিকে
এবং
আগস্ট বিপ্লবের মহানায়ক কর্নেল সৈয়দ ফারুক রহমান ও তার সহযোগী এবং আরব বিশ্বের অবিসংবাদিত হিজবুল্লাহ নেতা বিপ্লবী বীরঃ হাসান নাসরুল্লাহ এবং চেচনিয়া, ফিলিস্তিন, ইরাক, আফগানিস্তান, কাশ্মীরের স্বাধীনতাকামী মুজাহিদ এবং ৭১- এর শহীদ মুহাজির ও অগণিত শহীদানের উদ্দেশে

মুখবন্ধ

খন্দকার এম আমিনুল হক একজন সাহসী দেশপ্রেমিক ব্যক্তি। কয়েক বছর আগে তিনি '**আমি আলবদর বলছি**' বইখানি লিখে এবং তা প্রকাশ করে সেই দুঃসাহসেরই প্রমাণ দিয়েছিলেন। "**আমি আলবদর বলছি**" বইখানির তিনি অতি সম্প্রতি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। এই সামপ্রতিক সংস্করণে তিনি আমার একখানা পত্র সংযুক্তিতে দিয়েছেন। পত্রখানা আমি তাকে ঢাকায় লণ্ডন থেকে লিখেছিলাম, বস্তুতঃ সেই প্রথম সংস্করণের বইখানা লণ্ডনে পাবার পর একটি প্রাপ্তি স্বীকার স্বরূপ।

২০০৭ সালের শুরুতে তিনি যখন তার আর একখানা বই '**দুই পলাশী দুই মীরজাফর**' এর পাণ্ডুলিপিটি আমাকে দেখার জন্য দেন, তখন আমি এটি পড়ে দেখি। কিছু পরামর্শও দেই। সেসব পরামর্শের কিছু কিছু তিনি গ্রহণ করেন। আমি এজন্য খুশী হয়েছি। কেননা ১৭৫৭ সালের পলাশীর চরম বিপর্যয়ের সাথে বাংলাদেশের দ্বিতীয়বারের স্বাধীনতার 'নায়ক বলে পরিচিত' খল নায়কটির হুবহু মিল যে আছে, তা অনেক ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন। জনাব হকের মত আমি নিজেও করি।

'**দুই পলাশী দুই মীরজাফর**' এর পাণ্ডুলিপিটি বই এর আকারে প্রকাশিত করতে যে উদ্যোগ তিনি নিয়েছেন, তা তার সৎসাহস, গভীর দেশপ্রেম এবং মুসলিম জাতিসত্তার অব্যাহত অগ্রগতির প্রতি তার চরম আদর্শিক কমিটমেন্টের একটি অনুকরণযোগ্য বাস্তব নমুনা বটে। দুনিয়াব্যাপী মুসলমানদের এই অতি দুঃসময়ে এমন ভাল কাজ- কাম যারা করেছেন বা করতে পারেন, তারা যে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ইমানদারীর ও নিষ্ঠার উজ্জল স্বাক্ষর রাখছেন বা রাখবেন তাতে আমার তিলমাত্রও সন্দেহ নাই। স্মরণযোগ্য যে দুনিয়ার মানবকূল দুর্ভাগ্যজনকভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি হচ্ছে গোমরাহীর ও অন্যটি হচ্ছে- মানবতার সঠিক মুক্তির ও সঠিক অর্থেই আজাদীর। জনাব আমিনুল হকের আগের এবং এখনকার কাজটি গোমরাহীর বিরুদ্ধে এবং মানবতার আজাদীর পক্ষের এক একটি মহান অবদান বলেই আমি বিশ্বাস করি। বাংলাদেশের মানুষের সার্বিক আজাদীর লক্ষ্যে তার এই কাজটিও যে ইতিহাসে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে তাতে আমার কোনই সন্দেহ নাই। এদেশের মুসলিম জাতিসত্তার স্বরূপ নিয়ে যারা দ্বিধা- দ্বন্দ্বে ভোগে তাদের জন্য আমিনুল হকের এই বইটি যে একটি সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারে, তা বোধ করি বলাই বাহুল্য।

পরিশেষে আমি মহান আল্লাহর কাছে মোনাজাত করি, লেখকের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সার্বিক সামর্থ্যের জন্য যা দিয়ে তিনি আরো অনেক ভাল কাজ- কর্ম করার সুযোগ পান। সেই সাথে অতি গুরুত্বপূর্ণ এই বইখানির মুখবন্ধটি লিখে দেয়ার জন্য তিনি আমাকে যে সুযোগ দিয়েছিলেন, সেজন্য তাকে এই সাথে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

তারিখ : ০৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০৭ইং মোহাম্মদ তাজাম্মুল হোসেন

অভিমত

স্নেহাস্পদ কে, এম, আমিনুল হক আমাকে তাঁর একখানি পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি '**দুই পলাশী দুই মীর জাফর**' পড়ে অভিমত লিখে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। আমি এর আগেও তাঁর প্রকাশিত তিনটি বই পড়েছি। দেখেছি তাঁর সাহসিক সিদ্ধান্ত সঠিক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। একজন মুজাহিদের জানবাজি দেশপ্রেমের ঈমানি দায়িত্ব সর্বোপরি নিজ জন্মভূমির অখণ্ডতা রক্ষাসহ শির অবনত না করার মহান প্রত্যয়ে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি।

কলেজ জীবনে যখন ধাপে ধাপে অল্প বয়সে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন বিলাসী আগ্রাসী ভারত দ্বারা তিনদিকে বেষ্টিত নিজ দেশের ভূ- প্রকৃতিগত রাজনৈতিক অবস্থানের বিষয়ে সুদূরপ্রসারী দূরদৃষ্টি থাকা অনেকটাই বিস্ময়ের। আজ দেশের ১৪ কোটি মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে- বুঝে ফেলেছে '৭১ সালে কি ঘটেছিল এবং কি খেলা চলেছে এ দেশটা নিয়ে এখনোবধি। "**আমি আলবদর বলছি**" বইখানিতে দু'টা দিক দেখেছি একটি হলো দেশের সংঘাতে বিবদমান দুটি আদর্শের ঐতিহাসিক লড়াই। অন্যটি হলো এতে তাঁর আত্মজীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। তাই ঐ বইখানিকে ইতিহাসের অপর দিকে বলা চলে নবাব সিরাজের উপর ডাহা মিথ্যা অত্যাচার অনাচারের দোষারোপ করে ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধ এবং পরবর্তী ২১৪ বছর পর ১৯৭১ সালে এককালের পূর্ব- পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশের ভিতরে যে ঘটনা প্রবাহ ঘটেছিল তার ঐতিহাসিক মিল, সাজুস্য ও উদ্দেশ্য খুঁজে পেয়ে বর্তমান প্রজন্মের জন্য ভবিষ্যতের ইতিহাস সমৃদ্ধির ফসল রেখেছেন কে এম আমিনুল হক আমার ধারণা।

১৯০ বছর ধরে গোলামী করার পর সকল ষড়যন্ত্র ঘাত- প্রতিঘাত মোকাবিলা করে একটি মহান জাতি যখন নতুন করে মেরুদণ্ড খাড়া করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার একটা ঠাঁই অর্জন করল তখন থেকেই আরম্ভ হলো আর এক নতুন ষড়যন্ত্র। ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ছিল ২টা বৈরী জাতি ইংরেজ ও ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষক দল। ১৯৪৭ পরবর্তীতে একমাত্র বৈরীশক্তি হলো হিন্দুস্তানের ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসককূল। আর দেশের অভ্যন্তরে রইলো তাদের সক্রিয় অনুচর তাঁবেদার। রাজনৈতিক পরিভাষায় যাদের বলা হয় ৫ম বাহিনী। এটা পরিষ্কারভাবে লেখক ইতিহাসের অকাট্ট প্রমাণ সাপেক্ষে তুলে ধরেছেন।

লেখকের সিদ্ধান্ত ও মত '৭১ এর সংঘাত ভ্রান্ত না অভ্রান্ত তা বুঝা যায় পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাস থেকে। সামান্য কথায় যদিও বলা যায় না, আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা যে বানোয়াট মিথ্যা নয় তা শেখ মুজিব ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে ফিরে এসে রমনা রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় স্বীকার করে সদর্পে ঘোষণা করে বলেন তিনি নাকি ১৯৪৮ সাল থেকেই এ দেশকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করতে চেষ্টা করছিলেন।

এটা আরো স্পষ্ট হয়েছে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল আজকের বাংলাদেশের পতনের পর দিল্লীর লাল কিল্লার জনসভায় আগ্রাসি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর ঘোষণায়। তিনি উল্লাসে ফেটে পড়ে দম্ভ ভরে বলেন, 'হ্যাঁম হাজার সালোকা বদলা লে লিয়া। হাজার সালোকা স্বপন সফল হুয়া"। ১০০০ বছরের প্রতিশোধ নাকি নিয়েছেন হিন্দুস্তান। তাদের স্বপ্নও নাকি সফল হয়েছে।
"মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় নিষিক্ত ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কেন্দ্র বিন্দু" শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন সরকারের নতজানু, নির্লিপ্ত ও নীরব ভূমিকায় বর্গীবেশে ভারতীয় সৈন্যের অবাধ লুণ্ঠনসহ ভারতীয় শকুন মারোয়ারীদের লুটতরাজে ২৪ বছরের সঞ্চিত এদেশের সম্পদ লোপাট হলো, নেমে এলো '৭৪- এর দুর্ভিক্ষ। ১০ লক্ষাধিক মানব সন্তানের অকাল মৃত্যু হলো। গাইবান্ধা রেল ষ্টেশনে সে সময়ে একদিন একজন মানুষের বমি নিয়ে মারামারি করে দু'জন ক্ষুধার্ত মানব সন্তানের ভাগ করে খাওয়ার কথাও ইতিহাসে সাক্ষী হয়ে আছে।

বাপ- মায়ের একমাত্র পুত্র সন্তান কে এম আমিনুল হক দশ বছর কারান্তরীণের কারণে স্নেহময়ী মাতা ও পিতার মৃত্যু শয্যার পাশে থাকতে পারেননি। এ করুণ ঘটনায় তিনি মনের দৃঢ়তা হারাননি। বন্দিকারা থেকেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রি লাভ করেন। জেল থেকে ১৯৮১ সালে মুক্তি পেয়ে তিনি দেখতে পান মা- বাপের শূন্য বিছানা। যে মহীয়ান মাতা, কামেল পিতা মরহুম কেএইচএম এ গনিশাহ তাঁদের একমাত্র সন্তান ও ওয়ারিশকে দেশের ক্রান্তিকালে দেশের জন্য উৎসর্গ বা হাদিয়ায় ওয়াকফ করে দিতে পারেন- এমন দৃষ্টান্ত দুনিয়ায় বিরল। মহামহিমাময় আল্লাহ নিশ্চয়ই তাঁদের মাগফেরাত কবুল করেছেন বা করবেন। ছুম্মা আমিন!

তারপরেও তার জেহাদি চেতনার কমতি নেই। তিনি জাতীয় সংসদ নির্বাচন করেন দু'বার। রাষ্ট্রীয় মেহমান হয়ে তিনি ইরানের মহান ইসলামী বিপ্লব দেখার জন্য ইরান সফর করেন। এ সালেই তিনি বাংলাদেশের হাজী

সমিতির সেক্রেটারী হিসেবে সভাপতি কাজি আজিজুল হকসহ পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেন এবং পবিত্র মক্কা শরীফে মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও ইহুদী-খৃস্টান চক্রের বিরুদ্ধে ইরান, বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৯৩ হাজার হাজির প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে সৌদী পুলিশের দ্বারা অত্যাচারিত হন।

আমিনুল হকের অসামান্য পরিশ্রমের ফসল পুস্তক তিনটি নিশ্চয় দেশবাসীর জন্য বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। তাঁর মঙ্গলজনক সাফল্য, সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

এম, এ, তাহের

কলাম লেখক, সাহিত্যিক, ইতিহাস গবেষক, সমাজসেবক

গ্রন্থকারের কথা

এদেশে জাতিসত্তার বিভাজন চলছে। বাংলাদেশের সূচনা পর্ব থেকে আজ অবধি তিন তিনটা যুগ অতিবাহিত হলেও এদেশে বিভাজন প্রক্রিয়া থেমে থাকেনি। কারণটা কি?

ভারতের জাতিসত্তায় সম্ভাব্য শতাধিক ভাঙনের চিড়ধরে আছে। কিন্তু এর উৎকট প্রকাশ উচ্চকিত হয় না কখনো। সেখানকার সংবাদ মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আচরণে অথবা রাজনৈতিক কর্মসূচীতে সরব ভাঙন প্রক্রিয়া অনুপস্থিত যদিও সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে।

কিছু অসংলগ্ন অভিব্যক্তির গুঞ্জন আবর্তিত হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যেকটি জাতিসত্তায় ঐক্যের অনুরণন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য আমাদের পঞ্চমবাহিনী বিশ্বাসঘাতকরা জাতিসত্তা বিভাজন প্রক্রিয়ার বিশেষ বিশেষ দিবসের সুনির্দিষ্ট ল্যাণ্ডমার্কসমূহ উচ্চকিত করে বছরে কয়েক মাস ব্যাপী অপপ্রচারের জোয়ার আনে এবং দেশপ্রেমিক জনগোষ্ঠীর একাংশকে অপশক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে জাতি সত্তাকে অনৈক্যের আবর্তে নিক্ষেপ করে চলেছে প্রতিনিয়ত পরিকল্পিতভাবে। কিন্তু কেন?

এই কেন? এর উত্তর অনুসন্ধানের আকাঙ্ক্ষা কারো কারো মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না এমনটি নয়। কিন্তু পঞ্চমবাহিনী ও তাদের সহযোগী শক্তিসমূহের সমস্বর কলকাকলি, সরব উল্লাস ও আবেগময় উচ্ছ্বসিত প্রচারণার তোড়ে অনুসন্ধানীদের আকাঙ্ক্ষা হারিয়ে যায় অপমৃত্যুর অতল গহ্বরে। একারণে আজকের ইতিহাস একপেশে। এই একপেশে ইতিহাসে পঞ্চমবাহিনী বিশ্বাসঘাতকদের আজ জাতীয় বীর হিসেবে আর দেশপ্রেমিকদের অপশক্তি ভিলেন হিসেবে চিহ্নিত করে চলেছে।

ভারতে যারা বহিরাগত তারা ভূমি সন্তানদের মাথার ওপর ছড়ি ঘুরাচ্ছে। ১৫ শতাংশ বহিরাগত ৮৫ শতাংশ ভূমি সন্তানদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে। ভারতের ১৫ শতাংশ ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের ৮৫ শতাংশ সম্পদ কুক্ষিগত করে রেখেছে, বহুকাল ধরে এখানকার ৮৫ শতাংশ মানুষ নিপীড়িত হয়ে চলেছে এবং নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছে আজ অবধি।

শতাব্দীর পর শতাব্দী এই বহিরাগত ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। এই আধিপত্যবাদী শক্তির কায়েমী স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবার সম্ভাবনা যে সব উপাদানে নিহিত রয়েছে সে সব উপাদানের শক্তি ও সামর্থ্য ফোকলা করে দেয়ার জন্য নিত্য নতুন কৌশল অবলম্বন

করতে হয় তাদের নিজেদের আধিপত্যবাদী কায়েমী স্বার্থ অক্ষুন্ন রাখার জন্য।

এখন কিছু জিজ্ঞাসা উপ্ত হওয়া স্বাভাবিক, বহিরাগত প্রতিরোধকামী সংখ্যাগুরু ভূমি সন্তানরা পর্যুদস্ত হয়েছিল কিভাবে? কিভাবে আজো তারা ভূমি সন্তানদের মাথা তোলার সাহস কেড়ে নিয়ে বিশাল জনগোষ্ঠীকে দুর্বল দলিত করে রেখেছে, আমরা জানি না। কিভাবে প্রগতিশীল শক্তি বৌদ্ধবাদীদের উত্থান হয়েছিল? শতাব্দীর পর শতাব্দী ভারত শাসন করা সত্ত্বেও কিভাবে তাদেরকে ভারত ভূমি থেকে উৎখাত ও বিতাড়িত হতে হয়েছিল আমরা তা জানিনা। কিভাবে এই ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি প্রবল প্রতাপশালী মুঘলদের কুড়ে কুড়ে নিঃশেষ করে বৃটিশ বেনিয়াদের হাতে তুলে দিয়েছিল আমরা তা জানিনা। কিভাবে বাংলার মুসলমানদের শৌর্য বীর্য কেড়ে নিয়ে একবারে লাঙ্গলের পেছনে ঠেলে দিয়ে পর্যুদস্ত ব্রাহ্মণ্য শক্তির উত্থান ঘটিয়েছিল আমরা তা জানিনা। আমরা জানিনা বৃটিশ শাসন অবসানে সর্বভারতীয় মুসলমানদের সংগ্রামের ইতিহাস। কায়দে আজমের দূরদৃষ্টি ও অনমনীয় নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ্যষড়যন্ত্রের অক্টোপাস ছিন্ন করে ভারতের মানচিত্র ভেঙে মুসলিম ভুখণ্ড পাকিস্তানের অভ্যুদয় উপমহাদেশ এবং দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য আশির্বাদ ছিল কিনা। আমরা জানিনা বাংলা খণ্ডিত হওয়ার ব্যাপারে ব্রাহ্মণ্য ষড়যন্ত্রের ইতিবৃত্ত। আমরা জানিনা সাত চল্লিশে মুসলিম বাংলার নব উত্থান, অতঃপর আবারো স্বাধীনতা মুক্তি ও তথাকথিত সোনার বাংলার আদলের নবতর বিপর্যয়। সমৃদ্ধির পথ থেকে পদস্খলন এবং আবারো তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত হওয়ার সত্যিকার ইতিহাস। এসব ইতিহাসের বড় বড় বাঁকগুলোকে আমাদের দৃষ্টি সীমানা থেকে সরিয়ে রাখার অদম্য প্রয়াস চলছে তথ্য ও ইতিহাস বিকৃতির মধ্যদিয়ে। অপ্রাসঙ্গিক ও আবেগ নির্ভর বিষয়গুলোর অবতারণা করে বিভাজন প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে জাতিসত্তাকে ভাঙতে ভাঙতে শক্তিহীন নিষ্ক্রিয় করে ফেলেছে। অথচ আমরা স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে নেশাগ্রস্তের মত ঢুলছি।

ইতিহাসের সত্যিকার উপলব্ধি থেকে আমরা অনেক দূরে। আমি আমার অনুভব ও গভীর উপলব্ধি দিয়ে ইতিহাস হাতিয়ে যা পেয়েছি সেই বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত তত্ত্ব ও উপাত্ত দিয়ে সত্যিকার গণবিরোধী শক্তি এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিপর্যয়কর সব ঘটনার নেপথ্য শক্তি ও একটি সুসংগঠিত ও চতুর প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি চলমান এই গ্রন্থে। আমার এই ছোট্ট প্রয়াস হাজার হাজার বছরের বহমান ইতিহাসের মূল্যায়ন হিসেবে যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে কোন বিজ্ঞ ইতিহাসবিদ যদি বিস্তৃত আলোচনার অবতারণা করে বিভ্রান্ত ও সম্মোহিত এ জাতিকে মূল্যবান গ্রন্থ দেবার উদ্যোগ নেন তাহলে আমি সবচেয়ে বেশী খুশী হব। আমার ছোট্ট গ্রন্থের ক্ষুদ্র পরিসরে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ অতি অল্প। আমার এই গ্রন্থটি বহমান একটি বিশাল ইতিহাসের আউট লাইন মাত্র।

আমার এই মহৎ প্রয়াসে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ক্ষমা প্রার্থী তাদের কাছেও এ গ্রন্থটি যদি কারো মানসিক যন্ত্রণার কারণ হিসেবে বিবেচিত হয়। কোন মনোযোগী পাঠক যদি এই গ্রন্থ পাঠে চলমান বিভ্রান্তি সম্মোহন ও নেশার ঘোর থেকে বেরিয়ে আসে তাহলে তার প্রতি আমি আমৃত্যু কৃতজ্ঞ থাকব। আল্লাহ হাফেজ!

সাবিয়া নগর, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ
তাং : ০৪- ০৫- ০৭ইং

বিনীত
কে এম আমিনুল হক

তৃতীয় সংস্করণের ভূমিকা

বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দের তাগিদ, উৎসাহ, সহযোগিতায় গ্রন্থটির তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশের উদ্যোগ নেয়া হল। গ্রন্থটির আকর্ষণীয় দিক হল এর বিষয়বস্তু। কেউ জানুক অথবা না জানুক কেউ বুঝুক অথবা না বুঝুক উপমহাদেশের মুসলমানদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র চলছে এক হাজার বছর ধরে।

যে নেপথ্য ষড়যন্ত্রের কারণে ভয়াবহ সংকট আমাদের দিকে ধেয়ে আসছে যে ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়ার জন্য আমার এই গ্রন্থটির অবতারণা করা হয়েছে। আমি দেখতে পাচ্ছি বঙ্গোপসাগরের উপকূলে আকাশ কাঁপান সংকট আগামী একদা আছড়ে পড়বে। সেদিনের জন্য যদি এখনই আমরা সতর্ক হতে না পারি তাহলে সম্ভাবনাময় এই বিশাল জনগোষ্ঠীকে ভয়ঙ্কর এক দানবের সম্মুখে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকতে হবে। এই জন্য ইতিহাসের সূত্র ধরে আমি সেই ভয়ঙ্কর দানবকে চিহ্নিত করেছি; চিহ্নিত করেছি তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য।

অতি প্রাচীন সভ্যতার উত্তরাধিকারী এই উপমহাদেশ এ সত্ত্বেও এখন পর্যন্ত পৃথিবীর সবচাইতে পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠীর আবাস ভূমি এটা। এর কারণ হিসেবে ইতিহাসের সূত্র ধরে আমি যা পেয়েছি সেটা হল একটি বিশেষ জনগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র। জনগণের মধ্যে ভেদ রেখা টেনে জনগণকে বিভক্ত করে সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর কায়েমী স্বার্থ সমুন্নত করার ষড়যন্ত্র।

ইতিহাস হাতড়ে যতটুকু জানা যায়- ঐতিহাসিক কার্যকারণ সমূহের অবতারণা করে দেখান হয়েছে যে একটা বিশেষ জনগোষ্ঠীর চলমান ষড়যন্ত্র জনগণের মধ্যে ভেদ রেখা টেনে সাধারণ মানুষের কর্মস্পৃহা এবং উদ্ভাবনী শক্তিকে স্থবির করে রেখেছেন কিভাবে। এটা করা হয়েছে শুধু মাত্র সংশ্লিষ্ট জনগোষ্ঠীর হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য।

উপমহাদেশের সভ্যতা অতিপ্রাচীন। ইতিহাসের শুরু থেকে এই উপমহাদেশে বনি আদমের আধিবাস ছিল বলে মনে করা হয়। অতিসামপ্রতিক গবেষণা থেকে জানা যায় যে এ অঞ্চলের অধিবাসিরা হযরত নূহ (আঃ)- এর অনুগামী ছিলেন। নূহ (আঃ)- এর মহাপ্লাবনের কিছু তত্ত্ব উপাত্ত এখানকার প্রাচীন ধর্মগ্রন্থসমূহে বিধৃত রয়েছে। কালক্রমে এখানকার অধিবাসীরা অহিলব্ধ জ্ঞান থেকে অনেক দূরে সরে যায়। এর মূলে রয়েছে উপরোল্লিখিত জনগোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবাদী ষড়যন্ত্র। এই ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এই উপমহাদেশের ভূমি সন্তান নয় বহিরাগত। এরা মধ্যপ্রাচ্য ও রাশিয়ার ইহুদীদের হারিয়ে যাওয়া জনগোষ্ঠী। খাদ্যাভাব অথবা অন্য যে কারণেই হোক তারা তাদের আধিনিবাস পরিত্যাগ করে নতুন আবাসের সন্ধানে বেরিয়ে পরে। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রমের মধ্যদিয়ে তারা উপমহাদেশে প্রবেশ করে। এখানে এসে তারা ভারতবর্ষের ভূমি সন্তানদের দ্বারা প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কূটবুদ্ধি এবং সুদীর্ঘ পথ অতিক্রমের অভিজ্ঞতা এবং যুদ্ধ ও আপোষের মধ্যদিয়ে বৈরি পরিবেশকে নিজস্ব নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে তারা উপমহাদেশের প্রতিরোধকামী আধিবাসি ভূমি সন্তানদের ওপর বিজয়ী হতে সক্ষম হয়। এবং ভূমি সন্তানদের অক্টোপাশের মত বেঁধে ফেলে ধর্মের খোল নালচে পাল্টে নতুন করে ধর্মাচার চালুর উদ্যোগ নেয়। শুধু তাই নয় ভূমি সন্তানদের বোকা বানিয়ে এদের ধর্মকে তারা নিজেরা গ্রাস করে এবং নতুন করে সংযোজন ও বিয়োজন করে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের উদ্যোগ নেয়। সম্ভবত ব্রাহ্মণ্যচক্র এখানকার ভূমি সন্তানদের চেয়ে জ্ঞান গরিমা ও কৌশলের দিক দিয়ে অগ্রসর ছিল বলেই এটা সম্ভব হয়েছিল। বিজয়ী ব্রাহ্মণ্যবাদীরা উপমহাদেশের সর্বত্র নতুন করে পিড়ামিড আকৃতির সমাজ কাঠামো গড়ে তুলে এবং পিরামিডের শীর্ষে অবস্থান নেয় ব্রাহ্মণ্যবাদীরা আর সর্বনিম্নস্তরে ঠেলে দেয় এখনকার ভূমি সন্তানদের। পুরো সমাজটার ভার বইতে হয় ব্রাহ্মণ্যচক্র নির্মিত নিম্নবর্ণের আধিবাসী দলিতদের। এরা এইসব ব্রাহ্মণ্যবাদীরা একদিন দু'দিন নয় হাজার হাজার বছর ধরে সমগ্র ভারতকে দহন করতে থাকে। এমতবস্থায় বৌদ্ধ ধর্মের উদ্ভব হয়। বৌদ্ধবাদ তখনকার দিনে ছিল একটি বিপ্লব। এই বৌদ্ধবাদীরা ব্রাহ্মণ্য দুঃশাসনের সম্মুখে হিমাচলের মত প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি শত শত বছর ধরে আগ্রাসী শক্তির মুকাবিলা করে রাজদন্ড হাতে নিয়ে সুশাসন প্রতিষ্ঠা করে। এই সময় ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সম্মুখ সমর পরিহার করে কূট কৌশলের আশ্রয় নেয়। তারা ক্ষমতার বাইরে থাকা বৌদ্ধবাদীদের মস্তিষ্কে ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে বিষ ঢালতে শুরু করে। আজকের মত সেদিনও যারা ব্রাহ্মণ্যবাদীচক্রের ফাঁদে পা রেখেছিল তাদেরকে প্রগতিশীল বলে আখ্যায়িত করা হয়। তখনকার পরিভাষায় তাদেরকে বলা হত মহাজান। আজকের মত সেদিনও বৌদ্ধদের মধ্যকার তথাকথিত প্রগতিশীল ব্রাহ্মন্যবাদীদের প্রশংসা পৃষ্ঠপোষকতা ও বৈষয়িক সাহায্য পুষ্ট হয়ে বৌদ্ধ ধর্ম ও ধর্মাচারের বিরোধিতা করতে থাকে। যারা বৌদ্ধ ধর্ম আকড়ে থাকে তাদের হীনযান বলা হত। এরপর এই হীনযান ও মহাজানদের সংঘাত শুরু হয়। সম্মিলিত ব্রাহ্মণ্য শক্তি এবং বৌদ্ধদের বিদ্রোহী শক্তি সমন্বয়ে মহাজোট সৃষ্টি হয়। এরপর শুরু হয় বৌদ্ধ ধর্মের

অবক্ষয়। শেষ পর্যন্ত সমগ্র বৌদ্ধবাদীদের বৌদ্ধ ধর্মের সুতিকাগার ভারতবর্ষ থেকে উৎখাত হতে হয় বড় নিষ্ঠুর মর্মান্তিক ও নির্মমভাবে। যারা টিকে থাকে তারা নাম মাত্র বৌদ্ধ। তারা টিকে থাকে নিজস্ব মৌলিকত্ব হারিয়ে ব্রাহ্মণ্য সৃষ্ট ধর্মচার এবং কালচার আঁকড়ে ধরে। উপমহাদেশ হারিয়ে যায় অন্ধকারে।

অতঃপর উপমহাদেশ দীর্ঘ তমস্যা বিদীর্ণ করা আলোর পূর্বাভাস দেখতে পায় মুহাম্মদ বিন কাশিমের সিন্ধু বিজয়ের মধ্যদিয়ে। এরপর সুলতান মাহমুদ ১৭ বার আঘাত হেনে কায়েমী স্বার্থবাদী চক্রের বেরিকেটগুলো ভেঙ্গে গুরিয়ে দেয়।

সর্বশেষ আঘাত হানেন মুহাম্মদ ঘোরী। তিনি উপমহাদেশ ঘিরে ব্রাহ্মন্যবাদী চক্রের সকল দুর্গ এবং সর্বশেষ দুর্গ ভাঙতে সক্ষম হন। তখন উপমহাদেশ শান্তি সাম্য ও সৌভ্রাতৃত্বের নতুন আলোর ঝলকানী দেখতে পায়। নতুন সভ্যতায় স্নাত হয় উপমহাদেশ। এরপর শুরু হয় মুসলিম রাজদরবারে ব্রাহ্মন্যবাদী চক্রের সেই পুরান খেলা। এই খেলা এই ষড়যন্ত্র ছিল মুসলিম রাজশক্তির তখত্ ঘিরে।

ক্ষমতাসীনরা ব্রাহ্মণ্যবাদী ষড়যন্ত্র কখনো উপলব্ধি করেছে, কখনো থেকেছে বেখবর। এদের প্ররোচনায় মুসলমানদের মধ্যে শুরু হয়েছে ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধ ও আত্মহনন। এরপর দৃশ্যে এসেছেন মধ্য এশিয়ার উচ্চাবিলাশী রাজপুরুষ সম্রাট জহির উদ্দিন বাবর। তিনি পানি পথের যুদ্ধে ইব্রাহীম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লীর সিংহাসনে সমাসিন হন। দিল্লীতে বাবর তার শক্তি সুসংহত করার আগেই মাত্র এক বছরের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাদের সম্মিলিত হিন্দু শক্তিকে সুসংহত করে ফেলে। উদ্দেশ্য বাবরকে উৎখাত ও বিতাড়িত করে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের স্বরাজ প্রতিষ্ঠা করা। আকস্মিক যুদ্ধে সম্মুখীন হতে হল বাবরকে। মাত্র ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে তিনি হিন্দুদের সম্মিলিত বাহিনীকে পরাস্ত করতে সক্ষম হন। এই খানুয়ার যুদ্ধের পর ব্রাহ্মণ্য শক্তি তাদের কৌশল বদলে ফেলে। তারা তাদের পুনরুত্থানের ব্যাপারে সন্মুখ সমরের কর্মসূচী থেকে সরে এসে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের পথ ধরে। সেই থেকে শুরু হয় মুসলিম বিরোধী ষড়যন্ত্র যার শেষ এখনো হয়নি।

এ সংক্রান্ত ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যগুলো টেনে এনে অকাট্য যুক্তির মাধ্যমে দেখান হয়েছে চোখে আঙ্গুল দিয়ে কিভাবে তারা মুসলিম রাজশক্তিকে দুর্বল করেছে, কিভাবে মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের সূচনা করা হয়েছে, কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে পলাশীর বিপর্যয়। কিভাবে মুসলমানদেরকে ভারতবর্ষ থেকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র চালান হয়েছে। দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্যদিয়ে অর্জিত পাকিস্তানকে কিভাবে খণ্ডিত করা হয়েছে। কিভাবে সংঘটিত হয়েছে ঢাকার পতন এবং ষড়যন্ত্রের আগামী দিন কত বিস্তৃত এসব কিছুর বিশ্লেষণাত্বক বিবরণ এই গ্রন্থের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিধৃত করেছি।

এই গ্রন্থের মধ্য দিয়ে আমি আমাদের আগামী প্রজন্ম এবং আগামী নেতৃত্বকে সতর্ক সংকেত দেবার চেষ্টা করেছি। এই সতর্ক সংকেত কারো অনুভবকে যদি আন্দোলিত না করে তাহলে বুঝতে হবে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সচেতন অথবা অবচেতন ভাবে ষড়যন্ত্রের ফাঁদে আটকে রয়েছেন। আমাদের সতর্ক উদ্যোগ সত্ত্বেও ত্রুটি বিচ্যুতি থাকতেই পারে। বিজ্ঞ পাঠকবৃন্দ যদি আমাদের এই উদ্যোগকে ক্ষমা সুন্দর চোখে দেখেন তাহলে আমরা বাধিত হব।

গ্রন্থটির চলমান সংস্করণে মুজিব ইন্দিরা ভূট্টোর সাক্ষাৎকার সংযোজন করেছি। সাক্ষাৎকার গ্রহণে ইটালীর বিখ্যাত সাংবাদিক (ওরিয়ানা ফালাচি- ১৯৭২) পলাশী ও মুজিব নগর ষড়যন্ত্রের সাদৃশ্য সংক্রান্ত একটি অধ্যায়ও সংযোজন করা হয়েছে। বিষয়টি এবং সম্পূর্ণ গ্রন্থটি বিজ্ঞ পাঠকদের সংবেদনশীল মননে নতুন তুলির আচড় টানতে সক্ষম হবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি তাদের কাছে অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যারা এই গ্রন্থটি গ্রন্থনার ব্যাপারে আমাদের সার্বিকভাবে বিরল সহযোগিতা করেছেন। গ্রন্থটি পাঠকদের অনুভবকে নাড়া দিলে আমাদের উদ্যোগ সফল হয়েছে বলে আমরা মনে করব। আল্লাহ হাফেজ!

কে এম আমিনুল হক
১৫ আগস্ট, ২০০৯

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

উপক্রমনিকা θ ১

প্রথম অধ্যায়

ভারত থেকে বৌদ্ধ উৎখাতে ব্রাহ্মণ্যবাদী ষড়যন্ত্র θ ৩
বাংলার ১৪ শতকের অভিজ্ঞতা θ ৮
উপমহাদেশ প্রসঙ্গ θ ১১
তিন প্রজন্ম প্রকল্প θ ১২
বাস্তবায়ন শুরু θ ১২

দ্বিতীয় অধ্যায়

পলাশী বিজয়ের পটভূমি θ ১৫
বৃটিশ শাসনের পূর্বে সুবাহ বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা θ ২০

তৃতীয় অধ্যায়

পলাশী নাটকের গ্রীন রুমে θ ২৪
ইংরেজদের সাথে বিরোধের সূচনা θ ২৬

চতুর্থ অধ্যায়

পলাশীর পরে θ ৩৫
ষড়যন্ত্রকারীদের পরিণতি θ ৩৯
মিরণ θ ৩৯
মুহাম্মদী বেগ θ ৪০
মীর জাফর θ ৪০
জগৎশেঠ মহাতাপ চাঁদ এবং মহারাজা স্বরূপচাঁদ θ ৪১
রবার্ট ক্লাইভ θ ৪১
ইয়ার লতিফ খান θ ৪২
মহারাজা নন্দ কুমার θ ৪২
রায় দুর্লভ θ ৪৩
উমি চাঁদ θ ৪৩
রাজা রাজ বল্লভ θ ৪৩
দানিশ শাহ বা দানা শাহ θ ৪৩
ওয়াটস্ θ ৪৪
স্ক্রাফটন θ ৪৪
ওয়াটসন θ ৪৪
মীর কাশিম θ ৪৪

পঞ্চম অধ্যায়

কোম্পানীর রাজস্ব নীতি θ ৪৫
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত θ ৪৭
মহাজনদের অত্যাচার θ ৫১
নীলকরদের অত্যাচার θ ৫১
লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত θ ৫২

ষষ্ট অধ্যায়

শতাব্দী কালের প্রতিরোধ যুদ্ধ অতঃপর হতাশা θ ৫৭

সপ্তম অধ্যায়

সিপাহী বিপ্লবের পর কেড়ে নেয়া হল মুসলমানদের মুখের ভাষা θ ৬২
শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছু হটিয়ে দেয়া হল θ ৬৪
বৃটিশ ও বর্ণ হিন্দুদের উদ্যোগে ধ্বংস করা হল বাংলার শিল্প θ ৬৫

অষ্টম অধ্যায়

বঙ্গভঙ্গ ও মুসলমানদের নব চেতনার উন্মেষ θ ৭০
সর্বশেষ সতর্ক সংকেত θ ৭৪

নবম অধ্যায়

পাকিস্তান প্রস্তাব ও মুসলমানদের নবযাত্রা θ ৭৮
বাংলা বিভক্তির ষড়যন্ত্র θ ৭৯
বাংলা খণ্ডিত হল বর্ণ হিন্দু ষড়যন্ত্রে θ ৮০

কোলকাতা নিয়ে বৃটিশ হিন্দু ষড়যন্ত্র θ ৮১
পাকিস্তান দাবীর প্রেক্ষিতে হিন্দু নেতৃবৃন্দ θ ৮২
সম্ভাবনাহীন ভূখণ্ড নিয়ে পাকিস্তানের যাত্রা শুরু θ ৮২
হিন্দু নেতৃবৃন্দের প্রত্যাশা θ ৮৩

দশম অধ্যায়
বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা θ ৮৫
পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলার অগ্রগতি θ ৯১
বৈষম্য নিরসনের উদ্যোগ θ ৯৭
ওরা জানতো বিচ্ছিন্ন হলে কি ভয়ঙ্কর মূল্য দিতে হবে θ ১০১

একাদশ অধ্যায়
ভাষা আন্দোলন একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র θ ১০৫

দ্বাদশ অধ্যায়
যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের নেপথ্যে θ ১২৭
হক সাহেবের মতিভ্রম θ ১৩০
পাগলা গারদে পরিণত হল পরিষদ কক্ষ θ ১৩৩
বিচ্ছিন্নতাবাদী বাম তৎপরতার সাথে আওয়ামী নেতৃবৃন্দ θ ১৩৬
প্রয়োজন হল একটি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব θ ১৩৯
স্বায়ত্বশাসন দাবীর আড়ালে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন θ ১৪০
বিচ্ছিন্নতাবাদে মার্কিন ইন্ধন θ ১৪২
সংহতির পক্ষে সোহরাওয়ার্দী θ ১৪৩

ত্রয়োদশ অধ্যায়
বিচ্ছিন্নতাবাদের বিদেশী ইন্ধন θ ১৫২
মুজিবের চাতুরীপূর্ণ অবস্থান θ ১৫৫
৬ দফার প্রতিক্রিয়া θ ১৫৭
ইসলাম পন্থীদের সুসময় θ ১৫৯
আগরতলা ষড়যন্ত্র উদঘাটন θ ১৬০

চতুর্দশ অধ্যায়
মুজিবের প্রতারণার ফাঁদে ইয়াহিয়া θ ১৬৭
ইয়াহিয়ার অঙ্গীকার θ ১৭১
গভর্নর আহসানের দুরভিসন্ধি ও বিচ্ছিন্নতাবাদের পালে হাওয়া θ ১৭২
নির্বাচনের পর মুজিব ভুট্টো θ ১৭৪

পঞ্চদশ অধ্যায়
বৈষম্য দূরীকরণে ইয়াহিয়ার উদ্যোগ θ ১৭৬
আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা θ ১৭৭
হিন্দুস্থানের সবুজ সংকেত θ ১৭৮
ইয়াহিয়ার সদিচ্ছার অভাব ছিল না θ ১৮০
পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় শাসনের অচলাবস্থা θ ১৮৩

ষষ্টদশ অধ্যায়
গনেশ উল্টে দে মা লুটে পুটে খাই θ ১৮৮
দিল্লীর সক্রিয় অবস্থান θ ১৯০
দায়ী কে? θ ১৯৩
বিপর্যয় এড়ানো যেত θ ১৯৪

সপ্তদশ অধ্যায়
প্ররোচিত যুদ্ধাবস্থা ও কূটনৈতিক উদ্যোগ θ ১৯৭
ইয়াহিয়ার সর্বশেষ উদ্যোগ θ ২০৩
রুশ ভারত সখ্যতার পটভূমি θ ২০৩

অষ্টাদশ অধ্যায়
স্বাধীনতার দৃশ্যপট θ ২০৫
নির্বাচনী ওয়াদা ছিল পাকিস্তানের সংহতির সপক্ষে θ ২০৬
স্বাধীনতার জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা হয়নি θ ২০৭
স্বাধীনতার পর নির্বিচার লুণ্ঠন θ ২১০
শিল্প সেক্টর ধ্বংস করা হল θ ২১৩

শ্রমিক শ্রেণীকে প্রভাবিত করার জন্য মুজিববাদের অবতারণা θ ২১৭
স্বজন প্রীতির প্লাবন θ ২১৯
আওয়ামী লীগের ইসলাম বিদ্বেষ ও মুসলিম বৈরিতা θ ২২০
বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ θ ২২২
মন্বন্তরের ছোবল θ ২২৮
মুজিবের নির্বাচন প্রহসন θ ২৩২
বাকশাল গঠন ও গণতন্ত্রের অপমৃত্যু θ ২৩৫
রক্ষীবাহিনীর সন্ত্রাস θ ২৩৯

ঊনবিংশ অধ্যায়

দুঃশাসনের যবনিকাপাত θ ২৪৩
আগস্ট বিপ্লবের পটভূমি θ ২৪৬
১৫ আগস্টের বিপ্লবী তৎপরতার
অধিনায়ক কর্নেল ফারুকের টেস্টামেন্ট θ ২৫২
কেন ১৫ আগস্ট ১৯৭৫? θ ২৫২
ভবিষ্যত কোনদিকে? θ ২৫৫
একাত্তরোত্তর দক্ষিণ এশিয়া বাংলাদেশ θ ২৫৭
পাকিস্তান θ ২৫৮
ভারত θ ২৬০
রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রবণতা θ ২৬২
কোন দেশের রাজনীতিতে কূটনীতিকদের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ নেই θ ২৬৪
ভারতের প্রত্যাশা ও বাংলাদেশের পানি সংকট θ ২৬৫
হুমকির মুখে বাংলাদেশের নিরাপত্তা θ ২৬৭
বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা θ ২৬৯
বঙ্গ ভূমি গঠনের ষড়যন্ত্র θ ২৭১
সীমান্তে বিএসএফ এর অপতৎপরতা θ ২৭২
উপসংহার θ ২৭৪
শেষ কথা θ ২৮২

পরিশিষ্ট

ইন্দিরা- মুজিব চুক্তি θ ২৯৪
মীর জাফরের চুক্তি θ ২৯৯
৭১'-এর স্মৃতি প্রসঙ্গে θ ৩০০
গণ জিজ্ঞাসা θ ৩০৮
ম্যাসেজ θ ৩০৯
শেখ মুজিবের উত্থান- পতন θ ৩০৯
সোনার বাংলায় পলাশীর অশনি সঙ্কেত θ ৩১৮

সাক্ষাৎকার

হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী θ ৩২৩
আবদুর রাজ্জাক θ ৩২৭
শেখ মুজিবুর রহমান θ ৩৪৪
ইন্দিরা গান্ধী θ ৩৫৪
জুলফিকার আলী ভূট্টো θ ৩৮০
আজাদের বাণী θ ৪১২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

উপক্রমণিকা

গ্রন্থের শুরু করছি একটি জিজ্ঞাসা দিয়ে- ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় কি- না? অনেকেই হয়তো বলবেন হয় না, আবার কেউ কেউ বলবেন হতে পারে। দুটোর কোনটিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। কেননা উভয়েই তাদের দাবীর পক্ষে ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ দলিল উপস্থাপন করতে পারবেন বলে আমি মনে করি। তবে আমার মনে হয় ইতিহাসের আনুষংগিক উপাদানগুলোর মধ্যে যদি সাদৃশ্য থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে পারে। তবে হ্যাঁ স্থান কাল পাত্র ভেদে আক্ষরিক আবর্তন নাও হতে পারে। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে যদি কেউ ইতিহাস বিশ্লেষণ করেন, যদি কেউ ইতিহাসের গতি প্রকৃতি ও চরিত্র সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করেন তাহলে দুটো ইতিহাসের সাদৃশ্য তিনি অনুভব করতে পারেন। তবে সকলেই সে সব অনুধাবন করতে সক্ষম নাও হতে পারেন।

আমার অনুভব দিয়ে পলাশীর বিপর্যয় ও একাত্তরের তথাকথিত বিজয়ের মধ্যে যে আক্ষরিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছি সেটারই চিত্রায়ন করব এই গ্রন্থে। আমার হৃদয়ের প্রতিধ্বনি কারো অন্তরে বাজুক অথবা না- ই- বাজুক, ইতিহাসের গভীরে হারিয়ে যাওয়া অনাবিষ্কৃত সত্যগুলো টেনে তুলে মুক্তোর দানার মত যদি আমি দৃশ্যমান করে তুলি তাহলে সে সবের পুনর্মূল্যায়ণ আপত্তিকর বলে মনে করা সঙ্গত হবে কি? হবে না। অধিকাংশ মানুষ আমার সাথে সহমত পোষণ করলেও আমি জানি আমাদের একটা বিরাট অংশ ঝড় তুলবেন চায়ের আড্ডা থেকে পত্রিকার দপ্তর পর্যন্ত। এদের যারা সচেতনভাবে দালাল ক্রীড়নক হিসেবে জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়ার জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য অর্জনের জন্য এখনো সক্রিয় তাদের সোচ্চার দাপটে আমার অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমি সঠিক চিত্র উপস্থাপনের ব্যাপারে কুণ্ঠিত হব না। গুটি কতক ঔপনিবেশিক দালালদের ঔদ্ধত্যের সম্মুখে সহমত পোষণকারী আমার সংখ্যাগরিষ্ট দেশবাসী নির্বাক হয়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করবেন হয়তো। ঔপনিবেশিক চক্রের সৃষ্ট রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবহ এখনো বিদ্যমান। আমি জানি এই বিদ্যমান পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা কোন মহল থেকে প্রতিবাদ

অথবা প্রতিরোধের ব্যাপারে একটি শব্দও উচ্চারিত হবে না। তবু অনাগত ভবিষ্যতের সত্যাগ্রহী চেতনাকে শাণিত করার জন্য রহস্য উদঘাটনের এমন একটি নয় অসংখ্য উদ্যোগ জরুরী। তা না হলে আধিপত্যবাদী ব্রাহ্মণ্য চক্র সৃষ্ট ধুয়াশায় নিমজ্জিত রয়ে যাবে আগামী প্রজন্ম এবং এ ভূখণ্ডে আগামী অনন্তকাল ধরে অব্যাহত থাকবে আত্মঘাতী ষড়যন্ত্র।

উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং এর ধারক ব্রাহ্মণ সমাজ। এ সমস্যা আজকে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে এমনটিও বলা যাবে না। এ সমস্যা শতাব্দী কালেরও নয় সহস্র সহস্রাব্দ আগে থেকে উপমহাদেশকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করছে। ব্রাহ্মণরা হল উপমহাদেশে বহিরাগত আর্য। যারা ছলেবলে কৌশলে উপমহাদেশের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। সেটা যেমন রাজনৈতিক, অনুরূপ সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকও বটে। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা ধীরে বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে তারা তাদের অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছে গেছে।

প্রথম অধ্যায়

ভারত থেকে বৌদ্ধ উৎখাতে ব্রাহ্মণ্যবাদী ষড়যন্ত্র

বর্তমান ভারতের কর্তৃত্ব যাদের হাতে রয়েছে সেই ব্রাহ্মণজনগোষ্ঠী ভারতের ভূমি সন্তান নয়। এরা আর্য। আর্যরা ভারতের ভূমি সন্তান নয়- বহিরাগত। তারা অভাব দারিদ্র্য খাদ্য সংকট প্রাকৃতিক বিপর্যয় অথবা যুদ্ধজনিত কারণে বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দিকে নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে আসে। আর্যদের আগমন সম্পর্কে সাম্প্রতিক ধারণা হল, খৃষ্টপূর্ব ৩ হাজার বছরের দিকে মধ্য অথবা পূর্ব ইউরোপের অংশে অথবা রাশিয়ার উরাল পর্বতমালার সমতল ভূভাগে ইন্দো ইউরোপীয় অথবা আর্য জাতির উদ্ভব হয়। অত্যধিক শীতের জন্য হোক অথবা অন্য জাতির আক্রমণের ফলেই হোক এ আর্যরা পিতৃভূমি হতে দক্ষিণ পূর্বে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। সভ্যতার দিক দিয়ে এরা খুব উন্নত ছিল এমনটি নয়। এ ব্যাপারে শ্রী অমিত কুমার বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন, 'খৃস্টের জন্মের দু' হাজার বৎসর পূর্বে অর্থাৎ আজ হইতে প্রায় ৪ হাজার বৎসর পূর্বে ভারত বর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের কাছে আর্য জাতির এক শাখা পশ্চিম পাঞ্জাবে উপনিবিষ্ট হয়। তাহাদের পূর্বে এদেশে কোল ভিল সাওতাল প্রভৃতি অসভ্য জাতি এবং দ্রাবিড় নামক প্রধান সুসভ্য জাতি বাস করিত।'

এই দ্রাবিড়রাই ছিল ভারতের ভূমি সন্তান। এদেশে আগমনের পর দ্রাবিড়দের সাথে আর্যদের সংঘাত শুরু হয়। পর দেশে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আর্যদের সংগ্রাম শুরু হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আর্যদের সাথে দ্রাবিড়দের সংঘাত অব্যাহত থাকে। দূর দেশ থেকে ভয়সংকুল পথ অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে সংকটের মধ্যে নিজেদের টিকিয়ে রাখার কৌশল অর্জন করে আর্যরা। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জাতিগত সংকটের কারণে তারা দক্ষতার সাথে দ্রাবিড়দের মুকাবিলা করতে সক্ষম হয়। এক পর্যায়ে তারা ভূমি সন্তান দ্রাবিড়দের উপর বিজয়ী হয়। কালক্রমে দ্রাবিড়দের সভ্যতা ও সংস্কৃতি আর্যরা রপ্ত করে নেয়। দুই সভ্যতার মিশ্রণে নতুন সাংস্কৃতিক ধারা এবং ধর্মীয় অনুভবের সূচনা হয়। ওদিকে পরাজিত দ্রাবিড়রা বনে জঙ্গলে আশ্রয় নেয় অথবা আর্যদের অধীনে লাঞ্ছিত হতে

থাকে। আর্যরা পরাজিত দ্রাবিড়দের ওপর তাদের নির্দেশনা চাপিয়ে দেয়। আর্যদের প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদ প্রথার সর্বনিম্ন স্তরে দ্রাবিড়দের স্থান দেয়া হয়। পিরামিডের শীর্ষে স্থান নেয় আর্যরা। সর্ব নিম্নে অবস্থান হয় দ্রাবিড়দের। পিরামিডের স্তর বিন্যাস হয় বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ দিয়ে। পুরো পিরামিডের ভার বহন করতে হয়- দ্রাবিড়দের। পর্যায়ক্রমে দ্রাবিড়রা আর্যদের বিন্যস্ত সমাজে হারিয়ে যায়। রুশ ঐতিহাসিক এ জেড ম্যানফ্রেডের মতে, সে যুগে ব্রাহ্মণদের কোন কর দিতে হত না। ক্ষত্রিয় শুদ্র প্রভৃতি জাতিকে ছোট লোক শ্রেণীর ধরা হত। নব্বই বছরের বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়কে নয় বছরের ব্রাহ্মণের পদ সেবা করতে হতো। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতির কাছে তাদের উৎপাদনের ৫ অথবা ৬ ভাগের এক ভাগ কর আদায় করা হত। নর হত্যা করলে শিরোশেদ হতো বটে কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ যদি শুদ্রকে হত্যা করতো তাহলে শুধু মাত্র সামান্য জরিমানা দিলেই চলতো। যেমন পোষা কুকুর মেরে ফেলার শাস্তিস্বরূপ কিছু জরিমানা হয়। এইভাবে নিম্নস্তরে অবস্থানকারী সমগ্র জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষের জীবন দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। আর্যরা সমকালীন সমাজ বিন্যস্ত করে ধর্মীয় আবেশ সৃষ্টি করে। সে সময় বিবেক বহির্ভূত অন্ধ আবেগের দ্যোতনা সৃষ্টি করে নিত্য নবনব নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া হয় সাধারণ মানুষের ওপর। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সাধারণ মানুষকে ব্রাহ্মণ্যবাদী নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করতে হয়।

অন্ধকারের পর যেমন আলো দেখা যায়, গ্রীষ্মের পর যেমন বর্ষা আসে অনুরূপ নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা সম্বলিত সমাজে নির্যাতন বিরোধী প্রতিরোধ শক্তির অভ্যুদয় হয়। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে নিপীড়নমূলক ব্যবস্থার ধারক ব্রাহ্মণ্য সমাজে জন্ম নেয় গৌতম বুদ্ধ। রাজকীয় সুখ সাচ্ছন্দ এবং প্রভুত্বের ব্যঞ্জনা তাকে আটকে রাখতে পারল না। যুগ যুগান্তর ব্যাপী দক্ষিণ এশিয়ায় মানবতার লাঞ্ছনা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যকার পুঞ্জিভূত দুঃখ ক্লেশ অসম্মান ও অবমাননা তার মধ্যে ভাবান্তরের সূচনা করে। তিনি রাজকীয় সুখ সম্ভোগের মোহ পরিত্যাগ করে দেশান্তরিত হন এবং প্রচলিত নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার বিপরীতে নতুন কোন ব্যবস্থার ছক অর্জন না হওয়া পর্যন্ত একনিষ্ঠভাবে চিন্তার গভীরে ডুব দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন নতুন ব্যবস্থার সূত্রসমূহের আবিষ্কার তার সন্তুষ্টির সীমায় এসে পড়ে তখন তিনি তার মত প্রচারে আত্মনিয়োগ করেন। সমকালীন ঘুণে ধরা বির্তনমূলক সমাজ কাঠামোর বিপরীতে তার নতুন চিন্তা শোষিত বঞ্চিত নির্যাতীত জনগোষ্ঠীর মধ্যে নবতর এক বিপ্লবের বার্তা হয়ে অনুরণিত হতে থাকে।

পর্যায়ক্রমে বৌদ্ধবাদ সাধারণ মানুষের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। ফলে শোষণ ও বিবর্তনমূলক সমাজ কাঠামোর ধারক কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তি তাদের প্রভুত্ব হারানোর ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় মানবিক বিপ্লব প্রতিহত করার জন্য বৌদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়। বৌদ্ধদের ধর্মবিরোধী নাস্তিক এবং বিদ্রোহী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে বৌদ্ধ বিরোধী উম্মাদনা সৃষ্টি করে বৌদ্ধদের উৎখাতে সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা।

ভারত জনের ইতিহাসে বিনয় ঘোষ লিখেছেন- 'বেদের বিরুদ্ধে বিরাট আক্রমণ হয়েছিল এক দল লোকের দ্বারা। তাদের বলা হতো লোকায়ত বা চার্বাক। বৌদ্ধগ্রন্থে এদের নাম আছে। মহাভারতে এদের নাম হেতুবাদী। তারা আসলে নাস্তিক। তারা বলতেন, পরকাল আত্মা ইত্যাদি বড় বড় কথা বেদে আছে কারণ ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচর এই তিন শ্রেণীর লোকরাই বেদ সৃষ্টি করেছে, ভগবান নয়। বেদের সার কথা হল পশুবলি। যজ্ঞের নিহত জীবন নাকি স্বর্গে যায়। চার্বাকরা বলেন, যদি তাই হয় তাহলে যজ্ঞকর্তা বা জজমান তার নিজের পিতাকে হত্যা করে স্বর্গে পাঠান না কেন...

'... এই ঝগড়া বাড়তে বাড়তে বেদ ভক্তদের সংগে বৌদ্ধদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঝাপ দিতে হয়। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা যে নাস্তিক, চার্বাকদের উক্তিতেই প্রমাণ রয়েছে। অতএব বৌদ্ধরা মূর্তিপূজা যজ্ঞবলি বা ধর্মাচার নিষিদ্ধ করে প্রচার করছিল পরকাল নেই, জীব হত্যা মহাপাপ প্রভৃতি। মোটকথা হিন্দু ধর্ম বা বৈদিক ধর্মের বিপরীতে জাতি ভেদ ছিল না।'

গতিশীল বৌদ্ধবাদ যখন জনসাধারণের গ্রহণযোগ্যতা পেতে শুরু করল তখন থেকে শরু হল ব্রাহ্মণ্যবাদের সাথে বৌদ্ধবাদের বিরোধ। সংঘাত ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্র হয়ে উঠল। উভয় পক্ষই পরস্পরকে গ্রাস করতে উদ্যত হল। হিন্দুরা তাদের রাজশক্তির আনুকুল্য নিয়ে বৌদ্ধদের উৎখাতের প্রাণান্ত প্রয়াস অব্যাহত রাখে। কখনো কখনো বৌদ্ধরা রাজশক্তির অধিকারী হয়ে তাদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার সর্বাত্মক প্রয়াস নেয়। বৌদ্ধবাদ কেন্দ্রিক নিপীড়িত জনগোষ্ঠীর- ভাঙন সৃষ্টির জন্য হিন্দুরা চানক্য কৌশল অবলম্বন করে। বৌদ্ধদের মধ্যকার অধৈর্যদের ছলেবলে কৌশলে উৎকোচ ও অর্থনৈতিক আনুকূল্য দিয়ে বৌদ্ধবাদের চলমান স্রোতের মধ্যে ভিন্ন স্রোতের সৃষ্টি করা হয় যা কালক্রমে বৌদ্ধদের বিভক্ত করে দেয়। বৌদ্ধবাদকে যারা একনিষ্ঠভাবে আঁকড়ে থাকে তাদেরকে বলা হতো হীনযান। আর হিন্দু ষড়যন্ত্রের পাঁকে যারা পা রেখেছিল যারা তাদের বুদ্ধি

পরামর্শ মত কাজ করছিল তাদেরকে ব্রাহ্মণ্য সমাজ আধুনিক বলে অভিহিত করে। এরা মহাযান নামে অভিহিত। এরাই প্রকৃত পক্ষে পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। মহাযান নতুন দল হিন্দুদের সমর্থন প্রশংসা পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে বৌদ্ধবাদের মূল আদর্শ পরিত্যাগ করে মূর্তিপূজা শুরু করে। ফলে বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তিমূলও নড়ে যায়। বৌদ্ধদের এই শ্রেণীকে কাজে লাগিয়ে প্রথমত নির্ভেজাল বৌদ্ধবাদীদের ভারত ভূমি থেকে উৎখাত করে এবং পরবর্তীতে মহাযানদেরও উৎখাত করে। কিন্তু যারা একান্তভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আশ্রয় নিয়ে বৌদ্ধ আদর্শ পরিত্যাগ করে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে তাদের জাতি সত্তাকে বিসর্জন দেয় তারাই টিকে থাকে। সে কারণে আজ বৌদ্ধের সংখ্যা বৌদ্ধবাদের জন্মভূমিতে হাতে গোনা।

কোন জাতি তার আদর্শ ও মূলনীতি পরিত্যাগ করে অপর কোন জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে অবগাহন করলে সেই জাতিকে স্বাতন্ত্রবিহীন হয়ে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হতে হয়। ছয়শতকে যখন আরবে জাহেলিয়াতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে ইসলামের অভ্যুদয় হয়েছে সে সময় বাংলায় চলছিল বৌদ্ধ নিধন যজ্ঞ। ৬০০ থেকে ৬৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলার শিবভক্ত রাজা শশাঙ্ক বাংলা থেকে বৌদ্ধ ধর্মকে উৎখাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন বুদ্ধদেবের স্মৃতি বিজড়িত গয়ার বোধিদ্রুম বৃক্ষ গুলি তিনি সমূলে উৎপাটন করেন। যে বৃক্ষের উপর সম্রাট অশোক ঢেলে দিয়েছিলেন অপরিমেয় শ্রদ্ধা সেই বৃক্ষের পত্র পল্লব মূলকাণ্ড সবকিছু জ্বালিয়ে ভস্মীভূত করা হয়। পাটলিপুত্রে বৌদ্ধের চরণ চিহ্ন শোভিত পবিত্র প্রস্তর ভেঙে দিয়েছিলেন তিনি। বুশিনগরের বৌদ্ধ বিহার থেকে বৌদ্ধদের বিতাড়িত করেন। গয়ায় বৌদ্ধ মন্দিরে বৌদ্ধদেবের মূর্তিটি অসম্মানের সঙ্গে উৎপাটিত করে সেখানে শিব মূর্তি স্থাপন করেন। অক্সফোর্ডের Early History of India গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধ মঠগুলি ধ্বংস করে দিয়ে মঠ সন্নাসীদের বিতাড়িত করেছিলেন। গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান নেপালের পাদদেশ পর্যন্ত বৌদ্ধ নিধন কার্যক্রম চালিয়েছিলেন কট্টর হিন্দু রাজা শশাঙ্ক। 'আর্য্যা মুখশ্রী মূলকল্প' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে শুধুমাত্র বৌদ্ধ ধর্ম নয় জৈন ধর্মের ওপরও উৎপীড়ন ও অত্যাচার সমানভাবে চালিয়েছিলেন তিনি।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের সাংস্কৃতিক চেতনা একই রকম। উভয় ধর্মে জীব হত্যা নিষেধ। আল্লাহ সম্বন্ধে তাদের ধারণা নেতিবাচক। এতদসত্ত্বেও ভারত থেকে বৌদ্ধ ধর্মকে উৎখাত করা হল এবং বৌদ্ধদের নিহত অথবা

বিতাড়িত হতে হল অথচ মহাবীরের ধর্ম জৈন আজো ভারতে টিকে রয়েছে। এটা বিস্ময়কর মনে হলেও এর পেছনে কারণ বিদ্যমান রয়েছে। সেটা হল বৌদ্ধরা শুরু থেকে হিন্দুদের দানবীয় আক্রমণ প্রতিরোধ করেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী তারা প্রতিক্রিয়াশীল- চক্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। পক্ষান্তরে জৈনরা হিন্দুদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়নি। হিন্দুদের সাথে সহঅবস্থান করেছে তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি সভ্যতা সংস্কৃতি জলাঞ্জলি দিয়ে। তারা মেনে নিয়েছে হিন্দুদের রীতিনীতি ও সংস্কৃতি, তারা ব্যবসায়ের হালখাতা, গনেশ ঠাকুরকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন, দুর্গাকালি স্বরস্বতী পূজা পার্বন হিন্দুদের মত উদযাপন করতে শুরু করে। ভারত জনের ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে- 'হিন্দু মতে যদিও জৈন ও বুদ্ধ উভয়ে নাস্তিক তাহা হইলেও হিন্দু ধর্মের সহিত উভয়ের সংগ্রাম তীব্র ও ব্যাপক হয়নি। হিন্দুদের বর্ণাশ্রম হিন্দুদেব দেবী এবং হিন্দুর আচার নিয়ম তাহারা অনেকটা মানিয়া লইয়াছেন এবং রক্ষা করিয়াছেন।'

আজকের হিন্দু ভারত তাদের পূর্ব পুরুষদের কৃতকর্ম মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের ধুয়া তুলসী পাতা হিসেবে উপস্থাপন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ দ্বারে একটি মিথ্যা বানোয়াট ও অমার্জনীয় তথ্য ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে... বিশ্ববিদ্যালয়টি ১১০০ খৃস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি ধ্বংস করেছেন। ভারতীয় ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বখতিয়ারের এই আক্রমণের তারিখ দিয়েছে ১১০০ খৃস্টাব্দ। অথচ স্যার উলসলি হেগ বলছেন, বখতিয়ার উদন্তপুরী আক্রমণ করেছেন ১১৯৩ খৃস্টাব্দে আর স্যার যদুনাথ সরকার এই আক্রমণের সময়কাল বলছেন ১১৯৯ খৃস্টাব্দ। মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দুভারত মুসলিম বিজেতাদের ভাবমর্যাদা ক্ষুণ্ন করার জন্য ইতিহাসের তথ্য বিকৃত করতেও কুণ্ঠিত নয়।

প্রকৃত ঘটনা হল একজন ব্রাহ্মণ কর্তৃক সম্রাট হর্ষবর্ধনকে হত্যা তারপর ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ক্ষমতা দখল করেন। এই সময় ব্রাহ্মণদের নেতৃত্বে একদল উগ্রবাদী ধর্মোন্মাদ হিন্দু নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস ও ভস্মীভূত করে। ৪০০ খৃষ্টাব্দে চীনা পর্যটক ফাহিয়েন যখন গান্ধারা সফর করেন তখন উত্তর ভারতে বিকাশমান বৌদ্ধ ধর্মের গৌরবোজ্জল অধ্যায় দেখতে পান। কিন্তু ৬২৯ খৃস্টাব্দে অপর একজন চীনা বৌদ্ধ সন্নাসী ১২০ বছর পর নাটকীয় পরিবর্তন লক্ষ্য করেন। ৬২৯ সালে আর একজন চীনা পর্যটক গান্ধারা সফর করে বৌদ্ধবাদের করুণ পরিণতি দেখে মানসিকভাবে বিপন্ন

হন। বখতিয়ার বৌদ্ধদের ওপর কোন ধরনের নির্যাতন করেছেন এমন কথা ইতিহাস বলে না বরং বৌদ্ধদের ডাকে বঙ্গ বিজয়ের জন্য বখতিয়ার সেনা অভিযান পরিচালনা করেন। এমনকি বিজয়ান্তে তিনি বৌদ্ধদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় থেকে বিরত থাকেন।

বাংলায় ১৪ শতকের অভিজ্ঞতা

১২ শতকে বাংলার ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরালে আমরা দেখতে পাব ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির উত্থান। ১৩ শতকের প্রথম দিকে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার দুশ' বছরের মধ্যে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটিয়ে বিধ্বস্ত হিন্দু শক্তির উত্থান সম্ভব হয়নি। কিন্তু ১৫ শতকে রাজাগনেশের আকস্মিক উত্থান কিভাবে সম্ভব হল? এ জিজ্ঞাসার জবাব পেতে সমকালীন ইতিহাস বিশ্লেষণের প্রয়োজন হবে।

উপমহাদেশের বৌদ্ধবাদের উৎখাতের পর বহিরাগত আর্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এখানকার মূল অধিবাসীদের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হলেও অপরাজেয় শক্তি হিসেবে মুসলমানদের উপস্থিতি তাদের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দেয়। মুসলমানরা বহিরাগত ব্রাহ্মণ সৃষ্ট বর্ণবাদের শিকার এদেশের সাধারণ মানুষকে মুক্তির নিঃশ্বাস নেবার সুযোগ করে দেয়। বিধ্বস্ত অবস্থায় ছোট ছোট অবস্থানে হিন্দু শক্তি তার বিক্ষত অস্তিত্ব কোন মতে ধরে রাখলেও বৃহত্তর পরিসরে শেষ পর্যন্ত বাংলাই ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির দৃশ্যমান সর্বশেষ দুর্গ। সব শেষে বাংলা থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি উৎখাতের পর তাদের প্রাধান্য বিস্তারে রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ে। এতদসত্ত্বেও তাদের পুনরুত্থানের আকাঙ্খা চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত হয়নি। সংগ্রাম সংঘাতের মধ্য দিয়ে আধিপত্য বিস্তারের ব্যাপারে কয়েক সহস্রাব্দের অভিজ্ঞতা ও কৌশল পুঁজি করে দুর্দমনীয় মুসলিম শক্তি বিনাশের জন্য সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে। সেই সুযোগটা এসে যায় ইলিয়াস শাহী সালতানাতের মুসলিম শক্তি কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতার মধ্য দিয়ে। মোহাম্মদ তুগলকের শাসনামলের শেষ পর্যায়ে উপমহাদেশের মুসলিম শক্তি কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে বাংলার ইলিয়াস শাহী সালতানাতকে ভয়ঙ্কর সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। যুদ্ধ ও অবরোধের মুকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে ইলিয়াস শাহকে বিপর্যস্ত হতে হয়। এই বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে নিজস্ব শক্তি পুনর্গঠন ও সুসংহত করার জন্য

সুলতানকে স্থানীয়ভাবে সৈন্য সংগ্রহ করতে হয় হিন্দু জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকে। এ কারণে হিন্দু প্রধানদের সদিচ্ছা ও সমর্থনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং রাষ্ট্রীয় নীতি কৌশল পুনর্বিন্যাসে হিন্দু প্রধানদের স্বার্থ বিবেচনায় আনতে হয়।

আর এ সময়ই রাজা গনেশ সুলতানের দরবারে স্থান করে নেয়। শুধু গনেশই নয়, এই সাথে আরো কতিপয় প্রভাবশালী হিন্দু ইলিয়াস শাহের দরবারে সংশ্লিষ্ট হয়। মুহাম্মাদ শাহের পুত্র ফিরোজশাহ তুগলক বাংলা পুনরুদ্ধার প্রয়াসে বিহার আক্রমণ করার ফলে ইলিয়াস শাহ এবং তার পুত্র সিকান্দার শাহ যে করুণ অবস্থার সম্মুখীন হন সেটা অবলোকন করে রাজা গনেশ তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠেন এবং গভীর মনোযোগী হয়ে উপমহাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। ফিরোজ শাহ তুগলকের মৃত্যুরপর দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করে বেশ কটি স্বাধীন সালতানাতের অভ্যুদয় এবং তৈমুর লং কর্তৃক দিল্লী লুণ্ঠনসহ বেশ কিছু ঘটনাপ্রবাহ বাংলায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুপ্ত আকাঙ্খা ব্রাহ্মণ্যবাদী জনগোষ্ঠীর মধ্যে বহমান হয়ে উঠে। সালতানাতের রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে রাজা গনেশের নেতৃত্বে হিন্দু রাজন্যবর্গ তাদের কূট কৌশল প্রয়োগ করে শাহী দরবারের সভাসদদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়। গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের শাসনামলের ঔদার্যের ফলে রাজা গণেশ প্রাধান্যে এসে যায়। সুলতানের মৃত্যু অথবা অপমৃত্যুর স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সালতানাতের সবচেয়ে বিচক্ষণ মন্ত্রী খানজাহান ইয়াহিয়ার হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হওয়ার পর ১৪১১-১২ সাল নাগাদ রাজা গনেশ সালতানাতের রাজনীতির পুরো ভাগে এসে পড়ে। ধারণা করা হয় যে, এসব অপমৃত্যু ও হত্যাকাণ্ডের অন্তরালে রাজা গনেশের চক্রান্ত বিদ্যমান ছিল। সাইফ আল দ্বীন হামযার স্বল্পকালীন শাসনামলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হয়ে ওঠে। হামযা শাহকে কোন এক পর্যায়ে রাজা গনেশ ক্ষমতাচ্যুত এবং হত্যা করেন। ইতিপূর্বে রাজা গণেশ হামযা শাহকে নামে মাত্র ক্ষমতাসীন রেখে সমস্ত ক্ষমতা নিজে কুক্ষিগত করে রাখেন। এমন অরাজক পরিস্থিতির মধ্যে হামযা শাহ এর গোলাম শিহাব সাইফুদ্দিন রাজা গনেশের গভীর ষড়যন্ত্র অনুধাবন করেন এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেন। শিহাব সাইফুদ্দিন রাজা গনেশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এবং রাজাকে সাময়িকভাবে স্তব্দ করে দিতে সক্ষম হন। অতঃপর শিহাব সাইফুদ্দিন বায়জিদ শাহ নাম ধারণ করে ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু বৈদিক

চক্রের কাছে অবশেষে তাকে পরাজিত হতে হয়। রাজা গনেশ তাকে ক্ষমতাচ্যুত এবং হত্যা করেন। বাইজীদ- এর সন্তান আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ গনেশের অপকর্মের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান নেন এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। ক্ষমতার এই টানাপোড়ন ৪ বছর স্থায়ী হয়। রাজা গনেশের কূট চক্রের কাছে অবশেষে আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ পরাস্ত হন এবং রক্তাক্ত পরিণতি তার ভাগ্যে জুটে।

ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে রাজা গনেশ মুসলমানদের উচ্ছেদ করার মহা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি তাদের প্রতি খড়গ হস্ত হয়ে উঠেন যারা মোটামুটি জনগণের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। অতি ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে মুসলিম নিধন শুরু করা হয় এবং বহু জ্ঞানী- গুণী হত্যা করা হয়। সমকালীন প্রভাবশালী মাশায়েখ শেখ বদরুল ইসলাম এবং তার পুত্র ফাইজুল ইসলাম রাজাকে অভিনন্দন জানাতে অস্বীকার করলে তাদেরকে দরবারে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। রাজা গনেশ তার শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করার অপরাধে পিতা পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। একই দিনে রাজার নির্দেশে অসংখ্য গুণী জ্ঞানী মানুষকে নৌকা ভর্তি করে মাঝ দরিয়ার ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। হেমিলটন বুকানন লিখেছেন, নির্যাতন ও নিষ্পেষণের চূড়ান্ত পর্যায়ে বাংলার নেতৃস্থানীয়রা শেখের চত্তরে ভিড় জমায়। নূর কুতুবুল আলম দ্বিরুক্তি না করে জৌনপুরের সুলতানের প্রতি বিপর্যস্ত মুসলিম জনগোষ্ঠীকে উদ্ধারের আমন্ত্রণ জানান। জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম সসৈন্যে ফিরোজপুর উপকণ্ঠে এসে ডেরা গাড়লেন। রাজা গনেশ মুসলিম সৈন্যদের প্রতিরোধের দুঃসাহস করলেন না। রাজা গনেশ নূর কুতুবুল আলমের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। শেখ বললেন, রাজা গনেশের ইসলাম গ্রহণ ছাড়া জৌনপুরের সেনাবাহিনী প্রত্যাহত হবে না। প্রথমত রাজা গনেশ সম্মত হলেও তার স্ত্রীর প্ররোচনায় ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে পিছিয়ে গেলেন। বিনিময়ে তার পুত্র যদুকে ইসলামে দাখিল করলেন। শায়েখ যদুকে ইসলামে দীক্ষিত করে নতুন নাম দিলেন জালাল উদ্দিন। জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে জৌনপুরের সৈন্যরা বাংলা ত্যাগ করে। বাংলা থেকে জৌনপুরের সৈন্য প্রত্যাহারের পর রাজা গনেশ পুনরায় স্বরূপে আবির্ভূত হলেন, নতুন করে শুরু হল মুসলিম নিপীড়ন। রাজা গনেশ তার ধর্মান্তরিত সন্তান যদুকে ব্রাহ্মণদের পরামর্শে প্রায়শ্চিত্য প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করানোর উদ্যোগ নেন। তার মুসলিম বিরোধী কর্মকাণ্ড এমনই ভয়ংকর হয়ে উঠে যে নূর কতুবুল

আলমের পুত্র শেখ আনোয়ারকে ফাঁসীতে ঝুলানো হয়। এই একই দিনে গনেশ বিরোধী ক্ষোভ তীব্র হয়ে এমন ভয়াবহ রূপ নেয় যে, তাৎক্ষণিক বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়ে গনেশ উল্টে যায়। রাজা গনেশ শুধু উৎখাতই হলেন না তাকে হত্যা করা হল এবং জালাল উদ্দিন মুহাম্মদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়া হল। রাজা গনেশের পুত্র নব দিক্ষীত মুসলমান জালাল উদ্দিন দক্ষ সুলতান হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। তিনি পুনরায় বাংলার সালতানাতকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করালেন। বাংলার ভিন্নমুখী স্রোত আগের মতই প্রবাহিত হতে শুরু করে।

উপমহাদেশ প্রসঙ্গ

১১৯৭ থেকে ১৫২৫ সাল পর্যন্ত তুর্ক আফগান মুসলমানরা সমগ্র উপমহাদেশে তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তাদেরকে ভোগ বিলাস ঘিরে ধরে তখনই তারা দুর্বল হয়ে পড়েন এবং অনৈক্য ও ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বিপর্যস্ত হতে থাকেন। মুসলিম শক্তির হাতে মার খাওয়া মধ্য ও উত্তর ভারতের হিন্দু রাজা মহারাজারা সংঘবদ্ধ হতে থাকে মুসলিম শক্তিকে পর্যুদস্ত করার জন্য। ওদিকে মধ্য এশিয়ার এক সংগ্রামী পুরুষ জজির উদ্দীন মুহাম্মদ বাবর যে তার রাজ্য সমরখন্দও বোখারা হারিয়ে নিরাশ্রয় ভবঘুরের মত পথে পথে ঘুরছিলেন, নিজের শক্তি সামর্থ্য অর্জন করে তিনি পুনরায় মধ্য এশিয়ায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর ভারত পর্যন্ত ধেয়ে আসেন। ১৫৬২ সালে তিনি পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইবরাহিম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লী দখল করেন। দিল্লীতে তখনও তিনি পরিপূর্ণ শিকড় গাড়তে সক্ষম হননি। দিল্লী দখলের ১ বছরের মাথায় রাজপুত নামালব ও মধ্য ভারতের ১২০ জন রাজা মহারাজা সংঘবদ্ধভাবে মুসলিম শক্তি উৎখাতের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাদের ৮০ হাজার অশ্বারোহী এবং ৫শ' রণহস্তী এবং অসংখ্য পদাতিক বাহিনীর মুকাবিলায় বাবরের মাত্র ১০ হাজার সৈন্য মরণপণ লড়াই করে আগ্রার অদূরে খানুয়ার যুদ্ধে সংঘবদ্ধ হিন্দু শক্তি বিদ্ধস্ত হওয়ার পর শক্তি দিয়ে মুসলমানদের মুকাবিলার উচ্ছাশা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মন থেকে উধাও হয়ে যায়। অতঃপর তারা ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করে। তাদের পরিক্ষীত কৌশল তিন প্রজন্ম প্রকল্প বাস্তবায়নে অধিক মনোযোগী হয়। এ প্রকল্প আর কিছু নয় তিন প্রজন্মের

মধ্যে মুসলমানদেরকে বিপথগামী করে নিজেদের সহায়ক শক্তিতে পরিণত করা। তিন প্রজন্ম প্রকল্প সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হল।

তিন প্রজন্ম প্রকল্প

প্রথম প্রজন্মে একজন ১০০% মুসলমান পুরুষের সাথে একজন ১০০% হিন্দু নারীর বিয়ে দিতে হবে। তাদের মিলনে যে শংকর সন্তান জন্মাবে সে হবে সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে ৫০% মুসলমান এবং ৫০% হিন্দু। দ্বিতীয় প্রজন্মে সেই ৫০% মুসলমানের ১০০% হিন্দু নারীর বিয়ে হলে যে শংকর সন্তান জন্মাবে সে হবে ১৭% মুসলমান ও ৮৩% হিন্দু। এবং তৃতীয় প্রজন্মে সেই ১৭% মুসলমানের সাথে কোন ১০০% হিন্দু নারীর বিয়ে দিলে পরবর্তী প্রজন্মের সন্তানটি সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে হবে ৯৩% হিন্দু এবং ৭% মুসলমান। অর্থাৎ তিন প্রজন্ম শেষ হতে না হতেই মুসলমানিত্ব শেষ হয়ে যাবে। (ইতিহাসের অন্তরালেঃ ফারুক মাহমুদ, পৃ.১৯৭)

বাস্তবায়ন শুরু

শেষ অবধি ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও হিন্দু রাজন্যবর্গ সম্মুখ সমর পরিহার করে মুসলমানদের চরিত্র হননের বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সেই চরিত্র হনন প্রক্রিয়া শুরু হয় হুমায়ুনের শাসন কাল থেকে। হুমায়ুন শের শাহের কাছে পরাজিত হয়ে পলাতক জীবন যাপনকালে হিন্দু রাজা মহারাজাদের সাহচর্যে এবং ইরানে আশ্রিত জীবন যাপন কালে শরাব সাকী এবং হেরেম জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তার দিল্লী পুনর্দখলের পর হেরেম জীবনের সুখানুভূতির আকাঙ্খা তীব্র হয়ে ওঠে। পিতা বাবরের সংগ্রামী জীবনের পথ পরিহার করে অবশেষে হুমায়ুন ভোগ বিলাসী জীবন যাপনের দিকে প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়ে। রাজপুত ও হিন্দু রাজা মহারাজা এবং উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা সে সময় যাবতীয় প্রমোদ উপাচার সুরা এবং নৃত্য গীত পটিয়সী সুন্দরী সরবরাহের যোগানদার হয়ে উঠে। তাদের সরবরাহকৃত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চতুর রমনীরা তাদের সুনিপুণ অভিনয় ও চাতুরী দিয়ে শুধু মুঘল সম্রাটই নয় আমীর ওমরাহদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং পরবর্তীতে মুঘল রাজনীতিকে পঙ্কিলতার আবর্তে নিক্ষেপ করে। অবশেষে হুমায়ুনের মৃত্যু ব্রাহ্মণ্যবাদী কুচক্রীদের জন্য বড় রকমের সুযোগ এনে দেয়। ১৩ বছরের কিশোর আকবর তখনো যার মধ্যে ভাল মন্দ উপলব্ধি করার শক্তি সুসংহত হয়নি

এমন একজন অশিক্ষিত নাবালক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। এই অশিক্ষিত কিশোর সম্রাটকে রাজপুত হেরেম বালারা তাদের রূপ যৌবন ছলাকলা দিয়ে বিভ্রান্তির দিকে টেনে নিয়ে চলে সফলভাবে। হিন্দু দর্শন ও জীবনাচার আকবরের মন মগজকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। রাজা মহারাজাদের অনেকেই আকবরের হাতে ভগ্নী ও কন্যা সম্প্রদান করে মুঘল পরিবারে আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলে। জয়পুরের রাজা বিহারী মল (মান সিংহের পিতামহ) তার কন্যা জয়পুরী বেগমকে বিয়ে দেন ১৯ বছরের তরুণ সম্রাট আকবরের সাথে। এই আত্মীয়তার সুবাদে পিতা পুত্র এবং পৌত্র যোগ দান করেন আকবরের সেনাপতি পদে। বিকানীর ও জয়সলমীরের রাজারাও আকবরকে কন্যা দান করেন। মানসিংহ তার বোন রেবা রানীকে বিয়ে দেন জ্যেষ্টপুত্র ভাবী সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে এবং কন্যাকে বিয়ে দেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ট পুত্র ভাবী সম্রাট খসরুর সাথে। (An Advanced history : Re Mayodan, P-441-43)

উত্তর মধ্য ভারতের অন্যান্য রাজা মহারাজারাও এই মহাজন পন্থা অনুসরণ করে মুঘল যুবরাজ ও ওমরাহদের আত্মীয়ভুক্ত হন। অতঃপর নিকটাত্মীয়ের দাবীতে মুঘল বাহিনীর প্রায় সবগুলো গুরুত্বপুর্ণ সেনাপতির পদ ব্রাহ্মণ্যবাদীদের করায়ত্ত হয়। তারা সোয়া তিনশত বছর ধরে সারা ভারতে জেঁকে বসা তাদের পুরানো শত্রু তুর্ক আফগান মুসলমানদের নির্মূল করেন মুঘলদের সাথে নিয়ে। রাজ দরবারে ফৈজী আবুল ফজল প্রমুখ আমীর ওমরাহের প্রতিপক্ষে বীরবল ও টোডরমল হিন্দু সভাসদবর্গ আসন গ্রহণ করে। (ইতিহাসের অন্তরালে ফারুক মাহমুদ, পৃঃ ১৯৭)

জাহাঙ্গীরের সময় নূরজাহান এবং আসফ জাহর রাজনৈতিক তৎপরতা এবং শায়েখ আহমদ সরহিন্দের বলিষ্ট ভূমিকায় ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের দুর্নিবার অগ্রযাত্রা অনেকখানি ব্যাহত হলেও মুঘল প্রাসাদে আকবরের আমলে যে বিষ বৃক্ষ রোপিত হয়েছিল সেটা ইতিমধ্যে মহীরুহে পরিণত হয়ে গেছে। ভোগ বিলাসী আত্মসর্বস্ব যুবরাজ ও আমীর ওমরাহ প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও আত্মঘাতী সংঘাতের মধ্য দিয়ে আত্মবিনাশের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এই সুযোগে মুসলিম শক্তিকে উৎখাত করে হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য তৎপর হয়ে ওঠে রাজপুত, জাঠ ও শিখ সম্প্রদায়। এর পেছনে সক্রিয় ছিল বর্ণ হিন্দুরা। যে ভাবে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদেরকে ভারতের মাটি থেকে উৎখাত করা হয়েছিল অনুরূপ পন্থায় মুসলিম শক্তিকে উৎখাত করার জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। 'মারাঠারা সমগ্র মধ্য ভারত

জয় করে। দিল্লী শহর লুণ্ঠন করে। মারাঠা রাজপুত জাঠ শিখদের বিভিন্ন সসস্ত্র বাহিনী, উপবাহিনী সমগ্র মধ্য পশ্চিম ও উত্তর ভারতের মুসলিমদের অসংখ্য মসজিদ ধ্বংস করে, সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং তাদেরকে দলে দলে হত্যা করতে থাকে।' কিন্তু এতদসত্ত্বেও মুঘলদের প্রাসাদ ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। তারা এবং আমীর ওমরাহ সকলে নিজেদের নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ে। উপমহাদেশের মুসলমানদের এই নিরূপায় অবস্থায় দিল্লীর মুজাদ্দিদ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর আহ্বানে আফগান বীর আহমদ শাহ আবদালী পর পর ৯ দফা ভারত আক্রমণ করে মারাঠাদের ঔদ্ধত্য গুঁড়িয়ে দেন। দিল্লীর সন্নিকটে একটি রণক্ষেত্রে ১ লক্ষ মারাঠা সৈন্য প্রাণ হারায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের মুসলিম বিধ্বংসী তৎপরতা অব্যাহত থাকে। তবে আগের দুর্নিবার গতি অনেকটা হ্রাস পায়। কিন্তু সুবাহ বাংলায় সেই একই তৎপরতা প্রচ্ছন্নভাবে সমান গতিতে এগিয়ে চলে। নবাবদের পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের অজ্ঞাতে তাদের উৎখাতের ষড়যন্ত্র ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠে। একদিকে পর্যায়ক্রমিক ব্রাহ্মণ্য ষড়যন্ত্র উত্তরোত্তর শক্তি সঞ্চর করে, অন্যদিকে 'দক্ষিণের পথ ধরে বর্গী বলে অভিহিত মারাঠা বাহিনী সুবাহ বাংলা অবধি লুটতরাজ চালায়। তাদের শিকার হয়েছিল সুবাহ বাংলার সম্পদশালী মুসলিম পরিবারগুলো।

দ্বিতীয় অধ্যায়
পলাশী বিজয়ের পটভূমি

পলাশী বিপর্যয়ের মূল নায়ক মীর জাফর নয় মূল নায়ক ছিলেন জগৎশেঠ। ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের স্বৈরাচারী শোষণ, লুণ্ঠন এবং আধিপত্যের অবসান হয় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর। তাদের লুপ্ত শক্তি পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ ইতিহাসে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই কখনো প্রকাশ্যে আবার কখনো নেপথ্যে। সম্মুখ সমরে মুসলমানদের পরাস্ত করার সর্বশেষ প্রয়াস ছিল আগ্রার অদূরে খানুয়ায় বাবুরের সাথে যুদ্ধ। উত্তর ও মধ্য ভারতের হিন্দু রাজা ও মহারাজাদের সম্মিলিত বাহিনীর ৮০ হাজার অশ্বারোহী এবং ৫০০ রণ হস্তী সম্রাট বাবুরের ১০ হাজার সৈন্যের প্রতিরোধের মুখে বিধ্বস্ত হওয়ার পর ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সম্মুখ সমর পরিহারের নীতি অবলম্বন করে। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্য তারা অতি ধৈর্য সহকারে নেপথ্য ষড়যন্ত্রের পথে এগুতে থাকে। তোষণ ও আনুগত্যের অভিনয় করে এক দিকে যেমন সংশ্লিষ্ট শাসকদের আস্থা অর্জন করে, অন্যদিকে অনুরূপ ষড়যন্ত্রের নিত্য নব নব কৌশল অবলম্বন করে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে।

এই কর্ম প্রয়াস শুরু হয় উপমহাদেশের সর্বত্র। যেমন মুর্শিদাবাদে শুরু হয় মুর্শিদকুলি খানের শাসনামল। আমি আগেই উল্লেখ করেছি পলাশী ট্রাজেডীর মূল নায়ক ছিলেন জগৎশেঠ। মীর জাফর ছিলেন শিখণ্ডী, পুরানের ভাষায় অধৈর্য। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা প্রতিপক্ষের প্রভাবশালী অধৈর্য ব্যক্তিত্বকে অর্থবিত্ত এবং ক্ষমতায়নে প্রলুব্ধ করে এবং তাকে সামনে রেখে ষড়যন্ত্রকে সর্বব্যাপী করে তুলে।

জগৎশেঠ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হীরানন্দ সাহা তিনি মারোয়ারের নাগর থেকে পাটনায় এসে সুদের কারবার শুরু করেন। ১৭১১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র মানিক চাঁদ সুদের কারবার শুরু করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত মুর্শিদকুলি খানের আস্থাভাজন হয়ে উঠেন। মুর্শিদকুলি খান তার দিওয়ানী দপ্তর মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করার সাথে সাথে মানিক চাঁদও ১৭১২ সালে মুর্শিদাবাদে এসে পড়েন। একই বছর তিনি নবাব কর্তৃক নগর শেঠ উপাধিতে ভূষিত হন। ১৭১৪ সালে মানিক চাঁদের মৃত্যু হলে তার ভাগিনা ফতেহ চাঁদ সাহা তার উত্তরাধিকারী হন। মুর্শিদকুলি খানের সুপারিশে ফতেহ চাঁদ দিল্লীর বাদশাহ

কর্তৃক জগৎশেঠ অর্থাৎ বিশ্ব ব্যাংকার উপাধিতে ভূষিত হন। তুর্ক আফগান সামন্তদের বিদ্রোহের আশংকায় মুর্শিদ কুলিখান তার কৌশল পরিবর্তন করে বর্ণ হিন্দু রাজা মহারাজাদের অতিরিক্ত সুবিধা দিতে শুরু করেন এবং তাদের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। নবাব মুসলিম মুদ্রা ব্যবসায়ীদের ব্যবসা ত্যাগে বাধ্য করেন। ডক্টর মোহর আলী লিখেছেন, একচেটিয়া মুদ্রা ব্যবসা ও সরকারী টাকশালে বিদেশী বণিকদের স্বর্ণতাল ও মুদ্রা তৈরীর একচ্ছত্র ক্ষমতা শুধু জগৎশেঠকে প্রদান করা হয়। মুর্শিদকুলি খানের উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার সুজাউদ্দিন ছিলেন ভোগ বিলাসী চরিত্রহীন। অপুত্রক নবাব তার নাতি অর্থাৎ সুজাউদ্দিনের পুত্রকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং দিল্লীস্থ তার প্রতিনিধি বালকিষানকে বাদশাহর স্বীকৃতি আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন। শুরু হয় ষড়যন্ত্র নাটক। নবাবের আস্থাভাজন জগৎশেঠ ফতেহ চাঁদ নবাবের ঘোষিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে অতি গোপনে সুজাউদ্দিনকে প্ররোচিত করেন এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও সমর্থন দিয়ে সুজাউদ্দিনের প্রত্যাশা ও অবস্থানকে সুদৃঢ় করেন। এমনকি পরবর্তীতে নবাব হিসেবে স্বীকৃতি লাভের ব্যাপারে দিল্লীর দরবারকে প্রভাবিত করেন। নবাব মুর্শিদকুলির নিজের প্রতিনিধি বালকিষান বাবু তার উত্তরাধিকারী মনোনয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব গোপন রেখে তার প্রেরিত নজরানা উপঢৌকন ব্যবহার করেই সুজাউদ্দিনের পক্ষে দিল্লীর দরবারে তদবীর করেন এবং মুর্শিদ কুলীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুজা উদ্দিনের নামে পরবর্তী নবাবীর সনদ সংগ্রহ করেন। [তারিখে বাংলা পৃঃ ১২৪, উদ্ধৃতি মোহর আলী : হিষ্ট্রি অব দি মুসলিম অব বেঙ্গল]

মুর্শিদকুলী খানের শয্যা পাশে বসে জগৎশেঠ সুজাউদ্দিনকে মুর্শিদাবাদ আক্রমনের সংকেত পাঠান। সুজাউদ্দিনের সৈন্যরা মুর্শিদাবাদ অবরোধ করে। নবাব পত্নীও তার কন্যা সুজাউদ্দিনের স্ত্রীর হস্তক্ষেপে মনোনীত নবাব সরফরাজ খান পিতা সুজাউদ্দিনকে নবাব হিসেবে মেনে নেন। সুজাউদ্দিন জগৎ শেঠকে তার অতি বিশ্বস্ত এবং ঘনিস্টজন হিসেবে গণ্য করেন এবং ৪ সদস্য বিশিষ্ট প্রশাসনিক পরিষদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

১৭২৭ সালে বিশ্বাসঘাতকতার সাফল্য জগৎশেঠ এবং তার সহযোগীদের অতি উৎসাহী করে তুলে। মুসলিম শাসনকে দুর্বল করে তোলা এবং বৈষয়িক ফায়দা অর্জনের জন্য ব্রাহ্মণ্য চক্র আর এক নতুন খেলা শুরু করলেন মুর্শিদাবাদের নবাবী নিয়ে। জগৎশেঠ আলম চাঁদ বাবুকে নিয়ে হাজী আহমদ ও আলীবর্দী খানের সাথে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। এদের লক্ষ্য ছিল আলীবর্দী খানকে মুর্শিদাবাদের নবাব হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করা। সেটা

আলীবর্দীর প্রতি দুর্বলতার কারণে নয়, বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল সুসংহত মুসলিম শক্তিকে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আত্মবিনাশের দিকে ধাবিত করানো এবং সংঘর্ষ, ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধের ডামাডোল পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদের অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থ হাতিয়ে নেয়া।

যাইহোক মুর্শিদাবাদের নবাব সুজাউদ্দিনের যখন মৃত্যু হল সে সময় নাদির শাহ দিল্লী দখল করে নেয় এবং সুবাহ বাংলার আনুগত্য ও রাজস্ব দাবী করে। নাদির শাহ মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট চিঠি লেখেন। নাদির শাহের পত্র পাওয়া মাত্র সরফরাজ খানের অনুমতি নিয়ে ব্যাঙ্কার জগৎশেঠ তাৎক্ষণিকভাবে রাজস্ব পরিশোধ করে দেন। কুচক্রী জগৎশেঠ এবং বাবু আলম চাঁদের পরামর্শে সুজাউদ্দিন অতিরিক্ত আনুগত্য প্রকাশের জন্য নাদির শাহের নামে খুতবা পাঠ করেন এবং মুদ্রা প্রচলন করেন। এটাও ছিল জগৎশেঠ গংদের ষড়যন্ত্র। ওদিকে কয়েক মাসের মধ্যে নাদির শাহ দিল্লী ত্যাগ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে মুহাম্মদ শাহ তার সিংহাসনে পুনরারোহণ করেন। এই সুযোগে দিল্লীর আনুকূল্য পাবার প্রত্যাশায় জগত শেঠ গোপনে তথ্য প্রমাণ সরবরাহ করে দিল্লীর দরবারকে জানিয়ে দেন যে সরফরাজ খান বিদ্রোহী। (তারিখে বাংলাহ পৃঃ ১৫৫-৫৬)। ব্রাহ্মণ্য চক্র এখানেই থেমে থাকল না। সরফরাজ খানের বদলে আলীবর্দী খানকে বাংলার সুবাদার করার ব্যাপারে দিল্লীর দরবারকে প্রভাবিত করলো। অবশেষে তারা আলীবর্দীর নামে সনদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেন। এই বাবু গোষ্ঠী ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের পরামর্শে সরফরাজ খান তার সেনাবাহিনীর অর্ধেক হ্রাস করলেন। ওদিকে ব্যাংকার জগত শেঠ ২৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ বর্তমান মুদ্রামানে ৫ শত কোটি টাকা আলীবর্দী খানের নিকট প্রেরণ করেন সুজার বরখাস্তকৃত সৈন্যদের তার সেনা বাহিনীতে নিয়োগ দেয়ার জন্য। অন্যদিকে বিহারের হিন্দু জমিদারদের আলীবর্দী খানকে নৈতিক ও বৈষয়িক সমর্থন দানের জন্য প্ররোচিত করেন। আলীবর্দী খানের সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে জগৎশেঠ তাকে মুর্শিদাবাদ আক্রমণের আহ্বান জানায়।

সামরিক গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথ তেলিয়াগিরি অতিক্রম করে আলীবর্দী খানের বাহিনী মুর্শিদাবাদের ২২ মাইল দুরত্বে অবস্থান নেয়। নবাব সরফরাজ খান আকস্মিক অবরোধে কিছুটা বিচলিত হলেও তাৎক্ষণিকভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেন। এই অবরোধে তার আমাত্যবর্গের যোগসাজশ সম্পর্কে তার ধারণা বদ্ধমূল হয়। তার সন্দেহ বহুলাংশ সঠিক হলেও পঞ্চমবাহিনীর মূল হোতাকে তিনি চিনতে ভুল করলেন। জগৎশেঠের বদলে

তিনি হাজী আহমদকে বিশ্বাসঘাতকতার জন্য কারারুদ্ধ করলেন। পঞ্চম বাহিনীর দুই হোতা বাবু আলম চাঁদ ও জগৎশেঠের সাথে সরফরাজ খানের সম্পর্ক আরো নিবিড় হয়ে উঠল। এই দুই কুচক্রী পরামর্শক হিসেবে সরফরাজ খানের যুদ্ধ যাত্রার সঙ্গী হলেন। প্রথম দিনের যুদ্ধে আলীবর্দী খানের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে উঠল। নিশ্চিত পরাজয় থেকে বাবু আলম চাঁদ আলীবর্দী খানকে উদ্ধার করলেন সরফরাজ খানকে যুদ্ধ মুলতবী ঘোষণার পরামর্শ দিয়ে। যুদ্ধের মোড় ফিরিয়ে নেয়ার জন্য বাবু আলম চাঁদ এবং জগৎশেঠ বিভিন্নভাবে যোগসাজশ সলাপরামর্শ করে এবং সরফরাজ খানের সেনাপতিদেরকে মুচলেকা অর্থ বিত্তের বিনিময়ে পক্ষ ত্যাগে প্রলুব্ধ করলেন। পরদিন পূর্বাহ্নের যুদ্ধে সরফরাজ খানের বিজয় নিশ্চিত হয়ে উঠলে বাবু আলম চাঁদ তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেছে মনে করে আত্মহত্যা করলেন। ষড়যন্ত্রের মূলনায়ক জগৎশেঠ ধরা ছোঁয়ার বাইরে রয়ে গেলেন শেষ অবধি। এমতবস্থায় জগৎশেঠ তার নেপথ্য ষড়যন্ত্র আরো জোরদার করলেন। দুপুরের পর যুদ্ধ পরিস্থিতি বদলে গেল। অবশেষে সরফরাজ খান নিহত হলেন। জগৎশেঠ সাদর সম্ভাষণ জানিয়ে বিজয়ী আলীবর্দী খানকে রাজধানীর অভিমুখে নিয়ে চললেন। বিশ্বাসঘাতকদের রক্তাক্ত আঙ্গিনা পেরিয়ে আলীবর্দী খান ক্ষমতাসীন হলেন। সম্ভবত সেদিনই সবার অলক্ষ্যে আর এক মর্মান্তিক বিপর্যয়ের ইতিহাস নিয়তির অদৃশ্য কাগজে লেখা হয়েছিল, লেখা হয়েছিল আলীবর্দীর বিশ্বাসঘাতকতা ও অপরাধের অনিবার্য পরিণতি হিসেবে।

এরপর জগৎশেঠ মুর্শিদাবাদের দরবারে সবচেয়ে প্রতাপশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। মুসলমানদের চূড়ান্ত বিপর্যয় ডেকে আনার জন্য জগৎশেঠ নতুন প্রেরণায় নবতর চক্রান্ত জাল বিস্তারের জন্য উন্মাতাল হয়ে উঠেন।

১৭৪০ সালে আলীবর্দী খান নবাব হলেন ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তার ক্ষমতারোহনের ৩৩ বছর আগে থেকে উত্তর- মধ্য পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত ছিল অস্থির। ব্রাহ্মণ্যবাদী ষড়যন্ত্র এগিয়ে চলছিল সাফল্যের দিকে। হুমায়ুন ও আকবরের সময় থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদী ষড়যন্ত্রের ঘাটিতে পরিণত হয়েছিল মুঘল প্রাসাদ। মুঘল হেরেমে রাজপুত বালাদের স্থান লাভের পর থেকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি মুঘল প্রাসাদকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নেয়। শরাব সাকী নৃত্য গীত বিলাসিতা ও আলস্যে বিবস হয়ে পড়ে সংগ্রামী বাবরের বংশধররা। তাদের ঔদাসীন্যের কারণে ব্রাহ্মণ্য ষড়যন্ত্র পোক্ত হয়ে

উঠে। সম্রাট আরঙ্গজেব চলমান ধারা থেকে বেরিয়ে আসার উদ্যোগ নিলেও তার সময় থেকেই শুরু হয় ব্রাহ্মণ্য বাদীদের মুসলিম বিরোধী তৎপরতা। আওরঙ্গজেব তাদের অপতৎপরতা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হলেও পরবর্তী মুঘল উত্তরাধিকারীরা বর্ণ হিন্দু, রাজপুত জাঠ মারাঠা এবং শিখদের সুসংবদ্ধ অগ্রযাত্রা ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি। উপমহাদেশের বৌদ্ধ নিধন যজ্ঞের মত মুসলিম নিধন শুরু হয়। লুণ্ঠন ও হত্যার নৃশংসতা মুসলিম জনপদগুলোতে ছড়িয়ে দেয়। মুঘল ও মুঘলাই সংস্কৃতির ধারকদের নেশাগ্রস্ত অন্তরে মুসলিম জনপদগুলোর মাতম কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনি। তারা ছিল প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে উম্মাতাল এবং আত্মঘাতি তৎপরতায় লিপ্ত। কিন্তু তখন সুবাহ বাংলার পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন রকম, এখানে প্রশাসন ছিল মিশ্র। নামে মুসলমানদের হাতে নবাবী থাকলেও সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য ছিল হিন্দুদের। মুঘলাই সংস্কৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারী বাংলার মুসলিম আমীর ওমরাহ ও উচ্চ শ্রেণী যাবতীয় নৈতিকতা ও সততা বিসর্জন দিয়ে ভ্রাতৃঘাতী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তবে বাংলার জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমান থাকার কারণে এবং বাংলার কোন বিশেষ অঞ্চল বর্ণ হিন্দুদের শাসনাধীনে না থাকায় বর্ণবাদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভূমিকা নিতে অথবা নেয়াতে সক্ষম হয়নি। এ সত্ত্বেও বাংলার বর্ণ হিন্দুরা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় মুসলিম বিরোধী ভূমিকায় পিছিয়ে ছিল না। তারা প্রকাশ্য যুদ্ধ না করলেও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নিয়ে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মাধ্যমে মুসলমানদের চূড়ান্ত ক্ষতিসাধনে তৎপর ছিল। সমস্ত মুসলিম বিরোধী তৎপরতার মূল নায়ক ছিলেন জগৎশেঠ। একদিকে যেমন আলীবর্দী খানের উপর ছিল তার প্রভাব অন্যদিকে মুদ্রা ভাংগানী ব্যবসার সূত্রে ইংরেজদের সাথে গড়ে উঠে সখ্যতা। আলীবর্দী খানের নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সহযোগী হওয়ার কারণে ঘষেটি বেগমের বিশ্বস্ত প্রাদেশিক দেওয়ান রাজ বল্লভ এবং বিহারে নিযুক্ত প্রথম গভর্নর জানকী রাম ও পরবর্তী গভর্নর রামনারায়ণের সাথে নবাবের দিওয়ান চিনুরায় বাবু বীরু দত্ত, আলম চাঁদের পুত্র বারারায়ান করাত চাঁদ ও উমিচাঁদের সহযোগিতায় রাজস্বের জামিন ব্যাংকার হিসেবে সারা বাংলার জমিদারদের সাথে ছিল স্বরূপ চাঁদ জগৎশেঠের নিয়মিত যোগাযোগ। সেনাবাহিনীর প্রধান প্রভাবশালী সৈন্যাধক্ষ, রায় দুর্লভ, রাম বাবু, মানিক চাঁদ, রাজা নন্দ কুমার, মোহন লাল প্রমুখও ছিলেন তার আপন জন। যেসব হিন্দু বেনিয়া মালামাল সরবরাহ করত সেই সব প্রতিষ্ঠিত

বণিকদের সাথেও জগৎশেঠের ভাল সম্পর্ক ছিল। এই কারণে জগৎশেঠ মধ্যমনি হয়ে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করতে অতি সহজে সক্ষম হন।

বর্গী হামলা প্রতিহত করার নামে বর্ধমানের মহারাজার সাথে মিলে জগৎশেঠ মুর্শিদাবাদের নবাবের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন। অবশ্য ধরা পড়ে বর্তমান মুদ্রামানে দু হাজার কোটি টাকা নবাবকে ফেরত দিতে বাধ্য হন। পক্ষান্তরে বর্গী হামলার হাত থেকে রক্ষার নামে ইংরেজদের সাথে ব্যবসারত বর্ণ হিন্দু বণিকদের চাঁদার টাকায় কোলকাতা নগরীকে ঘিরে মারাঠা রক্ষা প্রাচীর ও পরিখা গড়ে তুলে সমগ্র দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার বিত্তশালী বর্ণ হিন্দু ব্যক্তিদেরকে এমনভাবে জমায়েত করা হয় যে ১৬৯০সালে প্রতিষ্ঠিত কোলকাতার জনসংখ্যা ১৭৫৭ সালের আগেই হয়ে দাঁড়ায় লক্ষাধিক এবং এই জনসংখ্যার এক শতাংশও মুসলমান ছিল না। এর ফলে কোলকাতা কুচক্রীদের নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হলো।

বৃটিশ শাসনের পূর্বে সুবাহ বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা

এ দেশের শিল্প বাণিজ্য ধ্বংস করে বৃটিশ বেনিয়ারা। আজকের এই তলাবিহীন ঝুড়ির এক প্রান্তে বসে আমরা কল্পনা করতে পারি না বিপুল ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার এই বাংলা কি বিশাল সম্পদের অধিকারী ছিল এদেশের মানুষ! কি গতিশীল অর্থনীতি বিরাজমান ছিল এখানে।

ফরাসী ডাক্তার ব্যবসায়ী পর্যটক বার্নিয়ার তৎকালীন বাংলা মুলুক সফর করে লিখেছেন, "বাংলার মত দুনিয়ার অন্য কোথাও বিদেশী বণিকদের আকৃষ্ট করার জন্য এত বেশী রকমের মূল্যবান সামগ্রী দেখা যায় না... বাংলায় এতো বিপুল পরিমাণ সূতী ও রেশমী পণ্যসামগ্রী রয়েছে যে, কেবল হিন্দুস্থান বা মোগলদের সাম্রাজ্যের জন্য নয় বরং পার্শ্ববর্তী দেশগুলো এবং ইউরোপের বাজারসমূহের জন্য বাংলাকে এ দুটি পণ্যের সাধারণ গুদামঘর বলে অভিহিত করা চলে। মিহি ও মোটা, সাদা ও রঙিন ইত্যাদি সকল রকম সুতী বস্ত্রের বিরাট ¯তূপ দেখে আমি মাঝে মাঝে বিস্ময়াভিভূত হয়েছি যে, কেবলমাত্র ওলন্দাজ বণিকেরা বিভিন্ন প্রকারের ও মানের সাদা এবং রঙ্গীন সুতীবস্ত্র বিপুল পরিমাণে, বিশেষ করে জাপান ও ইউরোপে রফতানী করে থাকে, তা নয়। ইংরেজ, পর্তুগীজ ও দেশীয় বণিকেরাও এসব

দ্রব্য নিয়ে প্রচুর ব্যবসা করে থাকে। রেশম ও বিভিন্ন রেশমজাত দ্রব্য সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।" (বার্নিয়ার,পৃঃ ৪৩৯)

বাংলার চাউল সম্পর্কে বার্নিয়ার বলেন- "বাংলায় এতো বেশি পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হয় যে, তা কেবল প্রতিবেশী দেশগুলোতেই নয়, দূরবর্তী রাজ্যগুলোতেও রফতানী করা হয়ে থাকে। মসলিপত্তম ও করোমন্ডল উপকূলের নানাস্থানে প্রেরিত হয়। সাগর পারের রাজ্যসমূহে, বিশেষ করে সিংহল ও মালদ্বীপেও চাউল পাঠানো হয়।" তিনি লিখেছেন- "বাংলা মুলক চিনি উৎপাদনেও একই রকম সমৃদ্ধশালী; এই চিনি গোলকুন্ডা ও কর্নাটক রাজ্যে (সেখানে সামান্য চিনি উৎপাদিত হয়), মোকা ও বসোরা শহরের মাধ্যমে আরব ও মেসোপটেমিয়ায় এবং বন্দর আব্বাসের পথে পারস্য পর্যন্ত সরবরাহ করা হয়ে থাকে।" বার্নিয়ারের বর্ণনা মতে, বাংলা থেকে সে যুগে সব থেকে উন্নত ধরনের লাক্ষা, আফিম, মোম, মরিচ, গন্ধদ্রব্য ও ঔষধপত্র রফতানী হতো। তিনি বলেন- "ঘি- এর উৎপাদন এত প্রচুর যে, রফতানীর ক্ষেত্রে এটা খুব ভারী বস্তু হওয়া সত্ত্বেও সমুদ্র পথে বহুস্থানে প্রেরিত হয়।" (বার্নিয়ার, পৃঃ ৪৩৭- ৩৯)। বার্নিয়ার জানান- "বাংলা মুলকের পুর্তগীজ অধ্যুষিত এলাকায় অর্থাৎ দক্ষিণ বাংলায় নানান জাতীয় মিষ্টিও তৈরী হয়ে বিদেশে রফতানী হয়ে থাকে। (ইতিহাসের অন্তরালে, ফারুক মাহমুদ, পৃঃ ২১৮)

নদীমাতৃক বাংলার ভৌগোলিক অবস্থানই একে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সহায়ক করে তুলেছিল। ফলে কালক্রমে এই ভূখণ্ড বিশাল ভারত উপমহাদেশের গঞ্জ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাম্রলিপ্ত এবং সপ্তগ্রাম ছিল বাংলার ব্যস্ত বন্দর। সময়ের প্রয়োজনেই স্বাভাবিকভাবে এসব অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল জাহাজ নির্মাণ কারখানা। বহিঃসমুদ্রের উপযোগী বিরাট বিরাট জাহাজ নির্মাণ করতো এদেশেরই মানুষ। এদেশের সন্তানেরাই দূর সমুদ্রে যাত্রা করত বিরাট বিরাট বাণিজ্য বহর নিয়ে। এই জাহাজ নির্মাণ কারখানাগুলোকে বৃটিশরা ধ্বংস করল তাদের নিজস্ব স্বার্থে। বাংলার অন্যান্য মুখ্য শিল্পের মধ্যে ছিল চিনি, লবণ ও সোরা। এই সমস্ত দ্রব্য ব্যাপকভাবে রপ্তানী হত। চিনি ও লবণ এবং তৎসহ জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে বৃটিশ রাজত্বের সময়ে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে। প্রয়োজনীয় সর্ববিধ কৃষি তথা গৃহস্থালির যন্ত্রপাতি এবং বাসনপত্র তৈরি হত বাংলাতেই। বাংলা থেকে রপ্তানি করা পণ্যের মূল্য হিসেবে আমদানিকারক দেশগুলি দিত সোনার বাট, ধাতু মুদ্রা এবং মণিরত্ন। শত শত বছর ধরে বাংলা রপ্তানি উদ্বৃত্ত

ভোগ করেছে। ব্রিটিশ প্রভুত্ব কায়েম হবার পরে যে দুর্ভিক্ষ ঘন ঘন দেখা দিয়েছে, সে যুগে তা ছিল অজ্ঞাত। যে যে দেশের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তারা প্রত্যেকেই বাংলার শিল্পকুশলতা ও কারিগরী দক্ষতার কথা স্বীকার করেছে। এমনকি ব্রিটেনের মাটিতেও এখানকার রেশম বস্ত্রের সঙ্গে সমশর্তাবলীতে প্রতিযোগিতায় এটে উঠতে না পেরে বৃটিশরা পলাশী যুদ্ধের ৫৬ বছর পূর্বে ১৭০১ সালে, বাংলা থেকে রেশমবস্ত্র আমদানি সরাসরি নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। (ধ্বংসের পথে পশ্চিম বাংলা রণজিত রায় উদ্ধৃত নতুন সফর নভেম্বর, ১৯৯৬)

১৯৫৭ সালের আগে আরমেনিয়াসহ ইউরোপের ৭টি দেশের হাজার হাজার নাবিক শত শত জাহাজ নিয়ে বাংলার নদীতে পণ্য খরিদ করে ফিরতো অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে কেবল মসলিন, মোটা সূতী বস্ত্র, রেশম ও রেশমী বস্ত্র ইউরোপ ও জাপানসহ সারা বিশ্বে রফতানি হতো দশ/বার হাজার কোটি টাকার। বাংলাকে বলা হতো সারা ইউরোপের বাজারগুলোর কাপড়ের গুদাম; নারী- পুরুষ, বৃদ্ধ- কিশোর মিলিয়ে ন্যূণ ২৫ লাখ বস্ত্রশিল্পী নিয়োজিত থাকতেন কাপড় তৈরীর কাজে। গংগার পথে পাটনা হয়ে মধ্য ভারতে এবং করোমন্ডল উপকূলে, এমনকি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে চাউল রফতানি হতো; আফিম রফতানি হতো চীন জাপানে, চিনি রফতানি হতো আরব, ইরান, ইরাক অঞ্চলে। সল্টপিটার প্রেরিত হতো ইউরোপে। লবণ চালান হতো মধ্য ভারত ও আসামে। মরিচ, আদা ও দারুচিনি রফতানি হতো ইউরোপে ও মধ্যপ্রাচ্যে- সব মিলিয়ে ন্যূণ ১৫ হাজার কোটি টাকার পণ্য বাংলা থেকে বিশ্বের বাজারে ছড়িয়ে পড়তো। (ইতিহাসের অন্তরালে ফারুক মাহমুদ, পৃঃ ২১৮)

এই বিপুল রফতানির বিনিময়ে তাদের আমদানী ছিল খুবই কম। মোটা কাপড় প্রস্তুতের জন্য সুরাট মির্জাপুর থেকে কিছু সূতা এবং রেশম বস্ত্রের বাড়তি চাহিদা মেটাবার জন্য চীনদেশ থেকে কিছু কাঁচা রেশম আমদানি হতো। ধনী বাংগালীরা খনিজ লবণ ভালোবাসতো বিধায় নিজেদের তৈরী সামুদ্রিক লবণ রফতানি করে উত্তর ভারত থেকে খনিজ লবন আমদানি করতো। এছাড়া চীনামাটির সৌখীন থালাবাসন আমদানি হতো। আর আমদানি হতো কাফ্রী ক্রীতদাস- দাসী। বাংলার নিত্য বর্ধিষ্ণু কৃষি ও শিল্পোন্নত শ্রমশক্তির বিপুল চাহিদা ছিল, ঠিক যেমনটি বর্তমান বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোতে রয়েছে। বিদেশী বণিকেরা ক্রীতদাস- দাসী নিয়ে এসে বাংলায় বিক্রি করতো। বাংলার মুসলমান কারখানা ও খামার-

মালিকেরা তাদেরকে খরিদ করে উৎপাদনকার্যে নিয়োগ করতেন। এ কারণেই বাংলায় নিয়মিত ক্রীতদাস আমদানি হতো। এর বাইরে তেমন কিছুই আমদানি করতে হতো না। এসব আমদানি পণ্যের মূল্য যদি সেকালের মুদ্রায় ৪০ লাখ টাকা (বর্তমান মূদ্রামানে ৮ শত কোটি টাকা ধরা হয়, তাহলে বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যের নীট উদ্বৃত্ত দাঁড়াতো বার্ষিক ৭ কোটি টাকা বর্তমান মুদ্রামানে ১৪ হাজার কোটি টাকা। এ অর্থ এদেশে আসতো স্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান পাথর হীরা- জহরত মণিমরকত হিসেবে। (ইতিহাসের অন্তরালে ফারুক মাহমুদ, পৃঃ ১৪০)

মুসলিম শাসনামলে কৃষি নীতির প্রধান দর্শন ছিল লাঙলের পেছনের মানুষটি। কৃষি এবং শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ছিল উৎপাদনে শরীক। পণ্য এবং রাজস্ব বা কর উভয়ের মাধ্যমেই প্রজা এবং সার্বভৌমত্বের মধ্যে সংযোগ ছিল। দ্বিমূখী ফলনের অংশ দ্বারা রাজস্ব দিতে হত বলে মুদ্রার উৎপাত ছিল না। রাজা এবং প্রজার মধ্যে ধনকুবের এবং মুৎসুদ্দী শ্রেণীর কোন ঠাঁই ছিল না।

তৃতীয় অধ্যায়
পলাশী নাটকের গ্রীণরুমে

ডক্টর মোহর আলী লিখেছেন- দুই অপশক্তি অতি সন্তর্পণে এক অভিন্ন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে। উভয় দলের উদ্দেশ্যের ভিন্নতা থাকা সত্বেও তাদের লক্ষ্য ছিল এক। সেটা হলো সিরাজের পতন অনিবার্য করে তোলা। একটির উদ্দেশ্য ছিল শোষণ লুণ্ঠনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক সাফল্যকে চূড়ান্ত করার জন্য ঔপনিবেশিক প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা। অন্যটির উদ্দেশ্য ছিল সিরাজের পতন ঘটিয়ে মুসলমানদের বিনাশ করে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করা। তাদের একটা সহজ হিসেব ছিল মুসলমানরা ভারত বর্ষের যেখানেই প্রবেশ করেছে সেখানকার মাটি ও মানুষের সাথে একাকার হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের শিকড় অনেক গভীরে প্রথিত হয়ে যায়। এজন্য তাদের উৎখাত করা বর্ণ হিন্দুদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। এ কারণে তারা ভাবতে শুরু করল ইংরেজদের সাহায্য সহযোগিতায় মুসলমানদের পতন সম্ভব হলে কালক্রমে বৃটিশদের বিতাড়িত করা তাদের জন্য কঠিন হবে না। কেননা সাতসমুদ্র তের নদীর ওপার থেকে ভারতে তাদের প্রাধান্য বজায় রাখা বৃটিশদের পক্ষে অসম্ভব হওয়াই স্বাভাবিক।

উভয় পক্ষই তাদের আপাত লক্ষ্য অর্জনের জন্য অভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। প্রথম বর্ণবাদী হিন্দুচক্র এবং বৃটিশ বেনিয়া নিজেদের মধ্যে সখ্যতা বৃদ্ধির প্রয়াস নেয় এবং নিজেদের কৌশল সংক্রান্ত তথ্য বিনিময় করে। এই সাথে বিভিন্নভাবে গুজব ছড়িয়ে নবাবের চরিত্র হননের উদ্যোগ নেয়। সার্বিকভাবে নবাবের ছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে উভয় পক্ষ।

তৎকালীন বাংলার পরিস্থিতির উপর আলোচনা রাখতে গিয়ে প্রফেসর এমাজউদ্দিন লিখেছেন- তৎকালীন সামাজিক পরিবেশও ছিল ষড়যন্ত্রের উপযোগী। তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, "পশ্চিমবঙ্গে তখন বীরভূম ছাড়া আর সব বড় বড় জায়গাতেই হিন্দু জমিদার ছিল প্রতিষ্ঠিত। প্রকাশ্যে না হলেও ভিতরে ভিতরে প্রায় সব জমিদারই এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে প্রধান নদীয়ার রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র রায়। বর্ধমানের রাজার পরই ধনে মানে কৃষ্ণনগরের রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নাম। বাংলার মহাজনদের মাথা জগৎশেঠদের বাড়ীর কর্তা মহাতাব চাঁদ। জগৎশেঠরা জৈন সম্প্রদায়ের লোক হলেও অনেকদিন ধরে বাংলায় পুরুষানুক্রমে থাকায় তাঁরা

হিন্দু সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কর্মচারীদের পাণ্ডা হলেন রায় দুর্লভ রাম।... হুগলীতে রইলো নন্দকুমার।" জগৎশেঠ এবং উমিচাঁদের আশ্রিত ইয়ার লতিফ খাঁ আর একজন ষড়যন্ত্রকারী। সবার শীর্ষে ছিলেন আলীবর্দী খাঁর এক বৈমাত্রেয় ভগ্নীর স্বামী মীর জাফর আলী খাঁ। নবাব হবার বাসনা তার অনেক দিনের। বর্গীয় হাঙ্গামার সময় আলীবর্দী খাঁকে হত্যা করিয়ে বাংলার নবাবী গ্রহণের আকাঙ্খা তাঁর ছিল। শেষ পর্যন্ত সে চেষ্টা ফলবতী হয়নি। সিরাজউদ্দৌলা নবাব হলে জগৎশেঠ শওকত জঙ্গের সাথে মিলে ষড়যন্ত্রের আর এক গ্রন্থি রচনা করেন। কিন্তু তা কার্যকর হয়নি। এবারে জগৎশেঠ, ইয়ার লতিফ খাঁ, উমিচাঁদের সহযোগী হিসেবে মাঠে নামেন। সিরাজের সমর্থকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সেনা নায়ক মোহন লাল এবং মীর মদন বা মীর মর্দান (২৩ জুনের পূর্বে বাংলার 'মুক্তির চুক্তি' নামে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় মীর জাফর এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে। অক্ষয় কুমার মৈত্রের রচিত মীর কাসিম গ্রন্থের ২২৩- ২৪ পৃষ্ঠায় ১২ দফার এই চুক্তির বিবরণ রয়েছে। মীর জাফরের স্বাক্ষরে চুক্তিতে বলা হয় : 'আমি আল্লাহর নামেও আল্লাহর রাসূলের নামে প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমার জীবনকালে আমি এই চুক্তিপত্রের শর্তবলী মানিয়া চলিব।'

আগে উল্লেখ করেছি ভারতের মারখাওয়া ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে কিভাবে সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হচ্ছিল কিভাবে তারা তাদের লক্ষ্যের দিকে সন্তর্পণে এগুচ্ছিল সেটা সমকালীন প্রতিষ্ঠিত শাসকরা আঁচ করতে পারেনি। কারণ ব্রাহ্মণ্যবাদী কুচক্রীদের তোষামোদিতে সম্মোহিত হয়ে ছিল তারা। কিন্তু তৎকালীন পরিস্থিতি সংক্রান্ত গভীর উপলব্ধি ছিল বৃটিশদের। ১৭৫৪ সালে জনৈক ইংরেজ স্কটের পত্র থেকে সেটা জানা যায়। হিন্দু জমিদারদের মনোভাব সম্পর্কে তিনি লিখেন- 'হিন্দু রাজা ও জমিদাররা মুসলিম শাসকদের প্রতি সর্বদা হিংসাত্মক ও বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করেন। গোপনে তারা মুসলিম শাসনের হাত থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে।'

একই সময় কোম্পানীর একজন মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ার তার বৃটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট একটি রিপোর্ট পেশ করেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন- 'যদি ইউরোপীয় সেনাবাহিনী তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যে সঠিকভাবে হিন্দুদের উৎসাহিত করতে পারে তবে হিন্দুরা অবশ্যই যোগ দিবে তাদের সাথে, উমি চাঁদ ও তাদের সহযোগী হিন্দুরাজা ও সৈন্য বাহিনীর উপর যাদের আধিপত্য কাজ করছে তাদেরও টানা যাবে এ ষড়যন্ত্রে।' কে কে

দত্তের আলীবর্দী এন্ড 'হিজ টাইম' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে- '১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংসহাসন চ্যুত করার ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলেছিল হিন্দু জমিদার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী লেখক রাজীব লোচন লিখেছেন- 'হিন্দু জমিদার ও প্রধানগণ সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। [কে, কে. দত্ত. আলীবর্দী এন্ড হিজ টাইম, পৃঃ ১১৮]।

পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে ক্লাইভের সাথে বর্ধমান, দিনাজপুর ও নদীয়ার জমিদারদের পত্র যোগাযোগ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ মেলে যে, অগ্রিম আনুগত্য প্রকাশ করে তারা ক্লাইভকে যুদ্ধযাত্রার দাওয়াত জানান [শিরীন আক্তার]। নদীয়া, বর্ধমান, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর, দিনাজপুর, বীরভূমের রাজা- মহারাজারা মুর্শিদাবাদ সমবেত হয়ে দেওয়ান- ই- সুবা মহারাজা মহেন্দ্রের কাছে অনেকগুলো দাবী পেশ করেন- তাদের ক্রমবর্ধিষ্ণু দাবী মিটাতে নবাব অপারগ হলে জগৎ শেঠের পরামর্শে তারা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নেতৃত্বে- এক বৈঠকে মিলিত হয়ে সিরাজদ্দৌলাকে উৎখাতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সভার পক্ষে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কোলকাতায় মিঃ ড্রেকের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আহবান জানান এবং সর্বমুখী সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দেন। (Ierrititial Aristocracy of Bangla the Naelia Raj : C.R. 1872 1.V., 107-110.) সুবে বাংলার কুলিন বর্ণহিন্দু রাজা- মহারাজারা আলাবর্দীকে দিয়ে নবাব সরফরাজকে উচ্ছেদ করে যেরূপ ফায়দা হাসিল করেন, নবাব আলীবর্দীর মৃত্যু মুহূর্তেও তেমনি দেওয়ান রাজবল্লভের নেতৃত্বে তাদের একদল সিরাজের বড় খালা ঘষেটি বেগমকে উস্কানি দিয়ে, সসৈন্যে সাথে করে নিয়ে মুর্শিদাবাদ আক্রমণের জন্য নগরীর দ্বারপ্রান্তে হাজির করেন। সিরাজউদ্দৌলা তাঁর খালার মন জয় করে তার সমর্থন পেয়ে যাওয়ায় দিশেহারা দেওয়ান রাজবল্লভ নিজ পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে দিয়ে নবাবের ঢাকাস্থ যাবতীয় অর্থবৃত্ত সম্পদ- সম্ভার কোলকাতায় ইংরেজদের আশ্রয়ে পাচার করে দেন। অন্যদিকে সিরাজের খালাতো ভাই পুর্নিয়ার গভর্নর শওকত জংকেও শ্যামসুন্দর বাবুরাই উস্কানি দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ করেন।

ইংরেজদের সাথে বিরোধের সূচনা

আসকার ইবনে শাইখ লিখেছেন- নবাব আলীবর্দী খানের শাসনামলে (১৭৪০- ৫৬) ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভকে হিসাবপত্র নিরীক্ষণের জন্য কাগজপত্রসহ মুর্শিদাবাদ তলব করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে তহবিল তসরুফের

প্রামাণ্য অভিযোগ ছিল। কিন্তু হিসাব পরীক্ষার পূর্বেই তিনি কাশিম বাজারে কুঠির প্রধান উইলিয়াম ওয়াটসের নিকট তাঁর পুত্র ও পরিজনের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণ দাস বা কৃষ্ণবল্লভ ৫৩,০০০০০ টাকা মূল্যের নগদ অর্থ ও সোনা রূপাসহ কলকাতায় আশ্রিত হন। এই কৃষ্ণবল্লভকে প্রত্যার্পণের জন্য নবাব দরবার হতে বার বার নির্দেশ ও তাগিদ দেয়া সত্বেও কোম্পানীর গভর্নর রজার ড্রেক তা পালন করতে অস্বীকার করেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ১৭৫৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে। নবাবের নিষেধ সত্বেও ইংরেজরা তাদের ফোর্ট উইলিয়াম (কলকাতায়) দুর্গটিকে সামরিক সাজে সজ্জিত করে তুলতে শুরু করে। বৃদ্ধ নবাব আলীবর্দী এ দুটি ঘটনার 'প্রতিকার করে যেতে পারেননি।

নবাবী লাভ করেই সিরাজউদ্দৌলা কৃষ্ণবল্লভকে প্রত্যার্পণ করতে গভর্নর ড্রেককে এবং দুর্গ দেয়াল ভেঙ্গে পরিখা বন্ধ করে দিতে ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলকে নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণ সিংহ নামক একজন বিশ্বস্ত দূতকে ইংরেজদের মনোভাব যাচাই করার জন্য কলকাতা পাঠালেন। কিন্তু ইংরেজরা নারায়ণ সিংহকে অপমান করে কলকাতা হতে তাড়িয়ে দেয়। নবাব আবার অন্যতম ব্যাংক ব্যবসায়ী খাজা ওয়াজিদকে একই উদ্দেশ্যে কলকাতা পাঠান। পরপর চার বার তিনি কলকাতা যান, কিন্তু ইংরেজরা তার সঙ্গেও সংযত আচরণ বা আপোষমূলক মনোভাব প্রদর্শন কোনটিই করেনি।

এভাবে নবাবের আন্তরিক সদিচ্ছা ব্যর্থ হবার ফলে তিনি দুর্লভরাম ও হুকুম বেগকে কাশিম বাজার কুঠি অবরোধের নির্দেশ দিলেন। মির মোহাম্মদ জো খান হুগলীতে জাহাজ নির্গমনের পথ রোধ করলেন এবং নবাবের উপস্থিতিতে কাশিম বাজারের পতন ঘটল। কুঠি প্রধান ওয়াটস্ এবং কলেটকে সঙ্গে নিয়ে নবাব কলকাতার দিকে অগ্রসর হলেন। কাশিম বাজার অবরোধ ও পতনের মাধ্যমে সমঝোতায় আসতে ইংরেজদের উপর চাপ সৃষ্টি করাই নবাবের উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তী ঘটনায় তার প্রমাণ মিলে। খাজা ওয়াজিদের মিশন ব্যর্থ হবার পর উর্মিচাঁদ ও শ্রীবাবু নামক জনৈক ব্যবসায়ী সমঝোতার প্রস্তাব দেন। মীমাংসায় আসার জন্য নবাবের নিকট একজন দূত পাঠাতে ড্রেককে অনুরোধ করে পত্র লেখেন উইলিয়াম ওয়াটস্ ও কলেট। এ পত্র পাঠান হয় ওলন্দাজ এজেন্ট বিসডোমের মাধ্যমে। ড্রেক তাও রক্ষা করেননি। অবশেষে ফরাসী দেশীয় ম্যাকুইস দ্যা সেন্ট জ্যাকুইস এর

মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠানো হয় কোলকাতায়। উত্তরে উদ্যত রজার ড্রেক প্রস্তাবকারীকে পক্ষ পরিবর্তনের উপদেশ দেন।

সুতরাং অনিবার্য হয়ে উঠল সংঘাত। ১৭৫৬ সালে ১৩ই জুন নবাব ফোর্ট উইলিয়মে পৌঁছান এবং যথারীতি কোলকাতা অবরুদ্ধ হয় ১৯ জুন। নাটকের উদ্ধৃত অহংকারী নায়ক রজার ড্রেক সঙ্গী মিনকিন, ম্যাকেট ও গ্রান্টসহ সগৌরবে পিছন দিকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। সংগে সংগে ইংরেজ শিবিরে পলায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত সংক্রমিত হয়ে পড়ে। এক ঘণ্টার মধ্যে ইংরেজদের সকল জাহাজ পলাতকদের নিয়ে ভাটির পথে পাড়ি জমায়...।

... ড্রেক ও অন্যান্যদের পলায়নের পর ফোর্ট উইলিয়ামের মাত্র আটজন যুদ্ধ পরিষদের সদস্য অবশিষ্ট রইল। তাদের মধ্যে হলওয়েল রজার ড্রেকের স্থলবর্তী গভর্নর নিয়োজিত হলেন। হলওয়েল পলায়নের কোন নৌকার অভাবেই কলকাতায় থেকে যেতে বাধ্য হন এবং তিনিই পরবর্তীকালে তথাকথিত কাল্পনিক অন্ধকুপ হত্যার গল্প কাহিনীর জন্ম দান করেন। হলওয়েল গভর্নর হয়ে এক দুপুর টিকে ছিলেন; তার পর আত্মসমর্পন ভিন্ন কিছুই আর তাঁর করবার রইল না। ২০ জুন বিকেল চারটায় কলকাতার পতন ঘটে।

১৭ জুলাই বন্দীদের নবাবের সামনে হাজির করা হয়। অন্যদিকে কাশিমবাজার ও কলকাতার পতন সংবাদ পর পর মাদ্রাজ পৌঁছে। ফলে প্রথমে মেজর কিলপেট্রিক-এর নেতৃত্বে দুটি জাহাজ এবং পরে রবার্ট ক্লাইভের নেতৃত্বে- প্রচুর সৈন্য, গোলাবারুদ ও সাজ-সরঞ্জামসহ বারটি জাহাজ পাঠান হয় বাংলায়। এই অভিযানের প্রধান দুটি উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়; ক. নবাবের বিরুদ্ধে একটি অভ্যুত্থান ঘটিয়ে কোম্পানীর ইচ্ছানুরূপ ক্ষমতা পরিবর্তন : খ. কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীদের চন্দন নগর হতে উৎখাত। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলকে লিখিত মাদ্রাজের সেন্ট জর্জ কাউন্সিলের লিখিত পত্রে (১৩ অক্টোবর ১৭৫৬) 'The sword should go hand in hand with the pen' উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে নবাবের বিরুদ্ধে যে কোন স্বার্থান্বেষী মহলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে এবং ফরাসীদের চন্দন নগর হতে বিতাড়নের নির্দেশও দেয়া হয়।

২৫ ডিসেম্বর ফুলতা পৌঁছেই ক্লাইভ ও ওয়াটসন 'কলমের সঙ্গে সঙ্গে তরবারির মহড়া শুরু করেন। ৩০ ডিসেম্বর তাঁরা বজবজ দখল করেন এবং ২ জানুয়ারী (১৭৫৭) কলকাতা পুনরুদ্ধার করে ড্রেক ও তাঁর কাউন্সিল

সদস্যদের ফোর্ট উইলিয়ামে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিজয়ের গৌরবে ইংরেজেরা ৩ জানুযায়ী নবাব ও তাঁর দেশবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে। হুগলী শহরটি ব্যাপকভাবে লুণ্ঠিত হয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে তারা আগুন ধরিয়ে দেয়। সেদিনই নবাব তাঁর এক ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে হুগলীর উত্তরে পৌঁছেন। ইংরেজরা ফিরে যায় কলকাতা। ফরাসী ও ওলন্দাজেরা নবাব ও ইংরেজদের বিবাদে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ইংরেজেরা তাদের কাউকে বিশ্বাস না করে এবার খাজা ওয়াজিদের মাধ্যমে তাদের দাবীর কথা জানিয়ে দেয় ২২ জানুয়ারী। বলা হয়, কাশিমবাজার ও কলকাতা দখলের ক্ষতিপূরণ, ১৭১৭ সালের ফরমানানুযায়ী সকল সুবিধা, কলকাতায় সামরিক দুর্গ নির্মাণের অনুমতি এবং কোম্পানীর নিজস্ব মুদ্রা তৈরীর অধিকার দিতে হবে।

বৃটিশদের ঔদ্ধত্য ও আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের ফলে নওয়াব দারুণভাবে বিব্রত ও ক্ষুব্ধ হন। ওদিকে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর আমন্ত্রণে আফগান বীর ভারতবর্ষে আগমন করেন মূলত মারাঠা ঔদ্ধত্য গুড়িয়ে দেয়ার জন্য। তার আক্রমণের লক্ষ্য সুবাহ বাংলা ছিল না। কিন্তু দরবারের কুচক্রী সৃষ্ট আহমদ শাহ আবদালীর বাংলা আক্রমণ সংক্রান্ত গুজব নতুন আশঙ্কার জন্ম দেয়। এ আশঙ্কা নবাবকে অনেকটা হত বিহবল করে ফেলে। উদ্বিগ্ন নবাব আবদালীর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেন। সে সময় ইংরেজদের ঔদ্ধত্যপূর্ণ্য আচরণ নবাবের কাছে গৌণ বলে অনুভূত হয়। নবাব ইংরেজদের সাথে আপোষের কথা ভাবতে থাকেন, এই কারণে যেন আবদালীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে মনযোগী হতে পারেন। ওদিকে নবাবের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানার উদ্দেশে নবাব বিরোধী ষড়যন্ত্র পোক্ত হওয়ার জন্য ইংরেজদেরও সময়ের প্রয়োজন ছিল। উভয়ের প্রয়োজনে ১৭৫৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এই সন্ধির পর নবাব আফগান আক্রমণ প্রতিরোধে মনোযোগী হলেন। এই অবকাশে ইংরেজরা একদিকে নবাবের পারিষদবর্গ ও সেনানায়কদের প্রলুব্ধ ও প্রভাবিত করার সুযোগ পেল এবং অন্যদিকে ফরাসীদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল সম্ভাব্য বিপর্যয় নাটকের দৃশ্য থেকে ফরাসীদের বিদায় করার জন্য। বাংলার প্রেক্ষিত নয় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সামনে এনে ইঙ্গ ফরাসী যুদ্ধের দোহাই পেড়ে ইংরেজরা ১৪ মার্চ ফরাসী অধ্যুষিত চন্দন নগর অবরোধ করে।

(১৭৫৭) চন্দন নগর অবরোধের সংবাদ পেয়ে নবাব দুর্লভরাম ও নন্দকুমারকে আবার ফরাসীদের সাহায্যের জন্য পাঠান। ইংরেজদের দেয়া ঘুষে এবারও তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। ২৩ মার্চ চন্দন নগরের পতন ঘটে। ফরাসীরা বাংলায় তাদের সবগুলো কুঠি ইংরেজদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তাদের কিছু সৈন্য কাশিম বাজারে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে, কিছু প্রাণ দেয়, কিছু বন্দী হয়। ইংরেজদের পক্ষে যুদ্ধ করে নিহত দেশীয় সিপাহীদের ইংরেজ সেবার নিদর্শন স্বরূপ জনপ্রতি দশ টাকা করে পুরস্কার দেয়া হয়।

ডক্টর মোহর আলী লিখেছেন- 'ইংরেজদের চন্দন নগর আক্রমণের প্রাক্কালে নবাব তাদের প্রতিরোধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু বিপুল পরিমাণ ঘুষের বিনিময়ে প্রতিরোধ বাহিনীর নেতা নন্দকুমার বিশ্বাসঘাতকতা করেন এবং রায় দুর্লভ রাম ইংরেজদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি গ্রহণে সিরাজকে বাধা দিতে থাকেন। ক্ষমতা লাভের ছয় মাসের মধ্যেই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল পরিপক্ক হয়ে ওঠে। এই লোকগুলোর সহযোগিতায় ক্লাইভ খুব সহজেই নবাব প্রশাসনকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিকল করে ফেলেন এবং নবাবের গোপন কাগজ ও চিঠিপত্র হস্তগত করেন। নবাব এসব ষড়যন্ত্রের সবকিছু জানতে পারেন। কিন্তু ব্যাপক বিস্তৃত এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তখন তাঁর কিছুই করার ছিলো না। কারণ, তিনি কাউকেই বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করতে পারেননি।' প্রফেসর আব্দুর রহিম লিখেছেন, ২৩ এপ্রিল (১৭৫৭) ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কোলকাতা কাউন্সিল নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসন চ্যুত করার জন্য একটি প্রস্তাব পাস করে। হিল লিখেছেন যে, ক্লাইভ উমিচাঁদকে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র গড়ে তোলার কাজে ব্যবহার করেন।'

অন্যদিকে ডক্টর মোহর আলী- ১৭৫৭ সালের পয়লা মে অনুষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম সিলেক্ট কমিটির বিবরণ দিয়ে লিখেছেন- 'সিরাজকে উৎখাতের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের হীন পকিল্পনার পক্ষে যে সকল যুক্তি দাঁড় করায় তা হচ্ছে-

(ক) সিরাজ অসৎ এবং ইংরেজদের নির্যাতনকারী।

(খ) তিনি ফরাসীদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, যার অর্থ হচ্ছে ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ এবং

(গ) সিরাজ বাঙ্গালীদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছেন- যার ফলে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সহজেই ঘটতে পারে।

এই পরিকল্পনা গ্রহণের পর মুর্শিদাবাদের অদূরে পলাশী প্রান্তরে ক্লাইভ তাঁর সৈন্য সমাবেশ শুরু করেন। মীর জাফর ও দুর্লভ রামের নেতৃত্বে নবাব ১৫,০০০ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। এদিকে মুর্শিদাবাদের ইংরেজ প্রতিনিধি ওয়াটস তখনই যুদ্ধ না বাঁধিয়ে সৈন্য প্রত্যাহার করে কলকাতায় সুযোগের প্রতীক্ষা করতে ক্লাইভকে উপদেশ দেন। ক্লাইভ তা মেনে নেন এবং নবাবকেও তাঁর সৈন্য প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। ইংরেজদের আচরণ নবাবের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে; তিনি তাঁর বাহিনী অপসারণের নির্দেশ দিলেন। ক্লাইভ তাঁদের আচরণের সততার প্রতি নবাবের সন্দেহ দূর করার জন্য এক কুটচাল চালেন। মারাঠাদের লিখা এক চিঠি দিয়ে তিনি স্ক্রেফটনকে মুর্শিদাবাদ পাঠান। এ চিঠিতে ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে বাংলাকে ভাগ করে নেবার প্রস্তাব ছিল। এবার নবাব ইংরেজদের বিশ্বাস করলেন এবং তার বাহিনীকে মুর্শিদাবাদ ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন।

'নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারেন। তিনি মীর জাফরকে প্রধান সেনাপতির পদ হইতে অপসারিত করেন এবং আবদুল হাদী খানকে সে পদে নিয়োগ করেন। আবদুল হাদী ও মীর মদন মীর জাফরকে ধ্বংস করিবার জন্য নবাবকে পরামর্শ দেন। কিন্তু জগৎশেঠ ও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতক উপদেষ্টাগণ নবাবকে পরামর্শ দেন যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে শক্তিবৃদ্ধির জন্য মীর জাফরের সহযোগিতা লাভ করা নবাবের পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হইবে। নবাব তাহাদের উপদেশ গ্রহণ করেন। তিনি মীর জাফরের বাড়ীতে গিয়ে নবাব আলীবর্দীর নামে তাঁহার নিকট ইংরেজদের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য মর্মস্পশী আবেদন জানান। পবিত্র কুরআন হাতে লইয়া মীর জাফর এই সময় অঙ্গীকার করেন যে, তিনি নবাবের জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন'। (প্রফেসর আব্দুর রহিম)

সাময়িক পদচ্যুতির অপমানে মীর জাফর দারুণভাবে প্রতিহিংসা পরায়ণ ও ক্রোধান্ধ হয়ে উঠলেন। সিরাজের আশু পতন অনিবার্য করে তোলার জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ নিলেন। মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করার জন্য বার বার ক্লাইভের নিকট বার্তা প্রেরণ করে তাগাদা দিতে থাকেন। এমন মাহেন্দ্রক্ষণের প্রতীক্ষায় ছিলেন ক্লাইভ। এই সুযোগে তিনি আরো অতিরিক্ত শর্ত যুক্ত করলেন। পরিণতির কথা না ভেবেই মীর জাফর সব দাবী অকপটে মেনে নিলেন। জগৎশেঠের প্রোথিত বিষাক্ত বীজ অঙ্কুর থেকে বৃক্ষে পরিণত

হল, অতঃপর মহীরুহে। ম্লেচ্ছ যবন মুসলিম শাসনের অবসান ঘটিয়ে নব উত্থান সম্ভাবনায় ব্রাহ্মণ্যবাদীরা উদ্বেলিত হয়ে উঠল।

'অতঃপর ষড়যন্ত্রকারীগণ জগৎশেঠের বাড়িতে গোপন বৈঠকে মিলিত হয়। জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, মীর জাফর, রাজবল্লভ এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই বৈঠকে যোগ দেন। ইংরাজ কোম্পানীর এজেন্ট ওয়াটস মহিলাদের মত পর্দা- ঘেরা পাল্কিতে জগৎশেঠের বাড়িতে আসেন। এই বৈঠকে সিরাজউদ্দৌলাকে সরাইয়া মীর জাফরকে বাংলার মসনদে বসাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ওয়াটস এই কাজে ইংরেজদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। ইহার পর কোম্পানীর প্রধানগণ চুক্তিপত্রের খসড়া প্রস্তুত করেন এবং ১৯মে ইহাতে দস্তখত করেন। মীর জাফরসহ ৪ জন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। চুক্তির শর্তানুযায়ী ইংরাজদের সৈন্য সাহায্যের বিনিময়ে মীর জাফর তাহাদিগকে কয়েকটি বাণিজ্য- সুবিধা দিতে স্বীকার করেন। তাহা ছাড়া তিনি ইংরেজ সৈন্যদের ব্যয়ভার বহন করিতে এবং কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দুই কোটি টাকা দিতে সম্মত হন। নবাবের কোষাগার হইতে উমিচাঁদকে ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে বলিয়া বলা হয়। উমিচাঁদকে প্রতারিত করিবার জন্য ক্লাইভ চুক্তিপত্রের দুইটি খসড়া প্রস্তুত করেন। আসল খসড়ায় উমিচাঁদকে টাকা দেয়ার শর্তের উল্লেখ করা হয় নাই। নকল খসড়ায় এই শর্তটি লিখিত হয়। ইহার দস্তখতগুলি সবই ক্লাইভ জাল করিয়াছিলেন। রায়দুর্লভকেও লুটের মালের কিয়দংশ দেওয়া হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়'। (প্রফেসর আব্দুর রহিম)

৪ জুনের স্বাক্ষরিত চুক্তিটি ছিল নিম্নরূপ :

"আমি আল্লাহর নামে ও আল্লাহর রাসূলের নামে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমার জীবনকালে আমি এই চুক্তিপত্রের শর্তাবলী মানিয়া চলিব।

ধারা- ১ : নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে শান্তিচুক্তির যেসব ধারায় সম্মতি দান করিয়াছি, আমি সেসব ধারা মানিয়া চলিতে সম্মত হইলাম।

ধারা- ২ : ইংরেজদের দুশমন আমারও দুশমন, তাহারা ভারতবাসী হোক অথবা ইউরোপীয়।

ধারা- ৩ : জাতিসমূহের স্বর্গ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় ফরাসীদের সকল সম্পত্তি এবং ফ্যাক্টরীগুলো ইংজেরদের দখলে থাকিবে এবং কখনো তাহাদিগকে (ফরাসীদেরকে) ওই তিনটি প্রদেশে আর কোন স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করিতে দিব না।

ধারা- ৪ : নবাব সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা দখল ও লুণ্ঠনের ফলে ইংরেজ কোম্পানী যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছে তাহার বিবেচনায় এবং তন্নিমিত্ত মোতায়েনকৃত সেনাবাহিনীর জন্য ব্যয় নির্বাহ বাবদ আমি তাহাদিগকে এক ক্রোর তঙ্কা প্রদান করিব।

ধারা- ৫ : কলিকাতার ইংরেজ অধিবাসীদের মালামাল লূণ্ঠনের জন্য আমি তাহাদিগকে পঞ্চাশ লক্ষ তঙ্কা প্রদান করিতে সম্মত হইলাম।

ধারা- ৬ : কলিকাতার জেন্টু (হিন্দু), মূর (মুসলমান) এবং অন্যান্য অধিবাসীকে প্রদান করা হইবে বিশ লক্ষ তঙ্কা। (ইংরেজরা হিন্দুদেরকে জেন্টু' এবং মুসলমানাদের 'মূর' ও 'মেহোমেটান' বলে চিহ্নিত করতো)।

ধারা- ৭ : কলিকাতার আর্মেনীয় অধিবাসীদের মালামাল লুণ্ঠনের জন্য তাহাদিগকে প্রদান করা হইবে সাত লক্ষ তঙ্কা। ইংরেজ, জেন্টু, মূর এবং কলিকাতার অন্যান্য অধিবাসীকে প্রদেয় তঙ্কার বিতরণভার ন্যস্ত রহিল এডমিরাল ওয়াটসন, কর্নেল ক্লাইভ, রজার ড্রেক, উইলিয়াম ওয়াটস, জেমস কিলপ্যাট্রিক এবং রিচার্ড বীচার মহোদয়গণের উপর। তাঁহারা নিজেদের বিবেচনায় যাহার যেমন প্রাপ্য তাহা প্রদান করিবেন।

ধারা- ৮ : কলিকাতার বর্ডার বেষ্টনকারী মারাঠা ডিচের মধ্যে পড়িয়াছে কতিপয় জমিদারের কিছু জমি; ওই জমি ছাড়াও আমি মারাঠা ডিচের বাইরে ৬০০ গজ ইংরেজ কোম্পানীকে দান করিব।

ধারা- ৯ : কল্পি পর্যন্ত কলিকাতার দক্ষিণস্থ সব জমি ইংরেজ কোম্পানীর জমিদারীর অধীনে থাকিবে এবং তাহাতে অবস্থিত যাবতীয় অফিসাদি কোম্পানীর আইনগত অধিকারে থাকিব।

ধারা- ১০ : আমি যখনই কোম্পানীর সাহায্য দাবি করিব, তখনই তাহাদের বাহিনীর যাবতীয় খরচ বহনে বাধ্য থাকিব।

ধারা- ১১ : হুগলীর সন্নিকটে গঙ্গা নদীর নিকটে আমি কোন নতুন দুর্গ নির্মাণ করিব না।

ধারা- ১২ : তিনটি প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র আমি উপরিউক্ত সকল তঙ্কা বিশ্বস্তভাবে পরিশোধ করিব।

২৩ জুন ১৭৫৭ মীর জাফরের সাময়িক পদচ্যুতির মাত্র একমাসের ব্যবধানে সমাগত হল সিরাজের অন্তিম পর্ব। পলাশীতে সৈন্য সমাবেশ হল নবাব এবং ক্লাইভ উভয় পক্ষের। নবাবের পক্ষে সৈন্য সংখ্যা ৫০ হাজার, এর মধ্যে পদাতিক ৩৫ হাজার অশ্বারোহী ১৫ হাজার। ক্লাইভের পক্ষে ছিল মাত্র ৩ হাজার দেশী বিদেশী সম্মিলিত ভাবে।

২৩ জুনের পূর্বে বাংলার মুক্তি চুক্তি নামে ১২ দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় মীর জাফর ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে, তাতে মীরজাফরের পক্ষ থেকে বলা হয় : আমি আল্লাহর নামেও আল্লাহর রাসূলের নামে প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমার জীবনকালে আমি এই চুক্তিপত্র মানিয়া চলিব।

এই মুক্তির চুক্তি মীর জাফর সত্যি আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করেছিলেন। প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব নিয়ে তিনি রনাঙ্গনে ছবির মত দাঁড়িয়ে ছিলেন। দাঁড়িয়েছিল তার বাহিনী। তিনি প্রধান সেনাপতি হয়ে নবাবের পতন উপভোগ করলেন প্রাণভরে। মুর্শিদাবাদের পতন হল। পুনরুদ্ধারের আশায় নবাব ছুটে চললেন বিহারে তার অনুগত বাহিনীর নিকট। তার আশা পূর্ণ হলো না। পথে গ্রেপ্তার হলেন। মীরজাফর তনয় মিরন তাকে নির্মমভাবে হত্যা করল। তার রক্তপাতের মধ্য দিয়ে সমগ্র সুবাহ বাংলার স্বাধীনতা ১৯০ বছরের জন্য মহাকালের অন্ধকারে হারিয়ে গেল। সমগ্র জাতি শৃংখলিত হল ঔপনিবেশিক অক্টোপাসে। সে ইতিহাসও অতি মর্মান্তিক। ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। সিরাজের পতনের মধ্যে তারা দেখতে পেল তাদের উত্থান সম্ভাবনা।

চতুর্থ অধ্যায়
পলাশীর পরে

পলাশী যুদ্ধের প্রহসনমূলক নাটক শেষ হতে না হতেই লুণ্ঠিত হল মুর্শিদাবাদের রাজকোষ। সে সময় রাজকোষে কি পরিমাণ সম্পদ ছিল?

মুর্শিদকুলী খাঁর শাসনকাল থেকে দীর্ঘ ৫৫ বছরের সঞ্চয় একত্রিত হয়ে নবাব সিরাজ- উদ- দৌলার কোষাগারে পূর্ণিয়া যুদ্ধের পর সঞ্চিত ছিল সার্জন ফোর্থের প্রদত্ত হিসেব মতে মণিমুক্তা হিরা জহরতের মূল্য বাদ দিয়ে, তৎকালীন মুদ্রায় ৬৮ কোটি টাকা [S. C. Hill. Bengal in 1757-67, P.108] যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজেটের সাথে তুলনীয়।'

পলাশীর নাটক শেষ করে সিরাজ- উদ্দৌলারই দীওয়ান রামচাঁদ বাবু মুনশী নবকিষেণ, লর্ড ক্লাইভ ও মীরজাফরকে নিয়ে নবাবের কোষাগারে হাজির হন বিত্ত- সম্পদ লুট করার জন্য। দীওয়ান বাবুর তালিকার সাথে মিলিয়ে প্রাপ্ত সম্পদ তারা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেন। সিরাজউদ্দৌলার প্রাসাদে ও অন্দরমহলে রক্ষিত সম্পদ ভাগ করে নেন দীওয়ান রামচাঁদ, মুনশী নবকিষেণ, মীর জাফর আলী খান ও আমীর বেগ খান। (সিয়ারে মতাযেলি, ২য় খণ্ড (অনুবাদ) পৃ- ২৩।

মুর্শিদাবাদের রাজকোষ থেকে পাওয়া গেল পনের লক্ষ পাউন্ড অর্থাৎ ৩০ কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ। ক্ষতিপূরণ হিসেবে বৃটিশ নৌবাহিনী এবং স্থল বাহিনীর ৬জন সদস্যকে দিতে হল ৮কোটি টাকা। সিলেক্ট কমিটির ৬ জন সদস্যকে দিতে হল ৯ লক্ষ পাউন্ড (১৮ কোটি টাকা), ক্লাইভ তার নিজের জন্য আদায় করলেন ২ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাউন্ড (প্রায় ৩ কোটি টাকা), কাউন্সিল মেম্বাররা পেলেন এক থেকে দেড় কোটি টাকা করে।

এছাড়াও উৎকোচ, নিপীড়ন এবং আরো বিবিধ নীতি বহির্ভূত ঘৃণিত পন্থায় এ দেশের সম্পদ লুট করেছে বৃটিশ বেনিয়ারা। সিরাজের পতনের পর নবাবের শূন্য আসনটি কোম্পানীর অর্থোপার্জনের উৎসে পরিণত হয়। শিখণ্ডি নবাবী কেনাবেচার মধ্য দিয়ে কোম্পানীর নতুন ধরনের তেজারতি শুরু হয়।

কোম্পানী এবং তাদের কর্মচারীগণ যাকে খুশী তাকে নবাবের পদে অধিষ্ঠিত করতে পারতো এবং যাকে খুশী তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতো। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত মাত্র আট- ন' বছরে এ ব্যাপারে কোম্পানী ও তার দেশী বিদেশী কর্মচারীদের পকেটে যায় কমপক্ষে ৬২,৬১,১৬৫ পাউন্ড। প্রত্যেক নবাব কোম্পানীকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সুযোগ- সুবিধা দানের পরও বহু মূল্যবান উপঢৌকনাদি দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতো। (বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, আব্বাস আলী খান, পৃ.- ৯৫)

মীরজাফর ক্ষমতায় আরোহণ করে টের পেলেন যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে বাংলার নবাব নন, শিখণ্ডি মাত্র। বলতে গেলে তিনি বৃটিশদের অর্থোপার্জন এবং শোষণের যন্ত্র। সিরাজের প্রধান সেনাপতি থাকা অবস্থায় তিনি যে মর্যাদা এবং প্রতিপত্তির প্রতীক ছিলেন আজ নবাবীর আসনে অধিষ্ঠিত হয়েও তাকে কোম্পানীর সাধারণ কর্মচারীদের তোষামোদ করে চলতে হচ্ছে। তাদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য উৎকোচ উপঢৌকন হিসেবে তাকে লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করতে হয়েছে। কিন্তু তবু কোম্পানীর ক্ষুধা মেটান সম্ভব হয়নি। রাজকোষের সমস্ত ভাণ্ডার উজার করে দিয়েও তিনি তার ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেননি। ষড়যন্ত্রের শুরুতে তিনি ভেবেছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্র এবং ইংরেজ বণিকদের সহযোগিতা নিয়ে তিনিই হবেন উপমহাদেশের সবেচেয়ে শক্তিশালী নবাব। নবাবীর নেশায় তিনি এত উন্মত্ত মাতাল ছিলেন যে, ষড়যন্ত্রের গভীরে আর এক ষড়যন্ত্রকে আমলে আনতে পারেননি। কিন্তু নবাবের পতনের পর যখন দেখলো শক্তির সব সূত্রগুলো ছিন্ন ভিন্ন, সব অমাত্যবর্গ উগ্র লালসা নিয়ে ক্লাইভের তোষামোদে ব্যস্ত, দেখলেন কোম্পানীর কর্মকর্তাদের দাপট, দেখলেন রাজকোষের নির্মম লুণ্ঠন এবং লোপাট হতে দেখলেন নগর জনপদগুলো। বাংলার নবাব হয়ে তাকে দেখতে হল সবকিছু নীরবে, নিরুপায় হয়ে। দুর্বিষহ মনে হলেও কোম্পানীর সব অপকর্মকে সমর্থন দিতে হল হাসি মুখে। ক্লাইভের চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহসটুকুও তার অবশিষ্ট রইল না। সিরাজের পতনের সাথে সাথেই বাংলার মুসলমান হয়ে পড়ল অভিভাবকহীন। বাংলার মুসলমানদের জীবন- জীবিকা এবং অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দের সব উৎসমুখগুলোতে আগুন জ্বলে উঠল। একের পর এক ধনী গরীব নির্বিশেষে বাংলার সব মুসলমান এগিয়ে চলল ধ্বংসের কিনারে।

মীরজাফর নিজেকে শেষ অবধি কি চিনতে পেরেছেন? পারলেও তার ফেরার পথ খোলা ছিল না। অবজ্ঞা, অপমান আর ঘাত প্রতিঘাত নির্দেশ খবরদারীর দুর্বিপাকে পড়ে স্বপ্ন আর সম্মোহনের ঘোর কাটতে খুব বেশী দেরী হয়নি তার। দেরী হয়নি তার নিজেকে চিনতে। নবাবীর মোড়কে ঢাকা বেনিয়া চক্রের শিখণ্ডী বৈতো তিনি আর কিছু নন। উচ্চাভিলাষ চরিতার্থের জন্য তার ব্যক্তিসত্তা বিক্রি হয়েছে অনেক আগে।

সিরাজের শোণিত-সিক্ত বাংলার মসনদ পরিণত হল তেজারতের পণ্যে। ক্লাইভের অর্থের তৃষ্ণা মেটাতে ব্যর্থ হয়ে মীর জাফর অসহিষ্ণু এবং মরিয়া হয়ে উঠলেন ইংরেজদের লালসার দোহন থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাইলেন। একারণে তিনি ওলন্দাজদের সাহায্য নিয়ে ইংরেজদের দেশছাড়া করার এক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। আর এ কারণেই নবাবের নাটমঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হল মীর জাফরকে। তাকে পদচ্যুত করে কোলকাতায় নজরবন্দী করে রাখা হল। এর পর কোম্পানীকে টাকা উৎকোচ দিয়ে গ্রীনরুম থেকে মঞ্চে উপস্থিত হলেন মীর কাসিম। মীর কাসিম শুধুমাত্র মঞ্চাভিনয়ে সীমাবদ্ধ রইলেন না। সত্যিকার নবাব হবার চেষ্টা করলেন। নাটমঞ্চ থেকে রণাঙ্গনের রক্তাক্ত পথ বেছে নিলেন বাংলার ভাগ্য ফেরানোর জন্য। সাতটি রক্তাক্ত যুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে তার অতীত গুনাহর কাফফারা আদায় করেছেন তিনি। শেষ অবধি বিচ্ছিন্ন শক্তি সমূহের সব সূত্র একই গ্রন্থিতে বাধার চেষ্টা করেও তিনি ব্যর্থ হলেন। সব সময় পঞ্চম বাহিনী গাদ্দারদের প্রেতাত্মা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছে। গিরিয়ালা, উদয়নালা এবং বক্সারের প্রতিরোধ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাকে বাংলার মাটি ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে হয়। অবশেষে অনাহারে অর্ধাহারে ধুঁকে ধুঁকে নিরাশ্রয় মীর কাশিম দিল্লীর রাজপথে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তখন বাংলার অবস্থা কি?

অবশেষে কোম্পানীর ছোট বড় সব কর্মচারী এবং তাদের দলগত চক্র শোষণ লুণ্ঠনের দুঃসহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সমগ্র বাংলাব্যাপী। আর মুসলমানদের উচ্চবিত্ত আমীর ওমরাহর দল শিখণ্ডী নবাব হবার অভিলাষে তাদের সম্পদ উজাড় করে ইংরেজদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে এবং বৃটিশদের অর্থতৃষ্ণা মেটাতে থাকে। মীর কাশিম একই উদ্দেশ্যে ২ লক্ষ পাউন্ড (৪ কোটি টাকা) বর্তমান মুদ্রামানে ৮ হাজার কোটি টাকা কোম্পানীর

হাতে তুলে দেন। মীরজাফরের পুত্রও কোম্পানীকে দেয় ১ লক্ষ ৪৯ হাজার পাউন্ড অর্থাৎ ৩ কোটি টাকা, বর্তমান মুদ্রামানে ৬ হাজার কোটি টাকা।

ওদিকে বাংলার জনপদ তার জেল্লা হারিয়ে নৈরাশ্য, হতাশা এবং বিশৃংখলার দিকে ধাপে ধাপে এগুতে থাকে। ক্লাইভের স্বীকৃতি থেকে তৎকালীন পরিস্থিতি কিছুটা অনুধাবন করা যায়। ক্লাইভের ভাষায়- "আমি কেবল স্বীকার করতে পারি, এমন অরাজকতা বিশৃংখলা, উৎকোচ গ্রহণ, দুর্নীতি ও বলপূর্বক ধনাপহরণের পাশব চিত্র বাংলা ছাড়া অন্য কোথাও দৃষ্ট হয়নি।" অথচ নির্লজ্জ ক্লাইভই এ শোষণযজ্ঞের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। (মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ সংস্কৃতির রূপান্তর, আব্দুল ওয়াদুদ, পৃ.- ৬০-৬২)

ব্রিটিশ আমলে বাংলার অর্থনীতি মানেই হলো- সুপরিকল্পিত শোষণের মর্মভেদী ইতিহাস। ঐতিহাসিকরা মোটামুটি হিসেব করে বলেছেন, ১৭৫৭ থেকে ১৭৮০ পর্যন্ত মাত্র তেইশ বছরে বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে চালান গেছে প্রায় তিন কোটি আশি লক্ষ পাউন্ড অর্থাৎ সমকালীন মূল্যের ষাট কোটি টাকা। কিন্তু ১৯০০ সালের মূল্যমানের তিনশো কোটি টাকা। (বর্তমান মুদ্রামানে ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা)। (Miller quoted by Misra. P-15.)

পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে ষড়যন্ত্রকারী দল কি মহামূল্য দিয়ে ব্রিটিশ রাজদণ্ড এ দেশবাসীর জন্য ক্রয় করেছিল, তার সঠিক খতিয়ান আজও নির্ণীত হয়নি, হওয়া সম্ভব নয়। কারণ কেবল অলিখিত বিবরণ অর্থ সাগরপারে চালান হয়ে গেছে, কিভাবে তার পরিমাপ করা যাবে? (বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, আব্বাস আলী খান, পৃ- ৯৫)

একটা স্বপ্নের ঘোর ছিল মীরজাফরের। তিনি নিজেকে ভেবেছিলেন সিরাজ বিরোধী চক্রের মহানায়ক। সিরাজের পতনের অর্থ তিনিই বাংলা বিহার উড়িষ্যার মহান অধিপতি। তিনি জানতেন, দুঃসাহস আর দৃঢ়তা নিয়ে সিরাজ দাঁড়িয়েছিলেন চোরাবালির উপরে। আর এ চোরাবালি সৃষ্টির নায়কেরা তারই সহযোগী। তাদের পছন্দসই, তাদেরই মনোনীত নবাব তিনি। তিনি ভেবেছিলেন জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, উঁমিচাদ, নন্দকুমার প্রমুখ অসংখ্য হিন্দু অমাত্যবর্গ এবং মীর কাসিমের পতনের পর পুনরায় মীর জাফরকে পুতুল নবাব হিসেবে ক্ষমতায় বসানো হলো। এবার কিন্তু মীর

জাফরকে নির্দেশ দেয়া হল সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দেয়ার জন্য। কোম্পানীর নির্দেশকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা শিখণ্ডী নবাবের ছিল না। বাধ্য হয়ে তিনি ৮০ হাজার সৈন্যকে বরখাস্ত করলেন। এর আগে মীর কাসিমের ৪০ হাজার সৈন্য ছত্র-ভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। মোটের উপর পলাশীর প্রহসনমূলক যুদ্ধ নাটকের পর থেকে সেনাবাহিনীর দেড়লক্ষাধিক সৈন্য এবং এ বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট ৫০ হাজার কর্মচারী চাকুরীচ্যুত হল। এদের সবাই ছিল মুসলমান। এর ফলে বাংলার অসংখ্য মুসলিম পরিবার এগিয়ে চললো বেকারত্ব এবং দারিদ্র্যের দুঃসহ অবস্থার দিকেও, শুরু হল সুবাহ বাংলার মুসলমানদের অর্থনৈতিক বিপর্যয়।

হান্টার (১৮৭১ সালে) বলেন, জীবিকার্জনের সূত্রগুলির প্রথমটি হচ্ছে সেনাবাহিনী। সেখানে মুসলমানদের প্রবেশাধিকার রুদ্ধ হয়ে যায়। কোন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান আর আমাদের সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করতে পারতো না। যদিও কদাচিৎ আমাদের সামরিক প্রয়োজনের জন্যে তাদেরকে কোন স্থান দেয়া হতো, তার দ্বারা তার অর্থোপার্জনের কোন সুযোগই থাকতো না।

ষড়যন্ত্রকারীদের পরিণতি

নিউটনের তৃতীয় সূত্রে বলা হয়েছে, প্রত্যেক ক্রিয়ার সমমুখী ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। এটা শুধু মাত্র বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এমনটি নয়। রাজনীতি অর্থনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে সমান প্রতিক্রিয়া, তা না হলে গাদ্দারদের এমন মর্মান্তিক পরিণতি হবে কেন?

সিরাজ উৎখাতে পলাশী ষড়যন্ত্রে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিল ইতিহাসে অমোঘ নিয়মে তাদেরও হয়েছিল মর্মান্তিক পরিণতি। কাউকে পাগল হতে হয়েছিল, কারো হয়েছিল অপঘাতে মৃত্যু। কাউকে নির্মম অপমৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হয়েছিল। সবার ভাগ্যে জুটেছিল কোন না কোন ভয়াবহ পরিণতি। নীচে কতিপয় মুখচেনা মুখ্য ষড়যন্ত্রকারীদের পরিণতি তুলে ধরা হল।

মিরন

মিরন ছিলেন পলাশী ষড়যন্ত্রের অন্যতম নায়ক। তার পুরো নাম মীর মুহাম্মদ সাদেক আলি খান। তিনি মীরজাফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আলীবর্দী খানের ভগ্নী শাহ খানমের গর্ভে তাঁর জন্ম হয়েছিল। এই সূত্রে মিরন ছিলেন

আলিবর্দীর বোনপো। অত্যন্ত দুর্বৃত্ত, নৃশংস ও হীনচেতা এবং সিরাজ হত্যাকাণ্ডের মূল নায়ক মিরন। আমিনা বেগম, ঘষেটি বেগম হত্যার নায়কও তিনি। লুৎফুন্নিসার লাঞ্ছনার কারণও মিরন। মীর্জা মেহেদীকেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিলেন তিনি।

এই মিরনকে হত্যা করে ইংরেজদের নির্দেশে মেজর ওয়ালস। তবে তার এই মৃত্যু ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার জন্যে ইংরেজরা মিথ্যা গল্প বানিয়েছিল। তারা বলেছে, মিরন বিহারে শাহজাদা আলি গওহারের (পরে বাদশাহ শাহ আলম) সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে পথের মধ্যে বজ্রাঘাতে নিহত হন। ইংরেজরা বলেছে, বজ্রপাতের ফলে তাঁবুতে আগুন ধরে যায় এবং তাতেই তিনি নিহত হন। ফরাসী সেনাপতি লরিস্টনের ঔবধহ-খধি ঘটনাকে অস্বীকার করেছেন। বরং এই মত পোষণ করেন যে, মিরনকে আততায়ীর দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল।

মুহাম্মদীবেগ

মুহাম্মদীবেগ ৩ জুলাই বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। নবাব সিরাজ এ সময় তার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাননি। তিনি কেবল তার কাছে থেকে দু'রাকাত নামাজ পড়ার অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু কুখ্যাত মুহাম্মদীবেগ নবাব সিরাজকে সে সুযোগ প্রত্যাখ্যান করার পরপরই তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

পরবর্তী পর্যায়ে মুহাম্মদী বেগের মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটে, এমতবস্থায় সে বিনা কারণে কূপে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। এই মুহাম্মদীবেগ সিরাজউদ্দৌলার পিতা ও মাতামহীর অন্নে প্রতিপালিত হয়। আলীবর্দীর বেগম একটি অনাথ কুমারীর সাথে তার বিয়ে দিয়েছিলেন।

মীরজাফর

পলাশী ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান নায়ক ছিলেন মীরজাফর আলি খান। তিনি পবিত্র কোরআন মাথায় রেখে নবাব সিরাজের সামনে তাঁর পাশে থাকবেন বলে অঙ্গীকার করার পরও বেঈমানী করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে ষড়যন্ত্রের মধ্যমণি ছিলেন জগৎশেঠ মীর জাফর নয়। তিনি ছিলেন ষড়যন্ত্রের শিখণ্ডি।

মীরজাফরের মৃত্যু হয় অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে। তিনি দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। নিখিলনাথ রায় লিখেছেন, ক্রমে অন্তিম সময়

উপস্থিত হইলে, হিজরী ১১৭৮ অব্দের ১৪ই শাবান (১৭৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে) বৃহস্পতিবার তিনি কুষ্ঠরোগে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগত হন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে নন্দকুমার কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত আনাইয়া তাহার মুখে প্রদান করাইয়াছিলেন এবং তাহার তাহাই শেষ জলপান।'

জগৎশেঠ মহাতাপচাঁদ এবং মহারাজা স্বরূপচাঁদ

পলাশী বিপর্যয়ের নীল নক্সা তিনিই প্রণয়ন করেন সিরাজের সাথে ইংরেজদের সংঘাত এবং তার বিপর্যয় পর্যন্ত সব কিছুর মধ্যমনি ছিলেন তিনি- আলীবর্দী খাঁর শাসনামলেই জগৎশেঠের সাথে ইংরেজদের সম্পর্ক গভীর ছিল। নবাব সিরাজ ক্ষমতায় এলে এই গভীরতা আরো বৃদ্ধি পেলো এবং তা ষড়যন্ত্রে রূপ নিলো। পলাশী বিপর্যয়ের পর জগৎশেঠ রাজকোষ লুণ্ঠনে অংশ নেন।

নিখিলনাথ রায় লিখেছেন- ইহার পর ক্রমে ইংরেজদিগের সহিত মীর কাসেমের বিবাদ গুরুতর হইয়া উঠিলে, নবাব কাটোয়া গিরিয়া, উধুয়ানালা প্রভৃতি স্থানে পরাজিত হইয়া মুঙ্গেরে জগৎশেঠ মহাতাপচাঁদকে অত্যুচ্চ দুর্গশিখর হইতে গঙ্গারগর্ভে নিক্ষেপ কর হয়। মহারাজা স্বরূপচাঁদও ঐ সাথে ইহজীবনের লীলা শেষ করিতে বাধ্য হন।

রবার্ট ক্লাইভ

নবাব সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন রবার্ট ক্লাইভ। ক্লাইভ খুব অল্প বয়সে ভারতে আসেন। প্রথমে তিনি একটি ইংরেজ বাণিজ্য কেন্দ্রের গুদামের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। বিরক্তিকর এই কাজটিতে ক্লাইভ মোটেও সন্তুষ্ট ছিলেন না। এ সময় জীবনের প্রতি তার বিতৃষ্ণা ও হতাশা জন্মে। তিনি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন। তিনি রিভলভার দিয়ে নিজের কপালের দিকে লক্ষ্য করে পর পর তিনটি গুলী ছোঁড়েন। কিন্তু গুলী থাকা অবস্থাতেই গুলী রিভলবার থেকে বের হয়নি। পরে তিনি ভাবলেন ঈশ্বর হয়ত তাকে দিয়ে বড় কোন কাজ সম্পাদন করবেন বলেই এভাবে তিনি তাঁকে বাঁচালেন। পরবর্তীতে দ্রুত তিনি ক্ষমতার শিখরে উঠতে শুরু করেন। পরিশেষে পলাশী ষড়যন্ত্রে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি কোটি টাকার মালিক হন। ইংরেজেরা তাকে 'প্লাসি হিরো' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি দেশে ফিরে গিয়ে একদিন বিনা কারণে বাথরুমে ঢুকে নিজের গলায় নিজের হাতেই ক্ষুর চালিয়ে আত্মহত্যা করেন।

ইয়ার লতিফ খান

পলাশী ষড়যন্ত্রের শুরুতে ষড়যন্ত্রকারীরা ইয়ার লতিফ খানকে ক্ষমতার মসনদে বসাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে এক্ষেত্রে মীর জাফরের নাম উচ্চারিত হয়। ইয়ার লতিফ খান ছিলেন নবাব সিরাজের একজন সেনাপতি। তিনি এই ষড়যন্ত্রের সাথে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন এবং যুদ্ধের মাঠে তার বাহিনী মীর জাফর, রায় দুর্লভের বাহিনীর ন্যায় ছবির মতো দাঁড়িয়েছিলো। তার সম্পর্কে জানা যায়, তিনি যুদ্ধের পর অকস্মাৎ নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যান। অনেকের ধারণা, তাকে কে বা কারা গোপনে হত্যা করেছিল। (মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, আসকার ইবনে শাইখ, পরিশিষ্ট)।

মহারাজা নন্দকুমার

মহারাজা নন্দকুমার এই ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। মুর্শিদাবাদ কাহিনী গ্রন্থে নিখিলনাথ রায় লিখেছেন- নন্দকুমার অনেক বিবেচনার পর সিরাজের ভবিষ্যৎ বাস্তবিকই ঘোরতর অন্ধকার দেখিয়া, ইংরেজদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের ইচ্ছা করিলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, ইংরেজরা সেই সময়ে উমিচাঁদকে দিয়া নন্দকুমারকে ১২ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। পলাশী ষড়যন্ত্রের পর নন্দকুমারকে মীরজাফর স্বীয় দেওয়ান নিযুক্ত করে সব সময় তাকে নিজের কাছে রাখতেন। মীরজাফর তার শেষ জীবনে যাবতীয় কাজকর্ম নন্দকুমারের পরামর্শানুসারে করতেন। তার অন্তিম শয্যায় নন্দকুমারই তার মুখে কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত তুলে দিয়েছিলেন।

তহবিল তছরূপ ও অন্যান্য অভিযোগের প্রেক্ষিতে আদালত মহারাজা নন্দকুমারের প্রাণ দণ্ডের আদেশ প্রদান করে।

রায় দুর্লভ

রায় দুর্লভ ছিলেন নবাবের একজন সেনাপতি। তিনিও মীরজাফরের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। যুদ্ধকালে তিনি এবং তার বাহিনী মীরজাফররের সাথে যুক্ত হন এবং সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে।

উমিচাঁদ

ক্লাইভ কর্তৃক উমিচাঁদ প্রতারিত হয়েছিলেন। ইয়ার লতিফ খান ছিলেন উমিচাঁদের মনোনীত প্রার্থী। কিন্তু যখন অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীরা এ ক্ষেত্রে মীরজাফরের নাম ঘোষণা করলেন, তখন উমিচাঁদ বেঁকে বসলেন এবং বললেন, আপনাদের প্রস্তাব মানতে পারি এক শর্তে, তা হলো যুদ্ধের পর নবাবের রাজকোষের ৫ ভাগ সম্পদ আমাকে দিতে হবে। ক্লাইভ তার প্রস্তাব মানলেন বটে কিন্তু যুদ্ধের পরে তাকে তা দেয়া হয়নি। যদিও এ ব্যাপারে একটি মিথ্যা চুক্তি হয়েছিল। ওয়াটস রমণী সেজে মীর জাফরের বাড়িতে গিয়ে লাল ও সাদা কাগজে দুটি চুক্তিতে তার সই করান। লাল কাগজের চুক্তিতে বলা হয়েছে, নবাবের কোষাগারের পাঁচ শতাংশ উমিচাঁদের প্রাপ্য হবে। এটি ছিল নিছক প্রবঞ্চনামাত্র। যাতে করে উমিচাঁদের মুখ বন্ধ থাকে। যুদ্ধের পর ক্লাইভ তাকে সরাসরি বলেন, আপনাকে কিছু দিতে পারবো না। এ কথা শুনে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। এবং স্মৃতিভ্রংশ উন্মাদ অবস্থায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে তার মৃত্যু ঘটে।

রাজা রাজবল্লভ

ষড়যন্ত্রকারী রাজা রাজবল্লভের মৃত্যুও মর্মান্তিকভাবে ঘটেছিল। জানা যায়, রাজা রাজবল্লভের কীর্তিনাশ করেই পদ্মা হয় কীর্তিনাশা।

দানিশ শাহ বা দানা শাহ

দানিশ শাহ সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। অনেকে বলেছেন, এই দানেশ শাহ নবাব সিরাজকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখেছেন, দানিশাহ ফকির মোটেই জীবিত ছিলেন না। আসকার ইবনে শাইখ তাঁর মুসলিম আমলে বাংলার শাসন কর্তা গ্রন্থে লিখেছেন' বিষাক্ত সর্প দংশনে দানিশ শাহর মৃত্যু ঘটেছিল।

ওয়াটস

ওয়াটস এই ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি রমণী সেজে মীর জাফরের বাড়িতে গিয়ে চুক্তিতে মীরজাফরের স্বাক্ষর এনেছিল। যুদ্ধের পর কোম্পানীর কাজ থেকে বরখাস্ত হয়ে মনের দুঃখে ও অনুশোচনায় বিলাতেই অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

স্ক্রাফটন

ষড়যন্ত্রের পিছনে স্ক্রাফটনও বিশেষভাবে কাজ করেছিলেন। জানা যায়, বাংলার বিপুল সম্পদ লুণ্ঠন করে বিলেতে যাওয়ার সময় জাহাজডুবিতে তার অকালমৃত্যু ঘটে।

ওয়াটসন

যড়যন্ত্রকারী ওয়াটসন ক্রমাগত ভগ্নস্বাস্থ্য হলে কোন ওষুধেই ফল না পেয়ে কলকাতাতেই করুণ মৃত্যুর মুখোমুখি হন।

মীর কাশিম

মীরজাফরের ভাই রাজমহলের ফৌজদার মীর দাউদের নির্দেশে মীর কাশিম নবাব সিরাজের খবর পেয়ে ভগবানগোলার ঘাট থেকে তাকে বেঁধে এনেছিলেন মুর্শিদাবাদে। পরে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তিনি নবাব হন এবং এ সময় ইংরেজদের সাথে তার বিরোধ বাঁধে ও কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হন। পরে ইংরেজদের ভয়ে হীনবেশে পালিয়ে যান এবং রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান।। অবশেষে অজ্ঞাতনামা হয়ে দিল্লীতে তার করুণ মৃত্যু ঘটে। মৃতের শিয়রে পড়ে থাকা একটা পোটলায় পাওয়া যায় নবাব হিসেবে ব্যবহৃত মীর কাশেমের চাপকান। এ থেকেই জানা যায় মৃত ব্যক্তি বাংলার ভূতপূর্ব নবাব মীর কাশিম আলী খান।

এই ভাবেই বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা পলাশী যুদ্ধের কিছুকালের মধ্যেই বিভিন্ন পন্থায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পলাশী ষড়যন্ত্রকারীদের ওপরে আল্লাহর গজব নাজিল হয়েছিল বলেই অনেকের ধারণা। আসলে এইসব ঘটনা থেকেই আমাদের অনেক কিছু শেখার বিষয় রয়েছে। (লেখাটি ডঃ মুহাম্মদ ফজলুল হক রচিত 'বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ' প্রকাশিতব্য গ্রন্থ থেকে)

পঞ্চম অধ্যায়

কোম্পানীর রাজস্ব নীতি

একটা স্বাধীন দেশের নাগরিকের রাষ্ট্রের প্রতি যেমন দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে অনুরূপ রয়েছে তার অধিকার ও সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর মূল লক্ষ্যই হলো শোষণ। সাধারণ মানুষের জন্য ন্যূনতম মানবিক দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকারে আবদ্ধ নয় ঔপনিবেশিক শাসকেরা। শোষণের মৌলিক নীতি সামনে রেখেই উপনিবেশবাদীরা তাদের সব ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। বৃটিশদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়নি। বরং উপনিবেশবাদীদের ইতিহাসে জঘন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে বৃটিশ বেনিয়ারা।

মুসলিম শাসনামলে যদিও বাংলায় জমিদার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহলেও এসব প্রতিষ্ঠান লাগামহীন শোষণের যন্ত্র হিসেবে কেউ মনে করত না। সরকার এবং প্রজাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের নীতিই ছিল মুসলিম শাসন ব্যবস্থার মূলনীতি। জমিদাররা কোন অবস্থায় খাজনা বৃদ্ধি করতে পারতেন না। জমির উপর প্রজাদের বংশানুক্রমিক মালিকানা স্বত্ব বহাল থাকত এবং পুরুষানুক্রমে জমি ভোগ দখল করতে পারত। তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দিত। জনগণের নিরাপত্তা এবং সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হত শাসকদের।

কিন্তু কোম্পানী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে তার দৃষ্টিভঙ্গি ছিল পৃথক। মুনাফা অর্জন ছাড়া ভিন্ন কোন ভাবনা তাদের ছিল না। যার ফলে অর্থনৈতিক শোষণই ছিল কোম্পানী শাসনের মূল নীতি। প্রজাদের কল্যাণ এবং সুযোগ সুবিধার প্রতি তাদের মোটেও ভ্রুক্ষেপ ছিল না।

'ক্লাইভ প্রথম রাজস্বের ভার গ্রহণ করেন এবং শাসনের দায়িত্ব এড়াইয়া চলেন। রাজস্ব ব্যবস্থা হইতে মুনাফার জন্য তিনি বাংলায় দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করেন। কোম্পানী রাজস্ব ব্যবস্থা হইতে প্রচুর অর্থ মুনাফা করিত। প্রতি বৎসর পাঁচ লক্ষ পাউন্ড রাজস্বের মুনাফা বিলাতে প্রেরিত হইত এবং ইহা কোম্পানীর অংশীদারদের মধ্যে ভাগ হইত। বাংলার রাজস্বে ইহার কৃষকদের কোন উপকার হইত না। তাহা ছাড়া কোম্পানী রাজস্বের ব্যাপারে

যে পুঁজি নীতি (Investment policy) অবলম্বন করে, তাহা বাংলার পক্ষে খুব ক্ষতিকর হয়। কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ রাজস্ব ব্যবসায়ে নিয়োগ করিত এবং এই টাকায় পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া বিদেশে পাঠাইত ও লাভজনক ব্যবসায় করিত। শাসনকার্য চালাইবার জন্য টাকার অভাব হইত। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে হাউস অব কমনসের সিলেক্ট কমিটি ইহার রিপোর্ট স্বীকার করে যে, কোম্পানীর রাজস্ব সম্পর্কে পুঁজিনীতির ফলে বাংলা ও বিহার খুবই আর্থিক দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে'। (বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, এম এ রহিম, পৃ.- ৪৫)

মীর জাফর বৃটিশদের শিখণ্ডী হওয়া সত্ত্বেও তার আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৮,১৭,৫৫৩ পাউন্ড। অথচ দেওয়ানী লাভের প্রথম বছরেই ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রাজস্ব আদায় করে ১৬,৮১,৪০৭ পাউন্ড। আগের তুলনায় দ্বিগুণ।

এখানে এসে অন্য আর একটি হিসেবে দেখা যায়, ১৭৫৬ থেকে ১৭৬৬ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে যেখানে মোট আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৫ লাখ ৮১ হাজার পাউন্ড, ১৭৬৬- ৬৭ সালে সেই রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫ লাখ ২৭ হাজার পাউন্ডে। ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে ওয়ারেন হেষ্টিংস যে কঠোরতা অবলম্বন করেন এবং যে নৃশংসতার পরিচয় দেন তা ইতিহাসের বিরল। (কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী এম আর আখতার মুকুল, পৃ.- ৩৭)

রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে ওয়ারেন হেষ্টিংসের নতুন ব্যবস্থায় বাংলার মানুষ বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে তীব্র সংকটের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। হেষ্টিংস নিলামে রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন। প্রথমত ইংরেজরা রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে নির্ভর করেছে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার উপর। ফলে নবাবী আমলের কর্মচারী কর্মকর্তারা নিজস্ব অবস্থানে থেকে নতুন দেওয়ানীর অধীনে কর্মরত থাকে। হেষ্টিংস প্রতিটি জেলায় ইংরেজ কালেক্টর নিয়োগ করলেন এবং এদের সহযোগী কর্মচারীদের নেয়া হল হিন্দু জনগোষ্ঠী থেকে। এর ফলে রাজস্ব আদায়ে লিপ্ত মুসলমান কর্মচারীরা অপসারিত হল। ইংরেজ কালেক্টররা জেলার দায়িত্বভার গ্রহণ করেই নিলামে রাজস্বের বন্দোবস্ত দেয়ার উদ্যোগ নেয়। যারা অধিক পরিমাণে রাজস্ব প্রদানে স্বীকৃত

হল তাদের হাতেই তুলে দেয়া হল জমিদারী। এ প্রেক্ষিতে জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হল।

রাজস্ব বিভাগ কোম্পানীর পরিচালনাধীন হওয়ার পর কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে হিন্দু ও ইংরেজ আদায়কারীগণ অতিমাত্রায় শোষণ নিষ্পেষণের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করে কোম্পানীর রাজকোষ পূর্ণ করতে থাকে। ইতিপূর্বে প্রজাদের নিকট থেকে আদায়কৃত সকল অর্থ দেশের জনগণের মধ্যে তাদেরই জন্যে ব্যয় হতো। কিন্তু তখন থেকে আদায়কৃত অর্থ ইংল্যাণ্ডের ব্যাংকে ও ব্যবসা কেন্দ্রগুলিতে স্থানান্তরিত হতে থাকে।

নীতি এবং দায়-দায়িত্বহীন কার্যক্রম, অনাবৃষ্টি, নির্যাতিত কৃষক সমাজের অস্থিরতা এবং বেহাল অবস্থা করুণ পরিণতির দিকে টেনে আনল বাংলার জনপদকে। সমগ্র বাংলা বিহারে এলো মহামন্বন্তর, হৃদয়বিদারক দুর্ভিক্ষ। খাদ্যের অভাবে নির্মমভাবে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল এদেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষ। কিন্তু তবু করুণার উদ্রেক হল না বেনিয়া এবং তাদের দালাল চক্রের। ১৭৭০-৭১ সালে হলো মহা মন্বন্তর (বাংলা ১১৭৬)। ইতিহাসে এই কুখ্যাত মন্বন্তরের পরে পরেই অধিক পরিমাণে বাহবা নেয়ার জন্য এবং নিজেকে করিৎকর্মা প্রমাণের উদ্দেশ্যে ১৭৭২ সালের ৩রা নভেম্বর বাংলার গভর্নর ওয়ারেন হেষ্টিংস বিলেতের ডিরেক্টর বোর্ডকে জানালেন- 'দুর্ভিক্ষে এই প্রদেশের এক তৃতীয়াংশের বেশী লোক মারা গেছে, চাষাবাদেরও ভয়ানক ক্ষতি হয়েছে' এই অবস্থা সত্ত্বেও ১৭৭১ সালের আদায়কৃত রাজস্ব ১৭৬৮ সালের রাজস্ব থেকে অনেক বেশী আদায় হয়েছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

এদেশে ইংরেজদের আগমনের শুরু থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী একচেটিয়া বাণিজ্যের সনদ লাভ করেছিল। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ছাড়া আর কোন বিদেশী কোম্পানী এমন কি ইংরেজ কোম্পানীরও বাণিজ্যের অধিকার ছিল না। তাদের জন্য এদেশে বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা ছিল অবারিত। অন্যান্য বিদেশী বণিকেরা এদেশে বাণিজ্যের চেষ্টা করলেও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট প্রতিযোগিতায় কুলিয়ে উঠতো না। ছলে বলে কৌশলে অন্যান্য বিদেশী বণিকদের বাণিজ্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রতিহত

করে নিজেদের জন্য অবারিত করে রেখেছিল। সুচারুরূপে বাণিজ্য পরিচালনার জন্য তারা বেশ কিছু এজেন্সী হাউস স্থাপিত করে। এইসব এজন্সী হাউস এক ধরনের ব্যাংকিং পরিচালনা করত। স্থানীয় বণিক মূলত যারা ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত তারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এইসব এজেন্সী হাউসগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। এসব এজেন্সী হাউসগুলোর মাধ্যমে এদেশের রেশম, পাট, তুলা, নীল, অন্যান্য পণ্যের ব্যবসা একচেটিয়াভাবে পরিচালিত হতে থাকে। এসব কারবারে অতিদ্রুত বিপুল পরিমাণ মুনাফা আসতে থাকে। এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে সুবর্ণ বণিকদের পুঁজির সাথে যক্তু হতে থাকে অকল্পনীয় মুনাফা। মুর্শিদাবাদ এবং বাংলার জনপদ লুট করার পর ইংরেজ বণিকদের চোখ পড়ে কোলকাতার বণিকদের সঞ্চিত সম্পদের দিকে। তারা আশঙ্কা করে যদি কোলকাতায় সুবর্ণ বণিকদের স্ফীত সম্পদ দেশে অথবা বহির্বিশ্বে বাণিজ্য পরিচালনায় ব্যবহার হয় তাহলে এরাই একদা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হবে। ১৭৭৩ সালের ৬ই মার্চ কর্নওয়ালিস ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরদের কাছে লিখলেন- 'বেশ কিছু নেটিভদের হাতে যে বিপুল পরিমাণ মূলধন রয়েছে তা বিনিয়োগ করার আর কোন পথ নেই। তাই জমিদারী বন্দোবস্ত (চিরস্থায়ী) নিশ্চিত করা হলে শীগগির উল্লিখিত সঞ্চিত মূলধন জমিদারী ক্রয়ে বিনিয়োগ করা হবে।' কর্নওয়লিসের এই পদক্ষেপ বৃটিশ স্বার্থের জন্য মোক্ষম হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। তার উদ্দেশ্য সুবর্ণ বণিকদের অর্জিত অর্থ সম্পদ ও মুলধন হাতিয়ে নেয়া এবং পুরাতন জমিদারদের হটিয়ে নতুন জমিদার সৃষ্টি করা, যারা অনুগত ঔপনিবেশিক দালাল হিসেবে কোম্পানীর স্বার্থ সমুন্নত রাখবে। মোটের উপর নবাবের পতন ঘটিয়েও ইংরেজরা নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পারেনি। ছোট ছোট জমিদার জায়গীরদারদের উচ্ছেদ করে মুসলমানদের কড়ির কাঙ্গালে পরিণত না করা পর্যন্ত তারা স্বস্তি পাচ্ছিল না।

যে কারণে লর্ড কর্নওয়ালিস দশশালা বন্দোবস্তে পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হয়ে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী ভিত্তিতে জমিদারী প্রথা চালু করলেন। সূর্যাস্ত আইনের অছিলায় মাত্র ২ বছরের মধ্যে লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে বাংলার অর্ধেক জমিদারী নিলাম হয়ে গেল। নিলামে এসব জমিদারী ক্রয় করল কোলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু বিত্তশালী ও সুবর্ণ শ্রেণীর মহাশয়েরা। শুরু হল

নতুন উদ্যোগে অত্যাচার। (কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী, এম আর আখতার মুকুল, পৃ- ৬৯।)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল মসলমান জমিদারদের অধীনে নিযুক্ত হিন্দু নায়েব ম্যানেজার প্রভৃতিকে নব্য জমিদার হিসেবে স্বীকৃতি দান। ১৮৪৪ সালে Calcutta Review যে তথ্য প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয় এক ডজন জমিদারীর মধ্যে, যাদের জমিদারীর পরিধি ছিল একটি করে জেলার সমান, মাত্র দুটি পূর্বতন জমিদারদের দখলে রয়ে যায় এবং অবশিষ্ট হস্তগত হয়, প্রাচীন জমিদারদের নিম্নকর্মচারীর বংশধরদের। এভাবে বাংলার সর্বত্র এক নতুন জমিদার শ্রেণীর পত্তন হয়, যারা হয়ে পড়েছিল নতুন বিদেশী প্রভুদের একান্ত অনুগত ও বিশ্বাসভাজন।

হান্টার তাঁর গ্রন্থে বলেন : যেসব হিন্দু কর আদায়কারীগণ ঐ সময় পর্যন্ত নিম্নপদের চাকুরীতে নিযুক্ত ছিল, নয়া ব্যবস্থার বদৌলতে তারা জমিদার শ্রেণীতে উন্নীত হয়। নয়া ব্যবস্থা তাদেরকে জমির উপর মালিকানা অধিকার এবং সম্পদ আহরণের সুযোগ- সুবিধা প্রদান করে। অথচ মুসলমানরা নিজেদের শাসনামলে এ সুযোগ সুবিধাগুলো একচেটিয়াভাবে ভোগ করেছে। (Hunter The Indian Musolman অনুবাদ আনিসুজ্জামান, পৃ- ১৪১)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নব্য জমিদারদের অবাধ লুণ্ঠনের অধিকার দিয়েছে। কিন্তু প্রজা সাধারণের কোন অধিকার দেয়া হয়নি। সাধারণ মানুষকে জমিদারদের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। প্রজাপালন এবং প্রজাদের কল্যাণের দিকে জমিদারদের কারো ভ্রুক্ষেপ ছিল না। প্রজা সাধারণ অনাবাদী জমিকে আবাদ যোগ্য করে তুললেও জমির উপর তাদের কোন স্থায়ী অধিকার ছিল না। জমিদার তার ইচ্ছা মত যে কোন প্রজাকে যে কোন সময় উচ্ছেদ করতে পারত। মুসলিম শাসন আমলে আইন ছিল প্রজা সাধারণের সাধারণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে জমিদাররা। তারা এজন্য সমাজ বিরোধী দুষ্কৃতকারী ও দস্যু তস্করের প্রতি সজাগ দৃষ্টি রাখতো, লুণ্ঠিত মালামালসহ ধরা পড়লে রাজকোষে জমা দিতে হতো। ১৭৭২ সালে কোম্পানী এই আইন রহিত করে দুষ্কৃতকারীদের বেআইনী লুণ্ঠনের অবাধ সুযোগ করে দেয়। ব্যবসায়ী শ্রেণী থেকে আগত নতুন জমিদারেরা স্বাভাবিকভাবে দস্যু তস্করদের ধরিয়ে দেয়ার পরিবর্তে তাদের লালনকারী

হয়ে উঠে এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশীদার হয়ে তাদের ধনাগার পূর্ণ করতে থাকে। ১৯৪৪ সালে Calcutta Review তে প্রকাশিত তথ্যে বলা হয় যে, এসব জমিদার ধন অর্জনের উদ্দেশ্যে দস্যু তস্করদের লালন পালন করত। বুকানন্ বলেন, "রায়তদেরকে বাড়ি থেকে ধরে এনে কয়েকদিন পর্যন্ত আবদ্ধ রেখে নিরক্ষর প্রজাদের নিকট থেকে জাল রশিদ দিয়ে জমিদারের কর্মচারীগণ খাজনা আদায় করে আত্মসাৎ করতো। (Martin-The history-Antiquities Topocraogt and stakes of esters Indian London-1438, Vol-11)

অন্য আর এক তথ্য থেকে জানা যায়- "তৎকালীন জমিদারগণ সরকারকে ৩৭,৫০,০০০ পাউন্ড রাজস্ব দিত। কিন্তু তাহারা প্রজাদের নিকট হইতে প্রায় ১,৩০,০০,০০০ পাউন্ড খাজনা আদায় করিত।" (বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস এম এ রহিম, পৃ- ৪৮)

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানগণ খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহাদের সমৃদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। হান্টার লিখিয়াছেন যে, মুসলমান আমলে রাজস্ব আদায় শাসন পরিচালনায় মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকার ছিল এবং ইহা হইতে তাহাদের প্রচুর অর্থ সমাগম হইত। পুরাতন রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন করিয়া বৃটিশ গভর্নমেন্ট বাংলার মুসলমানদের আর্থিক জীবনে তীব্র আঘাত করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবিচারের কথা স্বীকার করিয়া মেটকাফ বলিয়াছেন যে, এই ব্যবস্থায় জমির প্রকৃত মালিকদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া এরূপ এক শ্রেণীর বাবুদিগকে দেওয়া হয় যাহারা ঘুষ ও অন্যান্য অবৈধ উপায়ে ধনী হইয়াছেন। জেমস ও কেনেলী মন্তব্য করিয়াছেন- 'যে সকল হিন্দু কর্মচারী পূর্বে রাজস্ব বিভাগের সামান্য পদে ছিল, এই বন্দোবস্তে তাহাদেরকে জমিদার পদে উন্নীত করার জন্য জমির মালিকানাস্বত্ব দেওয়া হয় এবং অর্থ সংগ্রহ করিতে সুযোগ দেওয়া হয়। এই অর্থ মুসলমানদের শাসনকালে মুসলমানদের হাতে আসিত।' বড় জমিদারদের অধীনে অনেক তালুকদার ও পত্তনিদার ছিল। তাহারা জমিদারদের নির্দেশ মত চলিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তাহারা স্বাধীন হইয়া পড়ে।" (বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, এম এ রহিম, পৃ- ১৭)

মহাজনদের অত্যাচার

জমিদার- পত্তনীদারদের উৎপীড়নে কৃষকদের জীবন যখন দুর্বিষহ হয়ে পড়তো, বাধ্য হয়ে তাদেরকে তখন হিন্দু মহাজনদের দ্বারস্থ হতে হতো। উপরন্ত তাদের গরু, মহিষ মহাজনের কাছে বন্ধক রাখতে হতো। অভাবের দরুন মহাজনের কাছে অগ্রিম কোন শস্য গ্রহণ করতে হলে তার দ্বিগুণ পরিশোধ করতে হতো। আবার উৎপন্ন ফসল যেহেতু মহাজনের বাড়ীতেই তুলতে হতো, এখানেও তাদেরকে প্রতারিত করা হতো। মোটকথা হতভাগ্য কৃষকদের জীবন নিয়ে এসব জমিদার মহাজনরা ছিনিমিনি খেলে আনন্দ উপভোগ করতো।

কৃষকদের এহেন দুঃখ- দুর্দশার কোন প্রতিকারের উপায়ও ছিল না। কারণ তা ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। উপরন্ত জমিদার ও তাদের দালালগণ উৎকোচ ও নানাবিধ দুর্নীতির মাধ্যমে মামলার খরচ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিত। পরিণাম ফল এই হতো যে, জমিদার মহাজন তাদেরকে ভিটেমাটি ও জমিজমা থেকে উচ্ছেদ করে পথের ভিখারীতে পরিণত করতো। (বাংলার মুসলমানদের ইতিহাসঃ আব্বাস আলী খান, পৃ.- ১০৪)

নীলকরদের অত্যাচার

বৃটিশ সৃষ্ট নব্য জমিদারদের শোষণ এবং নিত্য নৈমিত্তিক, নিপীড়নের সাথে যুক্ত হল আর এক যন্ত্রণা নীলকরদের অত্যাচার। যেন গোদের উপর বিষফোড়া। এদিকে সিরাজের পতনের পর কোম্পানীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে বৃটিশ বণিকেরা নীলের জন্য বাংলাকে উপযুক্ত স্থান বলে মনে করল। শুরু হল ব্যাপক নীলচাষ। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমূহে প্রতিষ্ঠিত হল নীলকুঠি। রাজ্য হারিয়ে, জমিদারী হারিয়ে, চাকুরিচ্যুত হয়ে মুসলমানরা যখন দু'মুঠো অন্নের জন্য পুরোপুরি কৃষিনির্ভর হয়ে উঠল, সে সময় বৃটিশ বণিকরা নব্য জমিদারদের পাশাপাশি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ডেরা বাঁধল। জমিদারদের শোষণের সাথে সাথে শুরু হল জুলুম। বণিকরা কোম্পানীর বিজয়ের আধিপত্যকে পুঁজি করে গ্রামবাংলায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। এরা নীলের এমন নিম্নমূল্য বেঁধে দিল যাতে চাষীদের উৎপাদন খরচও উঠতো না। এই নিষ্ঠুর নীলকর সাহেবরা কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করত। তা না হলে বাড়ীঘরে আগুন লাগিয়ে দিত, দৈহিক অত্যাচার করত, এমনকি মহিলাদের অপরহণ করত। এছাড়াও জাল চুক্তিনামার বলে জমি- জিরাত

ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করতো। প্রশাসন এবং নব্য জমিদারদের সাথে ছিল এদের অন্তরের যোগ। এ কারণে পুলিশে খবর দিয়ে প্রতিকার তো হতোই না পরন্তু উল্টো ঝামেলায় পড়তে হতো। অনেক সময় জমিদাররা প্রজাকে শাস্তি দেয়ার জন্য তার কাছ থেকে জমি কেড়ে নিয়ে নীলকরদেরকে হস্তান্তর করত। যে কারণে একজন ম্যাজিস্ট্রেট একজন খৃস্টান মিশনারীকে কথা প্রসঙ্গে বলেন- 'মানুষের রক্তে রঞ্জিত হওয়া ব্যতীত একবাক্স নীলও ইংলন্ডে প্রেরিত হয় না।' (নীল কমিশন রিপোর্ট এবং ক্যালকাটা খৃস্টান অবজারভার, নভেম্বর ১৮৫৫ সাল)। ঐতিহাসিক হারান চন্দ্র চাকলাদার লিখেছেন, 'ইউরোপীয়রা এদেশে এসেছিল দাস মালিকের মনোবৃত্তি নিয়ে। নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের প্রচণ্ড লোভের সংগে উদ্ভাবনী কল্পনাশক্তি মিলিত হয়ে যত প্রকার উপায় আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল তার প্রত্যেকটিকেই নীলকর সাহেবরা এদেশে প্রয়োগ করেছিল।... (ফিফটি ইয়ার্স এগো, ডন ম্যাগাজিন, জুলাই, ১৯০৫)

লা'খেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

পলাশী যুদ্ধের প্রায় ১৫ বছর পর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তরবারির জোরে বঙ্গীয় এলাকায় তহসিলের দায়িত্ব নেয়ার পর ভেবেছিল যে খাজনা আদায়ের উদ্বৃত্ত অর্থ থেকে কোম্পানীর হেড অফিসে পাঠানো সম্ভব হবে। কিন্তু বাস্তবে তা না হওয়ার ফলে ১৭৭২ খৃস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিং সর্বপ্রথম হিসেব করে বের করলেন যে, বাংলার ৪ ভাগের ১ ভাগ জমি একেবারে নিস্কর অর্থাৎ লাখেরাজ হয়ে রয়েছে। এর পর থেকেই ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী নানা বাহানায় এসব জমি খাজনা যুক্ত করার জন্য এক অঘোষিত যুদ্ধ অব্যাহত রাখে, জমির প্রকৃত মালিক স্থিরীকরণের অছিলা এসব বাহানার অন্যতম। (কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী এম, আর, আখতার মুকুল, পৃ.- ৭৮)

কয়েক শতাব্দী ধরে লাখেরাজ সম্পত্তি যথানিয়মে ভোগ দখল হয়ে আসছিল। শাসক পরিবর্তন হলেও লাখেরাজ সম্পত্তির উপর কেউ হস্তক্ষেপ করেনি। কিন্তু বৃটিশ বেনিয়াদের অর্থনৈতিক লালসা এমন তীব্র ছিল যে লাখেরাজ সম্পত্তির উপর নির্মমভাবে হস্তক্ষেপ করতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি। লর্ড কর্নওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে আইনের ১৯ ও ৩৭ প্রবিধান বলে অফিসে লাখেরাজ জমির দানপত্র পরীক্ষার ব্যাপারে জেলা কালেক্টর অফিসে জমা দেয়ার জন্য নিস্কর সম্পত্তির মালিকদের প্রতি নির্দেশ জারি করেন। কোন

মাপকাঠির ভিত্তিতে দলিলসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে সে ব্যাপারে কোন দিক নির্দেশনা ছিল না। সম্ভবত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল 'মরি মারি পারি যে কৌশলে'। যেভাবেই হোক লাখেরাজ সম্পত্তি হস্তগত করাই হল ইংরেজ সরকারের মূল লক্ষ্য। কোন মাপকাঠি না থাকার দরুন কালেক্টরের ইচ্ছাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়। ওদিকে কালেক্টরদের প্রলুব্ধ করার জন্য বলা হয়, যেসব জমি বাজেয়াপ্ত করা হবে, কালেক্টরদের সেগুলির প্রথম বছরের খাজনার এক চতুর্থাংশ কমিশন হিসেবে দেয়া হবে। স্বাভাবিকভাবে কমিশন প্রাপ্তির আশায় লাখেরাজ সম্পত্তি সরকারের হাতে তুলে দেয়া কালেক্টরের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠল। এ যেন বৈধতার মোড়কে চুরিকে উৎসাহিত করা। এছাড়াও এক পর্যায়ে কালেক্টরদের নিস্কর জমি সংক্রান্ত মোকদ্দমা বিচারের অতিরিক্ত ক্ষমতা দেয়া হয়। সরকারী বাদী এবং বিচারক উভয়বিধ ক্ষমতার অধিকারী হয় কালেক্টর স্বয়ং। এর ফলে লাখেরাজ সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলাসমূহের সুবিচারমূলক নিষ্পত্তি হয়নি।

চট্টগ্রাম বোর্ড অব রেভিনিউ- এর জনৈক অফিসার নিম্নোক্ত মন্তব্য করেনঃ সরকারের নিয়তের প্রতি লাখেরাজদারগণ সন্দিগ্ধ হয়ে পড়লে তাতে বিস্ময়ের কিছুই থাকবে না। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক, ১৪৮৬৩টি মামলার মধ্যে সব কয়টিতেই লাখেরাজদারদের অনুপস্থিতিতে সরকারের পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ তিক্ত অভিজ্ঞতার পর Tribunals of Resumption- এর প্রতি তাদের আস্থাহীন হবারই কথা। Comment by Smith on Harver's Report of 19th June 1840. A.R. Mallick: British policy and the Muslims of Bengal.

মুসলমান লাখেরাজদারদের ন্যায্য ভূমি মালিকানা থেকে উচ্ছেদ করার জন্যে নানাবিধ হীনপন্থা অবলম্বন করা হতো এবং ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে এ ব্যাপারে এক বিদ্বেষদুষ্ট মানসিকতা বিরাজ করতো। লাখেরাজদারদের সনদ রেজিষ্ট্রী না করার কারণে বহু লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। জেলার কালেক্টরগণ ইচ্ছা করেই সময়মতো সনদ রেজিষ্ট্রী করতে গরিমসি করতো। তার জন্যে চেষ্টা করেও লাখেরাজদারগণ সনদ রেজিষ্ট্রী করাতে পারতেন না।

চট্টগ্রামে লাখেরাজদারদের কোর্টে হাজির হবার জন্যে কোন নোটিশই দেয়া হতো না। অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে যে, মামলার

ডিক্রী জারী হবার বহু পূর্বেই সম্পত্তি অন্যত্র পত্তন করা হয়েছে। ১৮২৮ থেকে ১৮৫১ সাল পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সমগ্র বাংলা বিহারে লাখেরাজদারদের মিথ্যা তথ্য সংগ্রহের জন্যে চর, ভুয়া সাক্ষী ও রিজাম্পশন অফিসার পংগপালের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং মুসলমানদেরকে মামলায় জড়িত করে। এসব মামলায় সরকার ছাড়াও তৃতীয় একটি পক্ষ বিরাট লাভবান হয়। যারা মিথ্যা সাক্ষ্যদান করে এবং যারা সরকারী কর্মচারীদের কাছে কাল্পনিক তথ্য সরবরাহ করে- তারা প্রভুত অর্থ উপার্জন করে। পক্ষান্তরে, মুসলিম উচ্চশ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার ফলে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বন্ধ হয়ে যায়। (বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস আব্বাস আলী খান, পৃ.- ১০৩)

'লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ফলে ১৮৪৭- ৪৮ সাল পর্যন্ত সরকারের যাহা খরচ হয়, তাহা এই বার্ষিক আয়ের প্রায় চারগুণ ছিল। হান্টার লিখিয়াছেন যে, এই আয়ের অধিকাংশই মুসলমানদের লাখেরাজ সম্পত্তি হইতে হইত। লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্তির দরুন বাংলার মুসলমানদের যে কি ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা উল্লেখ করিয়া হান্টার বলিয়াছেন, শত শত পরিবার সর্বস্বান্ত হইয়া পড়ে এবং যে সকল মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিস্কর জমির আয়ের উপর চলিত সেগুলি ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। সরকারের আঠার বৎসরব্যাপী স্বেচ্ছাচারিতামূলক কার্যকলাপের দরুন মুসলমানদের শিক্ষিত শ্রেণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়।

সিরাজের পতনের পর থেকে কোম্পানী কর্তৃপক্ষের প্রতিটি পদক্ষেপে মুসলমানদের জন্য ছিল অসনি সংকেত। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ মুসলমানদেরকে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। আঘাতে আঘাতে মুহ্যমান করে তুলেছে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠি বাংলার মুসলমানদের। বিনয় ঘোষের ভাষায়ঃ মুসলমানদের প্রতি বৃটিশ শাসকদের অবিচার ও বিদ্বেষভাব প্রথম যুগে বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল। ইংরেজদের নতুন জমিদারী ব্যবস্থার ফলে শুধু যে মুসলমান জমিদার জায়গীরদার ধ্বংস হয়ে গেলো তা নয় বাংলার যে কৃষক প্রজারা ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হল তাদের মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান। (কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী এম আর আখতার মুকুল, পৃ.- ৭৩)

এখানে এসে বৃটিশদের চক্রান্ত থেমে থাকল না। হিন্দু জনগোষ্ঠীর জন্য সৌভাগ্যের দ্বার একটার পর একটা উন্মোচন করার এবং মুসলমানদের রুটিরুজীর পথ রুদ্ধ করে সর্বহারা জাতিতে রূপান্তর করার চক্রান্ত অব্যাহত থাকল। হিন্দুদের সাথে হৃদ্যতা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল।

১৮৩৭ সালে অফিস আদালতে ফার্সীর পরিবর্তে ইংরেজীর প্রবর্তন মুসলমানদের কপালে বরাবর আর এক প্রচণ্ড আঘাত। কোলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু এলিটদের সাথে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ১৮৩৭ সালে মুসলমানদের ক্ষতবিক্ষত করার জন্য এই বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করা হয়। একটু গভীরভাবে খতিয়ে দেখলে চক্রান্তটা সুস্পষ্টই হয়ে উঠে। ১৮১৬ খৃস্টাব্দে উচ্চ শিক্ষার জন্য কোলকাতায় প্রথম হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময় থেকেই কোলকাতা এবং তার সন্নিহিত এলাকাসমূহে ব্যাপক ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ দেখা যায়। এর ফলে ১৫/২০ বছর সময়ের মধ্যে বিরাট সংখ্যক হিন্দু যুবক শিক্ষা সমাপন করে বেরিয়ে আসে। ওদিকে ইংরেজরা ভাষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশের আগেই দেখা গেল ১৮৩৫ সালে ইংরেজদের সহযোগী শক্তি ঔপনিবেশিক দালাল কোলকাতার ধনাঢ্য বর্ণহিন্দুরা ৬,৯৪৭ জনের এক যুক্ত দরখাস্তে অফিস আদালতের ভাষা ইংরেজী চালু করার দাবী তোলে। ওদিকে ১৮৩২ সালে ক্যাপ্টেন টি বৃসকান সিলেক্ট কমিটির কাছে অত্যন্ত জোরের সংগে সুপারিশ করেছিলেন যে অফিসের ভাষার পরিবর্তনটা যেন মন্থর হয়। অন্যথায় বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠী মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু তার সুপারিশ অরণ্যের রোদনে পরিণত হল। ১৮৩৭ সালে অফিস আদালতে এবং ১৮৪৪ সালের ১৪ই অক্টোবর সরকারী নির্দেশ এই মর্মে জারী করা হল যে 'অতঃপর সরকারের সমস্ত দপ্তরে ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের চাকুরিতে নিয়োগ করতে হবে। (কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী এম, আর আখতার মুকুল, পৃ- ৭৩)

ফারসীর বদলে ইংরেজী চালু করার শক্ত পদক্ষেপ নেয়ার ফলে শিক্ষা বিভাগ এবং প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগ থেকে দলে দলে বাঙালী মুসলমানরা চাকুরীচ্যুত হয়ে বিতাড়িত হল।

'এ পরিবর্তন অপর সম্প্রদায়ের (বাঙালী হিন্দু) জন্য খুব সুখকর হয়ে উঠলো। কারণ তারা ইতিমধ্যেই ইংরেজী শিক্ষায় অনেকদূর অগ্রসর হতে পেরেছিল। মুসলমানদের জন্য এ সময়ে ইংরেজী শিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠান

ছিল না। সুতরাং হিন্দু কলেজের (পরবর্তীতে কোলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ) ছাত্ররা এই পরিবর্তনের পূর্ণ উপকার ভোগ করেছে। অপরপক্ষে মুসলিম আপার ক্লাশ নতুন ব্যবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে সর্বস্তরের অফিস আদালত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। (ব্রিটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান)

আমীর আলী আরো বলেন- "গত বিশ বৎসর যাবত মুসলমানগণ যোগ্যতা লইয়া চাকুরীতে ঢুকিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু ভিন্ন সম্প্রদায়ের লোকগণ প্রত্যেক সরকারী চাকুরীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখায় তাহাদের পক্ষে কোনো অফিসে প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। যদি সৌভাগ্যক্রমে কোন মুসলমান চাকুরী পায়, তাহা হইলে ইহা রক্ষা করাও তাহার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠে।"

ষষ্ঠ অধ্যায়

শতাব্দীকালের প্রতিরোধ যুদ্ধ অতঃপর হতাশা

সিরাজের পতন অতঃপর মীর কাসিমের প্রতিরোধ যুদ্ধের অবসান হলে ইংরেজরা শুধু মাত্র শোষণ এবং এদেশের সম্পদ লুণ্ঠনের মধ্যে তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখেনি। তাদের সহযোগী, তাদের জুনিয়ার পার্টনার বর্ণবাদী হিন্দুদের সহযোগিতায়ই মুসলমানদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙলো। অতঃপর শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতা সবকিছু থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখল। একদিকে বৃটিশদের বিমাতাসুলভ আচরণ, নীলকরদের অত্যাচার অন্যদিকে হিন্দু জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচারে এদেশের মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ল। মুসলমানরা চাকুরি হারাল, আয়মা লাখেরাজ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হল। লক্ষাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ায় সমগ্র জাতি ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হল। বিলাতী বস্ত্রে ছেয়ে গেল দেশ। লক্ষ লক্ষ তাঁতী হল কর্মহীন। লবণ ব্যবসা চলে গেল ইউরোপীয়দের হাতে। নীলকরদের অত্যাচারে সর্বসান্ত হল কৃষকরা। খাজনা আদায়ের ভার দেয়া হল হিন্দুদের। জমিদার হয়ে বসল হিন্দুরা। অর্থনীতির সব সেক্টর থেকে মুসলমানরা হল বিতাড়িত।

এই সর্বহারা মুসলমানরা পরাধীনতার ঘোর অন্ধকারে তাদের হারানো ইতিহাস ঐতিহ্য হাতড়ে ফিরল। দেখল তাদের সব কিছু ধ্বংস স্তূপের নীচে চাপা পড়ে আছে। সেখান থেকে পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নিল। দেখল ঔপনিবেশিক শক্তি এবং তাদের ব্রাহ্মণ্যবাদী সহযোগীরা বিঘ্নের পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিপীড়নের মধ্য দিয়ে নিষ্পেষিত জনগণের প্রতিরোধ শক্তি দানা বেধে উঠল। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব পরিণত হল গণ প্রতিরোধে। সিরাজের পতন পর্যায়ে যে জনগণ ছিল প্রতিক্রিয়াহীন সে জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে সম্পৃক্ত হল।

যারা সবকিছু চাওয়া পাওয়ার বাইরে অবস্থান করছিল সেই ফোকরা গোষ্ঠি সংঘবদ্ধ হল এবং এগিয়ে এলো প্রতিরোধ যুদ্ধে। হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য জানবাজি রাখতে তৈরি হল। ইতিহাসে যেটা পরিচিত ফকীর বিদ্রোহ নামে। শুধুমাত্র বাংলায় স্থানীয়ভাবে বিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

ত্রিশটি বছর বিদ্রোহে বর্ণবাদী হিন্দুরা ছিল ঔপনিবেশবাদী বৃটিশদের সর্বাত্মক সহযোগী। তাদের প্ররোচনায় কোন নিপীড়নকারী হিন্দুদের কোন একটি অংশও স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নেয়নি। এককভাবে মুসলিম জন গোষ্ঠী স্বাধীনতা সংগ্রামে একটানা একশ বছর 'বিরামহীন ভাবে লড়াই করেছে। ফকির বিদ্রোহ থেকে মুজাহিদ আন্দোলন সবখানে ছিল মুসলমানদের সক্রিয় ভূমিকা। শুধুমাত্র ভারত কাঁপানো সিপাহী বিদ্রোহে ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাই এবং তাতিয়া তোপি এবং অবাঙালী সিপাহীরা বিদ্রোহে যোগ দিলেও বাঙালী বাবুরা এ বিদ্রোহে থেকে দূরেই শুধু অবস্থান করেনি তারা সিপাহী বিপ্লবের সময় ইংরেজদের সার্বিকভাবে সহযোগিতা করে নিজেদের ঔপনিবেশিক দালাল হিসেবে চিহ্নিত করেছে। স্বার্থপর শিখরা সিপাহী বিপ্লবের সময় স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের কথা চিন্তা করেনি। তারাও ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্র এবং বাঙালী বাবুদের মত ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ছিল শংকিত। একজন বাহাদুর শাহর পরিবর্তে একজন ডাল হৌসীর প্রয়োজন ছিল তাদের কাছে অনেক বেশী। 'ভারত উপমহাদেশে সিপাহী বিপ্লবের প্রচন্ড ঝড়কে চোখ বন্ধ করে উপেক্ষা করেছে শিখ ও কোলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু এলিট গোষ্ঠী বর্ণ হিন্দু ও তার প্রভাবিত বাঙালী হিন্দুরা। এরা ঝড়ের ঝাপটা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য ইংরেজদের পক্ষপুটের নিবিড় আশ্রয়ে নিরাপদ অবস্থান নিল। যখন ঢাকার পথে গাছের ডালে ডালে মুক্তিকামী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের লাশ ঝুলছিল তখন কোলকাতার বাবুদের ঘরে ঘরে চলছিল বিজয়ের মহোৎসব। যখন সমস্ত উপমহাদেশের মুসলমান ও সংশ্লিষ্ট অবাঙালী হিন্দুদের বুক বিদীর্ণ হচ্ছিল বন্দুকের গুলিতে তখন কোলকাতায় আতসবাজী দিয়ে বিজয়ী বৃটিশদের জানান হচ্ছিল সাদর অভিনন্দন। যখন মুসলিম রমনীদের চোখে নতুন করে ঝরছিল স্বজনহারা বেদনার অশ্রু তখন কোলকাতার হিন্দুকূল বধূরা উলুধ্বনি দিয়ে জানাচ্ছিল সম্ভাষণ। যখন লালবাগের ভাঙা কেল্লায় রক্তাক্ত সিপাহীরা আর্তনাদ করছিল তখন নির্মিত হচ্ছিল বাবুদের জন্য ইংরেজদের বিশেষ উপহার কোলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়।

সিপাহী বিপ্লবের প্রজ্জ্বলিত শিখা যখন ছড়িয়ে পড়েছে উপমহাদেশের সর্বত্র তখন ইশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় তৎকালীন বাঙালী অর্থাৎ হিন্দু সমাজের উদ্দেশ্যে উপদেশ প্রদান করে বলা

হয়- 'হে বাঙালী মহাশয়েরা এ বিষয়ে আপনাদের যুদ্ধ করিতে হইবে না। আপনারা শুধু একান্ত চিত্তে কেবল রাজপুরুষদের মঙ্গলার্থে সাস্ত্রায়ন করুন।

সিপাহী বিপ্লবের আগুন স্তিমিত হল। মুক্তিকামী সিপাহী ও জনতার লাশ মাড়িয়ে ইংরেজ সেনাপতি দিল্লীতে প্রবেশ করলে কোলকাতায় বয়ে যায় আনন্দের বন্যা। হিন্দু মানস উল্লসিত হয়ে ওঠে। পণ্ডিত গৌরী চন্দ্র সম্পাদিত সম্বাদ ভাস্কর পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়- 'হে পাঠক সকল উদ্বাহু হইয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে নৃত্য কর'।

কোলকাতার বাবুরা বৃটিশদের এতখানি আস্থাভাজন হয়েছিলেন যে, সমগ্র ভারতের ১৪টি শহরে সামরিক আইনের এবং ঔপনিবেশিক নিপীড়নের স্টীম রোলার অব্যাহত ভাবে চললেও কোলকাতা সামরিক আইনের আওতার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এছাড়াও বাংলার বাইরে বাঙালী হিন্দুদের গৃহে 'ক্যালকাটা বাবুজ' লেখা থাকলে সেটাও জুলুম মুক্ত নিরাপদ গৃহ হিসেবে বিবেচিত হতো।

ডক্টর আনিসুজ্জামানের মন্তব্যে বলা হয়েছে- সিপাহী বিপ্লবের সমস্ত দায়িত্বটা কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের ঘাড়ে এসে পড়েছিল। দেশে এবং বিলেতে শাসক মহলে এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে, মুঘল শাসনের পুনঃ প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানরা এ বিদ্রোহ ঘটিয়েছিলেন। শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মোটা অংশই তাদের ভাগ্যে জুটেছিল।

১৮৫৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর ইংরেজ কর্তৃক দিল্লী দখলের পরদিনের বিবরণ দিয়েছেন জনৈক ইংরেজ- 'আমাদের সৈন্যগণ নগরে প্রবেশ করার পর নগর প্রাচীরের মধ্যে যাকে পেয়েছে তাকেই বেয়নেটের আঘাতে হত্যা করেছে। কোন কোন বাড়ীতে চল্লিশ পঞ্চাশ জন লুকিয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় তাদের সংখ্যা বেশ ছিল। এরা বিদ্রোহী নয় শহরের অধিবাসী মাত্র।'

সিপাহী বিপ্লবের মর্মান্তিক পরিণতির পর মুসলমানদের পুনরুত্থান ও স্বাধীনতার আকাঙ্খা একেবারে স্থিমিত হয়ে পড়ে। স্বাধীনতাকামীদের যারা বেঁচে ছিলেন তারা বনে বাদারে অথবা নিভৃত পল্লীর অপরিচিত পরিবেশে স্থান নিলেন শুধু মাত্র ক্ষুদ কুড়ো দিয়ে জাবিকা নির্বাহের জন্য। নৈরাশ্য হতাশা ও নীরব কান্নায় গুমড়ে মরছিল সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠী। হিন্দু

বেনিয়া ও বৃটিশদের প্রতিশোধ স্পৃহা এবং তাদের বৈরী নীতি মুসলমানদেরকে অধঃপতনের দোর গোড়ায় নিয়ে এল। পাশাপাশি হিন্দু জনগোষ্ঠীর সৌভাগ্য আকাশ চুম্বী হয়ে উঠল। মুসলমানদের শুধুমাত্র দীর্ঘশ্বাস ছাড়া কোন অবলম্বনই অবিশষ্ট রইল না।

মুসলমানদের পুনরুত্থান প্রয়াসের শেষ আলোটা যখন সিপাহী বিদ্রোহের বহ্নি শিখা হয়ে দপ করে নিভে গেল তখন থেকে শুরু হল সত্যিকার হিন্দু রেঁনেসা। মুসলমানদের শাসক জাতি থেকে কড়ির কাঙালে পরিণত করা পর্যন্ত যে সময়টুকু লেগেছিল এই দীর্ঘ সময় ধরে বৃটিশ তোষণের মধ্যদিয়ে হিন্দু জনগোষ্ঠী তাদের শক্তি সুসংহত করে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে প্রকৃত পক্ষে হিন্দু রেঁনেসার সূচনা হয়। সিপাহী বিপ্লবোত্তরকালে কোম্পানীর বদলে রাজকীয় শাসনের সবটুকু সুফল হিন্দুদের ভাগ্যে জুটে। তখনো মুসলমানরা নতুন করে পরাজয়ের হীনমন্য মানসিকতা নিয়ে হতাশা আর দুর্ভাগ্যের শেষ প্রান্তে এসে আশা নয় শুধুমাত্র আশঙ্কার ঘোর তমসায় আচ্ছন্ন। মুসলিম বিদ্বেষ ঘৃণা আর প্রতিহিংসার ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে হিন্দু রেঁনেসার ইমারত। মুসলমানরা যখন জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য সংস্কৃতির অঙ্গন থেকে পরিত্যক্ত হয়ে অজ্ঞানতা ও অন্ধত্বের অথৈ সমুদ্রে আবর্তিত হচ্ছিল তখন হিন্দু জনগোষ্ঠী জ্ঞান- বিজ্ঞান সাহিত্য সংস্কৃতির নিত্য নব নব উপত্যকা পেছনে ফেলে দশ দিগন্তে পাখা মেলে এগিয়ে চলছিল। ডক্টর এম এ রহিম লিখেছেন- 'উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে হিন্দু সমাজের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের সূচনা হয় এবং ইহার উপর ভিত্তি করে তাদের রাজনৈতিক জাতীয়তার উত্থান হয়। এ বিষয়ে ডক্টর আর সি মজুমদার লিখিয়াছেন, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস কৃষ্টির ওপর ভিত্তি করিয়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট গড়িয়া উঠিয়াছে। জাতীয় পত্রিকা নামক সাময়িকীর মাধ্যমে রাজ নারায়ণ বসু ও কবি গোপাল মিত্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের বানী প্রচার করেন। ইশ্বর চন্দ্র গুপ্ত, রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় হেম চন্দ্র, নবীন চন্দ্র প্রমুখ কবিগণ তাদের রচনার মধ্য দিয়ে হিন্দুদের হিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন।

পরবর্তী পর্যায়ে বঙ্কিম চন্দ্র থেকে রবীন্দ্র নাথ পর্যন্ত অনেকেই হিন্দু রেঁনেসা সমুন্নত করার বিশেষ লক্ষ্যে সক্রিয় ছিলেন। প্রত্যেকের মধ্যে ছিল মুসলিম বিদ্বেষ ও বৃটিশ তোষণ। যেমন আনন্দ মঠে বিসি চ্যাটার্জী সংলাপ

আকারে লিখেছেন- আমরা রাজ্য চাহিনা কেবল মাত্র মুসলমানরা ভগবান বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত করিতে চাই ইত্যাদি।

হিন্দুদের এই মুসলিম বিদ্বেষ ও ঘৃণার উচ্ছাস মুসলমানদের মধ্যে অতি ধীরে হলেও চেতনার উন্মেষ ঘটাতে থাকে। অত্যন্ত ধীর গতিতে মন্দ মন্থরে মুসলমানরা শিক্ষাঙ্গনের দিকে পা বাড়াতে থাকে। মুসলমানদের মধ্যে অগ্রগামী ও চিন্তাশীল উদ্যোক্তা মুসলমানদের আড়ষ্টতা ভাংবার উদ্যোগ নেয়। ১৮৬৩ সালে কোলকাতার মোহমেডান লিটারারী সোসাইটি, ১৮৭৭ সালে কোলকাতার সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় থেকেই মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায় সংঘবদ্ধ হবার প্রয়াস।

১৮৮৩ সালে মুসলিমস সুহৃদ সমিতি গঠিত হয়। এই ভাবে মুসলমানরা একদিকে শিক্ষাঙ্গনে হাটি হাটি পা পা করে পদচারণা শুরু করে অন্যদিকে সমিতি সোসাইটি গঠন করার মধ্যদিয়ে রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠে।

সপ্তম অধ্যায়

সিপাহী বিপ্লবের পর
কেড়ে নেয়া হল মুসলমানদের মুখের ভাষা

ওদিকে (পাঁচ- সাতশ' বছর ধরে একটানা মুসলিম শাসনামলে আরবী ফারসী সমন্বয়ে প্রাকৃতিক নিয়মে মিশ্র প্রক্রিয়ায় সহজভাবে ভাব প্রকাশের জন্য একটা ভাষার উদ্ভব হয়েছিল সেটাকে বলা হত চলতি ভাষা। অনেকে বলত মুসলমানী ভাষা। এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টার বলেন-

আজ পর্যন্ত বদ্বীপ অঞ্চলের কৃষক মুসলমান। নিম্নবংগে ইসলাম এতই বদ্ধমূল যে, এটি এক নিজস্ব ধর্মীয় সাহিত্য ও লৌকিক উপভাষার উদ্ভব ঘটিয়েছিল। হিরাতের ফার্সী ভাষা থেকে ভারতের উর্দু যতোখানি পৃথক, 'মুসলমানী বাংলা' নামে পরিচিত উপভাষাটি উর্দু হতে ততোখানি পৃথক। (W. W Hunter-Indian Musoleman's, P-146.)

এই ভাষার পরিচয় যে যেভাবেই উপস্থাপন করুক না কেন, এটা ছিল হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে এদেশের প্রতিটি মানুষের মুখের ভাষা। এ সত্বেও গোড়া হিন্দু পণ্ডিতেরা এই ভাষাকে অবজ্ঞা অবহেলার চোখে দেখত। এর কারণ সম্ভবত এ ভাষাতে ছিল আরবী ফারসী উর্দু শব্দসমূহের সহজ মিশ্রণ। এছাড়াও ছিল এর মধ্যে মুসলিম সংস্কৃতির স্বাচ্ছন্দ প্রবেশাধিকার। হিন্দু মানসিকতার কাছে এটা ছিল দুর্বিসহ। শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে এর বিরুদ্ধে হিন্দু পণ্ডিতেরা সক্রিয় অবস্থান নিতে পারেনি। মুসলিম শাসকদের ঔদার্যের কারণে তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুদের অনেক ধর্মীয় গ্রন্থ অনুবাদ হয়। কিন্তু এইসব গ্রন্থ সাধারণ হিন্দুদের পাঠের ব্যাপারে হিন্দু পণ্ডিতেরা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রাখে। তারা বলে, অষ্টাদশ হিন্দু পুরাণ রাম চরিত যে মানব পড়বে, তার ব্যবস্থা হবে রৌরব নরকে। তাদের এই নিষেধাজ্ঞা পুরো হিন্দু সমাজকে চলতি বাংলাভাষা চর্চার ব্যাপারে অনীহাপ্রবণ করে তোলে। ভাষা চর্চার ব্যাপারে তারা সংস্কৃত আশ্রিত হয়ে উঠে।

ওদিকে খৃস্টান মিশনারীদের লক্ষ্য যেহেতু হিন্দু জনগোষ্ঠী তারা হিন্দুদের উপর প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে তাদের উপযোগী সাহিত্য সৃষ্টির

জন্য সংস্কৃত ভাষাকে নতুন করে সাজানোর চেষ্টা করে। একথা খৃস্টান মিশনারীগণও ভালোভাবে উপলব্ধি করেন যে, যে ভাষার প্রতি হিন্দু পণ্ডিতগণ ঘৃণা পোষন করেন, সে ভাষার শুদ্ধিকরণ ব্যতীত তার দ্বারা খৃস্টধর্মে আকৃষ্ট করা কষ্টকর হবে। তাই তাঁরা এক ঢিলে দুই পাখি মারার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন। ভাষাকে আরবী- ফার্সীর ছোঁয়াচ্ থেকে রক্ষা করে হিন্দুর গ্রহণযোগ্য করা এবং মুসলমানদের বাংলা মাতৃভাষার ধ্বংসযজ্ঞ সম্পাদন করা, যার উল্লেখ সজনীকান্ত করেছেন। এ মহান (?) উদ্দেশ্যে নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড (Halhed) ১৭৭৮ সালে A Grammar of the Bengali Literature নামে বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন এবং শ্রীরামপুর প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় মুদ্রিত গ্রন্থ হিসেবে। এইটিই ছিল প্রথম- যাতে প্রথম বাংলা অক্ষর ব্যবহৃত হয়। এরপর শুরু হয় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা। ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়ামে বাংলা বিভাগ খোলা হয়। উইলিয়াম কেরী হলেন অধ্যক্ষ, ভাষা সংস্কারের জন্য তার অধীনে ৮ জন পণ্ডিত নিযুক্ত হলো। সংস্কৃত স্টাইলের বাংলা ভাষায় মুসলমান বিবর্জিত বিষয়বস্তু নিয়ে পুস্তক প্রকাশ শুরু হল। প্রতাপ আদিত্য, রূপ সনাতন, বীরবল ইত্যাদি নিয়ে শুরু হল ভারতীয় ইতিহাসের চরিত্র চিত্রণ।

আবদুল মওদুদ বলেন- "এই মিশ্রনীতির বাংলাভাষায় সাহিত্য গড়ে উঠার মুখেই বণিকের তুলাদণ্ড হলো রাজদণ্ডে রূপান্তরিত এবং বণিকের তল্পীবাহক মিশনারীরাও দিলেন সাহিত্যের ভাষার মোড় পরিবর্তন করে।... পাশ্চাত্যের শিক্ষার প্রবর্তকরা বাংলা ভাষার কাঠামোকেও নতুন ছাঁচে তৈরী করে দিলেন- বাবু সম্প্রদায়ের জন্যে। তার দরুন বাবু কালচারের আবাহন হলো যে ভাষায়, তা কেবল সংস্কৃতঘেঁষা নয়, একেবারে সংস্কৃতসম। আর এটিও হয়েছে সুপরিকল্পিত সাধনায়- হিন্দু পন্ডিতরা উল্লসিত হলেন। তার দরুন সংস্কৃত ভাষা ও কৃষ্টির নব প্রবর্তনের সম্ভাবনায় এবং মিশনারীকূল তৎপর হয়েছিলেন মুসলমানদের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে তাকে সাহিত্য ও কালচারের দিক দিয়েও নিঃস্ব করে দিতে। (আব্দুল মওদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ, পৃঃ ৩৮৫)

শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছু হটিয়ে দেয়া হল

সে দিনের সুবাহ বাংলায় শিক্ষার এত ব্যাপক বিস্তৃতি সম্ভব হয়েছিল শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের ঐতিহ্যগত অনুরাগের কারণে। শাসক, ওমরাহ রাজকর্মচারী এবং সামর্থ্যবান ব্যক্তিরা শিক্ষিত লোক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এদেশের মুসলমানদের বিদ্যানুরাগ কত প্রবল ছিল উইলিয়াম এডামসের বক্তব্য থেকে বুঝা যায়। তিনি বলেনঃ বাংলার মুসলমান বহু বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল এবং শিক্ষাকে তারা কেবল জীবনের পেশা এবং জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসেবে গ্রহণ করেনি। তারা তাকে ন্যায় এবং পূণ্যের কাজ বলে বিশ্বাস করত। (মুসলমানদের ইতিহাস এম এ রহিম, পৃঃ ১০০)

বিহারে ৪ কোটি মানুষের জন্য এক লক্ষ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। একজন প্রাচ্য বিশারদ বলেন, ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার ৩০ বছর পূর্বে বাংলায় ৮০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। ফারুক মাহমুদ লিখেছেন, তৎকালীন বাংলায় ১৩টি বিশ্ব বিদ্যালয় ছিল। এ সত্ত্বেও মাত্র কয়েক যুগের ব্যবধানে শিক্ষার উজ্জল দিগন্ত থেকে ছিটকে হারিয়ে গেল অন্ধকারের অতল গহবরে। কিন্তু কিভাবে এমনটি হল।

মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের অর্থনৈতিক উৎস ছিল লাখেরাজ সম্পত্তি। ইতিপূর্বে আমরা বলেছি, লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ অর্থ সংকটে অচল হয়ে পড়েছিল। বৃটিশ হিন্দু যৌথভাবে এমন নীতি অবলম্বন করেছিল যেন মুসলমানরা তাদের বিধ্বস্ত বর্তমানকে সামাল দিতে ব্যস্ত থাকে।

এম. এ রহিমের ভাষায়- 'হিন্দু জমিদারগণ তাঁহাদের সম্প্রদায়ের জন্য স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। পূর্ববাংলায় কোন কোন হিন্দু জমিদার তাঁহাদের জমিদারীতে স্কুল স্থাপন না করিয়া পশ্চিম বাংলার হিন্দু এলাকায় স্কুল স্থাপন করেন। ঠাকুর পরিবার এবং আরও অনেক হিন্দু জমিদারের পূর্ববাংলায় জমিদারী ছিল। তাঁহারা কলিকাতা ও পশ্চিম বাংলায় বাস করিতেন এবং সেখানকার লোকের শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিতেন। তাহারা পূর্ববাংলায় নিজেদের জমিদারীর প্রজাদের শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করেন নাই। কোন কোন জমিদার প্রজাদের শিক্ষার বিরোধী ছিলেন, কারণ তাঁহারা মনে করিতেন যে, প্রজাগণ শিক্ষিত হইলে জমিদারীতে তাঁহাদের কর্তৃত্ব

দুর্বল হইয়া পড়িবে। (বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস এম. এ রহিম, পৃঃ ১১২)

'মিশনারী স্কুল ও কলেজের পাঠ্যতালিকা মুসলমানদের জন্য গ্রহণযোগ্য হয় নাই। হিন্দুদের পরিচালিত স্কুল ও কলেজে মুসলমানদের শিক্ষার উপযোগী না হওয়ায় তাহারা সেখানে ভর্তি হইতে উৎসাহ পাইত না। বিদ্যালয়গুলোতে যে সংস্কৃত উদ্ভুত বাংলা শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে খুব কঠিন হইয়া পড়িত, কারণ তাহারা কথ্যভাষা ব্যবহার করিত। তাহা ছাড়া বাংলা পাঠ্যপুস্তক দেবদেবী ও পৌরাণিক কাহিনীতে পূর্ণ ছিল।'

এ প্রসঙ্গে ইসি বেইলী বলেন- 'শিক্ষা পদ্ধতি মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ ছিল, এটা প্রবর্তন করার সময় তাদের সংস্কার সম্বন্ধে কোনরূপ বিবেচনা করা হয়নি এবং তাদের প্রয়োজনের প্রতিও লক্ষ্য করা হয়নি। এই জন্য শিক্ষাপদ্ধতি তাদের স্বার্থের পরিপন্থী ও সামাজিক রীতিনীতির প্রতিকূল হয়ে পড়ে।"

বেইলী আরো বলেন- 'সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, আমাদের জনশিক্ষা পদ্ধতি তিনটি বিষয়ে মুসলমানদের প্রবল মানসিক বৃত্তি উপেক্ষা করেছে। প্রাদেশিক ভাষায় শিক্ষা মুসলমানদের মনঃপূত হয়নি এবং হিন্দু শিক্ষকও তাহাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি। তাছাড়া গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলিতে যে শিক্ষা দেয়া হত তা মুসলমান ছাত্রদিগকে সামাজিক জীবনে শ্রদ্ধার আসন পেতে ও ধর্মীয় কর্তব্য পালন করতে সাহায্য করত না। জিলা স্কুলগুলিতেও আরবী- ফার্সী শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। জনশিক্ষা পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থার কোন পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষার স্থান ছিল না। মুসলমানগণ সাধারণ শিক্ষার সহিত ধর্মীয় শিক্ষা অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করিত। (বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস এম. এ রহিম, পৃঃ ১১২- ১১৩)

বৃটিশ ও বর্ণ হিন্দুদের উদ্যোগে ধ্বংস হল বাংলার শিল্প

বাংলার এই বিপুল ঐশ্বর্যের প্রতি বৃটিশ বেনিয়াদের ছিল অপরিসীম লোভ। এই সম্পদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ছিল তাদের দীর্ঘ কালের প্রয়াস। সুদীর্ঘকাল ধরে সুপরিকল্পিতভাবে তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা কাজ করে গেছে। প্রথমতঃ তারা এদেশের ধনিক বণিক বিশেষ করে হিন্দু

বণিকদের সাথে সখ্যতা স্থাপন করে। বাংলার রাজদরবারে এসব বণিকদের প্রভাব থাকার কারণে তাদের মাধ্যমে বৃটিশরা সব ধরনের বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় করে নেয়।

দ্বিতীয়তঃ বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে সমস্ত বিদেশী বণিকদের বাংলাদেশের বাজার থেকে বিতাড়িত করে। কখনো শক্তি প্রয়োগ করে, কখনো হিন্দু বেনিয়া রাজা মহারাজাদের মাধ্যমে রাজদরবারে প্রভাব বিস্তার করে সরকারী নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে অন্যান্য বিদেশী বণিকদের বৃটিশরা বাংলাছাড়া করে। মসলিন সুতি কাপড় রেশম ও রেশমজাত বস্ত্র চিনি চাউল, আফিম সল্টপিটার ইত্যাদি রপ্তানীর ক্ষেত্রে মনোপলি প্রতিষ্ঠা করে। সিরাজের পতনের পর বলতে গেলে সব কিছুর উপর বৃটিশদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির পর ব্রিটিশরা এমন রাজস্ব আয়- ব্যয় নীতি প্রবর্তন করে যার তুলনা বিশ্ব- ইতিহাসে ছিল না এবং এখনো নেই। কর আরোপ এখন থেকে হয়ে দাঁড়াল কোম্পানীর মুনাফা লোটার এক বাড়তি এবং মোটা রকমের উৎস। এখন হতে বাংলা থেকে আমদানিকৃত পণ্যদ্রব্যের জন্য ব্রিটেনের কোন মূল্য দিতে হত না। মূল্য প্রদান করা হত বাংলার রাজত্ব থেকে যাকে কোম্পানী তার বৈধ "মুনাফা" স্বরূপ গণ্য করত। ব্রিটেনে প্রেরণের উদ্দেশ্যে বাংলার পণ্যদ্রব্য খরিদের জন্য রাজস্ব সঞ্চয় ব্যবহার করাটাকে মোলায়েম করে বলা হত "বিনিয়োগ"। এই পণ্যদ্রব্য ব্রিটেনে বিক্রয় করে যে অর্থ লাভ হত তা জমা পড়ত কোম্পানীর লন্ডনস্থিত হিসেবের খাতায়, এবং বাংলা তা থেকে বঞ্চিত হত চিরতরে। রমেশ দত্তের ভাষায়ঃ মূল্যহ্রাস প্রাপ্ত টাকার হিসেবে পড়লে এটা দাঁড়াবে ১৪,৫০০০ কোটি টাকার সমান। (নতুন সফর, ঢাকা)

অতীতে বাংলা চিরদিনই ছিল পণ্যদ্রব্যের রপ্তানিকারক দেশ। উদ্বৃত্তের বিনিময়ে আমদানি হত স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাট, ধাতু মুদ্রা ও মণিরত্ন। রাজস্ব ব্যবস্থা কোম্পানীর হাতে যাওয়ার পর থেকেই স্বর্ণ- রৌপ্যের বাট প্রভৃতি আমদানী বন্ধ হয়ে যায়। কোম্পানির উদ্বৃত্ত রাজস্ব দিয়ে ব্রিটেন বাংলার পণ্যদ্রব্য ক্রয় করত। কিন্তু বাংলাকে ব্রিটিশ মালপত্র ক্রয় করতে হত ব্রিটিশ উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের নির্ধারিত দরে। ব্যক্তিগত হিসেব মারফতও পাঠান হত প্রচুর অর্থ। এর মধ্যে থাকত কোম্পানীর দালাল-

গোমস্তা অথবা কর্মচারীদের বেতন থেকে সঞ্চিত আয়, ব্যক্তিগত ব্যবসা থেকে অর্জিত মুনাফালব্ধ অর্থ এবং কোম্পানির নিজস্ব ব্যবসা থেকে অর্জিত অর্থ। রাজস্ব সঞ্চয়সহ এই অর্থের কিছু অংশ রেলপথ অথবা জনহিতকর কার্যে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে পরবর্তীকালে উচ্চ সুদে ভারতে ফিরে এসেছে। ফলে বিরাট হয়ে জমে উঠেছে ভারতের সরকারী ঋণের বোঝা। এই বোঝা আরো ভারী হয়ে উঠেছে অপর একটি কারণে। বিভিন্ন যুদ্ধে ইংরেজদের যে অর্থ ব্যয় হত তার দায় তারা চাপিয়ে দিত ভারতের কাঁধে।

বৃটিশরা এদেশে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রচলন করল দুটি উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে। আর্থিক কারসাজির মাধ্যমে দেশীয় ব্যবসায়ী মুৎসুদ্দী শ্রেণীকে বৈদেশিক বাণিজ্যের অঙ্গন থেকে হটিয়ে দিয়ে অন্তর্মুখী করে তোলা এবং সুদকে ব্যবসার আকর্ষণীয় বিকল্প বানিয়ে স্থানীয় উৎপাদনের বিনাশ করা। আর্থিক নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে তারা অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ শুরু করল। শোষণের দ্বার অবারিত করল সুদ ব্যবস্থার প্রচলন ঘটিয়ে। এদেশের উৎপাদন এবং বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্টরা ক্রমশ উৎসাহ হারাতে থাকে। এদেশী ভোক্তাদের প্রয়োজনীয় পণ্যের বাড়তি মূল্য গুনতে হত। বৃটিশরা এদেশে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আগে তাঁতশিল্পে বাংলার অগ্রগতি বিশ্ববাজারে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখত। এই শিল্পে বৃটিশরা হস্তক্ষেপ করে এবং শিল্প সংশিষ্টদের নিপীড়নের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ে পরিকল্পিতভাবে এ শিল্পকে ধ্বংস করে।

উইলিয়াম বোল্ট নামে একজন ইংরেজ বণিক বাংলার তাঁতীদের উপর কোম্পানীর নিপীড়নের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন- 'ইংরেজ এবং তাদের অনুগত হিন্দু বেনিয়া এবং গোমস্তাগণ নিজেদের মর্জি মাফিক কাপড়ের দর বেঁধে দিয়ে সেই নির্দিষ্ট দরে কাপড় সরবরাহে বাধ্য করত। নীলকরদের মত তারা বাধ্য করত তাঁতীদের স্বার্থবিরোধী চুক্তি স্বাক্ষর করতে। কোম্পানীর বেঁধে দেয়া বাজার দর থেকে শতকরা ১৫ থেকে ৪০ ভাগ কম হত। তাদের নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে বস্ত্র সরবরাহ করতে না পারলে তাঁতীদেরকে বেত্রাঘাত করা হত।' পরবর্তীতে কোম্পানী বাংলার বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংস করার জন্য বাংলার উৎপাদিত বস্ত্র ইংল্যান্ডে না এনে কাঁচামাল হিসেবে রেশম এবং কার্পাস আমদানী করত। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে বাংলার তাঁত শিল্প ধ্বংসের ক্ষেত্রে আর একমাত্রা যোগ হয়।

স্থানীয় উৎপাদিত যন্ত্রের উপর কোম্পানী শুল্ক নির্ধারণ করার ফলে ইংল্যান্ড থেকে আমদানীকৃত বস্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতায় এদেশের তাঁতীরা কুলিয়ে উঠতে পারে না। এভাবে দেশের তাঁতশিল্প পর্যায়ক্রমে মার খেতে খেতে তার অস্তিত্ব হারাতে থাকে। বৃটিশের নীতি ছিল এদেশের তাঁতী সম্প্রদায়কে নির্মূল করা।' (মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশঃ আব্দুল মওদুদ)

এদেশের ভাগ্যহত তাঁতীদের দুঃখ দুর্দশা সম্পর্কে পন্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু বলেন- 'এসব তাঁতীদের পুরানো পেশা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। নতুন কোন পেশার দ্বারও উন্মুক্ত ছিল না। উন্মুক্ত ছিল শুধু মৃত্যুর দ্বার। মৃত্যুবরণ করলো লক্ষ লক্ষ। লর্ড বেন্টিংক ১৮৩৪ সালের রিপোর্টে বলেন, তাদের দুঃখ-দুর্দশার তুলনা নেই বাণিজ্যের ইতিহাসে। ভারতের পথঘাট পূর্ণ হয়েছে তাঁতীদের অস্থিতে। (Pandit Nehru Discovery of India, P-352)

'উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশরা অধিকতর লাভজনক দু'টি বিকল্প ক্ষেত্রের সন্ধান পায়। একটি হলো পাট, অপরটি চা। পাটের ক্ষেত্রে একমাত্র শিকার হয় বাংলা এবং চায়ের ক্ষেত্রে প্রথমে আসাম ও তারপর বাংলা। বাংলা থেকে অর্থ সংগ্রহের মূখ্য উপায় হয়ে দাঁড়ায় পাট। কিন্তু তাতে চাষী বা বাংলার কোন লাভ হয়নি। বাজারে কারচুপি আর প্রত্যক্ষভাবে ঠকাবার দরুণ চাষের খরচ ওঠার মত দামও পাটচাষীর ভাগ্যে জুটত না। মুনাফা লুঠতো একমাত্র ব্যবসায়ীরা এবং পরবর্তীকালে পাটকলের মালিকরাও। ক্রীতদাসদের খাটানোর জন্য আমেরিকায় যেভাবে লোক নিযুক্ত করা হতো চা চাষের ক্ষেত্রে ব্রিটিশরাও সেই একই পন্থা অনুসরণ করতো। শ্রমিকদের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে, তারপর খাটান হত রুক্ত পানি করে। লাভ যা হত সব পাঠান হত ব্রিটেনে। (নতুন সফর, ঢাকা)

ঔপনিবেশবাদী বৃটেন তাদের শাসনকালের দুইপ্রান্তে দুটো মন্বন্তর উপহার দিয়েছিল বাংলাকে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং পঞ্চাশের মন্বন্তর। ১৭৬৯ সালে সংঘটিত দুর্ভিক্ষের ১ কোটি বাংলার মানুষ অনাহারে মুত্যুবরণ করে। ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে অনাহারে মৃত্যুবরণ করে ৩৫ লাখ আদম সন্তান। জে আর ডি টাটো ১৯৪৫ সালের মে মাসে লন্ডনে বলেন, যুদ্ধ এবং যুদ্ধে ভারতের সাহায্যের ফলে বাংলার দুর্ভিক্ষে লক্ষ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

এই অবস্থায় মুসলিম উচ্চবিত্তদের আয় কমে গেলো। হিন্দু মধ্যবিত্তরা সরকারী সকল প্রকার চাকরি বাকরি থেকে মুসলমানদের বহিষ্কার করে দিল। রাজনৈতিক এই পরিবর্তনের ফলে নেতৃস্থানীয় মুসলিম পরিবারগুলো বিনষ্ট হয়ে গেল।

বৃটিশদের মানসিক ভীতি হিন্দুদের প্রতিরোধস্পৃহা যুক্ত হয়ে নিত্য নব নব কৌশলে মুসলমানদের ওপর দিনের পর দিন চলতে থাকল জুলুম অত্যাচার আর শোষণ। বাংলার সমৃদ্ধশালী মুসলিম জনগোষ্ঠী কড়ির কাঙালে পরিণত হল। নৈরাজ্যের নিছিদ্র অন্ধকারে নিমজ্জিত হল। নিক্ষিপ্ত হল অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অতল গহবরে। বর্ণহিন্দুদের ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হল মুসলমানরা। মুসলমানদের জাতীয় স্বাতন্ত্র হিন্দু ষড়যন্ত্র আর বৃটিশদের কায়েমী প্রভুত্বের দাপট থেকে নিস্কৃতির পথ রচনা করতে চেয়েছে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের বিপর্যয় পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস বৃটিশ আর বর্ণহিন্দুদের যৌথ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মুসলমানদের একটানা বিদ্রোহ সংঘাত আর লড়াইয়ের ইতিহাস। লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাদের বুকের রক্ত উজার করে মুসলমানদের সভ্যতা সংস্কৃতি আর লুপ্ত গৌরবকে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছে, তারপর হিম্মতহারা মুসলমান রণাঙ্গন পরিহার করে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখে বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু হিন্দু ষড়যন্ত্র আর শোষণের রাজনীতি মুসলমানদের মাথা গুড়িয়ে দিয়েছে।

অষ্টম অধ্যায়

বঙ্গ ভঙ্গ ও মুসলমানদের নব চেতনার উন্মেষ

১৯০৩ সালে বড় লাট লর্ড কার্জন ঢাকায় সফরে এলে নওয়াব সলিমুল্লাহ পূর্ব বাংলার সমস্যাগুলো তুলে ধরে এতদাঞ্চলের দারিদ্র পীড়িত জনগোষ্ঠীর জন্য গ্রহণযোগ্য কিছু একটা করার আবেদন জানান। ওদিকে আসামের উৎপাদিত চা ও অন্যান্য পণ্য বিদেশে রপ্তানীর ব্যাপারে পরিবহন ব্যয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে কোলকাতার বদলে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের চিন্তা করে বৃটিশরা, এই সাথে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের ভাবনাও চলতে থাকে। বৃটিশদের বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং নবাবের আবেদন যুক্ত হয়ে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে বাংলা বিভাজনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পলাশী উত্তর ভাগ্যবান জনগোষ্ঠী ব্রাহ্মণ্যবাদীরা জ্বলে উঠল। কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবি ব্যবসায়ীদের তীব্র প্রতিবাদ সত্বেও ১৯০৫ সালে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা হল। বঙ্গভঙ্গ বর্ণ হিন্দুদের জন্য মোটেও সুখদায়ক হয়নি। বঙ্গভঙ্গের উপর আঘাত হানার জন্য শ্রেণী স্বার্থে তৎপর হয়ে উঠল তারা। ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত অন্তত ৩০০০ প্রকাশ্য জনসভায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হল এবং প্রতিটি জনসভায় ৫০০ থেকে ৫০,০০০ শ্রোতা উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে।

দলিত নেতা ডক্টর আম্বেদকর লিখেছেন- বাঙালী হিন্দুরা সমগ্র বাংলা উড়িষ্যা আসাম এমনকি ইউপিকেও তাদের কর্মক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। এসব অঞ্চলের সিভিল সার্ভিসের পদসমূহে তারাই অধিষ্ঠিত ছিল। বাংলা বিভাগের অর্থ ছিল তাদের বিরাট কর্মক্ষেত্রের ক্ষতি হওয়া। বাঙালী মুসলমানরা যেন পূর্ব বাংলায় তাদের স্থান দখল করতে না পারে সেটাই ছিল হিন্দুদের কাম্য। বিশেষত এসব কারণেই তারা বঙ্গ বিভাগের বিরোধিতা করেছিল।

১৮৮৫ সালে সর্বভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু জনগোষ্ঠী শিক্ষা-দীক্ষায় অগ্রগামী হওয়ার কারণে এর সার্বিক নেতৃত্বে তারাই সমাসীন হন। ভারতবাসীর একক সংগঠন হিসেবে কংগ্রেস তার

অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে। ১৮৭৭ সালে আমীর আলীর উদ্যোগে 'সেন্ট্রাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন' গঠনের সাথে স্যার সৈয়দ আহমদ দ্বিমত পোষণ করেন। তিনি মুসলমানদেরকে রাজনীতি থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস আত্মপ্রকাশ করার পর হিন্দি এবং উর্দুর বিরোধ সৃষ্টি হলে মুসলমানদের স্বার্থের ব্যাপারে সৈয়দ আহমদ সচেতন হয়ে উঠেন এবং ১৮৮৯ সালে রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে 'ইউনাইটেড ন্যাশনাল ডিফেন্স এ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন (১৮৮৯)। ১৮৯৩ সালে উত্তর ভারতে মোহমেডান 'এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স অরগানাইজেশন অব আপার ইনডিয়া' গঠিত হয়। ১৯০৩ সালে সাহরানপুরে মুসলিম রাজনৈতিক সংস্থা গঠিত হয়। ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে পাঞ্জাবে 'মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠিত হয়। এইভাবে উপমহাদেশে সব অঞ্চলের মানুষ রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠে এবং স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠিত হতে থাকে। কিন্তু সকলেই তাদের সীমাবদ্ধতার ব্যাপারেও অবগত ছিলেন। বৃটিশ ভারতের সমস্যা মোকাবেলার জন্য স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক শক্তি মোটেও যথেষ্ট ছিল না। এ কারণে সর্বভারতীয় সংগঠনের ব্যাপারে আগ্রহ সবার অবচেতন মনে দানা বেঁধেছিল। এদিকে বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র ভারত জুড়ে হিন্দু জনগোষ্ঠীর তুলকালাম কাণ্ড এবং মুসলিম বিদ্বেষের ঝড় বয়ে যাওয়ায় স্যার সলিমুল্লাহকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তোলে। তিনি সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলিম ঐক্যের কথা ভাবতে শুরু করেন। তিনি মনে করেন হিন্দু ষড়যন্ত্রের প্রতিরোধ সর্বভারতীয় পর্যায়ে হওয়া প্রয়োজন।

১৯০৬ সালের নভেম্বরে সলিমুল্লাহ সমগ্রভারতের বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের নিকট পত্রালাপে নিজের অভিপ্রায় তুলে ধরলেন এবং সর্বভারতীয় মুসলিম সংঘের প্রস্তাব রাখলেন। এর প্রতিক্রিয়া হল দারুণ। সকলেই এমন একটি প্রস্তাবের প্রতীক্ষায় ছিলেন। সলিমুল্লাহর ডাকে সকলেই সাড়া দিলেন। ১৯০৬ সালের ২৮- ৩০শে ডিসেম্বর সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন আহুত হল। শাহবাগে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সমগ্র ভারতের প্রায় ৮ হাজার প্রতিনিধি যোগ দিলেন।

নবাব সলিমুল্লাহ 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফেডারেন্সী' অর্থাৎ সর্বভারতীয় মুসলিম সংঘ গঠনের প্রস্তাব দেন; হাকিম আজমল খান, জাফর

আলী এবং আরো কিছু প্রতিনিধি প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেন। কিছু প্রতিনিধির আপত্তির প্রেক্ষিতে কনফেডারেন্সী শব্দটি পরিত্যাগ করে লীগ শব্দটিকে গ্রহণ করা হয়।

অবশেষে সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ গঠিত হয়। ঢাকায় এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নিন্দা করা হয়। এ সংগঠনের ব্যাপারে শুরু থেকেই হিন্দু জনগোষ্ঠী বিরূপ অবস্থান নেয়। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সম্পাদিত দি বেঙ্গলী পত্রিকা নবগঠিত মুসলিম লীগকে সলিমুল্লাহ লীগ হিসেবে অভিহিত করে। একে ভাতাভোগী তাবেদারদের সমিতি বলে বিদ্রুপ করা হয়। তা সত্ত্বেও নিরাশার তীরে বসে থাকা মুসলিম জনগোষ্ঠী চঞ্চল হয়ে উঠে।

বঙ্গভঙ্গের ফলে সুদীর্ঘকালের অবহেলিত পূর্ববাংলায় নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। সরকার এই প্রদেশের উন্নয়নের ব্যাপারে অনেকটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে। অত্যন্ত দ্রুত শিক্ষার প্রসার হয়। মাত্র ৫ বছরের মধ্যে ৩৫ শতাংশ ছাত্র বৃদ্ধি পায়।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে দূরত্ব রচিত হয়। বর্ণবাদী হিন্দু জমিদার ব্যবসায়ী এবং বুদ্ধিজীবিদের প্ররোচনায় সামগ্রিকভাবে হিন্দু জনগোষ্ঠী হিংস্র হয়ে উঠে। সমগ্র উপমহাদেশব্যাপী মুসলিম বিদ্বেষ এবং বৈরিতার ঝড় বয়ে যায়। মুসলমানদের উপর হিন্দুরা হিংস্র এবং খড়গহস্ত হয়ে উঠে। ঐতিহাসিক এম. এ. রহিম এনসি ঘোষের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন- 'বঙ্গভঙ্গের ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিদ্বেষ দেখা দেয়। মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের এইরূপ বিতৃষ্ণার সঞ্চার হয় যে, তাহাদের মধ্যকার বন্ধুত্ব ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলন থেকে ব্যাপক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের রূপ নেয়। পরে ক্রমশতা সীমিত হয়ে আসে। লর্ড মার্লো, লর্ড মিন্টো ও বৃটিশ সরকারের বড় কর্তা ছোট কর্তারা মুসলমানদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, বঙ্গ বিভাগ ব্যবস্থা একটা Settled fact কখনও এর পরিবর্তন হবে না। ১৯১১ সালে বৃটিশ সরকার সম্পূর্ণ গোপনে এমনকি বৃটিশ পার্লামেন্টকে না জানিয়ে সম্রাটের অনুশাসন হিসেবে Settled fact কে unsettled করে দিল। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ উল্লসিত হয়ে উঠলেন, মুসলিম নেতৃবৃন্দ প্রচন্ড আঘাতে মুহ্যমান হলেন।

১৯১২ সালে মার্চ মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে নওয়াব সলিমুল্লাহ বলেন- 'যখন বঙ্গ বিভাগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত র্পযায়ে তখন প্রতিপক্ষগণ বিরূপ হয়েছিলেন, বাস্তবে এর ফলে আমাদের বিশেষ লাভ হয়নি। কিন্তু যেটুকু আমরা পেয়েছিলাম তাও আমাদের স্বদেশবাসীরা আমাদের নিকট থেকে কেড়ে নেয়ার তীব্র আন্দোলন চালিয়েছে। হিন্দু জমিদাররা মুসলমানদেরও এ আন্দোলনে নামানোর চেষ্টা করেছে, মুসলমানরা এতে সাড়া দেয়নি। ফলে হিন্দু মুসলিম বিরোধ হয়েছে।'

মওলানা মোহাম্মদ আলী বঙ্গভঙ্গ রদ প্রসঙ্গে বলেনঃ এ যেন মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামকে আবার গোলামীতে আবদ্ধ করা হল। এরপর মুসলমানরা আরো সচেতন ও সতর্ক হয়ে উঠল।

ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বৃটিশরা পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের আহত আত্মায় কিছুটা সান্ত্বনার প্রলেপ দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু কোলকাতায় বর্ণ হিন্দুরা সেটাকেও সহ্য করতে পারল না। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় একদল হিন্দু প্রতিনিধি সহকারে ভাইসরয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তীব্র প্রতিবাদ জানান।

বঙ্গভঙ্গ রদ ছাড়াও আরো কতিপয় বৃটিশ কর্মকান্ড মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ অন্তরের জ্বলন্ত অঙ্গারে তেল ঢালে। বৃটিশ সরকার ইটালীর ত্রিপোলী আক্রমণকে সমর্থন জানায়। আলীগড়ে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে সরকার গড়িমসি করতে থাকে। এর ফলে মুসলিম জনগোষ্ঠী আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। সমকালীন মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ চেতনা মুসলিম লীগকে এমনি প্রভাবিত করে যে, শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ প্রবীণদের রাজভক্তির নীতি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং বৈপ্লবিক কর্মসূচী গ্রহণ করে। ১৮৯২ সালের ৩১শে ডিসেম্বর বাকীপুরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সভায় মাওলানা মোহাম্মদ আলী, সৈয়দ ওয়াজির হাসান এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর উদ্যোগে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয়, ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা মুসলিম লীগের লক্ষ্য। স্বাধীনতাকামী প্রগতিশীলদের সমাবেশ হওয়ার ফলে মুসলিম লীগ ক্রমশ গতিশীল হয়ে উঠে।

মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর অভ্যস্ত সৌজন্যের নীতি বর্জন করে ১৯১৩ সালের এপ্রিলে বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যরূপে ভাষণ

দানকালে এ কে ফজলুল হক বলেন- 'মুসলমানদের দাবীর প্রতি ক্রমাগত উপেক্ষা করে চললে বিপদের সম্ভাবনা আছে।... আমরা সরকারের বহু প্রস্তাবের মধ্যে প্রচুর আশ্বাসের কথা শুনেছি। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের বাস্তব সত্য যেরূপ মুসলমানদের উপকারে আসেনি।

ফজলুল হক আরো বলেন- 'আমি বঙ্গভঙ্গ রদের বিষয় উল্লেখ করে শুধু এটাই বুঝাতে চাচ্ছি যে, সময়ের ব্যবধান হলেও মুসলমানরা এমন কোন ব্যবস্থা মেনে নিতে পারেনা যার ফলে তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগতে পারে।' ফজলুল হকের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মুসলিম লীগে তারুণ্যের অগ্রযাত্রা শুরু হয়।

সর্বশেষ সতর্ক সংকেত

১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে কংগ্রেস ৬টি প্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। ১৯৩৭ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৯৩৯ সালের ১৫ই নভেম্বর/২২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় ক্ষমতাসীন ছিলো।

ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যে হিংস্রতা, যে বর্বরতা ও আদিম আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে ছিল সেটাই মুসলমানদেরকে তাদের অনিবার্য পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিল। কংগ্রেসী শাসনের অভিজ্ঞতা এমন এক উদ্দাম প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল যে, তারা ভারত ভেঙে পাকিস্তান অর্জন না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয়নি।

এই কংগ্রেসী শাসনামলে উপমহাদেশের মুসলমানরা যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল সেটাই পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মূল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। দু' বছর কাল স্থায়ী কংগ্রেসী মন্ত্রীসভার মেয়াদে ত্রিশটি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা অনুষ্ঠিত হয়। ফয়েজাবাদের টান্ডা নামক ছোট শহরে ৭০ জন মুসলমান পুলিশের গুলীতে নিহত হয়। ২শ' জন মুসলমানকে শিকল বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরানো হয়। এমনকি মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের দড়ি দিয়ে বাধা হয়। মধ্য প্রদেশের চাঁদপুরে চারশো মুসলমানকে দড়ি দিয়ে পা বেঁধে টেনে হেঁচড়ে আদালতে হাজির করান হয়। সরকারী কর্তৃপক্ষ ১৫০ জন নরনারী ও শিশুর বিরুদ্ধে

মামলা দায়ের করে। দু'জন মুসলমানকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং ২৪ জনকে দেয়া হয় দ্বীপান্তর।

এ সময় শেরে বাংলা ফললুল হক তার বিবৃতিতে বলেন- 'কংগ্রেসী নীতির দরুণ এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে অদলীয় সরকারসমূহ কর্তৃক আরোপিত বিধি নিষেধের বেড়া মারমুখো হিন্দুরা ভেঙ্গে ফেলেছে। মুসলিম সংখ্যালঘুদের ওপর তারা নিজেদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে। এই ইচ্ছা কি?... গোমাতাকে সম্মান দেখাতে হবে। মুসলমানদের গরুর গোস্ত খেতে দেয়া হবে না। মুসলমানদের ধর্মকে অবমাননা করতে হবে। কেননা এটা হিন্দুদের দেশ, সে কারণে আযান বারণ করা, নামাজের সময় মসজিদের সম্মুখে হৈহুল্লোর করা ও বাজনা বাজিয়ে মিছিল করে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ হচ্ছে। সুতরাং মর্মান্তিক ঘটনার পর মর্মান্তিক ঘটনা যদি ঘটে এবং দুধের নহরের পরিবর্তে রক্তের স্রোত যদি বয়ে যায় তাহলে বিস্ময়ের কি আছে?

স্টেটসম্যানের সম্পাদক আয়ান ষ্টিফেন লেখেন : যুক্ত প্রদেশ ও অন্যান্য স্থানের প্রাদেশিক মন্ত্রীরা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বাস্তাবায়িত করার বিষয়টা নিজেদের দৈনন্দিন কাজের অঙ্গীভূত করে নেন। এতে অহিন্দুদের মধ্যে বিরূপতা দেখা দেয়। মুসলমানদের ওপর সব রকম চাপ ও হয়রানী শোনা যেতে লাগল। স্কুলের ছাত্রদের হিন্দু পদ্ধতিতে জোড়হাতে মিঃ গান্ধীর প্রতিকৃতি পূজা করার ব্যবস্থা চালু করা হয়। বঙ্কিম চন্দ্রের আপত্তিকর উপন্যাসের বন্দে মাতরম সঙ্গীত ছাত্রদের গাইতে বলা হয়। গরুর গোস্ত খাওয়া বন্ধ করার জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা চলে। উর্দুভাষা ও বর্ণমালা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়। বড় বড় চাকুরিতে হিন্দুদের নিয়োগ করা হতে লাগল। দাঙ্গার সময় প্রশাসন হিন্দুদের পক্ষাবলম্বন করে।

কুপল্যান্ড লিখেছেন : কংগ্রেস পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক নীতি উপেক্ষা করে নিজেদেরকে পুরোপুরি ও চিরস্থায়ীভাবে জাতীয় সরকার হিসেবে গণ্য করতে শুরু করে। দুটো ছোটখাট ঘটনা থেকে এর প্রমাণ মেলে। প্রথমত ক্ষমতা লাভের সংগে সংগে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ পরিচালিত সংস্থাসমূহের ভবনের ওপর নিজেদের ত্রিবর্ণ পতাকা উড়ানো, এটা সংখ্যালঘুদের ওপর ছিল একটা চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। দ্বিতীয়ঃ আইন পরিষদের উদ্বোধনীতে বন্দেমাতরম সংগীত গাওয়া। এটাও সংখ্যালঘুদের ওপর ছিল একটা চ্যালেঞ্জ। আর এটা

ছিল অধিকতর আক্রমণাত্মক। কারণ বন্দে মাতরম সংগীতের কোন কোন ছত্রে ইসলামকে ক্ষুণ্ন করে হিন্দুধর্মকে উচ্চাসন দিয়েছে। ফলে মুসলিম সদস্যরা ওয়াক আউট করেন।

ডক্টর বেনী প্রসাদ লিখলেন: এর পরেই কংগ্রেসী সরকার বিদ্যামন্দির চালু করার ব্যবস্থা করলেন। কথাটা যে শুধু সংস্কৃত তা নয়, পরন্তু এর অর্থ হচ্ছে বিদ্যার মন্দির। মন্দির কথাটি মূর্তিপূজা বিরোধীদের নিকট আপত্তিকর। মুসলমানদের তীব্র বিরোধিতার মুখে কংগ্রেস এ ধরণের কর্মকাণ্ড চালু করেছিলেন বটে কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।... মুসলিম লীগ অনুভব করেছিল যে, সংখ্যালঘুদের সুযোগ সুবিধার প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠরা মোটেও মনোযোগ দিচ্ছে না। ১৯৩৭ সালেই মুসলমানরা নিজেদের ভবিষ্যত ভেবে শঙ্কিত হয়ে পড়ে।

এল এফ রাশ ব্রুক উইলিয়াম লিখলেন : কংগ্রেস শাসন থেকে সংখ্যালুঘুরা এই সত্যই উপলব্ধি করতে পারলো যে, প্রশাসনিক এমনকি শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচ তাদের রক্ষা করতে পারবে না। কেননা বিষয়টা শাসকগোষ্ঠীর মানসিকতার সাথে জড়িত। আর শাসক দল অপরাপর দলগুলিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে পরাজিত বলে মনে করে। তাছাড়া সমঝোতা বলে কোন শব্দ কংগ্রেসের ইতিহাসে আছে বলে মনে হয় না। কংগ্রেস কেবল নিজেকে প্রগতি প্রজ্ঞা ও দেশপ্রেমের সোলএজেন্ট বলে মনে করে।

জিন্নাহ বললেন, 'সামান্য ক্ষমতা হাতে পাওয়া মাত্রই শুরুতেই ক্ষমতাসীন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় এটাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছে যে, হিন্দুস্থান হচ্ছে হিন্দুদের জন্য।'

ফ্রাঙ্ক মরিয়মের মতে, নির্বাচনের পর যদি কংগ্রেস মুসলিম লীগের সাথে সতর্কভাবে ব্যবহার করত তাহলে হয়তো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হতো না।

আজন্ম লালিত বৈরিতা ও মুসলিম বিদ্বেষ পোষন করা সত্ত্বেও মুসলমানরা উপমহাদেশের স্বাধীনতার সৌজন্যে মৈত্রির দুটো হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতৃত্ব মুসলমানদের উদ্দেশ্যে কেবল নিক্ষেপ করে ঘৃণা ঘৃণা এবং ঘৃণা। স্বাভাবিকভাবে নিরাপত্তাহীন মুসলমানরা তাদের নিশ্চিত বিপর্যয় থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য নিজস্ব পথ এবং পদ্ধতির

তালাশ করে। দূরদর্শী বিচক্ষণ কায়দে আযম হিন্দু মুসলিম ঐক্যের সপক্ষে সংগ্রাম করে ব্যর্থ হন। হিন্দু ষড়যন্ত্রের গভীরতা আঁচ করে ফিরে আসেন তার আপন বলয়ে। উপমহাদেশের ১০ কোটি মুসলমানের চূড়ান্ত পরিণতির কথা ভেবে তিনি শিউরে উঠেন। অবশেষে তার অনুভূতির গভীর থেকে উৎসারিত চেতনার নির্যাস দিয়ে দ্বিজাতি তত্ব পেশ করেন। জাতি যেন এর প্রতীক্ষায় ছিল এতদিন। তার এ তত্ত্বের বাস্তবতা ঝড় তোলে টেকনাফ থেকে খাইবার পর্যন্ত। অভিন্ন এক চেতনার সেতু নির্মিত হয় এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। এখানে ভাষা উপেক্ষিত হয়। আঞ্চলিকতা উপেক্ষিত হয়। শ্রেণী উপেক্ষিত হয়। উপমহাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি মুসলমান একই চেতনার প্লাবনে ভেসে যায়।

পণ্ডিত নেহেরু যখন কোলকাতায় ঘোষণা করলেন, আজকের ভারতে মাত্র দুটো শক্তি রয়েছে একটি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ অন্যটি কংগ্রেস। জিন্নাহ এর জবাব দিলেন, না দুটো নয় আর এক তৃতীয় শক্তি রয়েছে সেটা হল ভারতের ১০ কোটি মুসলমানের প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ।

১৯৪০ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী হিন্দু ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বললেন : সেটা যদি আপনারা আজও বুঝে না থাকেন তাহলে আমি বলি আপনারা কখনও বুঝবেন না।... গ্রেট বৃটেন ভারত শাসন করতে চায়। মিঃ গান্ধী ও কংগ্রেস ভারত ও মুসলমানদের শাসন করতে চান। আমরা বলি বৃটিশ অথবা মিঃ গান্ধীকে মুসলমানদের ওপর শাসন করতে দেব না।

৬ই মার্চ বললেন... 'যদি বৃটিশ সরকার মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী কোন প্রকার সমঝোতা কংগ্রেসের সংগে করে আমরা তা টিকতে দেব না।

নবম অধ্যায়

পাকিস্তান প্রস্তাব ও মুসলমানদের নবযাত্রা

হিন্দুদের বৈরিতা ও সংঘাতপূর্ণ ঘটনা প্রবাহের মধ্যে মুসলমানদের চেতনায় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ঐক্যবদ্ধ চেতনাই ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ পাকিস্তান প্রস্তাব হিসেবে প্রকাশ পায়। লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলনে শেরে বাংলা ফজলুল হক এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবের তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয় : ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সীমানা সুসামঞ্জস্য করে এ সকল অঞ্চল এমনভাবে নির্দিষ্ট করতে হবে যাতে ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে সকল স্থানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সকল অঞ্চলসমূহকে যেন স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা যায় এবং এই রাষ্ট্র গঠনকারী অংশসমূহ স্বায়ত্ব শাসিত ও সার্বভৌম হবে।

কংগ্রেসের দাবী ছিল প্রথমত কংগ্রেসই ভারতবাসীর একমাত্র প্রতিনিধিত্বশীল প্রতিষ্ঠান দ্বিতীয়ত স্বাধীন ভারত হবে অখন্ড। কংগ্রেসের এই দাবীকে মুসলিম লীগ চ্যালেঞ্জ করে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চাইল মুসলমান ভারতের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ। ডিপি মেনন লিখেছেন- 'মুসলিম লীগ ইতিপূর্বে ঘোষণা করেছিল যে, পাকিস্তানের প্রশ্নে এবং মুসলিম লীগই যে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান এই দাবীতে তারা নির্বাচনী সংগ্রামে অবতীর্ণ হচ্ছেন, জিন্নাহ ও লীগের অন্য মুখপাত্রগণ ঘোষণা করেন যে, তাদের লক্ষ্য হচ্ছে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বাংলা ও আসাম প্রদেশগুলির সমন্বয়ে সামগ্রিকভাবে পাকিস্তান নামক একটি স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই দাবীর প্রেক্ষিতে ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনে ৩০টি মুসলিম আসনের ৩০টিতে বিজয়ী হয় মুসলিম লীগ। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের ৪৯৫টি আসনের মধ্যে ৪৩৪টি আসনে জয়লাভ করে মুসলিম লীগ। ওয়াল ব্যাঙ্ক লিখছেন- 'জিন্নাহর প্রতিষ্ঠান যে ভারতের জনগণের মুখপাত্র এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ রইল না।'

১৯৪৬ সালে ৯ই এপ্রিল ৪৭০ জন মুসলমান পরিষদ সদস্যবর্গের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সর্বসম্মাতিক্রমে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয় : ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতের উত্তর পূর্ব অঞ্চলের বাংলা ও আসাম এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সিন্ধু ও বেলুচিস্তান অঞ্চলসমূহ যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেগুলোর সমন্বয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র করা হোক এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দ্ব্যর্থহীন প্রতিশ্রুতি অবিলম্বে দেয়া হোক। লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল দলীয় সম্মেলনে, যেখানে বলা হয়েছিল উপমহাদেশে এক বা একাধিক মুসলিম রাষ্ট্রের কথা। কিন্তু দিল্লীতে গৃহীত এক পাকিস্তানের প্রস্তাব অধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। কেননা একদিকে দিল্লী সম্মেলন দলীয় সম্মেলন অন্যদিকে একে বলা চলে মুসলমানদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্মেলন। এ সম্মেলনের এক পাকিস্তান গঠনের পরিকল্পনা দ্বারা আগের প্রস্তাবের আংশিক নাকচ হয়ে যায়।

বাংলা বিভক্তির ষড়যন্ত্র

১৯৪৭ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারী বৃটিশ সরকার ভারত ত্যাগ ও ভারত বিভাগের সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করে। এই ঘোষণার পর পরই কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক চক্র ও হিন্দু মহাসভার বর্ণহিন্দুরা বাংলার ভবিষ্যতের ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে ওঠে। বাংলা বিভাজনের ষড়যন্ত্র শুরু হয়। প্রকাশ্য জনমত গঠনের জন্য হিন্দু নেতৃবৃন্দ মাঠে নেমে পড়ে এবং এনিয়ে নেপথ্য প্রাসাদ ষড়যন্ত্র শুরু হয়। হিন্দু মহাসভার নেতা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ২৩শে ফেব্রুয়ারী বাংলার গর্ভনর বারোদের সাথে সাক্ষাতের পর সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন। এতে বলা হয়, মুসলমানদের জন্য যদি ভারত বিভক্ত হয় তাহলে হিন্দুদের জন্য বাংলা বিভক্ত হতেই হবে। এই বিবৃতি দানের মাধ্যমে শতাব্দীর গোড়ার দিকে বর্ণহিন্দুদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী চেতনা সাম্প্রদায়িকতার শানিত ছুরি দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হল। তারপর তারা নব আঙ্গিকে নতুনরূপে নতুন ষ্ট্রাটেজীতে বাংলাকে খণ্ডিত করার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। অবশ্যি বঙ্গভঙ্গ বিরোধিতা এবং বাংলাকে খন্ডিত করার আন্দোলনের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য মোটেও ছিল না। নতুন বোতলে

সাম্প্রদায়িকতার পুরাতন মদ। দুটোতে একই সত্য বিদ্যমান ছিল, ছিল মুসলিম বিদ্বেষ, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উন্মাদনা।

বাংলা খণ্ডিত হল বর্ণ হিন্দু ষড়যন্ত্রে

কায়েদে আযমের অক্লান্ত পরিশ্রম, তার সদিচ্ছা ও ক্ষুরধার যুক্তির প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী ভারত বিভক্তির প্রশ্নটি যখন চূড়ান্ত হল, তখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী অখণ্ড বাংলার স্বাধীনতার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠলেন। শরত বসু তার সমর্থনে এগিয়ে এলেন। মুসলিম ভারতে অবিসংবাদিত নেতা কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আপত্তি না জানিয়ে স্বাগত জানালেন। কিন্তু বর্ণ হিন্দুরা বাংলা বিভাজনের জন্য তৎপর হয়ে উঠল। হিন্দু মহাসভার নেতা ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী ২৩ ফেব্রুয়ারী এক বিবৃতিতে বললেন- 'মুসলমানদের জন্য যদি ভারত বিভক্ত হয় তাহলে হিন্দুদের জন্য বাংলা বিভক্ত হতেই হবে। ৫ই এপ্রিল তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা সম্মেলনে স্বতন্ত্র হিন্দু বাংলা গঠনের জন্য ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। বাংলা কংগ্রেসের ডাঃ বিধান চন্দ্র রায়ের দলভুক্ত নেতা ও কর্মীরা বাংলা বিভাগের দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠে। প্রবল ইঙ্গহিন্দু বিরোধিতার মুখে বাংলার অখণ্ডতা রক্ষার শেষ প্রয়াস হিসেবে বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্যদের বৈঠক আহবান করা হয়।

১৯৪৭ সালের ২০ জুন বিধানসভার হিন্দু ও মুসলমান সদস্যদের যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বড়লাটের পার্সোনাল রিপোর্ট নং ১০ (২৮ শে জুন) মোতাবেক এই সভায় ১২৬ জন সদস্য এইমর্মে এক প্রস্তাবের সপক্ষে ভোট দেন যে, বাংলা অখণ্ড থাকবে এবং পাকিস্তানে যোগ দেবে। প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট পড়ে ৯০টি। একই দিন বঙ্গীয় বিধান সভার মুসলমান ও হিন্দু সদস্যরা পৃথক বৈঠকে মিলিত হন। মুসলিম সদস্যদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জনাব নূরুল আমীন এবং হিন্দু সদস্যদের বৈঠকে উদয়চাঁদ মেহতা। হিন্দুদের বৈঠকে ৫৮ জন সদস্য বঙ্গ ভঙ্গ এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহের ভারতের সাথে যোগদেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মুসলিম সদস্যরা পুনর্বার অখণ্ড বাংলার পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন। তবে ১০৫ জন সদস্য এইমর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, যদি বাংলাকে হিন্দুদের

অনমনীয় ভূমিকার জন্য ভাগ করতেই হয় তাহলে পূর্ববঙ্গ আসামের সিলেটসহ পাকিস্তানে যোগদান করবে। (খণ্ডিত বাংলাদেশ, দৈনিক ইনকিলাব ১ জানুয়ারী, ১৯৯১)

কিন্তু শেষ অবধি অখণ্ড বাংলার স্বপ্ন হিন্দুর ষড়যন্ত্রের কারণে অর্জিত হল না। এমনকি আসামও যুক্ত হল না পূর্ববাংলার সাথে।

কোলকাতা নিয়ে বৃটিশ হিন্দু ষড়যন্ত্র

যেহেতু পূর্ব বাংলায় কোন বন্দর ছিল না। পূর্ব বাংলার আমদানী রপ্তানীর জন্য কোলকাতা উভয় রাষ্ট্রের জন্য উন্মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। এছাড়াও পূর্ব বাংলার কাঁচা মালের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল কোলকাতার শিল্প বিশেষ করে জুট মিলগুলো। এজন্য উন্মুক্ত বাজার হিসেবে কোলকাতা উন্মুক্ত থাকা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয় ছিল কিন্তু সেটা হতে দিল না বৃটিশ এবং বর্ণ হিন্দুরা যৌথভাবে। জিন্নাহর দাবী ছিল অবিভক্ত বাংলা ও আসাম স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হবে। এ দাবী যখন অগ্রাহ্য হল তখন কোলকাতাসহ পূর্ববঙ্গ ও আসাম এবং একটি করিডোর চেয়েছিলেন। যাতে করে পূর্ব ও পশ্চিমের সংযোগ রক্ষা করা যায়। যখন এটাও অগ্রাহ্য হল তিনি চাইলেন পূর্ববঙ্গের সাথে কোলকাতা। জিন্নাহর ভাষায় 'কোলকাতা বিহীন পূর্ববঙ্গ নিয়ে কি করব?' সর্বশেষে তিনি কোলকাতায় গণভোট দাবী করলেন, যদিও কোলকাতার মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ মুসলমান ছিল। কিন্তু তার ভরসা ছিল তফসিলি সম্প্রদায় যা মোট জনসংখ্যার অর্ধেক। গণভোট হলে তারা পাকিস্তানের সপক্ষে ভোট দেবে। তার এই প্রচেষ্টাকেও ইংরেজ ও হিন্দুচক্র বানচাল করে দেয়। অতঃপর দাবী করা হয় কোলকাতাকে ফ্রি সিটি হিসেবে বহাল রাখার। কিন্তু সেটাও অগ্রাহ্য হল। সোহরাওয়ার্দী অনুরোধ করলেন, বাংলা বিভাগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েই গেছে তখন কোলকাতাকে মুক্ত শহর হিসেবে থাকতে দেয়া হোক। যদি এটাও সম্ভব না হয় অন্তত ৬ মাসের জন্য কোলকাতাকে মুক্ত রাখা হোক। এ ব্যাপারে ভাইসরয় কংগ্রেসের মতামত জানতে চাইলে প্যাটেল বলেন, Not even for six hours. এখানে ভাইসরয় কোন ভূমিকা নেননি। নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার আগেই সুনির্দিষ্ট সংলাপের রিহার্সাল দেয়া হয়েছে অনেক দিন ধরে।

পাকিস্তান দাবীর প্রেক্ষিতে হিন্দু নেতৃবৃন্দ

স্বাধীন ভারতের স্থপতি ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহারলাল নেহেরু বলেনঃ পরিণাম যাই হোক কংগ্রেস কখনও পাকিস্তানের দাবী স্বীকার করবে না। (স্টেটসম্যান, ১৬ এপ্রিল, ১৯৪৭)

হিন্দু ভারতের আপোষহীন নেতা স্বাধীন ভারতের ডিপুটি প্রধানমন্ত্রী সরদার প্যাটেল বলেনঃ পাকিস্তানের বিষয়ে কংগ্রেস কখনও আপোষ করতে পারে না। (প্রাগুক্ত)

অহিংসনীতির অবতার ভারতের জাতির পিতা করমচাঁদ গান্ধী বলেনঃ সারা ভারত যদি জ্বলতে থাকে তাহলেও আমরা পাকিস্তান দেব না, এমনকি মুসলমানরা যদি তলোয়ারের মুখে দাবী করে তাহলেও না। (প্রাগুক্তঃ ৩০ শে ১৯৪৭)

সম্ভাবনাহীন ভুখণ্ড নিয়ে পাকিস্তানের যাত্রা শুরু

অখণ্ড ভারত কেন্দ্রিক চূড়ান্ত স্বাধীনতা দানের উদ্দেশ্য নিয়েই লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভাইসরয়ের দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কায়েদে আযমের অনমনীয় মনোবৃত্তি এবং আপোষহীন নেতৃত্বের বলিষ্ঠ যুক্তির কাছে পরাজিত হয়ে ষড়যন্ত্রকারী লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন হিন্দু নেতৃত্বের সহযোগিতায় এমন একটি 'কাটা- ছেঁড়া পোকায় খাওয়া পাকিস্তান' দিলেন যা নিজস্ব অর্থনৈতিক বৃত্ত রচনা করতে সক্ষম হবে না, যা দুনিয়ার বুকে স্বনির্ভর হয়ে কোন দিনও দাঁড়াতে পারবে না। অখণ্ড ভারতে বিশ্বাসী মাউন্ট ব্যাটেনের ধারণায়- 'ভবিষ্যতের পাকিস্তান প্রকৃতিগতভাবেই হবে ক্ষণস্থায়ী। নিজের অন্তর্নিহিত গলদের দরুন, তাকে ধ্বংস হবার সুযোগ দিতে হবে। পরিণতিতে যাতে মুসলমানরা অখণ্ড ভারতের পথে ফিরে আসে।'

ভাইসরয় আরো বলেন- 'পূর্ব বাংলার সাথে সিলেট থাকলেও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সেটা টেকসই হবে না এবং ধীরে ধীরে ধ্বংস হতে বাধ্য হবে। (Freedom at Midnight, P-114)'

তার ভাষায়ঃ যেভাবে পাকিস্তান দেয়া হল তাতে সিকি শতাব্দীর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাবে। (Freedom at Midnight, P-127)

হিন্দু নেতৃবৃন্দেরও ধারণা ছিল অনুরূপ। একারণে বাংলার সবকটি সম্ভাবনাহীন এলাকা পূর্ব বাংলা অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে বরাদ্দ করে।

যে ভূখণ্ড উন্নত নয় এমন সম্ভাবনাহীন ভূখণ্ড নিয়েই পাকিস্তান যাত্রা শুরু করে নিয়তির উপর নির্ভর করে।

হিন্দু নেতৃবৃন্দের প্রত্যাশা

প্যাটেল মনে করেছিলেন, পাকিস্তান গ্রহণ দ্বারা মুসলিম লীগকে তিক্ত শিক্ষা দেয়া হবে। অল্পদিনের মধ্যে পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাবে এবং বিচ্ছিন্ন প্রদেশগুলিকে অকথ্য অসুবিধা ও দুর্ভোগে পড়তে হবে।

প্যাটেল তার বন্ধু কাণ্ডী দ্বারকাদাসকে এক পত্রে বলেন- 'পূর্ববঙ্গ, পাঞ্জাবের একাংশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান বাদেও ভারতের কেন্দ্র এত শক্তিশালী হবে যে বাকী অংশ (পাকিস্তানের এলাকাসমূহ) অবস্থার গতিতে আবার ফিরে আসবে ভারতে।' নেহেরুর প্রত্যাশা ধ্বনিত হয়েছে ভাইসরয়ের ৩১শে মের 'In this opinion Eastern Bengal was likely to be a great embarrassment to Pakistan. Presumably Pandit Nehru considered that eastern Bengal was bound sooner or later to rejoin India' অর্থাৎ 'তার মতে পূর্ববাংলা পাকিস্তানের জন্য একটি বিরাট বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি করবে। সম্ভবতঃ পণ্ডিত নেহেরু ধারণা করেছিলেন যে, আজ হোক আর কাল হোক পূর্ববাংলাকে আবার ভারতে যোগদান করতে হবেই।'

কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট আচার্য ক্রিপালিনী বললেন : খণ্ডিত মাতৃভূমিকে একত্রীকরণের জন্য আমাদের সব রকম শক্তি ও সামর্থকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে।

পণ্ডিত নেহেরু বললেনঃ ভারতের হৃদয় ভাঙ্গলেও এর একত্রীকরণ সম্ভাবনা ধ্বংস হয়নি।

সরদার প্যাটেল বললেনঃ ভারত বিভাগের যদিও সিদ্ধান্ত হয়েছে কিন্তু এখনও এটা অবাস্তব পরিকল্পনা... ভারত একক এবং অখন্ড একটি দেশ। কেউ সাগরকে অথবা প্রবাহমান জলরাশিকে স্বতন্ত্র করে রাখতে পারে না।

গান্ধীর ধারণায় বিভক্ত ভারত পুনরায় অখণ্ড ভারতে পরিণত হবে। তার ধারণায় মুসলিম লীগই ভারতের সাথে পাকিস্তানের সংযুক্ত হওয়ার কথা বলবে। তারা নেহেরুকে ডাকবে এবং নেহেরু তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

সক্রিয় সাম্প্রদায়িক সংগঠনসমূহ যেমন হিন্দু মহাসভা, স্বয়ং সেবক সংঘ এবং সংখ্যালঘু অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলন সীমান্তরেখা নির্মূল করতে দাবী জানাল এবং শক্তি প্রয়োগ করে পূর্ববাংলাকে ভারতের অংশে পরিণত করতে অথবা অর্থনৈতিক চাপের সম্মুখীন করার পরামর্শ দিল।

কেথ কেলার্ড বলেন- 'ভারতীয়দের অনেকে মনে করেন পাকিস্তানের সৃষ্টিটাই হল এক বেদনাদায়ক ভ্রান্তি। এই ভুলের সংশোধন হওয়া দরকার। অন্তত পূর্ব পাকিস্তানের ভারতে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারটা তারা চিন্তা করে থাকেন।

...পাকিস্তানীদের জীবনকে দুঃসহ করে তোলার জন্য ভারত সবরকম উদ্যোগ নিয়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম বাংলার সাথে সংযুক্ত করার ব্যাপারে পশ্চিম বাংলার নেতৃবৃন্দের আগ্রহের কারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুটোই। তারা আশা করে যে সীমান্ত রেখা মুছে ফেলা সম্ভব হলে পূর্ব বাংলায় তাদের আধিপত্য কায়েম হবে এবং শিল্প কারখানার জন্য কাঁচামালের বাজার হবে অবারিত।

দিল্লীর সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানকে খন্ডিত ভারতের মানচিত্র সংযুক্ত করে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে তারা সুপরিকল্পিতভাবে তাদের তৎপরতা শুরু করে।

দশম অধ্যায়

বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা

তৎকালীন বিভাগোত্তর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কি দারুণ সংকটের মধ্যে ছিল সেটা কুম্যুনিষ্টদের একটি গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত এবং উত্তেরাধিকার সূত্রে পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে কি প্রাপ্তিযোগ হয়েছিল তা ভারত বর্ষ তথা বাঙ্গালা বিভক্তির পর তৎকালীন পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গ প্রদেশ (বর্তমান বাংলাদেশ) সে সময় (১৯৪৭) কি-কি ভাগে পেয়েছিল তার একটি মোটামুটি ধারণা অবশ্যই শ্রমিক শ্রেণীর জানা থাকা দরকার।

পূর্ববঙ্গ পেয়েছিল ৪ কোটি ২০ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত ৫৪,৫০১ বর্গমাইল এলাকা। আর এজনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশই ছিলেন আধা-সর্বহারা বা সর্বহারা।

এখানকার অধিকাংশ জমিদারই ছিলেন হিন্দু-সম্প্রদায়ের। ধনশালী আর সম্পদশালী ছিলেন তাঁরাই। পূর্ববঙ্গের বড় ব্যবসায়ী ও মহাজন প্রায় সবই হিন্দু-সম্প্রদায়েরই ছিলেন। তাঁদের বৃহৎ অংশই অর্থাৎ ধন-সম্পদশালীদের প্রায় সবই যা কিছু গড়েছিলেন বা বিনিয়োগ করেছিলেন তার প্রায় সবই কলিকাতা ও হুগলী ভিত্তিক এবং বাঙ্গালা বিভক্তির পর তাঁরা পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে যাওয়ার ফলে তাদের পুঁজি-সঞ্চিত অর্থসহ অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী সবই ভারতে চলে যায়। জ্ঞান চক্রবর্তী তাঁর "ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ" বইয়ের ১৩১ পৃষ্ঠায় বলেছেন, "ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রকে হিন্দু জনসাধারণ প্রথম হইতেই আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। ফলে দেশ বিভাগের পরেই হিন্দুরা ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ শুরু করে। হিন্দু সরকারী কর্মচারীরা প্রায় সকলেই অপশনের ব্যবস্থা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া যায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরাও, বিশেষ করিয়া আর, এস, পি, ও ফরোয়ার্ড ব্লকের লোকেরা তাহাদের পরিবারসহ দেশত্যাগ করে।"

ঐ পর্যায়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের হাতে মূলতঃ তেমন কোন মূলধন ছিল না। এমনকি এ অঞ্চলের একমাত্র অর্থকরী ফসল পাট ব্যবসাটিও

মূলতঃ হিন্দু মাড়ওয়ারীদের হাতেই ছিল। তারা আবার মুনাফার টাকাটা ভারতেই বিনিয়োগ বা স্থানান্তরিত করতেন।

পূর্ববঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই প্রতিষ্ঠিত ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বারা। তাই কয়েক হাজার সম্পদশালী হিন্দু পরিবার পূর্ববঙ্গ থেকে চলে যাওয়ার ফলে শুধু যে পূর্ববঙ্গের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছিল তাই নয়, এখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও মারাত্মকভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল।

সে বিপর্যস্ত অর্থনীতির পাশাপাশি ভারত থেকে আসতে থাকল লক্ষ লক্ষ নিঃস্ব বাস্তুত্যাগী মানুষের ঢল যার সংখ্যা সরকারী হিসেবেই সাত লক্ষ বলে বলা হল।

পুর্ববঙ্গের ভাগে চাষযোগ্য জমি পড়েছিল সর্বমোট দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ একরের মত, যার মধ্যে ঐ সময়কালে এক কোটি আশি লক্ষ একরের মত চাষ করা সম্ভব হত; আর এর মধ্যে আঠার লক্ষ একরের মত পাট চাষযোগ্য জমি ছিল। অর্থকরী ফসল বলতে ছিল একমাত্র পাট। কিন্তু বাঙ্গালার ৬৮,২৫৮টি তাঁত সম্বলিত ১১৩টি পাটকলের মধ্যে একটি পাটকলও পূর্ববঙ্গের মাটিতে ছিল না। আর এখানে খাদ্যশস্য যা উৎপন্ন হত তা আবার এই প্রদেশের জনসংখ্যার প্রয়োজনের তুলনায় ছিল কম; তাই ছিল খাদ্য ঘাটতি সমস্যা।

শিক্ষার দিক থেকে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা পিছিয়ে ছিলেন যথেষ্ট পরিমাণে। তাই চাকুরীর ক্ষেত্রেও এখানকার হিন্দু সম্প্রদায়ই অগ্রগামী ছিলেন; তাদের মধ্যকার সক্ষম অংশও তখন ভারতে চলে গেলেন। এ প্রসঙ্গে একটি মাত্র উল্লেখ থেকেই তখনকার পূর্ববঙ্গের বাকি অবস্থাটা বুঝতে পারা যাবে তাহল এই যে, সে সময় সুপেরিয়র সিভিল সার্ভিসে এখানকার মাত্র একজন নমিনেটেড মুসলমান কর্মচারী ছিলেন।(এর ফলে যে প্রশাসন যন্ত্র পূর্ববঙ্গের জনগণের উপর চেপেবসে তা গঠন করতে হয় পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের লোক ও বাস্তুত্যাগীদের মধ্য থেকেই।)

খনিজ সম্পদ বলতে পূর্ববঙ্গ কিছুই পায়নি। তবে এখানে মৎস্য সম্পদ ছিল। আর ছিল দুই লক্ষ হস্তচালিত তাঁত।

বন সম্পদ যা পাওয়া গিয়েছিল তা রাজেন্দ্র প্রসাদ- এর 'ইন্ডিয়া ডিভাইডেড' বইয়ের ২৯০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত তথ্যই যথেষ্ট। তিনি বলেছেনঃ "ঐ সময়ের (বিভাগপূর্ব) সমস্ত বাঙ্গালার ৬,৫৮,০৩৩ টাকা সরকারী রাজস্ব আয়ের বনাঞ্চলের মধ্যে যে অংশ পূর্ববঙ্গের ভাগে পড়ে তার সরকারী রাজস্বের পরিমাণ ছিল মাত্র ২,০০,০০০ টাকার কিছু উপরে। আর পশ্চিমবঙ্গে পেয়েছিল ৪,৫০,০০০ টাকা রাজস্ব আয়ের বনাঞ্চল।"

অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের ভাগে বনসম্পদ পড়েছিল রাজস্ব আদায়ের অনুপাতে সমগ্র বাঙ্গলার বন সম্পদের ১৩ ভাগের ৪ ভাগ মাত্র।

পুর্ববঙ্গের স্থলপথ ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। তেমন উল্লেখযোগ্য পরিমাণের পাকা রাস্তা এখানে ছিল না। তবে রেলপথ উন্নত ছিল এবং রেলপথ পাওয়া গিয়েছিল ১,৬১৯ মাইল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই রেলপথগুলি খুব বেশী ব্যবহারের ফলে ইঞ্জিন ও গাড়ী যা পাওয়া গিয়েছিল তার অবস্থা প্রায় ভগ্নদশায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

শিল্প বলতে যা বুঝায় তা পূর্ববঙ্গের ভাগে যা পড়েছিল তা অতি নগণ্য- তেমন উল্লেখযোগ্য শিল্প এখানে স্থাপিত ছিল না। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর আর, কুপল্যান্ড- এর খতিয়ানটি উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর The future in India (ভারতের ভবিষ্যৎ) বইয়ের ৯৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, "বৃটিশ ভারতের শতকরা ২০ ভাগ লোকের বাস বাঙ্গলায় এবং শিল্প শ্রমিকের সংখ্যার হিসেবের অনুপাতে বৃটিশ ভারতের শিল্প মাত্র ২.৭ শতাংশ।"

অর্থাৎ বৃটিশ ভারতের সমগ্র শিল্পের মধ্যে বাঙ্গালায় ছিল ৩৩ শতাংশ শিল্প। তার মধ্যে পূর্ববঙ্গ পেল ঐ ৩৩ শতাংশের মধ্যে মাত্র ২.৭ শতাংশ, আর বাকি ৩০.৩ শতাংশ শিল্পের অধিকারী হল ভারতভুক্ত পশ্চিবঙ্গ। তাছাড়া বৃটিশ ভারতের সমগ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির মধ্যে মাত্র ৩ শতাংশ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র পড়েছিল সমগ্র পাকিস্তানের ভাগে।

রাজেন্দ্র প্রসাদ 'ইন্ডিয়া ডিভাইডেড' বইয়ের ২৯৫- ২৯৬ পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা হলঃ পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর- পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু (অর্থাৎ তদানিন্তন পাকিস্তান- লেখক) অংশে

বৃটিশ ভারতের ২৬.৭ শতাংশ লোকের বাস ছিল; কিন্তু এ সকল অঞ্চলে সম্মিলিতভাবে শিল্পের অবস্থান বৃটিশ ভারতের মাত্র ১৩.৯ শতাংশ। আর বৃটিশ ভারতের শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে মাত্র ৭.৩৬ শতাংশ শ্রমিক এ সকল অঞ্চলের (অর্থাৎ তদানিন্তন সমগ্র পাকিস্তান- লেখক) শিল্পে নিযুক্ত ছিল।

আদতে শিল্পের দিক থেকে পূর্ববঙ্গ পরিপূর্ণভাবেই অবহেলিত ছিল। এমনকি বিখ্যাত রাজনীবিদ এ, কে, ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং খাজা নাজিমুউদ্দীনও এক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য অবদানের অধিকারী হতে পারেননি।

পূর্ববঙ্গে কি- কি শিল্প তখন ছিল না বা পশ্চিমবঙ্গে কি- কি শিল্প পড়ল তা বলে বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। শুধু পূর্ববঙ্গ তখন শিল্প বলে যা পেয়েছিল তাই এখানে উল্লেখ করছি আর তা হল :

১. ৫০,০০০ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি মাত্র সিমেন্ট ফ্যাক্টরী ছাতকে।

২. ৭টি কাপড়ের কল ২৬০০ লুম ও ১,১২,০০০ স্পিন্ডল সম্বলিত।

৩. ৫টি চিনির কল।

৪. ৩৫ থেকে ৪০টির মত জুট বেলিং প্রেস।

৫. ৬০/৬৫টি ধান ভাঙ্গান কল।

৬. ছোট ছোট কয়েকটি ছাপাখানা।

৭. ছোট- খাট কয়েকটি ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ ও ডক।

৮. মাত্র ৭,৭০০ একরের চা বাগান।

৯. সৈয়দপুর ও পাহাড়তলীতে শুধু মেরামতযোগ্য দু'টি রেলওয়ে ওয়ার্কশপ।

১০. ছোট ছোট ৪টি ম্যাচ (দিয়াশলাই) কারখানা।

এর বাইরে উল্লেখ করার মত আর কোন শিল্প পূর্ববঙ্গের ভাগে পড়েনি। পূর্ববঙ্গ আর যা পেয়েছিল তা হল :

(ক) মাত্র ৭২৮৬ কিলোওয়াট বিদ্যু উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।

(খ) নদী পথে চলাচলের জন্য যাত্রীবাহী কিছু জাহাজ ও লঞ্চ ছিল।

(গ) নদী পথে মাল চলাচলের জন্য বার্জ, ফ্লাট, স্টিমার ও টাগ প্রভৃতি ছিল।

(ঘ) সে সময়কালে বছরে মাত্র ৫ লক্ষ টনের মত মাল হ্যান্ডলিং করার ক্ষমতাসম্পন্ন চট্টগ্রাম বন্দর।

(ঙ) ঢাকায় একটি ছোট বিমান ঘাটি ছিল এ প্রসঙ্গে আর উল্লেখ করার মত কিছু পূর্ববঙ্গ পায়নি।'

অনেক টানা- পোড়নের পর বৃটিশ এবং কংগ্রেস শর্ত সাপেক্ষে পাকিস্তান প্রস্তাব মেনে নিতে সম্মত হল। শর্ত ছিল বাংলা এবং পাঞ্জাবের বিভক্তি। তৎকালীন বাংলার প্রধান মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং তার সহকারীরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পূর্ব বাংলা টেকসই হবে না ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। অন্য সব সংকট বাদ দিলেও শুধু মাত্র খাদ্য ঘাটতি পূর্ব পাকিস্তানকে বিপন্ন করবে এমন একটা ধারণা তখন বিরাজ করছিল। তাদের স্থির বিশ্বাস ছিল পূর্ব পাকিস্তান টিকবে না। পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্যে তারা মরিয়া হয়ে অবিভক্ত বাংলার দাবীতে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। এমনকি উপমাহাদেশের মুসলমানদের প্রাণের দাবী পাকিস্তানের বাইরে অবস্থান নিয়ে হলেও যুক্ত বাংলার দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। তার উদ্বেগের পেছনে যথেষ্ট কারণ ছিল, মাউন্ট ব্যাটেন পূর্ব বাংলাকে সম্ভাবনাহীন অজ গ্রাম হিসেবে উল্লেখ করেছেন। এই দুর্বহ বোঝা স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নেয়ার জন্য তিনি জিন্নাহর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন (Mountbatten paper file –196)| মাউন্ট ব্যাটেনের আগে বাংলার গভর্নর আর জি ক্যাসী এই ভীতি আর উদ্বেগের প্রশ্নটি ব্যাপক প্রচার করে বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দকে পাকিস্তানের দাবী থেকে সরে আসতে এবং অবিভক্ত ভারতের পক্ষে সমর্থনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন।

সূচনা পর্বে পূর্ব পাকিস্তানের অবকাঠামো শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুপযোগী ছিল তা নয়, রাজধানীর উপযোগী একটি শহরও ছিল না। পূর্ব বাংলা ছিল অশিক্ষিত পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী সমৃদ্ধ। প্রশাসনিক ও

টেকনিকালী অদক্ষ মানুষে পূর্ণ ছিল পূর্ব বাংলা। এখানে তেমন কোন শিল্প গড়ে উঠেনি। একটিও পাটকল অথবা হাইড্রোলিক জুট প্রেসিং ছিল না। শুধু মাত্র ৫টি কটন মিল এবং ৪টি সুগার মিল ছিল। এসবের মালিক এবং পরিচালক সকলেই ছিল হিন্দু। (এস মুজিবুল্লাহ, নতুন সফর, এপ্রিল ১৯৯৬)। পূর্ব বাংলার আয়ের প্রধান উৎস ছিল কাঁচা পাট। যা দিয়ে ৯ কোটি টাকা বার্ষিক আয় হতো। কিন্তু পাটের বাণিজ্য পুরোটাই ছিল হিন্দু মাড়োয়ারীদের হাতে। এরা তাদের লভ্যাংশ ভারতে পাচার করতো। এটা সত্য যে কোলকাতার পাটকলগুলো পূর্ব বাংলায় উৎপাদিত পাটের প্রধান ক্রেতা ছিল এবং বিশ্ব বাজারে পাট রপ্তানী হতো কোলকাতা বন্দর দিয়ে। যে কারণে পাট থেকে বাংলার মূল আয়ের পুরোটাই নির্ভর করত দিল্লীর মেজাজ মর্জির উপর। স্বাধীনতা উত্তর প্রাথমিক পর্যায়ে বাণিজ্য বিষয়ে পাকিস্তানী প্রতিপক্ষের সাথে আলাপ আলোচনাকালে ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিনিধিরা স্পষ্টতই জানিয়ে দেয় আপনারা পাট নিয়ে কি করবেন আমাদের কাছে পাট বিক্রি ছাড়া আপনাদের ভিন্ন কোন পথ নেই। এসব আপনারা পুড়িয়ে ফেলুন অথবা বঙ্গপোসাগরে নিক্ষেপ করুন।'

শুরুতে এই প্রদেশে মাত্র ৫ কিলোমিটার শক্তি সম্পন্ন বেতার কেন্দ্র ছিল। একটি দৈনিক পত্রিকা ছিল না। কোন প্রকাশনা শিল্প, আধুনিক ছাপাখানা এমন কি ব্লক তৈরীর কোন ব্যবস্থাও ছিল না। যখন দৈনিক সংবাদ পত্র প্রকাশ হল তখন করাচী থেকে ব্লক তৈরী হয়ে বিমানে ঢাকায় আনা হতো। পূর্ব বাংলায় তখন ১০,৭০০ কিলোমিটার বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো। শহরের ৮০ শতাংশ সম্পত্তির মালিকানা ছিল হিন্দুদের এবং এখানকার ৮০ শতাংশ সম্পদের মালিকও ছিল হিন্দু।

শিক্ষার সম্পূর্ণটাই ছিল হিন্দুদের দখলে। প্রায় সবকটি হাই স্কুল এবং কলেজ হিন্দুদের অর্থানুকুল্যে এবং তাদের দ্বারাই পরিচালিত হত। উচ্চ শিক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য। ১৯৪৭ সাল অবধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্র সংখ্যা ছিল অত্যল্প এবং মুসলিম শিক্ষকের সংখ্যা ছিল অনুল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজশাহী কলেজের অবস্থা এর চেয়ে উত্তম ছিল না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের প্রাধান্য ১৯৫০ সাল অবধি একই রকম বিরাজ করছিল। এদের

পরীক্ষা নেওয়া হতো কোলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ে। এই প্রদেশে প্রশাসনিক জ্ঞান সম্পন্ন জনশক্তি ও স্থানীয় নেতৃত্ব ছিল না, যাদের উপর নির্ভর করে উন্নয়ন প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়া যায়। এখানে ২০/২৫ জন ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এবং সাব ডিপুটি ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। পুলিশ অফিসার এবং কনষ্টেবলের সংখ্যা ছিল ন্যূনতম প্রয়োজনের এক পশ্চমাংশ। অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে যেমন রেলওয়ে জনশক্তিতে পূর্ব বাংলার মানুষ ছিল প্রায় অনুপস্থিত। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ছিল প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে। মাত্র ২শ' জন শক্তি নিয়ে একটি সেনা বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। তখন প্রশাসনিক সামরিক কোন ক্ষেত্রেই পূর্ব বাংলা স্বনির্ভর হওয়ার মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ দক্ষ জন শক্তি ছিল না। ভারত থেকে আসা অবাঙালী দক্ষ জনশক্তি ও প্রশাসনিক জনশক্তি তৎকালীন পূর্ব বাংলার জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। তখন খাদ্য ঘাটতিও ছিল তীব্র। এই খাদ্য ঘাটতি সূচিত হয় সিরাজের পতনের পরবর্তী পর্যায় থেকে। স্বাধীনতা উত্তর প্রাথমিক পর্যায়ে চট্টগ্রামে খাদ্য সংকট তীব্র হয়ে উঠলে সিন্ধুর গভর্নরের আবেদন ক্রমে সংগৃহীত তহবিল দিয়ে পর্যাপ্ত খাদ্য চট্টগ্রামে প্রেরণ করে আসন্ন দুর্ভিক্ষের মুকাবিলা করা হয়।

অগ্রসর হিন্দু জনগোষ্ঠীর অসহযোগিতা এবং দিল্লীর প্ররোচনায় হিন্দুস্থানে পাড়ি জমানোর ফলে যে ভযাবহ শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা অবাঙালী মুসলিম দক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী দিয়ে তা পূরণ করা হয়। এখানকার অগ্রসর দক্ষ জনগোষ্ঠী কখনোই পূর্ব বাংলার স্বাধীনতাকে তাদের স্বাধীনতা মনে করেনি, যে কারণে সাত চল্লিশে স্বাধীনতার আগেই তা2রা তাদের অর্থ বিত্ত নিয়ে হিন্দুস্থানে পাড়ি জমায়। এই অর্থ বিত্ত ও দক্ষ জন শক্তিহীন পশ্চাৎপদ অঞ্চল নিয়ে কায়দে আযম কখনই নিরাশায় ভেঙে পড়েননি। কৃষি নির্ভর এ অঞ্চল উন্নয়নের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অতি আশাবাদী।

পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলার অগ্রগতি

যদিও এ কথা সত্য যে তৎকালীন পাকিস্তানে তথা পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প-বিল্পব শৈশবকালীন অবস্থায় ছিল, তবুও স্বীকার করতেই হবে যে এখানকার বুর্জোয়ারা তাদের সাম্রাজ্যবাদী মাতা- পিতার হাত ধরে হাঁটি- হাঁটি পা- পা করে পা ফেলতে ফেলতে এগোচ্ছিল। ১৯৪৭ সালে পূর্ববঙ্গে (পরবর্তীতে

পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমান বাংলাদেশ) একটি পাটকলও ছিল না অথচ ১৯৭০ সালের মধ্যে ২৪,৩৩৪টি লুম সম্বলিত ৬৮টি পাটকল স্থাপিত হল; ১৯৪৭ সালে যেখানে ২৬০০ লুম ও ১,১২,০০০ স্পিন্ডল সম্বলিত মাত্র ৭টি কাপড়ের কল ছিল সেখানে ১৯৭০ সালের মধ্যে তা ৭,০০০ লুম ও ৭,৫০,০০০ স্পিন্ডল সম্বলিত ৪৪টি কাপড়ের কলে উন্নীত হয়; চিনিকল ছিল ৫টি, তা ১৯৭০ সালের মধ্যে ১৫টিতে উন্নীত হল; ম্যাচ ফ্যাক্টরীর উৎপাদন ক্ষমতা যেখানে সমগ্র পাকিস্তানে ১৯৪৭ সালে ছিল ৮০ লক্ষ গ্রুস বাক্স শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানেই ১৯৭০ সালে উৎপাদন হল ১১৩ লক্ষ গ্রুস বাক্স; রেলওয়ে ওয়ার্কসপ (উন্নত মানের) তৈরি হল দুইটি, খুলনায় তৈরী হল শিপইয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জে ডক ইয়ার্ড নির্মিত হল; স্টিল মিল হল একটি, গালফ্রা হাবিব নামে জুট মিল স্পেয়ারস তৈরির কারখানা হল; ক্যাবল ফ্যাক্টরী হল, রসায়ন শিল্প হল, অক্সিজেন তৈরির কারখানা হল, অ্যরডন্যানস ফ্যাক্টরী হল; দুইটি কাগজ কল, একটি নিউজপ্রিন্ট মিল ও একটি হার্ডবোর্ড মিল হল; বৃহৎ মুদ্রণ শিল্প স্থাপিত হল; সার কারখানা হল; গাড়ী সংযোজন কারখানা হল, মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী হল, ইলেক্ট্রিকাল ইকুইপমেন্ট তৈরির কারখানা হল; বাই- সাইকেল সংযোজন- তৈরি কারখানা হল; তৈল শোধনাগার হল; যেখানে কোন সিগারেট ফ্যাক্টরী ছিল না সেখানে সিগারেট ফ্যাক্টরীর উৎপাদন ১৯৬৯- ৭০ সালে এক হাজার সাত শত কোটি সিগারেট- এ উন্নীত হল; ১৯৬৯- ৭০ সালে কস্টিক সোডা উৎপাদন হল ৩,৩৫০ টন, সালফিউরিক এসিড উৎপাদন হল ৬,৪৫০ টন, ক্লোরিন উৎপাদন হল ২,৯০০ টন, বাস, ট্রাক, কার ও জীপ এসেম্লিং হল ৪৫৫টি, ইউরিয়া ফার্টিলাইজার উৎপাদন হল ৯৬,০০০ টন; চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের মাধ্যমে ১৯৬৭- ৬৮ সালে রপ্তানী হয়েছিল ১৪ লক্ষ টনের উপর এবং আমদানী হয়েছিল ৪২ লক্ষ টনের উপর মালামাল; ১৯৪৭ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল মাত্র ৭,২৮৬ কিলোওয়াট তা ১৯৭০ সালের মধ্যে ৫,৪৮,০০০ কিলোওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্বলিত উৎপাদন কেন্দ্রে উন্নীত হল; ১৯৪৭ সালে সমগ্র পাকিস্তানে কার, জীপ, ট্যাক্সী, বাস, ট্রাক, ব্যাবিট্যাক্সী, মোটর সাইকেল প্রভৃতি রাস্তায় চালিত যানের সংখ্যা ছিল ২৫,৪৩৫ তা ১৯৭০ সালের মধ্যে শুধু পূর্ব পাকিস্তানের ৭০,০৮৬টিতে উন্নতি হয়েছিল; ১৯৪৭ সালে সমগ্র পাকিস্তানে টেলিফোনের সংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার, তা ১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে দাঁড়িয়েছিল ৪৫,৬৫৭টিতে; নতুন

রেলপথ নির্মিত হল ১৫৭ মাইল; ১৯৫২ সালে যেখানে উন্নতমানের পাকা রাস্তা ছিল ৫৯৪ মাইল ও নিম্নমানের পাকা রাস্তা ছিল ১,০২৮ মাইল, সেখানে ১৯৬৯- ৭০ সালের মধ্যে তা উচ্চামান সম্পন্ন পাকা রাস্তা হল ৪,৪৮১ মাইল আর নিম্নমানের পাকা রাস্তা হল ১৮৭৪ মাইল। ১৯৬৯- ৭০ সালে কৃষিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার হল ২,৭৭,০০০ টন; পাওয়ার পাম্প ও নলকূপের সাহায্যে জল সেচের ব্যবহার হল ঐ বছর ৮ লক্ষ একরেরও বেশী জমিতে।

বিদ্যুৎ, রাস্তা, যোগাযোগ, পরিবহণ, সেচ, বন্দর প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়নের পাশাপাশি প্রায় ১৫০টি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল। তা ছাড়া রেল, নৌ ও সড়ক পরিবহণ শিল্পের উন্নতি নিশ্চয়ই সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় শোষণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯৬৯- ৭০ সালে শুধুমাত্র রেলওয়েতে চালান দেওয়া মালের ওজন ছিল ৪৮ লক্ষ টন।

এর পাশাপাশি ১৯৪৭ সালে মাত্র, ৭,৭০০ একরের চা বাগান শিল্প উন্নীত হয়ে ১৯৬৯ সালের মধ্যে এক লক্ষ একরে দাঁড়িয়েছিল; জুট প্রেসও প্রায় ৭০টিতে উন্নীত হয়েছিল। এ ছাড়া গড়ে উঠেছিল মাঝারি ও ছোট আকারের অনেক রি- রোলিং মিল, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, মুদ্রণ, প্রকাশনা ও প্যাকেজিং শিল্প, সংবাদপত্র শিল্প, ঔষধ প্রস্তুত শিল্প, চামড়া শিল্প, পাদুকা উৎপাদন কারখানা কাঁচের দ্রব্যাদি প্রস্তুত শিল্প, লৌহ কারখানা, ঢালাই কারখানা, এলুমিনিয়াম ফ্যাক্টরী, মেরামত কারখানা ও ডকইয়ার্ড, ইট তৈরি শিল্প, ফার্নিচার তৈরি শিল্প, স- মিল, আটা- চাল- তৈল- ডাল ভাঙ্গান কল, ময়দা শিল্প, লবণ তৈরি কারখানা, বিস্কুট ও বেকারী শিল্প, প্লাষ্টিক ও রাবার শিল্প, টায়ার উৎপাদন শিল্প, হোসিয়ারী শিল্প, ইলেক্ট্রিক তার, বাল্ব, পাখা ইত্যাদি তৈরি শিল্প; মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও আলু হিমায়িতকরণ শিল্প, প্রসাধনী সামগ্রী প্রস্তুত শিল্প, ব্যাটারি উৎপাদন শিল্প, সাবান কারখানা, পিচবোর্ড ও কাগজের দ্রব্য প্রস্তুত কারখানা, বিভিন্ন ধরনের সংযোজন ও মেরামত কারখানা, পোশাক তৈরি শিল্প প্রভৃতি কয়েক হাজার শিল্প- যার মধ্যে ১৯৭০ সালে সরকারীভাবে রেজিস্ট্রিকৃত ছিল সাড়ে তিন হাজারের উপর, আর চীফ ইনসপেক্টর অব ফ্যাক্টরীজ এন্ড এষ্ট্যাবলিশমেন্টস- এর ১৯৬৯ সালের রেকর্ড অনুযায়ী ছিল ৫,৫৪১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান। ১৯৭০ সালে চলচ্চিত্র গৃহের সংখ্যা ছিল ১৬৬টি।

আরও ছিল অগণিত হস্তচালিত তাঁত (সরকারীভাবে স্বীকৃত হ্যান্ডমুল ফ্যাক্টরী ছিল প্রায় সাড়ে সাত শত) শিল্প ও বিভিন্ন কুটির শিল্প, অলংকার প্রস্তুত শিল্প, বিড়ি তৈরি কারখানা, নির্মাণ শিল্প, টেইলারিং সপ, বই বাঁধাই কারখানা ইত্যাদি। যাতে নিযুক্ত ছিল লক্ষ লক্ষ শ্রমিক। এর পাশাপাশি ছিল হাজার হাজার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও দোকান। ছিল ইম্পোর্ট- এক্সপোর্ট ব্যবসা, ক্লিয়ারিং- ফরোয়ার্ডিং ব্যবসা, ক্যারিং ব্যবসা, কনসাল্টিং ফার্ম, ব্যাংক ও বীমা শিল্প ইত্যাদি। ১৯৬৯- ৭০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের টাকার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৮১ কোটি ও ১৬৭ কোটি টাকা। সে সময়ে এক টন পাটজাত দ্রব্যের গড় রপ্তানী মূল্য ছিল ১,৫৫৫.০০ টাকা ও এক টন কাঁচা পাটের গড় রপ্তানী মূল্য ছিল ১,২২৩.০০ টাকা এবং এক পাউন্ড চা- র গড় রপ্তানী মূল্য ছিল এক টাকা পঞ্চাশ পয়সার মত। প্রশ্ন হচ্ছে, পুঁজির বিকাশ ছাড়া এসব হল কী করে? আর এর থেকে কি পূর্ববতী সামাজিক অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি?

রাশ ব্রুক উইলিয়াম ১৯৭১ সালে লিখেছেন- 'আমার পর্যবেক্ষণ আমাকে এই উপসংহার টানতে বাধ্য করেছে যে, মাত্র শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ ২৫ বছরের মধ্যে পাকিস্তান যেভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে অগ্রগতির নতুন দিগন্ত রচনা করেছে অতীতের লম্বা ইতিহাসের কোন পর্যায়েই এমন অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। সফল স্থাপনা কাপতাইবাধ, চট্টগ্রামকে প্রধান সামুদ্রিক বন্দর হিসেবে প্রতিষ্ঠা, চন্দঘোনা পেপার মিল, ফেঞ্জুগঞ্জ সার কারখানা যা পাকিস্তানের যে কোন স্থানে নির্মিত হতে পারত। কিন্তু সেটা ছিলো কেন্দ্রের উদ্যোগ। কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রাইভেট সেক্টরেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।'

১৯৬৭- ৬৮ সাল নাগাদ ৯২৭টি বৃহৎ শিল্প ৬ শতাংশ জিডিপি অর্জন করে। (সি এম আই রিপোর্ট ইসলামাবাদ ১৯৬৯) ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আরো অগ্রগতি হয়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এবং শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে পঞ্চম বাহিনীর নায়ক শেখ মুজিব যখন বিষোদগার করছেন তখন পর্যন্ত ৭৯টি জুট মিল, ৪২টি কটন মিল ২০টি চিনির মিল, তিনটি সার কারখানা, ২টি পেপার মিল, একটি নিউজ প্রিন্ট মিল, দুটো পেপার বোর্ড মিল, ২টি রেয়ন মিল, একটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরী, একটি মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী, একটি

রিফাইনারী এবং অসংখ্য চামড়া ট্যানিং ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন পর্যন্ত পিচঢালা সড়ক নির্মিত হয়েছিল ৩ হাজার মাইল। রেল পথ বর্ধিত হয়েছিল ১৮০০ মাইল পর্যন্ত এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ১ লক্ষ কিলোয়াট। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়েছিল ১৯৫০ সালেই। উচ্চ বর্ণের হিন্দু সাংসদদের বিরোধিতা সত্ত্বেও মুসলিম বায়তদের মালিকানা স্বত্ব প্রদান করা হয়। স্থবির কৃষি সেক্টরে প্রাণ চাঞ্চল্যের সূচনা করা হয়েছিল এমন ভাবে যে, দুর্ভিক্ষ কোন দুর্ভিক্ষই তার কালো হাত বাড়াতে পারেনি। ষাটের দশকে পূর্ব বাংলা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়।

১৯৪৭ সাল নাগাদ যেখানে পুর্ব বাংলায় মাত্র একটি বিশ্ববিদ্যালয় একটি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল, অর্ধডজন ডিগ্রি কলেজ ছিল সেখানে পাকিস্তান যুক্ত করেছ ৫টি বিশ্ববিদ্যালয় (তিনটি সাধারণ, একটি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং একটি কৃষি)।

এছাড়া এখানে ৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ৬টি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ১৭টি পলিটেকনিক এবং ৭টি মেডিক্যাল কলেজ, ৪টি সাধারণ বিশ্ববিদ্যালয় ছিল '৭১ সালে। ১৯৪৬ সালে ঢাকা মেডিকেল কলেজ এবং ষাটের দশকের শুরুতে মোনয়েম খান যখন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য মন্ত্রী ছিলেন তখন তিনি ৭টি মেডিকেল স্কুলকে কলেজ ঘোষণা করেন। পরে গভর্নর হয়ে এ ঘোষণা কার্যকর করেন। এবং অসংখ্য মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বিজ্ঞান কলা ও বাণিজ্য অধ্যয়নের জন্য ২ শতেরও অধিক কলেজ প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

শিক্ষিত হিন্দুরা দেশ ত্যাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে শিক্ষিতের হার ছিল প্রায় শূন্যের কোঠায়। পাকিস্তান আমলে শিক্ষিতের হার দাঁড়ায় ১৯ শতাংশ অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষিতের হার ছিল ১৮ শতাংশ।

১৯৪৯-৫০ সালে পাকিস্তানের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। যারা লিখিত পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এমন বাংলাভাষী ৪০ জনকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন শাখায় নিয়োগ দেয়া হয় সরকারী নির্দেশে। ১৯৪৯-৫০ সালে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মেধা ভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয় ২০ শতাংশ বাকী ৮০ শতাংশ পদ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া হয়। (R Symond, the British and their

Successors 44-90) অথচ পূর্ব পাকিস্তানের কতিপয় পরিচিত মুখ এর বিরোধিতা করে। ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে সিএসপিদের ৩ বছর কম সময় অতিক্রান্ত হলে তাদের নিজ প্রদেশে প্রত্যাবর্তন করানো শুরু হয়। ১৯৫৫ সালের প্রাথমিক পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানী সিএসপির অনুপাত ৩৫ শতাংশে পৌছে। ১৯৭১ সালে নাগাদ এদের সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানীদের সমপর্যায়ে উন্নীত হয়। ১৯৪৭ সালে এখানে কয়েকজন কমিশন অফিসার, ৫০/৬০জন জুনিয়র কমিশন এবং ২০০ জন জোয়ান ছিল। ১৯৭১ সাল নাগাদ এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০ হাজারে।

হিন্দু প্রতিযোগীদের অবর্তমানে মুসলমানরা ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও বিস্তৃতির যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিল। পাকিস্তানোত্তর পূর্ব বাংলার মুসলমানদের মধ্যে খুব দ্রুত শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অর্জন করেছে নবতর মর্যাদা। যেমন এর আগে হিন্দুদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে হীনমন্যতা অনুভব করতো, খুব সহজে এই হীনমন্যতা অতিক্রম করেছে। (জিপি ভট্টাচার্য ১৯৭৩, ১১৯, ২০) শুরু থেকে হিন্দুরা মুসলমানদের এই উত্থান অসহ্য মনে করেছে।

স্বাধীনতার প্রথম পর্যায়ে পাকিস্তানের সব মুসলমানই ভাবতে শুরু করে তারা উচ্চ শ্রেণীর, তারা শাসকের বংশধর এবং হিন্দুরা তাদের অধীন। একজন ঠেলাগাড়ী চালক ও একজন প্রভাবশালী হিন্দুকে একথা বলার সাহস রাখতো যে আপনাদের দ্বিধা সংকোচের কোন কারণ নেই, নির্ভয়ে চলাফেলা করুন। কেননা মুসলমানরা অর্থাৎ তারা শাসক এবং হিন্দুদের নিরাপত্তা দেয়া তাদেরই দায়িত্ব। এটাই ছিল মুসলমানদের মানসিকতার প্রাণবন্ত উত্থান। (পিসি লাহিরী ১৯৪৬ : ৮-৯)

পরিস্কার ভাবে একথা বলা যায় যে, পাকিস্তান সামাজিক অর্থনৈতিক মনস্তাত্বিক মুক্তির ব্যাপারে কয়েক শতাব্দী রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করেছে যা তাদের মধ্যে এনে দিয়েছে সার্বিক উন্নয়নের সামর্থ। এতদসত্বেও এটা ঠিক যে, উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈষম্য নিয়ে পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হয়েছিল এবং সেই বৈষম্য পূর্ণাঙ্গভাবে দূরীভূত করা তখনও সম্ভব হয়নি।

বৈষম্য নিরসনের উদ্যোগ

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য অনাকাঙ্খিত হলেও এটা অস্বাভাবিক ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তান বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীন হয় পলাশীর শত বছর পর। যে কারণে বাংলার মানুষ যেভাবে বৃটিশ এবং তাদের সহযোগী বর্ণ হিন্দুদের ধারাবাহিক নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং সামগ্রিক ভাবে তেমন শোষণ বঞ্চনার সম্মুখীন হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলার মত কোন হিন্দু জমিদারের নিষ্পেষণ এবং মহাজনদের দৌরাত্ব ছিল না। অথবা বাংলার মত আধুনিক শিক্ষা ও কর্মের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ ছিল না। তদুপরি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৌশলগত গুরুত্বের কারণে সেখানে কখনো প্রশাসনিক ঔদাসীন্যও পরিলক্ষিত হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানের এলাকা সমূহে কৃষি ব্যাপক সেচ সুবিধা পেয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য অবকাঠামো গত সুবিধা থেকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল লাভবান হয়েছে। মোটের উপর দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের প্রয়োজনীয় উপাদান সেখানে মওজুদ ছিল। (জিপি ভট্টাচার্য, ১৯৭৩ : ১১৯- ২০)

১৯৪৮ সালের মার্চে পূর্ব পাকিস্তান সফর কালে জিন্নাহ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য অনাকাঙ্খিত বলে উল্লেখ করেন। তিনি সহযোগিতা প্রদান এবং ধৈর্য ধারণের আহ্বান জানিয়ে যতদ্রুত সম্ভব পূর্ব ও পশ্চিমের বৈষম্য দূরীকণের আশ্বাস দেন। কায়দে আযমের এই আশ্বাস সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্ববহ হয়ে উঠে। ১৯৫৬ এবং ৬২ সালে উভয় সংবিধানে রাষ্ট্রের উভয় অংশের মধ্যকার বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণের এবং জাতীয় পরিষদে এ ব্যাপারে পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

আইয়ুব খান ১৯৪৮ সালে জানুয়ারীতে যখন পূর্ব পাকিস্তানের জিওসির দায়িত্ব প্রাপ্ত হলেন তখন এখানে সেনা বাহিনীর মাত্র ৫টি কোম্পানী সহকারে দুটো ব্যাটেলিয়ান ছিল। জেনালের আইয়ুব তার আত্মজীবনী ‘ফ্রেন্ডস নট মাস্টার’স গ্রন্থে লিখেছেন- ‘সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে কোন টেবিল চেয়ার বা ষ্টেশনারী ছিল না, বলতে গেলে আমাদের কিছুই ছিল না। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের একটি মানচিত্র পর্যন্ত ছিল না। পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে জিন্নাহ সেনাবাহিনীতে অধিক সংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানের

জোয়ানদের নিয়োগ দেয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং একজন পূর্ব পাকিস্তানী মেজর আব্দুল গণিকে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করার দায়িত্ব প্রদান করেন। পরবর্তীতে ডকিং সুবিধা সহ একটি নেভাল বেজ চট্টগ্রামে স্থাপন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের তরুণদের রিক্রুটের জন্য একটি ডিপো, অনেক বিক্রুটিং সেন্টার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনা করা হয়। অন্য আর একজন পূর্ব বাংলার কর্নেল আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরীকে পূর্ব পাকিস্তানের তরুণদের যুগোপযোগী দক্ষ হিসেবে ভবিষ্যত নেতৃত্বের জন্য গড়ে তোলার ব্যাপারে ক্যাডেট কলেজ স্থাপনের দায়িত্ব অর্পন করা হয়। ৬৯ থেকে ৭১ সালের মধ্যে ৪টি রেজিমেন্ট গড়ে তোলা হয় শুধু মাত্র পূর্ব পাকিস্তানীদের নিয়ে। এর উপরে পাঞ্জাব, বেলূচ এবং ফ্রন্টিয়ার রেজিমেন্ট গড়ে তোলার সময় ২৫ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানীকেও রিক্রুট করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানীদের এত দ্রুত নিয়োগ দেয়া হচ্ছিল যে, ঢাকার ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার সেনাবাহিনীর মান হ্রাস হওয়ার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

আইয়ুব শাসনামলের প্রাথমিক পর্যায়ে দেখা গেছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দৌড়ে পূর্ব পাকিস্তান অনেক পিছিয়ে রয়েছে। পুর্ব পাকিস্তানের মাথা পিছু গড় আয়ের বৃদ্ধি সত্ত্বেও এখানকার তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বেশী। এটা সম্ভব হয়েছিল প্রাথমিক পর্যায়ের সুযোগ সুবিধা ও অবকাঠামো থাকার কারণে স্বাভাবিকভাবে গড় পড়তা আয়ের ক্ষেত্রে উভয় প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য ব্যাপক হতে থাকে। ১৯৫১- ৫২ সালে গড় পড়তা আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল ১৮ শতাংশ, ১৯৬৭- ৬৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ শতাংশে দাঁড়ায়। (রিপোর্ট অব দি প্যানেল ইকোনমিস্ট অন দি সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান) কেন্দ্রীয় সরকারের প্লানিং কমিশনের মধ্যকার বেশ কিছু পূর্বপাকিস্তানী অর্থনীতিবিদ এবং অর্থনৈতিক মন্ত্রণালয় মনে করে গড়পড়তা আয়ের পার্থক্য সূচিত হয় অধিক হারে বিনিয়োগ এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচারের কারণে। দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্যের জন্য তারা বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও ধারণার আশ্রয় গ্রহণ করে। পশ্চিম পাকিস্তানী সহযোগীরা তাদের কিছু অভিযোগের ব্যাপারে বাধ সাধে। এর জবাবে তারা অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে যে, কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনার ব্যয় প্রতিরক্ষা সেক্টরের ব্যয়, আন্ত প্রদেশ বাণিজ্য উদ্বৃত্ত এবং ব্যাঙ্কিং ও বীমার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হচ্ছে।

(ইসলামিক রিলেসন বিটুইন ইষ্ট এন্ড ওয়েষ্ট পাকিস্তান) তাদের বিদ্যমান বৈষম্যের ব্যাপারে এবং তাদের বিশ্লেষনের ব্যাপারে বিপরীত মত ছিল না। ক্রমে বিতর্ক গুরুত্ববহ হয়ে উঠে। কেন্দ্রীয় সরকার বৈষম্য বিরোধী পদক্ষেপ নেয়ার ফলে যখন কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতিনিধিত্বের আশানুরূপ অগ্রগতি হচ্ছিল তখন পূর্ব পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদদের বিলাপ বেসুরো হয়ে বাজছিল।

সরকারের সিনিয়র অর্থনৈতিক উপদেষ্টাদের দ্বন্দ্ব চলাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপকরা পশ্চিম পাকিস্তানের কথিত ঔপনিবেশিক শোষণের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে। এদেরই একজন প্রস্তাব দেয় যে, পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য দুটো অর্থনীতি পৃথকভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বিষয়টির উপর গুরুত্বরোপ করেন এবং অর্থনীতি পৃথকীকরণের পক্ষে কাজ শুরু করেন। ১৯৬২ সালের প্রথমার্ধে শিল্প, রেল বিদ্যুৎ ও পানি যা কেন্দ্রীয় সরকারের অধিক ব্যয়ের খাত সেসব প্রাদেশিক সরকারের অধীনে ন্যাস্ত করা হয়। এসব হল পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন, পাকিস্তান রেলওয়ে বোর্ড এবং পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংস্থা। প্রাদেশিক সরকারকে সংশ্লিষ্ট বিভাগ উন্নয়নের পরিকল্পনা নেয়া এবং এসব বাস্তবায়নের অধিকার দেয়া হয়। ৭০ শতাংশ বিক্রয় কর সহ কেন্দ্রীয় সরকারের ৫৪ শতাংশ ট্যাক্স রেভিনিউ এবং অন্যান্য ট্যাক্স এবং ডিউটির সম্পূর্ণটাই পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয়। (এইচ জহির, ১৯৯৪ : ৯২- ৯৩)

তদুপরি ১৯৬৩- ৬৪ সালে পাবলিক সেক্টর উন্নয়ন ব্যয় ৫০ শতাংশে বর্ধিত করা হয়। এ সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ এবং বামপন্থী ছাত্ররা পূর্ব পাকিস্তানকে অবহেলা করার অভিযোগ উত্থাপন করে এবং নতুন যুক্তির অবতারনা করে বলে যে, অধিক বরাদ্দই যথেষ্ট নয়, এটা হতে হবে মাথা পিছু গড় আয়ের উপর ভিত্তি করে এবং আরো বলা হয় যে, বৈষম্য নিরসনের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে আইন আদালত যদি শক্তি প্রয়োগ করতে না পারে তাহলে সেটা হবে অর্থহীন। এতদসত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের অনুকূলে সরকারী উদ্যোগ অব্যাহত থাকে।

১৯৫৮- ৫৯ সালে উন্নয়ন বরাদ্দ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ১৯৬৬ কোটি টাকা, পূর্ব- পাকিস্তানের জন্য ছিল ২৫.০৯ কোটি টাকা। ১৯৬৬- ৬৭ সালে বরাদ্দ করা হয় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৯৫.৪০ কোটি টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৩৬.৩৩ কোটি টাকা। আইয়ুব শাসনামলে কেন্দ্রীয় বাজেটের অধিক পরিমাণ বরাদ্দ করা হয় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য। কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যকার অর্থনৈতিক সম্পর্কের ব্যাপারে রেইজ ম্যান রোয়েদাদ পরিবর্তন করা হয় এবং প্রদেশের অর্থনৈতিক উৎস বর্ধিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। ১৯৬২- ৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানের রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম শুরু করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে শুরু হয় এক বছর পর। এই কর্মসূচীর জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অধিক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য ৫২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয় ২৭০০ কোটি টাকা পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয় ২৫০০ কোটি টকা। শিল্প উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য ট্যাক্স হলিডে ব্যবস্থা চালু করা হয়। পূর্বপাকিস্তান এটা ভোগ করে ৪- ৬ বছর। অপর দিকে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পোদ্যোক্তরা ট্যাক্স হলিডে ভোগ করার সুযোগ পায় ২- ৪ বছর। আশা করা হয়েছিল এ অবস্থা চলতে থাকলে ১৯৮৫ সালের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সব ধরনের বৈষম্য দুর করা সম্ভব হতো। (জিপি ভট্টাচার্য- ১৯৭৩ : ১৫২- ৫৩)

১৯৬৮- ৬৯ সালে উন্নয়ন ঋণ বরাদ্দ হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১,০৬০ মিলিয়ন টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৭৮০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৬৯- ৭০ সালের উন্নয়ন ঋণ বরাদ্দ হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১২৯০ মিলিয়ন পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৯১০ মিলিয়ন। একই রকম দেখা যায় এক্সপোর্ট ক্রেডিটের ক্ষেত্রে ১৯৬৫- ৬৬ থেকে ১৯৬৯- ৭০ অর্থবছর অবধি পূর্ব পাকিস্তান গ্রহণ করে ২১০ মিলিয়ন ডলার পশ্চিম পাকিস্তান গ্রহণ করে ১৯২ মিলিয়ন ডলার (এল এফ রাস ব্রুক উইলিয়াম, ১৯৭৩ : ১৫২, ৫৩)

অতি প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আমদানীর ক্ষেত্রে সাবসিডি দেয়া হত। যেমন পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সিমেন্ট আমদানীর ক্ষেত্রে সাবসিডি দেয়া হতো।

কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে আমদানীর ক্ষেত্রে সাবসিডি দেয়া হতো না। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে অধিক দামে পূর্ব পাকিস্তানের পণ্য বিক্রি করার সুযোগ দেয়া হত। যেমন পূর্ব পাকিস্তানের চা আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ৭গুণ বেশী দামে পশ্চিম পাকিস্তানে বিক্রি হত। (অমৃতবাজার পত্রিকা, কোলকাতা ২৪ মে, ১৯৭৪)

একাত্তরে যুদ্ধকালে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব পাবলিক এ্যাফেয়ার্সের চেয়ারম্যান আর পি কাপুর এর বক্তব্যে সবকিছু পরিস্কার হয়ে যায়। তিনি লিখেছেন- বাংলাদেশের ঘটমান পরিস্থিতির যৌক্তিক ব্যাখ্যা হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানীদের শোষণের ধুয়া তোলা হয় সেটা সর্বৈব অন্যায় এবং পরিস্থিতির অতি সহজ এবং লঘু ব্যাখ্যা।' (আর পি কাপুর : ১৯৭১)

ওরা জানতো বিচ্ছিন্ন হলে কি ভয়ঙ্কর মূল্য দিতে হবে

একাত্তরের যুদ্ধকালে কোলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার উপর আলোকপাত করে ভবিষ্যৎবাণী করা হয় যে, বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভায়াবল অর্থাৎ টেকসই হবে না। অন্যদিকে বৈরি ভারতের অর্থনীতিবিদরা পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে পাকিস্তানের অবদানকে স্বীকারই করেন না। পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার মাসখানেক আগে পশ্চিম বাংলার সিনিয়র অর্থনীতিবিদ সতর্ক করে বলেন যে, ১৯৭১ সালের আগেকার অবস্থানও মর্যাদা বাংলাদেশ অদূর ভবিষ্যতে অর্জন করতে সক্ষম হবে না এবং বাংলাদেশীদের উদ্দেশে তিনি এই বলে উপদেশ দেন যে, তাদেরও অনগ্রসতার সাথে মানিয়ে নেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। (বাংলাদেশ ইকনমিক প্রবলেম এন্ড পার্সপেকটিভ) পাকিস্তানোত্তর এই বাংলাদেশে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষের ঘরে ঘরে অর্থনৈতিক হতাশা ও বিপর্যয় আসতে দেরী হয়নি।

একাত্তরে গৃহ যুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রথম বছরেই বাংলাদেশ ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থনৈতিক সাহায্য পেয়েছিল। এতে বাংলাদেশের

লাভ হয়েছিল ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটাই সবকিছু নয়। পাকিস্তানোত্তর বাংলাদেশ ২৩ বছরে পেয়েছে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এইড হিসেবে। অখণ্ড পাকিস্তান যে বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছিল তার চার গুণ হল বাংলাদেশের এসব প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা। তদুপরি তথাকথিত শোষণ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচারের অভিযোগের প্রশ্নতো আর নেই। তা সত্ত্বেও মুজিবের সোনার বাংলা আজ অবধি মরিচিকা হয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়ণ প্রশাসন নিরীক্ষণ করে দিলাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ প্রশাসনের অধ্যাপক উইলিয়াম ডব্লিউ বয়ার উপসংহার টেনে লিখেছেন, পাকিস্তান আমলে এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক ভাল অবস্থায় ছিল। (ইভিনিং জার্নাল দেলাওয়ার) এমনকি ৮০'র দশকের শেষ দিকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশের শিল্প উৎপাদন ৬০ এর দশকের পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প উৎপাদনের ৮৬ শতাংশের মত। (সি বাক্সটার এবং এস রহমান হিস্ট্রিকাল ডিকসনারী অব বাংলাদেশ ১৯৮৯ : ৬০- ৬১) একাত্তরে সসস্ত্র সংঘাত শুরু হওয়ার কয়েক দিন আগে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী কূটনৈতিক আনওয়ারুল করীম চোধুরী মার্কিন কূটনীতিককে কোলকাতায় বলেছিলেন যে, বিশ্ববাজারের ক্রমহ্রাসমান পাটের চাহিদার প্রেক্ষিতে নিজস্ব অর্থনীতি নির্মাণের সামর্থ্য বাংলাদেশের সামান্যই অবশিষ্ট থাকবে। এটা দুর্বল এবং অস্থিতিশীল হতে বাধ্য। (আরখান, দি আমেরিকান পেপারস সেকরেট এন্ড কনফিডেন্সিয়াল ইনডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ ১৯৬৪- ৭৩) আমেরিকার নিজস্ব মূল্যায়নও অনুরূপ। আমেরিকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে- 'কেমন করে রাষ্ট্রটি সময়ের দীর্ঘ পরিক্রমায় তার মৌলিক চাহিদা পূরণ করবে। বাহিরের বড় অঙ্কের সাহায্য প্রদান করে হলেও এর অর্থনীতির উন্নতি বিধান করা উচিত।'

যখন বিচ্ছিন্নতা অথবা তথাকথিত স্বাধীনতার উন্মাদনা চরমে সে সময় কোলকাতার একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক জনৈক নেতৃপর্যায়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীর চোখ খুলে দেন এই বলে যে, বিভিন্ন উপলক্ষে আমি কয়েক বার পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বালাদেশ) সফর করেছি। সেখানকার মুসলিম মধ্যবিত্তের জীবন যাপনের মান দেখে আমি ইর্ষান্বিত হয়েছি। অনেক অধ্যাপক, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সাংবাদিক, লেখক, শিল্পী এবং অফিসারদের গাড়ী বাড়ীর মালিক হতে দেখে আমি হতবাক হয়েছি। তাদের অহরহ বিদেশ ভ্রমনের গল্প শুনে আমি ইর্ষা অনুভব করেছি। আপনি কি বলতে

পারেন বাংলাদেশের মুসলমানরা তাদের উন্নত মানের সমৃদ্ধ জীবনের হাতছানি উপেক্ষা করে কেন স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল?

এর জবাব মিলেছে একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী বুদ্ধিজীবির পক্ষ থেকে :

ভারতের পশ্চিম বাংলার সাথে তুলনা করা হলে দেখা যাবে আমরা পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্তরা পাকিস্তান আমলে অনেক উন্নত ও বিলাস বহুল জীবন যাপন করেছি মুজিব নগর (কোলকাতা) থেকে ফেরার পর এটা আমরা অনুভব করেছি।

করাচী লাহোর ইসলামাবাদের বড় বড় মানুষরা কোলকাতা সফরের অনুমতি দিত না ভারত বৈরিতার কারণে, এই আশঙ্কায় যে পশ্চিম বাংলার সংস্কৃতি আমাদের বিভ্রান্ত করবে। এই কারণে আমরা পশ্চিম বাংলার সাথে আমাদের অবস্থার তুলনা করতে পারিনি। অন্যদিকে তারা আমাদের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, ছাত্র রাজনীতিবিদ ও অফিসারদের প্রায়ই পশ্চিম পাকিস্তান সফরের আয়োজন করতো পাকিস্তানের সংহতির নামে। পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্য বিত্তদের সাথে তুলনা করে আমরা নিজেদের অবহেলিত ও বঞ্চিত মনে করতাম। আমরা ছিলাম পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ, এই প্রেক্ষিতেই আমাদের অধিকাংশকে মুক্তি যুদ্ধ তাড়িত করেছে। (এম আর আখতার মুকুল, ১৯৮৪ : ১৬৮- ৬৯)

নেতৃস্থানীয় আওয়ামী লীগ এমপি এবং শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত বন্ধু এম এ মুহাইমেন এর বক্তব্যও অনুরূপ। তিনি বলেন- 'সীমান্ত পেরিয়ে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যবিত্তবা উপলব্ধি করলাম, আমাদের অর্থনীতি এবং জীবন যাপনের মান কত উন্নত। পশ্চিম বাংলার মধ্যবিত্তের তুলনায় আমরা কত সুখী ও সমৃদ্ধ। এমনকি সে সময় অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারে টিভি এবং ফ্রিজ রয়েছে অথচ সীমান্তের ওপারে ৮০ শতাংশ মধ্য বিত্তের ঘরে এসব নেই। (দুই দশকের স্মৃতি, ১০৯)

এটা সত্য নয় যে, পূর্ব পাকিস্তানীদের পশ্চিম বাংলা ভ্রমণে বাধা ছিল। শুধুমাত্র ১৯৬৫ সালে পাক ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষিতে জরুরী আইন বলবত থাকার সময় ছাড়া সবসময় পশ্চিম বাংলা অথবা ভারত সফরে বাধা ছিল না। কোলকাতার চিকিৎসকদের অবাধে ঢাকা সফরের উক্তিই পশ্চিম বাংলা সফরের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত উক্তিকে মিথ্যা

প্রতিপন্ন করে। বাস্তবতার নিরিখে বিচ্ছিন্নতাবাদী পঞ্চম বাহিনীর মোহভঙ্গ হলেও নিজেদের ভুল পদক্ষেপের পক্ষে যুক্তির অবতারণা করছে অন্যকে দোষারোপ করে। আমরা বিশ্বাস করি না যে এম আর আখতার মুকুল একাত্তরের আগে পশ্চিম বাংলায় পা রাখেননি। তিনি বহুবার পশ্চিম বাংলা সফর করেছেন। কিন্তু তার বোধোদয় হয়নি। এক দুর্নিবার মোহ তার মত অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে ভারতে। হতে পারে সেটা আবেগ জনিত কারণে অথবা প্রাপ্তি যোগের কারণে। যদি অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া অপরিহার্য হয়ে থাকে তাহলে পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে সেটা আরো অপরিহার্য ছিল। ১৯৭২ সালে আনন্দ বাজার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পশ্চিম বাংলার মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতিবসুর অভিযোগ সম্বলিত এক সংবাদে বলা হয়েছে, সেখান থেকে কেন্দ্র ৫০০ কোটি টাকা আয় করলেও দিল্লী পশ্চিম বাংলাকে ৫০ কোটি টাকা প্রদান করে। এমন অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কোলকাতার বুদ্ধিজীবি ও রাজনীতিকরা দিল্লী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি কেন?

একাদশ অধ্যায়

ভাষা আন্দোলন একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র

পঞ্চাশ দশকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেটা ঘটেছিল সেটা হলো ৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। সময়ের দাবীর প্রেক্ষিতে আন্দোলন, আইন-শৃংখলার অবনতি, প্রশাসনের সাথে সংঘাত, গুলী বর্ষণ, খুন জখম, আন্দোলনের সাফল্য অথবা ব্যর্থতা তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতির চলমান ঘটনা প্রবাহ। কিন্তু ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য ঘটনা প্রবাহের মধ্য মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। অন্য সব আন্দোলনের দাবী স্বীকৃত হলে প্রেক্ষিত গৌণ হয়ে পড়ে। কিন্তু ভাষা আন্দোলনে সেটা হয়নি। হিন্দু এবং বৃটিশ বেনিয়াচক্রের যৌথ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত জাতিসত্তার বিভাজন হয়েছিল। ভাষা আন্দোলনে ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে ভাষার দাবী স্বীকৃত হলেও ভাষা আন্দোলন কেন্দ্রিক যে ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়েছিল সেটা ৫৪ সালে মুসলিম লীগ সরকারের পতন ঘটিয়েছিল। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করেছিল এবং প্রশাসনকে দুর্বল করেছিল। এর ধারাবাহিকতার মধ্যদিয়ে বৈরীতা তুঙ্গে উঠেছিল, গণ বিদ্রোহ সূচিত হয়েছিল, অসহিষ্ণুতার সূচনা হয়েছিল, উগ্র আঞ্চলিকতার বিকাশ হয়েছিল এবং জঙ্গী মনোভাব এবং অস্থিরতা বেড়ে গিয়েছিল। যা থেকে আজো জাতির নিষ্কৃতি মিলেনি। একারণে ভাষা আন্দোলন বৃটিশ পরবর্তী উপমহাদেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

উপমহাদেশে ভাষা নিয়ে বিরোধ ছিল, কিন্তু সেটা খুব পুরনো বলা যাবে না। শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে, উর্দু, এবং হিন্দি নিয়ে বিরোধ। মুসলিম শাসনামলে রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালিত হত ফারসীর মাধ্যমে। বৃটিশরা তাদের সুবিধার জন্য ফারসীর বদলে ইংরেজীকে অফিস আদালতের মাধ্যম হিসেবে চালু করে। কিন্তু কোন সময়ই ভাষা নিয়ে বিরোধ হয়েছে এমনটি ইতিহাস বলে না।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনোত্তর কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহে হিন্দুচেতনাকে সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা নেয়া হয়। এই সাথে দেবনাগরী লিপির প্রচলন করা হয়। এটা করা হয় এ কারণে যে,

তারা উর্দুকে মুসলমানদের ভাষা হিসেবে মনে করত। কেননা উর্দুর স্বরলিপি আরবীর অনুরূপ। উর্দূতে আরবী শব্দ এবং পরিভাষায় প্রাচুর্য থাকায় বর্ণবাদী হিন্দুচক্র এটাকে মনে করতো মুসলমানী ভাষা। এরা ত্রিশ দশকের শেষার্ধে সীমিত ক্ষমতা পেয়েই উর্দু লিপির ব্যবহার অচল করার লক্ষ্যে দেবনাগরী লিপির প্রচলন করে। তখন থেকেই ভাষা নিয়ে হিন্দু মুসলিম বিরোধের সূচনা হয়।

'ইংরেজ আমলে আমাদের দেশে ভাষা সমস্যা বলতে মনে করা হতো হিন্দি- উর্দুর সমস্যা। হিন্দুরা সমর্থন করতো হিন্দির দাবীকে। আর মুসলমানরা সমর্থন করতো উর্দুর দাবীকে। বিখ্যাত ভাষা তাত্ত্বিক সুনীতি কুমার চট্টপাধ্যায় তার বহুল পঠিত 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা' নামক পুস্তকে সমর্থন করেন হিন্দিকে ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার। রবীন্দ্রনাথ সুনীতি কুমারের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত ছিলেন। সুনীতি কুমার বাবুর বইটি প্রকাশিত হয় বিশ্বভারতী থেকে। পক্ষান্তরে মুসলমানরা সমর্থন করতে থাকেন উর্দুর দাবীকে। ১৯৩৭ সালে লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে মুসলিম লীগ তার ১১নং প্রস্তাবে উর্দুর উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং এটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানান হয়। ১৯৩৮ সালে বাংলার বিখ্যাত মুসলিম নেতা একে ফজলুল হক, All India Muslim Educational Conference- এর সভাপতির ভাষণে বলেন, হিন্দি নয়, উর্দুকেই গ্রহণ করতে হবে ভারতের সাধারণ ভাষা বা লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা (Lingua Franca) হিসেবে। বাংলা যে কোনো সময় কোনো দেশের রাষ্ট্রভাষা হতে পারে, তা সে সময় কেউ কল্পনাই করতে পারেনি। (এবনে গোলাম সামাদ, দৈনিক ইনকিলাব ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮)

সর্বোপরি ১৯৪৭ সালে সাধারণ মত ছিল, হিন্দি ও উর্দু হবে ভারত ও পাকিস্তানের সরকারী ভাষা। শুধুমাত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদী নয় কমিউনিস্টরাও এটাকে সেটেল্ড ফ্যাক্ট হিসেবে মনে করতো।

উপমহাদেশের মুসলমানদের দাবী ও আন্দোলনের কারণে ভারত খণ্ডিত হলে হিন্দি ও উর্দুর বিরোধ স্তিমিত আঙ্গিকে ভাষা সংক্রান্ত বিরোধের সূচনা হয়। এ প্রসঙ্গে ভাষা আন্দোলনের একজন সৈনিক অধ্যাপক আবদুল গফুর সাহেব লিখেছেন- 'একথা এখন নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, পার্টিশন না হলে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত না হলে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী

তোলা সম্ভব হতো না। লাহোর প্রস্তাব পূর্ণভাবে বাস্তাবায়িত হলে পূর্ব পাকিস্তান নামেই হোক, আর যে নামেই হোক উপমহাদেশের মুসলিম অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলে যে রাষ্ট্র গঠিত হত, বাংলাই হত সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা এবং এ নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব সৃষ্টির কোন অবকাশই আসত না। সাতচল্লিশের পার্টিশনের প্রাক্কালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরৎচন্দ্র বসু প্রমুখের প্রস্তাবিত সার্বভৌম বৃহত্তর বাংলার রাষ্ট্রভাষা হত বাংলা। কোন আন্দোলনের প্রয়োজন পড়ত না। সাতচল্লিশে লাহোর প্রস্তাবের আংশিক বাস্তবায়ন হয়েছিল এবং পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার মেজরিটির মাতৃভাষা বাংলা ছিল বলেই সেদিন পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার দাবী তোলা সম্ভব হয়েছিল। ভারতবর্ষ অখণ্ড থাকলে সেখানে মেজরিটি জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলা এ যুক্তিতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী তোলা যেত না। এমনকি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত স্বাধীন (অখণ্ড) ভারতের সরকারী ভাষা হিসেবে হিন্দির বাইরে ইংরেজি ছাড়া অন্য কোন ভাষার কথা চিন্তা করতে পারেননি এবং এ প্রশ্নে ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহর সঙ্গে তাঁর যে মতবিরোধ হয়েছিল তা অভিজ্ঞ ব্যক্তি মাত্রেরই জানা থাকার কথা। ভারতবর্ষ অখণ্ড থাকলে বরং হিন্দির বিপরীতে মুসলমানদের উর্দুকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীই অধিকতর হত। কারণ নিখিল ভারতীয় সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে হিন্দুদের হিন্দির বিপরীতে মুসলমানরা উর্দুকেই তাদের নিজেদের ভাষা বিবেচনা করত। যারা উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিলেন তারা বঙ্গদেশেরও বাংলাভাষার বৈশিষ্ট্যের কথা ভুলে অখণ্ড ভারতীয় পরিবেশে হিন্দি উর্দুর দ্বন্দ্বকেই যে অধিক স্মরণে রেখেছিলেন, তা সুস্পষ্ট।

১৯৪৬ সালের দিল্লী সম্মেলনের আগ পর্যন্ত লাহোর প্রস্তাবকেই মনে করা হত পাকিস্তান আন্দোলনের মূলমন্ত্র। সেই হিসেবে চল্লিশের দশকে ঢাকার পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ ও কলিকাতার পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটিতে "পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা" হিসেবে বাংলার কথাই আলোচিত হত। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তান দাবীর সপক্ষে জনগণের সুস্পষ্ট রায় ব্যক্ত হবার এবং দিল্লীর কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের আংশিক সংশোধন করে উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় একটি মাত্র (পাকিস্তান) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার পরই প্রস্তাবিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে কথাবার্তা ও লেখালেখি শুরু হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অনতিপূর্বে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ জিয়াউদ্দিন উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দিলে তার প্রতিবাদ জানান ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। (দৈনিক ইনকিলাব, ১১ মার্চ, ১৯৯৮)

বিভিন্ন দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন দাবী উচ্চারিত হলেও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব সমূহের অধিকাংশ তা সে মুসলিম জাতীয়তাবাদী হোক কমিউনিস্ট অথবা ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রী হোক তাদের প্রায় সকলে লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হিসেবে উর্দু এর পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনিক এবং গণ নির্দেশনার ভাষা বাংলার পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন। (এ এন জিল ২০০০ : ১৩৫) এটাই ছিল মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের সুদূর প্রসারী বৃহত্তর অবস্থান। এ সত্ত্বেও একটি জিজ্ঞাসা প্রকট হয়ে উঠে, ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে বাংলা ভাষাকে প্রাদেশিক ভাষা ঘোষণার পরও কেন আন্দোলন? এই প্রশ্নের আলোকে আর এক জিজ্ঞাসা এসে যায়, আঞ্চলিকতার বিষবাষ্প থেকে এবং পঞ্চম বাহিনীর অপতৎপরতা এবং তাদের ক্রীড়নক হওয়া থেকে সতর্ক থাকার ব্যাপারে কায়দে আযমের মুখে মুহুর্মুহু সতর্কবাণী উচ্চারিত হচ্ছিল কেন? এটা কি শুধুমাত্র রাজনৈতিক চাপাবাজি?

না, অর্থহীন রাজনৈতিক চাপাবাজির ইতিহাস জিন্নাহর জীবনে কখনই ছিল না। বর্ণবাদী হিন্দুদের নিচ্ছিদ্র ষড়যন্ত্রের বেড়া ভেঙে এবং অখণ্ড ভারত ভেঙে যে মহামানুষ মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাস ভূমি পাকিস্তান ছিনিয়ে এনেছিলেন একমাত্র তার পক্ষেই জানা সম্ভব সমকালীন ষড়যন্ত্রের গভীরতা। সময়ের প্রেক্ষিতে বর্ণবাদী হিন্দু নেতৃত্ব বাংলাকে পাকিস্তানের একটি অংশ হিসেবে মেনে নেয় এই আশায় যে, পূর্ববাংলাকে এক সময় গ্রাস করা সম্ভব হবে। অথবা পূর্বপাকিস্তানীরা নিজস্ব যন্ত্রণায় ভারতের সাথে স্বেচ্ছায় একীভূত হতে চাইবে। এ কারণে তারা পূর্ব পাকিস্তানীদের জন্য যন্ত্রণাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে থাকে প্রথম থেকেই। পাকিস্তান সৃষ্টির আগেই কতিপয় বুদ্ধিজীবীকে কিনে ফেলে ওরা। দীর্ঘদিনের বুদ্ধিবৃত্তিক অভিজ্ঞতা দিয়ে লাঙ্গলের পেছন থেকে আসা হালে গজিয়ে ওঠা বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবিত করে অতি সহজে। পূর্ব বাংলায় আগ্রাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইন্ডিয়ান ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর প্রধান হিসেবে অতিরিক্ত নিয়োগ দেয়া হয় একজন বাঙালী বর্ণবাদী এন মল্লিককে। তিনি প্রধানমন্ত্রী

মতিলাল নেহেরুর সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখতেন। (দি সানডে কোলকাতা ১৮-২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮) তদুপরি বিশেষ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ১৯৪৯ সালে কোলকাতার সন্নিকটে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞজনদের একটি সেল সংগঠিত করা হয় ত্রিগুণা সেনের নেতৃত্বে। একই অবস্থান থেকে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা সম্প্রীতি সমিতি গঠন করা হয় অজিত রায়ের নেতৃত্বে এবং তাদের পত্রিকা এপার বাংলা ওপার বাংলা প্রকাশ করা হয়। একাত্তরের পরে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং এপার বাংলা ওপর বাংলার কো এডিটর ১৯৭১ এর পরে লিখেছেন- 'অজিত রায় এক সময় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর নির্দেশনায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য জাপান ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে কাজ করেছেন। পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মকভাবে আত্ম নিয়োগ করেন। বাংলাদেশে তার রাজনৈতিক স্বার্থ ছিল। বাংলাদেশের রাজনীতিতে তার নীরব ও সক্রিয় ভূমিকা অনেকেরই অজানা। (জিপি ভট্টাচার্য, ১৯৭৩)

পৃথিবীর মানচিত্রে পাকিস্তান দৃশ্যমান হওয়ার আগেই অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্নাবিষ্ট বর্ণ হিন্দুরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। সম্ভাব্য টার্গেট সামনে রেখে পূর্ব পাকিস্তানের কিছু কিছু তরুণকে হরেক রকম আশা ও আশ্বাস দিয়ে অখণ্ড ভারতের সপক্ষে প্রভাবিত করে।

১৯৪৭ সালে ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দুই সপ্তাহ আগে কতিপয় তরুণ গণ আজাদী লীগ গঠন করেন। এদের মধ্যে ছিলেন কামরুদ্দিন আহমদ, মোহম্মদ তোহা, অলি আহাদ এবং তাজুদ্দিন আহম্মদ। এরা পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন একাত্তর পর্যন্ত। এখন প্রশ্ন এসে যায়, সুদীর্ঘ ১৯০ বছর পরাধীনতার পর স্বাধীনতায় উত্তরণের ক্রান্তিকালে কোন্ অশুভ শক্তির ইশারায় পূর্ব পাকিস্তানের মাটিকে উত্তপ্ত করার লক্ষ্যে তারা একটি রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য সক্রিয় হল। দলের মেনিফেস্টোতে বলা হয়েছে, পাকিস্তানের বাঙালীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই তাদের লক্ষ্য। এদের কি বলা যাবে, হয় তারা নির্বোধ অথবা কোন অপশক্তির দালাল এরা। নির্বোধ বলা হচ্ছে এই কারণে যে, সদ্য মুক্ত দেশ পাকিস্তানের প্রশাসন চালানোর মত লোকবল, অর্থবল কিছুই ছিল না, মুসলিম বিশ্বের সহানুভূতিশীলদের অর্থ সাহায্যে সরকারী কর্মচারীদের বেতন ভাতা দিতে হত, এমতবস্থায় তাদের আবার

অর্থনৈতিক মাথা ব্যাথা শুরু হল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই। কি বিচিত্র! অশুভ শক্তির দালাল বলা হল এই কারণে, যারা পাকিস্তানকে সহ্য করতে পারেনি, যারা পাকিস্তানের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছে এই উদ্দেশ্যে যে, পূর্ব পাকিস্তান যেন নিজস্ব যন্ত্রণায় ভারতের সাথে একীভূত হতে চায়। তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যদি কেউ সক্রিয় হয় তাকে দালাল ও পঞ্চমবাহিনী ছাড়া কি বলা যাবে! এদের পরবর্তী কর্মকাণ্ড এটাই প্রমাণ করেছে, এই অপশক্তির ক্রীড়নকরা বাংলা ভাষা দাবীর জন্য সোচ্চার হয়েছিল।

পাকিস্তানের বয়স যখন ২ সপ্তাহ তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার প্রভাষক গণ আজাদী লীগের অন্যতম সদস্য আবুল কাশেম তমুদ্দুন মজলিস গঠন করেন। যদিও এর উদ্দেশ্য লক্ষ্য ছিল ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা এবং এই সাথে এদের তাৎক্ষণিক লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবী আদায় করা। শামসুল আলম, একে এম আহসান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম তমুদ্দুন মজলিসকে দিক নির্দেশনা দেন। কিন্তু এরা মজলিসের কর্মকাণ্ডে জড়িত ছিলেন না। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী কামরুদ্দিন এবং কমিউনিস্ট তোহা মজলিসের সাথে জড়িত ছিলেন। আবুল কাশেম মজলিস প্রতিষ্ঠার ১৫ দিনের মধ্যে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা দাবী করে। একটি হিন্দু প্রেস পুস্তকটি ছাপিয়ে দেয়। একজন হিন্দু ম্যাজেসিয়ান পিসি সরকার তহবিল সংগ্রহ করে দেন। এই পুস্তিকার জন্য চাঁদা প্রদান করে আবুল মনসুর আহমদ এবং ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ, ডক্টর এনামুল সহ অন্যান্য প্রায় সব বুদ্ধিজীবী দূরদর্শী ভাবনা পরিত্যাগ করে হালকা হাওয়ায় ভাসতে থাকেন। আসলে উপমহাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং বর্ণবাদী হিন্দুদের গভীর চক্রান্ত আঁচ করার মেধা সম্ভবত এদের কারো ছিল না। বাংলা ভাষার পক্ষে সংসদে সোচ্চার কণ্ঠ শোনা যায় ধীরেন্দ্র নাথ দত্তসহ অন্যান্য কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের। মুসলিম সাংসদরা ছিলেন নির্বাক দর্শক। তারা স্বাধীনতার প্রথম প্রভাতে অনাহুত সমস্যার উটকো যন্ত্রণায় বিব্রত বোধ করছিলেন। হিন্দু সাংসদরা যা করছিলেন সেটা ছিল দ্বিজাতি তত্ত্বকে অকার্যকর করা এবং বর্ণ হিন্দুদের অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌঁছানোর প্রথম সোপান হিসেবে ব্যবহার করতে। কোন এক বর্ণবাদী বাঙালী বুদ্ধিজীবি কথা প্রসঙ্গে বলেছেন, What Bengali thinks today, all India thinks tomorrow'

এখানে বাঙালী বলতে বুঝানো হয়েছে পশ্চিম বঙ্গের উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের। যারা আমাদের চেয়ে দেড়শত বছর আগে শিক্ষা এবং জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করেছে। আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে তাদের চেয়ে দেড় শত বছর পর। তাদের মেধা তাদের জ্ঞান চর্চা, তাদের উপলব্ধি তাদের বোধ শক্তি ও চেতনা আমাদের চেয়ে সন্দেহাতীত ভাবে অগ্রসর হবে এটাই স্বাভাবিক। তারা শুধু বাংলার মুসলমানদের চেয়ে অগ্রসর ছিল তা নয়, দলমত নির্বিশেষে সমগ্র ভারতের মধ্যে অগ্রসর ছিলেন সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সাংস্কৃতিক সব ক্ষেত্রে। এ সত্ত্বেও তারা অকপটে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে মেনে নিয়েছেন কোন রকম বাদ প্রতিবাদ না করে। অথচ তারাই পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলনে ইন্ধন যুগিয়েছে অর্থ ও কৌশল সরবরাহ করেছে। আর আমাদের লাঙ্গলের পেছনে থেকে আসা সদ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুণদের মন মস্তিষ্কে গরল ঢেলে আত্ম হননের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। অন্যদিকে আমাদের অগ্রজ অপরিণামদর্শী বুড়োরা হয় নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়েছে অথবা বুদ্ধি পরামর্শ এবং পৃষ্ঠপোষকতা দান করে পূর্ব বাংলার তরুণদের অপ্রতিরোধ্য আত্মঘাতী করে তুলেছে।

ওরা এখানকার দেশ প্রেম নয় ভাষা প্রেমের রাজনৈতিক উন্মাদনায় উদ্দীপ্ত করেছে বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনের জন্য। ভাষা কেন্দ্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ২শ বছরের বঞ্চনার ধকল কাটিয়ে ওঠার আগেই আর এক শোষণ বঞ্চনার কৃত্রিম আবহ সৃষ্টি করে ওরা সম্ভাবনাময় তরুণদের মারমুখো মরিয়া করে তোলার নীল নক্সা বাস্তবায়নে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবী হল ধর্ম নিরপেক্ষ গণতন্ত্রী গণ প্রজাতন্ত্র এবং কমিউনিস্টরা চেয়েছে ইউনাইটেড ষ্টেট অব সোসালিষ্ট রিপাবলিক। যদিও বাহ্যিক দিক দিয়ে দুটো পরিভাষার মধ্যে বিশাল পার্থক্য অনুভূত হবে। কিন্তু পাকিস্তানের ইসলামী পরিচিতি এবং মুসলমানদের আশা আকাঙ্খা কেড়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের নামে কেন্দ্রকে দুর্বল করার ব্যাপারে কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টি ছিল ঐক্যবদ্ধ। দুই সংগঠনেরই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধি বৃত্তিক উৎস ছিল কোলকাতা। কমিউনিস্ট পার্টির মুসলিম সদস্যরা তখনও, সম্ভবত এখনও জানেন না যে উপমহাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন বর্ণবাদী হিন্দুরা। এদের সাম্যবাদী শ্লোগান ও উম্মাদনা থাকলেও কংগ্রেসের মত আধিপত্যবাদী লক্ষ্য রয়েছে তাদের মুখোশের অন্তরালে। যেহেতু কোলকাতা থেকে চালিত

হত কমিউনিস্ট পার্টি, কংগ্রেস এ কারণে উভয় শক্তিই বিঘূর্ণিত হয়েছে একই লক্ষ্যকে কেন্দ্র করে। সেই লক্ষ্য আর কিছু নয় অখণ্ড ভারতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, দ্বিজাতি তত্ত্ব এবং এর অর্জিত সব কিছুকে ধ্বংস করা। একারণে তারা ভাষাভিত্তিক ঐক্য যে কোন মূল্যে টিকিয়ে রাখতে চাইল। কিন্তু সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপের ফলে ভাষা আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত হয়ে এল। দীর্ঘ আলাপ আলোচনা এবং বাদ প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে একটি রেজাল্ট বেরিয়ে এল পূর্ব পাকিস্তানের আইন প্রশাসনের মাধ্যম হবে বাংলা। কিন্তু পাকিস্তানের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হবে উর্দু।

এতদসত্ত্বেও তমুদ্দুন মজলিস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক প্রতিবাদ সভায় প্রকাশ্যে সরকারকে দোষারোপ করল। ক্ষমতাসীন পার্টি মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সভাপতি হিসেবে মাওলানা আকরম খা একটি বিবৃতি দিয়ে এবং বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ভাষণ দিয়ে বললেন, পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাকে উৎখাত করে উর্দু চাপিয়ে দেয়ার কোন প্রশ্নই নেই। বাংলাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ও প্রশাসনের ভাষা। ওদিকে মজলিস, নতুন ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগ, ছাত্র ফেডারেশন এবং গণতান্ত্রিক যুব লীগকে নিয়ে ভাষা কমিটি নতুন করে সংগঠিত করল। এ সময় পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম রাষ্ট্র ভাষা উর্দুর দাবীতে তাদের নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রাখে। উর্দুর দাবীতে তারা সিগনেচার ক্যাম্পেইন শুরু করে। ইতোমধ্যে সেক্রেটারিয়েটের কেরানীদের মধ্যে বাংলা ও উর্দুর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ও প্রশাসনের ভাষা হিসেবে বাংলাকে মেনে নিয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষার দাবী পরিহার করে এবং সেটা জনগণের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেয়। (তোহা ১৯৮১)। গণ আজাদী লীগও অনুরূপ সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৮ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারী তমুদ্দুন মজলিস মুসিলম ছাত্রলীগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে বর্ধিত কলেবরে সংগ্রাম কমিটি পুনর্গঠিত হল। ১১ মার্চ প্রতিবাদ দিবস সফলভাবে পালিত হল। হরতাল ও বিক্ষোভ প্রদর্শিত হল। মিছিলে পুলিশের হামলা হল। গ্রেপ্তার হলেন অনেকে। কিন্তু বিক্ষোভ থামল না। ১৪ই মার্চ পর্যন্ত বিক্ষোভ অব্যাহত রইল। ১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। ১৯ মার্চ কায়দে আযম ঢাকায় এলেন।

এ সময় সবচেয়ে বেশী দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিলেন লঘুচেতা শেরে বাংলা একে ফজলুল হক তার অতীত কর্মকাণ্ড থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে। তিনি তখন এডভোকেট জেনারেল হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ১১ মার্চের বিক্ষোভ মিছিলে আকস্মিকভাবে যোগ দিলেন তার বার্ধক্য সত্ত্বেও। তিনি ১৯৩৯ সালে কোলকাতা নিখিল ভারত মুসলিম কনফারেন্সে উর্দুর উপর গুরুত্বারোপ করেন। এমনকি তিনি আরবী বর্ণমালায় বাংলা লেখার পক্ষপাতি ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় পরিষ্কার করে দেয়া হয়, বাংলা হবে প্রদেশের শিক্ষা নির্দেশনা ও প্রশাসনের ভাষা। এর কয়েক মাস পর কায়েদে আযম ২১ মার্চ ঢাকায় এক ভাষণে বললেন- "Whether Bengali shall be the state language of this province is a matter for the elected representative of the people of this province to decide... let me tell you in the clearest language that there is no truth that your normal life is going to be touched or disturbed as for your Bengali language is concern."

জিন্নাহর দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যের স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা হিসেবে অনুমোদন করে।

অদূরদর্শী তারুণ্যের আবেগজনিত কর্মকাণ্ডকে যৌক্তিকতার প্রলেপ দিয়ে আজকের প্রবীণ নেতা জনাব অলি আহাদ লিখেছেন- 'স্বাধীনতার পর কায়েদে আযম প্রথম পূর্ববঙ্গ সফর উপলক্ষে ১৯ মার্চ ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করিলে তাহাকে অশ্রুত ও স্বতস্ফূর্ত ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ঢাকা বিমান বন্দর হইতে রেসকোর্স পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য ছিল। তিল ধারণের স্থান কোথাও ছিল না। হর্ষোৎফুল্ল জনতার এই ঢল দেখিয়া কে বলিবে, মাত্র দুই দিন পূর্বেও ঢাকা শহরে সরকার বিরোধী আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ ঢাকার কর্তাব্যক্তিদের মসনদকে টলটলায়মান করিয়া তুলিয়াছিল। দেশবাসীর কি অকৃত্রিম ভালবাসাই না ছিল রাষ্ট্রের জনকের প্রতি। অতি পরিতাপের বিষয় কায়দে আযম ২১শে মার্চ রেসকোর্সে অনুষ্ঠিত জন সমাবেশে ভাষণ দানকালে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে, উর্দুই

পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হইবে এবং ভাষা আন্দোলন বিদেশী চক্রান্ত বিশেষ।

কায়দে আযমের আমন্ত্রণে ২৪শ মার্চ সর্বজনাব শামসুল হক, নইমুদ্দিন আহমদ, আজিজ আহমদ, কামরুদ্দিন আহমদ, শামসুল আলম, তাজুদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক আবুল কাশেম, মোঃ তোয়াহা এবং আমি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হইতে তাহার সহিত পূর্ববঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদের বাসভনে (পরবর্তী মিণ্টু রোডস্থ গণভবন) এক বৈঠকে মিলিত হই। পরস্পরের শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর কায়দে আযমের সহিত আলাপ আলোচনা শুরু হয়। আলোচনার প্রারম্ভে কায়দে আযম মন্তব্য করেন যে, একাধিক রাষ্ট্রভাষা রাষ্ট্রের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর। ইহার জবাবে কামরুদ্দিন আহমদ বলেন যে, সুইজারল্যান্ড ও কানাডায় একাধিক রাষ্ট্রভাষা জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি করিয়াছে।

কায়েদে আযম তদুত্তরে অসহিষ্ণু স্বরে বলেন যে, তাহাকে ইতিহাস শিখাইতে হইবে না, তিনি ইতিহাস জানেন। অবচেতনভাবে আমি প্রতিউত্তরে বলিয়া ফেলিলাম যে, ইতিহাস নিশ্চয় আপনি জানেন, তবে রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করছেন। অতঃপর কায়দে আযম ধীরস্থির শান্ত কণ্ঠে পাকিস্তান সংগ্রামের ইতিবৃত্ত চুম্বুক ভাষায় বিবৃত করিয়া আবেগের মুহূর্তে আমাদের ইংরেজিতে বলিলেন- In the interest of integrity of Pakistan, if necessary you will have to change your mother tounge অর্থাৎ পাকিস্তানের সংহতির খাতিরে প্রয়োজনবোধে তোমাদিগকে মাতৃভাষা পরিবর্তন করিতে হইবে।'

অতি সম্প্রতি (দৈনিক ইনকিলাব, ৪ মার্চ, ১৯৯৮) এক সাক্ষাৎকারে জনাব অলি আহাদ বলেছেন- 'কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছিলেন সত্যবাদী স্পষ্টভাষী। ধোকা কাকে বলে তিনি জানতেন না। গান্ধীজি, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুসহ ভারতের নামকরা প্রায় সব রাজনীতিবিদদেরই জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তারা ছিলেন প্রতারক। কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সমগ্র অখন্ড ভারতের কোন প্রসঙ্গে যার মধ্যে দোদুল্যমানতা ছিল না। ছিল সত্যবাদিতা, স্পষ্টবাদিতা। আমরা তার নেতৃত্বে কাজ করছি। কিন্তু পরবর্তীকালে সে মানের নেতৃত্ব আমরা পাইনি।'

আর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন- 'একমাত্র কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর অনুসারী আমি।' (দৈনিক ইনকিলাব, ৪ মার্চ, ১৯৯৮)

পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা হিসেবে বাংলাকে অনুমোদন দানের পর পরিস্থিতি বলতে গেলে নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবী কিছু সংখ্যক ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীর সীমিত পরিসরে বিঘূর্ণিত হতে থাকে। কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট পার্টির রাজনৈতিক অঙ্গনে এ সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা অব্যাহত থাকলেও এর অবস্থান শক্তি সঞ্চার করতে পারেনি। ভাবাবেগ জোরদার হয়ে উঠে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী কমিউনিস্টদের উদ্যোগে আহুত ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের গুলিতে তিন জনের মৃত্যুর পর। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত ছিলেন। এই ঘটনা সংঘটিত হয় জিন্নাহ এবং লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর। তখন থেকে স্বার্থবাদী রাজনীতির ধারা শুরু হয়। শুরু হয় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। মুসলিম লীগের গতিশীলতা ক্রমশ ক্ষীয়মান হতে থাকে। মুসলিম লীগের সম্প্রসারণ ও সদস্য সংগ্রহ সীমাবদ্ধ করা হয়। তাদের ছাত্র ফ্রন্টের তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়। উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের নিদারুণ পরাজয় সাধারণ মানুষকে স্তম্বিত করে দেয়। এসবের মধ্য দিয়ে মুসলিম লীগ গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

কংগ্রেস কমিউনিস্ট পার্টি এবং নব গঠিত সেকুলার দল আওয়ামী মুসলিম লীগ কেন্দ্রকে দুর্বল করার জন্য তৎপর হয়ে উঠে। মিথ্যাচার গুজব অপপ্রচার গণমনে স্থান পেতে থাকে। এর পেছনে কারণ ছিল একটি, সেটা হল সংবাপত্র ও পত্র পত্রিকা সবগুলো ছিল কমিউনিষ্ট অথবা সেকুলারিষ্টদের দখলে। পাকিস্তান বিরোধী প্রচারণা, ষড়যন্ত্র ও তৎপরতা চলাকালে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বক্তব্য দিয়ে পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করে ফেললেন। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারী ঢাকায় সফরে এলে তিনি বলেন, জাতীয় পরিষদের মূল নীতি নির্ধারক কমিটি পাকিস্তানের সরকারী ভাষা হিসেবে উর্দুকে অনুমোদন দিয়েছে।

এই ঘোষণার প্রতিবাদে ছাত্ররা অনেক বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করে। একটি সভার সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রেসিন্ডেন্ট আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। তিনি এর আগে বাংলাভাষা আন্দোলনের জন্য

অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন। একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হল। এই কমিটি ২১ ফেব্রুয়ারী সাধারণ ধর্মঘট পালনের ডাক দিল। এই দিন প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেশন হওয়ার কথা। সরকার ২১ ফেব্রুয়ারী সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। ২০ ফেব্রুয়ারী আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর অবর্তমানে আবুল হাশিম- এর সভাপতিত্বে সংগ্রাম কমিটির সভা হল। এতে আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য ২১ ফেব্রুয়ারীর পরিবর্তে ২২ ফেব্রয়ারী বিক্ষোভ সমাবেশের সিদ্ধান্ত নেয়া হল। কিন্তু ২০ ফেব্রুয়ারী রাত্রিতে যুব লীগের নেতারা তাদের কমিউনিষ্ট গুরুদের প্ররোচনায় সংগ্রাম কমিটির সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত নিল এবং বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে অগ্রসর হল এবং খুন জখমের মধ্য দিয়ে মিছিলের সমাপ্তি হল। কংগ্রেস সদস্যরা সরকারকে দোষারোপ করে পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করলেন। বেশ কিছু মুসলিম সদস্য তাদের অনুসরণ করলেন। দৈনিক আজাদের সম্পাদক মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করলেন এবং দৈনিকটিও সরকার বিরোধী অবস্থান নিল। যদিও আজাদের মালিক তখনও মুসলিম লীগের প্রাদেশিক প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখলেন। পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারী মুসলিম লীগ সমর্থিত দৈনিক মর্নিং নিউজ এবং সংবাদের কার্যালয় আক্রমণ করে পুড়িয়ে দেয়া হল। যেখানে পুলিশের গুলি বর্ষণ করা হয়েছিল সেখানে শহীদ মিনার গজিয়ে উঠল। সরকার উদ্যোক্তাদের অনেককে গ্রেপ্তার করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনল এবং হাইকোর্টের একজন ইংরেজ বিচারকের উপর বিচার বিভাগীয় তদন্তের দায়িত্ব অর্পন করা হল। ইতোমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে স্বীকৃতির ঘোষণা দিলেন। (ডন করাচী, ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২)

এক মাস পর মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন প্রাদেশিক পরিষদে কমিউনিস্ট এবং ভারতীয় এজেন্টদের রাজনীতির ছদ্মাবরণে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগ তুলে তৎকালীন পরিস্থিতির বিস্তৃত বিবরণ দেন। তিনি বলেন, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে ব্যাপক পরিমাণ ধ্বংসাত্মক প্রচার পত্র উদ্ধার করা হয়। নারায়ণগঞ্জের মিছিলে জয়হিন্দ এবং যুক্ত বাংলা চাই শ্লোগান দেয়া হয়। নব গঠিত আওয়ামী লীগের নেতা এবং এম এল এ এবং জনৈক মারোয়ারীর সাথে সম্পৃক্ত পাট ব্যবসায়ী ওসমান আলীর বাসগৃহ থেকে ধ্বংসাত্মক লিফলেট উদ্ধার করা হয় এবং একই অবস্থান থেকে ভারতীয় হিন্দু যুবকদের গ্রেফতার করা হয়। একই ধরনের গ্রেফতার হয়

চট্টগ্রাম, রাজশাহী এবং আরো কিছু স্থানে। (বি আল হেলাল ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ৪৪৯- ৫০)। ছাত্র লীগের নেতৃবৃন্দ যারা বিক্ষোভে অংশ নিত তারা প্রতিদিন বুলেটিন প্রকাশ করত। বুলেটিনের হেড লাইন ছিল এ ধরনের- পূর্ব বঙ্গে রক্তাক্ত বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ, পূর্ব বঙ্গ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলনের ব্যাপক অগ্রগতি ইত্যাদি। (এম, এ মোহাইমেন, ১৯৮৬ : ২১)।

কোলকাতার কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র নিয়মিত এ সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করতো এবং তাদের এক সম্পাদকীয়তে জেলা এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কমিউনিস্টদের দিক নির্দেশনার দাবী করা হয়। (স্বাধীনতা, কলিকাতা, ১০ এবং ১১ মার্চ ১৯৫২) তমদ্দুন মজলিসের মুখপত্র দৈনিকটি একথা স্বীকার করে যে, রাজনৈতিক সুযোগ সন্ধানী এবং পাকিস্তান বিরোধী চক্র ভাষা আন্দোলনকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। (ঢাকা, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২)। সমকালীন চীফ সেক্রেটারী প্রায় দু'দশক পর স্বীকার করেন যে, গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্টে বলা হয়েছিল বেশ কিছু ভারতীয় অনুপ্রবেশ করেছে এবং কমিউনিস্টরা অত্যন্ত তৎপর। (এ এন্ড এ দীল ২০০০: ১৮৩) অর্থপূর্ণ কারণে ২১ ফেব্রুয়ারী গুলিবর্ষণকারী পুলিশ অফিসারদের চিহ্নিত করার ব্যাপারে সহায়তা করার পরিবর্তে নেতৃস্থানীয় আন্দোলনকারীদের অধিকাংশ এলিস কমিশন থেকে দূরে অবস্থান করে। জাস্টিস এলিস বলেন, আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দ সকলে সহযোগিতা করলে তদন্ত যথাযথ হতে পারত। (এ ওহাব, বি ওমর ১৯৮৫ : ১৬৬- ৭০) জাতীয় প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক অবশেষে আলোড়ন সৃষ্টিকারী তথ্য প্রকাশ করেন। সেটা হল ২১ ফেব্রুয়ারী যার মৃত্যুর কারণে সংকটের সূচনা হয়েছে সেই আবুল বরকত পুলিশের ইনফরমার ছিল। পুলিশের উপর প্রবল আক্রমণের সময় তার মৃত্যু হয়। (বিচিত্রা ঈদ সংখ্যা ১৯৮৮)

দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা এবং সময়ের বাস্তবতার মধ্য দিয়ে অনেকেই কায়দে আযমকে নতুন করে উপলব্ধি করছে। ১৯৪৮ সালে ভাষার প্রশ্নে জনাব অলি আহাদ এবং আরো অনেকেই কায়দে আযমকে বিব্রত করেছিলেন। উপমহাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কোনটা সঠিক ছিল এখনো সেটা নিরূপিত না হলেও আগামী দিনের ইতিহাস নিরূপণ সেটা করবে। কায়দে আযম এ কারণেই অসহযোগ আন্দোলন এবং খিলাফত

আন্দোলনকে সমর্থন দেননি। সময় বলে দিয়েছে জিন্নাহর সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। জিন্নাহ ছিলেন ভাবাবেগ বর্জিত নিঃস্বার্থ দূরদর্শী মহান নেতা। জিন্নাহর ভাষা উর্দু ছিল না এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষাও উর্দু ছিল না। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষাকে বাঙালীদের উপর চাপিয়ে দেননি এবং বাংলাকে আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে ব্যবহার করতেও নিষেধ করেননি। তিনি রাষ্ট্রীয় ঐক্য এবং সংহতির জন্য একটি ভাষার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যদিও অন্যান্য অনেক দেশে একাধিক ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালু রয়েছে। কিন্তু অন্যদেশ এবং পাকিস্তানের প্রেক্ষিত ছিল ভিন্ন। পাকিস্তানের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী শত্রু পরিবেষ্টিত ছিল পাকিস্তান। দুই অংশের ব্যবধান ছিল ১২০০ মাইল। তিনি সবকিছু বিবেচনা করে রাষ্ট্রীয় ভাষা উর্দু করার চেষ্টা নিয়েছিলেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দি হওয়াতে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীরা আন্দোলন করেনি কারণ জাতীয় সংহতির জন্য সেটা ছিল অপরিহার্য। অথচ পূর্ববাংলার মানুষের চেয়ে পশ্চিম বাংলার মানুষ শিক্ষা দীক্ষা কৃষ্টি কালচারের দিক দিয়ে ছিল অগ্রগামী। আজো ভাষার প্রশ্নে হিন্দুস্থানের কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। অথচ কোলকাতার পত্রিকাগুলো ভাষা আন্দোলন জোরদার করার জন্য আমাদেরকে অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনা খয়রাত করতো। কিন্তু কেন এটুকু তলিয়ে দেখেনি আমাদের আবেগপ্রবণ লঘুচেতা নেতৃবৃন্দ। ভাষার প্রশ্নে কায়দে আযমের সিদ্ধান্তকে অনেকেই এখন আবেগহীন বাস্তবতা দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করেছেন। যেমন আওয়ামী লীগের সাবেক নেতা এবং এমপি জনাব এম এ মোহাইমেন তার প্রকাশিত ফেব্রুয়ারী ১৯৯৪ প্রথম সংস্করণ ইতিহাসের আলোকে দেশ বিভাগ কায়দে আযম জিন্নাহ শুরুতেই তাঁর গ্রন্থে লিখেছেন,

'উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার পীড়াপীড়ির পিছনে জিন্নাহ বিরোধীরা তাঁর বাঙ্গালী বিদ্বেষী মনোভাব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষার ঐকান্তিক আগ্রহের প্রমাণ বলে মনে করেন। পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মানুষের ধারণা জিন্নাহ সাহেবের মাতৃভাষা ছিল উর্দু। তাই উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবির পিছনে জিন্নাহ সাহেবের স্বীয় ভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্বের নিদর্শন মনে করে বাঙ্গালী মাত্রই ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালীই জানেনা যে, জিন্নাহ সাহেবের মাতৃভাষা ছিল গুজরাটি; উর্দু নয়। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার পিছনে তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী পাঁচটি রাষ্ট্রকে একই ভাষার মাধ্যমে এক জাতিতে পরিণত করা। ভাষা যেহেতু জাতি

গঠনের মাধ্যম হিসেবে অনন্য অবদান রাখতে সক্ষম তাই এক ভাষার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষগুলোকে একজাতীয়তা ও ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করার জন্যও উর্দুকে মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর ধারণা ছিল উর্দু যেহেতু বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান কারোই ভাষা নয়, তবে সব প্রদেশগুলোতেই এ ভাষা মোটামুটি বোধগম্য তাই এ ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করলে অন্যান্য প্রদেশ থেকেও তাদের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উঠবে না। উর্দু যেহেতু পাকিস্তানের কোন প্রদেশের ভাষা নয়, এটি যুক্তপ্রদেশের মুসলমানদের ভাষা যার সঙ্গে সারা ভারতের মুসলমানরা মোটামুটি পরিচিতি তাই এ ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করতে পাকিস্তানের সকল অংশের মানুষ সহজে রাজি হবে'।

এক জাতি গঠনের লক্ষ্যে জিন্নাহ সাহেব যে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এর পিছনে তার কোন সংকীর্ণ মনোভাব ছিল না- এর প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত থেকে। হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার পিছনে কি উদ্দেশ্য ও মনোভাব প্রধানমন্ত্রী হিসেবে জওহরলালের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর রচিত Glimpses of World History থেকে। তিনি যখন ১৯১২ সনে সানইয়াং সেনের সঙ্গে দেখা করার জন্য চীন যান তখন তাঁর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, চীনের উত্তর অঞ্চল মানচুরিয়া থেকে দক্ষিণে নানকিং পর্যন্ত এ সাড়ে তিন হাজার মাইলের বিরাট দেশে সমস্ত মানুষই চীনা ভাষার কথা বলে, যদিও উত্তর আর দক্ষিণের মধ্যে উচ্চারণে স্থানীয় কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্য সত্ত্বেও উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত এ বিরাট দেশের লোক একজনের কথা আরেকজন সহজে বুঝতে পারে। এর ফলে এই বিরাট দেশের মানুষগুলোর মধ্যে একটা অখণ্ড জাতীয়তা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠেছে যেটা ভারতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। চীনের ঐক্য ও জাতীয়তাবোধের প্রেক্ষিতে তিনি দুঃখ করে বলেছেন, হায়রে আমার ভারতবর্ষ সেখানে বাঙ্গালী গুজরাটির ভাষা বুঝে না, গুজরাটি আবার মারাঠিদের ভাষা বুঝে না, মারাঠিরা আবার তামিলদের ভাষা বুঝে না। তারা প্রত্যেকে একজন থেকে আর একজন সম্পূর্ণ আলাদা স্বতন্ত্র জীবন- যাপন করছে। কারও মধ্যে ভাষার বিভিন্নতার কারণে চিন্তার দিক থেকে কোন ঐক্যবোধ নেই। এক জাতি হিসেবে নিজেদেরকে এরা চিন্তাই করতে পারে না। চীনের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন, ভারত যদি

কখনো স্বাধীন হয় তবে এই বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষগুলোকে এক জাতিতে পরিণত করার জন্য ভাষাই হবে একমাত্র বন্ধন। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার পিছনে খুব সম্ভব তাঁর এ মনোভাবই কাজ করেছিল। তিনি ভেবেছিলেন, হিন্দি মোটামুটি সকলে বুঝতে পারে তাই তিনি ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষদেরকে এক ভারতীয় জাতি হিসেবে গড়ে তুলবার মানসে হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতের উত্তর অঞ্চলে তিনি সফল হলেও দক্ষিণ অঞ্চলে অদ্যাবধি সফল হন নাই। দক্ষিণের তামিল তেলেগু অর্থাৎ বৃহত্তর মাদ্রাজ অঞ্চল আজও হিন্দিকে গ্রহণ করেনি। যেমন বাংলাদেশ উর্দুকে গ্রহণ করেনি। হিন্দিকে ভারতে রাষ্ট্রভাষা করার পিছনে জওহরলালের যেমন সদিচ্ছাই ছিল, কোন কু- মতলব ছিল না, তেমনিই আমাদের মনে হয় উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পিছনে জিন্নাহ সাহেবেরও সৎ উদ্দেশ্যই ছিল, কোন প্রকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দুরভিসন্ধি ছিল না। তাঁর গৃহীত নীতি হয়তো ভুল হতে পারে তবে এর পিছনে যে তাঁর কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

জিন্নাহ সাহেবের প্রতি দ্বিতীয় অভিযোগ হল যে, তিনি ১৯৪৬ সনের মার্চ মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ কনভেনশনে দুই সার্বভৌম স্টেটসকে এক স্টেটে রূপান্তরিক করেন। '৪০ সনের মূল লাহোর প্রস্তাবে ছিল পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে দুইটি সার্বভৌম স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন হবে। '৪৬ সনে তিনি দুই রাষ্ট্রের জায়গায় এক রাষ্ট্র করে বাংলার মুসলমানদের পশ্চিম পাকিস্তানীদের অধীন করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীরা জিন্নাহর '৪৬ সনের এই পরিবর্তনকে বাঙালী জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁকে বাঙালীর শত্রু হিসেবে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস চালিয়ে আসছিল।

জিন্নাহ সাহেবের গণতন্ত্রের চেতনা, তাঁর নির্লোভ চরিত্র ও যুক্তিবাদী চিন্তার সঙ্গে যারা পরিচিত তাদেরকে তাঁর শেষ মুহূর্তে এ সিদ্ধান্ত নেয়ার পেছনে জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন তাগিদ ছিল কিনা এ ব্যাপারে গভীরভাবে ভেবে দেখতে হবে। জিন্নাহ্ সাহেব জন্মসূত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের লোক ছিলেন না। তাঁর মাতৃভাষা উর্দু ছিল না। ধন দৌলতের প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না। খ্যাতনামা ব্যারিস্টার হিসেবে বিপুল অর্থ উপার্জনের

মারফত যে অগাধ সম্পত্তির মালিক তিনি হয়েছিলেন সে অর্থ নিজের একমাত্র কন্যাকে দান না করে দেশের জন্য তিনি দান করে গিয়েছিলেন। এহেন ব্যক্তির কাছে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থকে আলাদা চোখে দেখার কোন কারণ ছিল বলে মনে হয় না। দুই অঞ্চলের লোকের স্বার্থকে তাঁর মত সচ্চরিত্র ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির সমান দৃষ্টিতে দেখাই ছিল স্বাভাবিক। এই সম্পর্কে গভীরভাবে যারা চিন্তা করেছেন তাদের কাছে এটাই মনে হয়েছে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের স্বার্থেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। (নতুন সফর, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭)

বলশেভিকরা সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাদের আদর্শ সুমুন্নত করার জন্য বর্ণমালা এবং পরিভাষার পরিবর্তন করে। এর কারণ আবিষ্কারের জন্য কোন ষড়যন্ত্র তালাশ না করে বরং বলা যায়, নতুন প্রজন্মকে সাবেকী আমলের বুর্জোয়া সাহিত্যের আবিলতা মুক্ত রাখার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল এর পেছনে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নির্ভেজাল কমিউনিস্ট গড়ে তোলো। (শিক্ষা দীক্ষা নাজেদা ক্রুপস্কায়া)

অনুরূপভাবে তুরস্কে কামাল আতাতুর্ক ক্ষমতা দখল করে আরবী বর্ণমালা পরিবর্তন করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম নয়, পাশ্চাত্যের চিন্তাধারায় তার দেশের মানুষকে গড়ে তোলা। তার এ পদক্ষেপ সঠিক ছিল না বেঠিক ছিল আমরা সেই আলোচনার অবতারণা না করে বলতে পারি যে, সেকুলার চিন্তাধারা বাস্তাবায়নের জন্য কামাল পাশার এই পদক্ষেপ অপরিহার্য ছিল।

প্রত্যেকটি জাতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে সেই দেশের নীতি কৌশল ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। পাকিস্তান আন্দোলনের পিছনে ছিল একটি আদর্শ এবং চেতনা। এই চেতনাকে সমুন্নত করার দায়িত্ব ছিল তারই যিনি হিন্দু ও বৃটিশ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে উপমহাদেশের নিগৃহীত মুসলমানদের জন্য ছিনিয়ে এনেছিলেন স্বাধীন স্বতন্ত্র আবাসভূমি। কায়দে আযম জানতেন ষড়যন্ত্রের গভীরতা। তিনি মুসলমানদের স্বার্থ সমুন্নত করার জন্য তাদের কাছ থেকে পাকিস্তান ছিনিয়ে এনেছিলেন। যারা মুসলমানদের স্থায়ীভাবে গোলাম বানিয়ে রাখার জন্য অখন্ড ভারতের অকৃত্রিম প্রবক্তা হয়ে পাকিস্তান আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন, কোন অবস্থায় তারা পাকিস্তানের

দাবীকে স্বীকার করে নেয়নি। একান্ত বাধ্য হয়ে যখন ভারতকে খন্ডিত করতে হলো, তখন তারা পরিকল্পনা নিল, যে কোন মূল্যের বিনিময়ে পাকিস্তানকে অখন্ড ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কায়েদে আযম তার ধীশক্তি এবং দূরদর্শী অনুভব দিয়ে ভাষা আন্দোলনের অনিবার্য পরিণতি আঁচ করেছিলেন। তিনি জানতেন বাঙলার মুসলমানদের দৈন্য ও অশিক্ষার সুযোগে হিন্দুরা ভাষার উপর যে দখলীস্বত্ব কায়েম করে আছে, যেভাবে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি দ্বারা মুসলমানরা প্রভাবিত হয়ে আছে, তা থেকে নতুন প্রজন্মকে বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠবে এবং এ অঞ্চলের মুসলমানরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেও এক ধরনের গোলামীকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিবে। পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, কায়েদে আযমের অনুভব এবং দূরদর্শিতা কত গভীর ছিল।

ডঃ এবনে গোলাম সামাদ লিখেছেন- 'ভাষা আন্দোলন বিশ্লেষণ হওয়া উচিত বাংলাভাষী মুসলমানদের ইতিহাসের ধারায়, কারণ কেবল তারাই করেছিলেন এই আন্দোলন। (দৈনিক ইনকিলাব, ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮)

জনাব এবনে গোলাম সামাদের প্রত্যাশিত ঔচিত্যবোধের সীমা অতিক্রম করেছিল পঞ্চাশের দশকেই। এই আন্দোলন শুরু করেছিলেন সেই মুসলমানরা যারা আন্তরিকভাবে ইসলামী তাহজিব তমুদ্দুনে বিশ্বাসী ছিলেন। মজলিসের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মুসলিম ছাত্রলীগ ও অন্যান্য সংগঠনের সম্মিলিত আন্দোলন '৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী কতিপয় মূল্যবান জীবনের বিনিময়ে যে সাফল্য অর্জন করেছিল সেটা তাদের সামনেই প্রবাহিত হয়েছিল ভিন্ন খাতে। নিরুপায় অবস্থান থেকে তাদের অনেককেই আমি লোকচক্ষুর অন্তরালে কাঁদতে দেখেছি। আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এদের অনেকেরই নাম ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা নেয়া হচ্ছে। যেমন করে জামায়াতে ইসলামীর কেয়ারটেকার ফর্মূলার পথ ধরে জামায়াতের ঘাড়ে পা রেখে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়ে জামায়াতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছে। মসনদকে সুসংহত করে হাসিনা এখন জামায়াতকে ডাণ্ডা দেখাতেও কসুর করেনি। আর জামায়াতে ইসলামী উদ্বেগ হতাশা এবং বঞ্চনার তীরে দাঁড়িয়ে অধ্যাপক গোলাম আযমকে কেয়ারটেকার সরকারের রূপকার হিসেবে উপস্থাপন করে নির্বোধোচিত

আত্মতৃপ্তি পাওয়ার চেষ্টা করছে। অনুরূপভাবে তমুদ্দন মজলিসের সাথে সংশ্লিষ্টরা এবং সমকালীন দেশপ্রেমিক ইসলামপন্থী তরুণ নেতৃত্ব প্রৌঢ়ত্বের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নিজেদের ভাষা আন্দোলনের উদ্যোক্তা হিসেবে কল্পনা করে আত্মপ্রবঞ্চনার অতৃপ্ত আনন্দ পেতে চাচ্ছেন।

তমুদ্দন মজলিস, মুসলিম ছাত্রলীগ এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবি ও সংগঠনসমূহের উদ্যোগে সৃষ্ট '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন সফলতার দ্বারপ্রান্তে এসে উপনীত হলে ছাত্র ইউনিয়ন নামে একটি নতুন ছাত্র সংগঠন ছাত্র আন্দোলনে আবির্ভূত হয়। এই সংগঠনটি ছিলো কমিউনিস্ট আন্দোলনের ছাত্র শাখা। কমিউনিস্টদের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ ছিলেন হিন্দু। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দিক নির্দেশনায় এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন পরিচালিত হতো। আর কমিউনিস্টরা রাজনৈতিক দিক দিয়ে ছিল অত্যন্ত সচেতন। হাওয়াকে নিজেদের দিকে প্রবাহিত করার অসীম দক্ষতা ছিল এদের। এর কারণ হলো রাজনীতির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মীদের সচেতন এবং দক্ষ করে তোলার প্রক্রিয়া এ সংগঠনে শুরু থেকেই অব্যাহত ছিল। আবেগপ্রবণ উঠতি বয়সের তরুণদের তারা মহান আদর্শবাদের ইউটোপিয়া দিয়ে আচ্ছন্ন করে ফেলতো। তাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ ছিল মুসলিম তরুণদেরকে ইসলাম বিমুখ করে তোলা। ভাষা আন্দোলনের ছিদ্রপথ দিয়ে, ভাষা আন্দোলন কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক ব্যঞ্জনা দিয়ে অতি সহজেই তারা তরুণদের উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। তাদেরই পরোক্ষ ইন্ধনে মুসলিম ছাত্রলীগের লেজ কাটা হয় অর্থাৎ মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে হিন্দুদের সন্তুষ্ট করার উদ্যোগ নেয়া হয়। '১৯৬৮ সালে ছাত্রলীগের ষোঘণাপত্রে বলা হয়- রক্তক্ষয়ী বায়ান্নর পর ১৯৫৩ সালের কাউন্সিল অধিবেশনে এ প্রস্তাব (মুসলিম শব্দটি পরিহার করা) চূড়ান্তভাবে কার্যকরী করা হয়। (বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, ডক্টর এম এ হান্নান, পৃ.- ১৯)

আওয়ামী লীগও নামের আগে মুসলিম শব্দটি পরিহার করে। কাজী জাফর আহমদের প্রতিবেদনে (১৯৬৩) এ বিষয়ে একটি বিবরণ রয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়- '১৯৫৬ সালে আমাদের তৃতীয় কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম বৃহৎ রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিজেদের অসাম্প্রদায়িক

প্রতিষ্ঠানরূপে ঘোষণা করে এবং দলের নাম হতে মুসলিম শব্দটি উঠিয়ে দেয়া হয়।'

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর আদর্শিক কার্যকারণে পরিত্যক্ত অপসৃয়মান হিন্দুস্থানী জাতীয় বীর ও মনীষী এবং বুদ্ধিজীবীরা ধীরে ধীরে এদেশের জাতীয় বীরের আসনে সমাসীন হতে থাকে। কাগমারী সম্মেলনের মধ্য দিয়েই এ কাজের উদ্বোধন হয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই বাঙালী সংস্কৃতির নামে হিন্দু কালচার প্রথমত কোমলমতি তরুণদের, পরবর্তীতে সমগ্র জাতিকে গ্রাস করে। প্রথম দিকে শহীদ দিবস পালিত হত মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে। পরবর্তীতে হিন্দু কালচার এসে শহীদ মিনার পূজার মন্ডপে পরিণত করে। যে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববাংলার স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকার করতে পারেনি এবং বংশ পরম্পরায় পূর্ববাংলায় জমিদারীর সুবাদে এদেশের মানুষকে লুট করেছিল সেই রবীন্দ্রনাথ আত্মার আত্মীয়ে পরিণত হল ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। সবকিছু সংঘটিত হয়েছিল পরিকল্পিতভাবে তরুণদের আবেগকে প্রভাবিত করে। এর পেছনে ছিল বিত্তবান হিন্দুদের সাহায্য এবং ইন্ধন। এছাড়াও এর পেছনে ছিল ভারতীয় দূতাবাসের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতা। কিন্তু যারা সত্যিকার অর্থে পাকিস্তানে বিশ্বাসী ছিল, কায়েদে আযমের নেতৃত্বের প্রতি যাদের ছিল গভীর আস্থা তারা আবেগের বাইরে থেকে নীরবে অশ্রুপাত করেছে। নজরুলের ভাষায় তাদের অবস্থা হয়েছিল 'বাহিরে ঝড় বহে, নয়নে বারি ঝরে।'

কায়দে আযমের দিক নির্দেশনার প্রতি পূর্ববাংলার মানুষের অনাস্থাও আনুগত্যহীনতাকে মূসা (আ) ও তার কাওমের কর্মকাণ্ডের সাথে তুলনা করা যায়। ফেরাউনের জুলুম নিপীড়ন ও গোলামী থেকে মুক্ত করে মূসা (আ) তার কওমকে শান্তি স্বস্তি এবং মুক্তির নতুন উপত্যকায় নিয়ে এলেন। বনি ইসরাইলীরা সুখ সমৃদ্ধির দিগন্ত রচনা করল। সেখানে তারা পেল আযাদীর মুক্ত হাওয়ার সন্ধান। অতপর যখন মূসা (আ) আল্লাহর নির্দেশে স্বীয় জাতিকে ডেকে বললেন- 'হে আমার জাতি! খোদার অবদান স্মরণ কর। তিনি তোমাদের মধ্যে অনেক নবীর জন্ম দিয়েছেন। এখন তিনি তোমাদের বাদশাহী দান করেছেন। যা আজ পর্যন্ত কাউকে দেয়া হয়নি। তাই সাহস ও দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে চল। তার শাসনভার শুধু তোমারদেরই

ভাগ্যে লেখা হয়েছে। কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না। এর পরিণাম ব্যর্থতা এবং হতাশা ছাড়া কিছু নয়। (সূরা মায়েদা ২০- ২১)

মূসার (আ) জাতি জবাব দিল, কোরআনের ভাষায়- 'হে মূসা তুমি তোমাদের খোদাকে নিয়ে লড়াই করো আমরা এখানে বসে তামাশা দেখব।' (সূরা মায়েদা ২৪) নবীর আদেশ এবং নেতার নির্দেশ অগ্রাহ্য করার জন্য সমগ্র কওমের উপর শাস্তির ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ বললেন, বাইতুল মোকাদ্দাসে প্রবেশ তাদের জন্য ৪০ বছর নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। এখন থেকে এই এলাকায় তারা নত মস্তকে চলবে। (সূরা মায়েদা)

দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে বর্ণবাদী হিন্দু ও বৃটিশদের সম্মিলিত চক্রান্ত নস্যাৎ করে কায়দে আযম যে জাতিকে শৃংখল মুক্ত করলেন, একটানা ২শ' বছরের গোলামী থেকে যে জাতিকে আযাদ করলেন, এই সদ্যমুক্ত জাতিকে তিনি যখন তার সুদূর প্রসারী ভাবনা ও প্রজ্ঞা দিয়ে দিক নির্দেশণা দিলেন তখন সেটা প্রত্যাখ্যান করল। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমি বিশ্লেষণ করে বললেন- 'পাকিস্তানের সংহতির খাতিরে প্রয়োজনবোধে মাতৃভাষা পরিবর্তন করতে হবে।' কায়েদে আযমের এই দিকনির্দেশনা অগ্রাহ্য করা হল। ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাকিস্তানকে ধ্বংস করা হল। সাতচল্লিশের কাংখিত উপত্যকা পরিত্যাগ করে আমরা নতুন উপত্যকায় এলাম। এখানে এই উপত্যকায় এসে আমাদের প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির যোগ হলো না। এখানে 'আমতো মিললইনা ছালা হারানো'র সম্মুখীন হলাম। এখানে স্বাধীনতা, মৌলিক অধিকার, অর্থনীতি এবং রাজনীতি প্রশ্নবোধক চিহ্নের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। অহির নির্দেশে বনি ইসরাইলীদের বাইতুল মোকাদ্দাস প্রবেশ ৪০ বছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল, গর্বিত বনি ইসরাইলীদের মাথা হেট হয়েছিল। জাতির দুর্দিনে খোদার দান হিসেবে যে নেতাকে আমরা পেয়েছিলাম, তার নির্দেশ উপেক্ষা এবং অগ্রাহ্য করার কাফফারা হিসেবে সত্যিকার স্বাধীনতার তোরণদ্বারে প্রবেশ করার জন্য এ জাতিকে কত বছর অপেক্ষা করতে হবে আল্লাহই ভাল জানেন।

দ্বাদশ অধ্যায়

যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের নেপথ্যে

প্রায় ২শ' বছর বৃটিশ হিন্দুর যৌথ ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত হয়ে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পূর্ববাংলার মানুষ আবেগপ্রবণ হয়ে উঠে। যৌক্তিক মানসিকতাকে উন্মাদনা ঘিরে ধরে। আর উন্মাদনা সৃষ্টির জন্য কোন নীতি অথবা কৌশলের প্রয়োজন পড়ে না। আবেগময় বক্তব্য, ভিত্তিহীন গুজব এবং অকল্পনীয় মিথ্যাচারই এর জন্য যথেষ্ট। এসবের অনুশীলন শুরু হয় পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে। দীর্ঘদিনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমিউনিস্ট কর্মীরা এ কারণেই এ জাতির আবেগ নিয়ে খেলবার সুযোগ পায়।

দেশপ্রেমিক ইসলামী শক্তি ভাষা আন্দোলনের সূচনা করলেও আন্দোলনের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে এর নিয়ন্ত্রণ এসে পড়ে কমিউনিষ্টদের হাতে। তৎকালীন হিন্দুস্থানে কমিউনিস্টদের উপর দলন পীড়ন অব্যাহত থাকলেও দিল্লী পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্টদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করে শুধুমাত্র পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য। কমিউনিষ্ট নেতৃত্বের মূলে হিন্দু নেতৃবৃন্দ থাকার কারণে হিন্দুস্থানী সাহায্য অবারিত হয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে তারা রাজনীতি এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পুরোমাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠে। প্রথমতঃ তারা বাঙালী জাতীয়তাবাদ কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক ধারার সূচনা করল পাকিস্তান থেকে বাংলাভাষীদের মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্য নিয়ে। দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করে রাজনৈতিক শক্তিকে দুর্বল করতে চাইল। নির্বাচনকে সামনে রেখে নেপথ্য থেকে তারা মুসলিম লীগ বিরোধী ফ্রন্ট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করল। 'এ পরিস্থিতিতে কমিউনিস্ট পার্টির সম্মুখে নতুন কর্তব্য এসে হাজির হল। কারণ যুক্তফ্রন্ট গঠনের নেপথ্যে মূল কাজটি সম্পাদন করে যাচ্ছিল কমিউনিষ্ট পার্টি। প্রকাশ্য রাজনীতিতে কার্যত নিষিদ্ধ এই পার্টি যুক্তফ্রন্ট গঠনে প্রধান ভূমিকা পালন করে তার মতাদর্শ প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন গণতন্ত্রী দল ও আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে কর্মরত শুভানুধ্যায়ীদের দ্বারা। (মোহাম্মদ হান্নান : বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, পৃঃ ২৫)

কমিউনিস্ট পার্টি মূলত ছাত্র সংগঠনসমূহের মাধ্যমে রাজনৈতিক মেরুকরণ প্রক্রিয়া শক্তভাবে শুরু করে। ছাত্ররা কোথাও ঠান্ডা মাথায় রাজনীতিকদের যুক্তি দিয়ে প্রভাবিত করে, কোথাও চাপ প্রয়োগ করে আবার কোথাও ভীতি প্রদর্শন করে যুক্তফ্রন্ট গঠনের তাগাদা দিতে থাকে। রাজনীতিতে শক্তি প্রদর্শনের নতুন ধারার সূচনা হয় সেই সময় থেকে। রাজনীতিকরা ছাত্রদের পথনির্দেশ করার বদলে রাজনীতিকরাই পরিচালিত হতে থাকে লঘুচেতা ছাত্রদের ধারা মত। বলতে গেলে তখন থেকেই শুরু হয় এই অশুভ প্রবণতা। 'দলগতভাবে কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং এ কে ফজলুল হক যুক্তফ্রন্ট গঠনের বিরোধী ছিলেন। ছাত্ররা এ ব্যাপারে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে এবং শেরে বাংলার বাসভবন ঘেরাও করে রাখে। শেষ পর্যন্ত ফজলুল হক যুক্তফ্রন্টের ব্যাপারে তার মতামত পরিবর্তন করলে ছাত্ররা তাকে কাঁধে নিয়ে উল্লাস করতে করতে ফিরে আসে।' (প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা, ২৫)

সাধারণ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে মনে হবে যুক্ত ফ্রন্ট সরকার বিরোধী একটি জোট, মুসলিম লীগের ব্যর্থতার উপর যারা রচনা করতে চেয়েছিল সাফল্য এবং সুখ সমৃদ্ধির নতুন দিগন্ত। কিন্তু নেপথ্য থেকে যারা যুক্তফ্রন্ট গঠনে ভূমিকা রেখেছিলেন তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তাদের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল সাংগঠনিক শক্তি মুসলিম লীগকে ধ্বংস করা, পাকিস্তানের আদর্শিক চেতনা থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করা এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে প্রকট করে তোলা। কালক্রমে সমস্যা ও সংকটের ভারে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পাকিস্তানকে ম্রিয়মান করে তোলা। যে কারণে 'যুক্তফ্রন্টে নেজামে ইসলাম দলকে গ্রহণ করার ব্যাপারে ফ্রন্টের মূল সংগঠকদের আপত্তি ছিল। ফজলুল হক নতুন জটিলতার অবতারণা করেন। তিনি দাবী করেন ফ্রন্টে নেজামে ইসলামকে নিতে হবে। এ দলকে ছাড়া তিনি যুক্তফ্রন্টে যাবেন না। বস্তুত যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন হতে যাচ্ছিল, তাতে নেজামে ইসলামকে নেয়ার ব্যাপারে নৈতিক প্রশ্ন জড়িত ছিল। কিন্তু শেরে বাংলা ফজলুল হককে ছাড়াও যুক্তফ্রন্টের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। ফলে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সঙ্গে জড়িত দলগুলো নেজামে ইসলামকে নিতে শেষ পর্যন্ত রাজী হল।

কিন্তু নেজামে ইসলাম যুক্তফ্রন্টের সদস্য হয়েই প্রথম কমিউনিষ্ট পার্টি সম্পর্কে আপত্তি তুললে শেরে বাংলা ফজলুল হক তাকে সমর্থন করেন। ফলে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনী লড়াই সম্পর্কে জটিলতার উপাখ্যানের অবতারণা হয়। আওয়ামী মুসলিম লীগের মওলানা ভাসানী, খেলাফতে রাব্বানী পার্টির আবুল হাশিম গণতন্ত্রী দলের মাহমুদ আলী প্রমুখ কমিউনিস্ট পার্টিকে জোটে নেয়ার পক্ষে জোর প্রচেষ্টা চালান। (প্রাগুক্ত, পৃঃ ২৫)

এমনি টানাপোড়নের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি যুক্তফ্রন্ট থেকে দূরে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিয়ে যুক্তফ্রন্টকে টিকিয়ে রাখে। কোন ঠুনকো অজুহাতে ফ্রন্ট ভেঙ্গে গেলে কমিউনিস্ট পার্টির সমস্ত নেপথ্য পরিকল্পনা ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এ কারণে কমিউনিস্টরা কোন বিতর্কের অবতারণা না করে নীরবে সরে গেলেন। কিন্তু ফ্রন্টের উপর তাদের অদৃশ্য কর্তৃত্ব কখনোই খর্ব হয়নি। যুক্তফ্রন্টের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশপ্রেমিক যারা ছিলেন তাদের দূরদর্শিতার অভাব এবং চিন্তার সীমাবদ্ধতার কারণে কমিউনিস্ট পার্টি এবং পঞ্চমবাহিনীর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আঁচ করতে পারলেন না।

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা কর্মসূচী নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগ তার সীমাবদ্ধতার কারণে অঙ্গীকার পূরণ করতে না পারায় জনগণের মধ্যে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেটাকে পুরোপুরি কাজে লাগাল যুক্তফ্রন্ট। স্বাধীনতা উত্তর মুসলিম লীগের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সংগঠন প্রসারিত না হয়ে সংকুচিত হয়ে পড়ে।

সীমাবদ্ধ সাংগঠনিক শক্তি দিয়ে সর্বদলীয় ঐক্যবদ্ধ আক্রমণের মোকাবেলা করা মুসলিম লীগের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি। পঞ্চমবাহিনী, হিন্দু জনগোষ্ঠী এবং কমিউনিস্ট পার্টি যা চেয়েছিল, নির্বাচনী ফলাফল তার চেয়েও চমকপ্রদ হয়েছিল। যারা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে সংগঠিত হয়েছিল তাদের মধ্যে আগে থেকেই ছিল অন্তর্বিরোধ। স্বাভাবকিভাবে ক্ষমতার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে কখনো নেপথ্যে, কখনো প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

হক সাহেবের মতিভ্রম

১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। যুক্তফ্রন্টের চমকপ্রদ বিজয় ফজলুল হককে দারুণভাবে উৎসাহী করে তুলে। এই অভূতপূর্ব বিজয়ের পেছনে যে শক্তিসমূহ সক্রিয় ছিল তিনি তাদেরকে সন্তুষ্ট রেখেই সম্ভবত রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন অনেকটা সুবিধাবাদীর মত। এ ধরনের সুবিধাবাদী চরিত্রের প্রতিফলন তার অতীত কর্মকাণ্ডেও দেখা গেছে। ক্ষমতা হাতে পেয়েই ফজলুল হক পশ্চিম বাংলা সফরে গেলেন সেখানে তাকে মোহিত করার মত বিপুল সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল। এটা যে ছিল ব্রাহ্মণ্য চক্রের সাজানো নাটক, সেটা তিনি বুঝলেন না। আবেগে আপ্লত হয়ে উঠলেন। তার সংবর্ধনার জবাবে তিনি বললেন-

'রাজনৈতিক কারণে বাংলাকে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতি এবং বাঙালীত্বকে কোন শক্তিই কোন দিন ভাগ করিতে পারিবে না। দুই বাংলার বাঙালী চিরকাল বাঙালীই থাকিবে।' ফজলুল হকের এই উক্তি যেন উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা সরদার প্যাটেলের উক্তির পুনরাবৃত্তি। ভারত খন্ডিত হওয়ার পর ১৯৪৭ সালে সরদার প্যাটেল বিলাপ করেন এই বলে- Today the partition of India a settled fact and yet it is an unreal fact. The partition would remove the poison from the body politic of India... India is one an indivisible. One cannot devide the sea or split running water of a river. (G. W. Chawdhury: Pakistun Relation with India, Page: 84)

শেরে বাংলা এর মধ্যে আর এক ধুয়াশার সৃষ্টি করেন। 'নিউইয়র্ক টাইমস সংবাদদাতা মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলার সহিত সাক্ষাৎকারের বিবরণীতে বিচ্ছিন্নতা- বাদের আভাস দান করেন। মিঃ কালাহানের এক প্রশ্নোত্তরে শেরে বাংলা নাকি বলিয়াছিলেন 'পূর্ববাংলা স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে।' (অলি আহাদ জাতীয় রাজনীতি : ২১৬)

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার জন্য কমিউনিষ্ট এবং পঞ্চম বাহিনী চক্র কর্ণফুলী পেপার মিলে বাঙালী অবাঙালী দাঙ্গার সৃষ্টি করে। এর উদ্দেশ্য অন্য একটি ছিল পাকিস্তানের একমাত্র

পেপার মিলকে অচল করে দেয়া। এশিয়ার সর্ববৃহত পাটকল আদমজী জুটমিলে একইভাবে দাঙ্গার সূচনা করা হয়। এতে প্রায় দেড় হাজার শ্রমিকের মৃত্যু হয়। যদিও যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করে, কিন্তু সমকালীন পর্যবেক্ষকদের ধারণা ছিল উল্টো। শুরু থেকেই এদেশের শ্রমিকদের উপর বামপন্থীদের প্রাধান্য ছিল। বাংলাভাষী শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির যেমন প্রভাব ছিল অবাঙালী শ্রমিকদের মধ্যে তাদের প্রভাব ছিল আরো বেশি। রাজনৈতিক ফায়দা আদায়ের জন্য তারা পরিকল্পিতভাবে দাঙ্গার সৃষ্টি করে। পাকিস্তানকে বিশৃংখল করে তোলার জন্য হিন্দুস্থানও ইন্ধন যোগাতে কার্পণ্য করেনি। আবার শেখ মুজিবকে মন্ত্রীসভায় না নেয়ার জন্য ফজলুল হকের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য শেখ মুজিবও এর পেছনে পরোক্ষ মদদ দিয়ে থাকতে পারেন।

যাই হোক পাকিস্তান থেকে পূর্ববাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে পঞ্চমবাহিনী তৎপর হয়ে উঠে। এর পেছনে কমিউনিস্টদের তৎপরতা ছিল সবচেয়ে বেশি। বিচ্ছিন্নতার ধ্যান ধারণা কোলকাতার বর্ণবাদী হিন্দুরা পূর্ব বাংলায় পাচার করে। কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে হিন্দু নেতৃবৃন্দের প্রাধান্য থাকায় তাদের মাধ্যমে বর্ণবাদী হিন্দুরা তাদের সাম্প্রদায়িক ধ্যান- ধারণায় মার্কসবাদী দর্শনের রঙ ছড়িয়ে পূর্ববাংলার আবেগপ্রবণ তরুণদের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলে। দৃষ্টান্ত হিসেবে দেবেন সিকদারের কথা বলা যায়- 'দেবেন সিকদারের ১৯৫৬ সালের স্বাধীনতার দাবীর প্রশ্নটির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে হয়তো, তবে এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক নেই যে, দেবেন সিকদার বরাবরই প্রথম থেকে বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতার বিষয়টি পার্টিতে তুলেছেন এবং কর্মী মহলে প্রচার করেছেন। (মোহাম্মদ হাননান, বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, পৃঃ ৪৬)

'১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় কমিটির যে সম্মেলন কোলকাতায় আয়োজন করা হয়েছিল তাতে কুমার মৈত্র বাবু বাংলার স্বাধীনতার প্রস্তাব তুলেছিলেন।' (দেবেন সিকদার উপমহাদেশে কমিউনিস্ট বিভ্রান্তি, পৃঃ ১১০)

পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম নেতা মওলানা ভাসানীও পিছিয়ে থাকলেন না। ১৯৫৭ সালে কাগমারীতে সাংস্কৃতিক সম্মেলন করলেন বিদেশী এবং বিজাতীয় মনিষীদের নামে অসংখ্য তোরণ নির্মাণ করে সংশ্লিষ্ট

জাতিসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সমকালীন পর্যবেক্ষকদের ধারণা কোন বিদেশী শক্তির ইংগিতে এবং তাদের অর্থনৈতিক সহযোগিতায় এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। এই সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দীর উপস্থিতিতে ভাসানী পাকিস্তান থেকে পূর্ববাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচ্ছন্ন ইংগিত দিলেন। বললেন- 'পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন আদায় না হলে আসসালামু আলাইকুম।'

মওলানা ভাসানীর ভারসাম্যহীন উক্তি প্রসঙ্গে নেজামে ইসলাম দলের সভাপতি মওলানা আতাহার আলী বলেন- 'জনাব ভাসানী পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে বিদ্বেষ ও তিক্ততার প্রচারণা চালাইয়া ও পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান ইসলামী জামহুরিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয় দেখাইয়া ক্ষান্ত হন নাই, লেনিন গেট, গান্ধী গেট, সুভাষ গেট প্রভৃতি নামে তোরণ নির্মাণ করিয়া পাকিস্তানকে কি ধাঁচে গড়িয়া তুলিতে চান তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। সমকালীন দৈনিক আজাদের সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়- 'পাকিস্তান সম্পর্কে কোন পাকিস্তানীর মুখে পাকিস্তান বিচ্ছেদের মারাত্মক কথা যে এমন হালকাভাবে উচ্চারিত হতে পারে ইহা কে কবে ভাবিতে পারিয়াছিল?... পাকিস্তানের প্রতি ইহা রাষ্ট্রদ্রোহের উক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। (দৈনিক আজাদ, ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

যখন প্রত্যেকটি দল এবং অদূরদর্শী নেতৃবৃন্দ জনগণের আবেগে সুরসুড়ি দিয়ে আঞ্চলিক মনোভাব জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিল। সেই সময় ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদে স্বায়ত্তশাসন দাবীর প্রস্তাব নেয়া হয়। অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এক সাক্ষাৎকারে বলেন, যে প্রস্তাবটি তিনিই তুলেছিলেন এবং আওয়ামী লীগের বিরোধিতা সত্বেও শেখ মুজিব তা সমর্থন করেছিলেন। স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব-উত্থাপনের মধ্যে দোষের কিছু নেই। কিন্তু এর নেপথ্যে যারা ছিলেন তাদের উদ্দেশ্য তো ভিন্ন ছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের রূপকার কমিউনিষ্ট পার্টির একটি রাজনৈতিক চিঠিতে (১৫ই জুলাই '৬২) তাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। এতে বলা হয়- 'এই রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের আন্দোলণ যত জোরদার হইবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আদর্শগত ভিত্তিও তত দুর্বল হইবে।' (বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, পৃঃ ৬৮)

পাকিস্তানের সংহতিতে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ প্রধান তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক সমাবেশে বিষয়টি উত্থাপন করে বলেন : 'পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে প্রাদেশিকতার মনোভাব উস্কে দিয়ে কিছু ব্যক্তি নায়ক হতে চাচ্ছেন এবং এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানীদের মনে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে পূর্ব পাকিস্তানীরা তাদের সাথে একত্রে থাকতে চায় না।' (সাপ্তাহিক বিচিত্রা ২৩ আগস্ট, ১৯৬৫)

কংগ্রেস নেতা মনোরঞ্জন ধর পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান করে ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে পাকিস্তান ধ্বংস প্রক্রিয়ার আঞ্জাম দিতে থাকেন। উচ্চাভিলাষী এবং অদূরদর্শী মুজিবকে তারা তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বেছে নেন। মুজিবের সামনে তুলে ধরা হয় এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন। ১৯৫৬ সালে মুজিবের সাথে মনোরঞ্জন ধরের আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে কংগ্রেস-আওয়ামী লীগ গোপন চুক্তি হয় যা পঞ্চশীলা নামে পরিচিত। এ চুক্তি অনুযায়ী আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হয়ে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি বাতিল করবে এবং সংবিধানের ইসলামী চরিত্র হনন করে তাকে ধর্ম নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক করতে হবে। এই সাথে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সব ব্যাপারে সমান অধিকার নিশ্চিত করবে। (জ্যোতিসেন গুপ্ত হিসট্রি অব ফ্রিডম মোভমেন্ট ইন বাংলাদেশ) এই গোপন চুক্তির পর থেকে হিন্দু জনগণ এবং হিন্দুস্থানের সমর্থন ও সহযোগিতার দ্বার মুজিবের জন্য অবারিত হয়। তাকে সামনে রেখেই হিন্দুস্থান পাকিস্তানের চূড়ান্ত ভাঙন খেলার দিকে পরিস্থিতি এগিয়ে নিয়ে চলে। এদিকে পৃথক নির্বাচন বাতিল হওয়ায় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী এখানে ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিণত হয়।

পাগলা- গারদে পরিণত হল পরিষদ কক্ষ

স্বার্থান্ধ সংকীর্ণ রাজনীতিকদের সমন্বয়ে গঠিত মুসলিম লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই দেশের মানুষকে হতাশ করল। জনগণের প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির যোগ হল না। বর্ণচোরা রাজনীতিকরা স্বমূর্তি ধারণ করলেন। দেশের মানুষের স্বার্থ সমুন্নত করার জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ নেয়া হল না। নির্লজ্জ দালালীতে মেতে উঠল সকলে। শুরু হল ক্ষমতার জন্য অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা। ভাঙ্গা-গড়া চলতে

থাকল সমানে। রাজনৈতিক অস্থিরতা বেড়ে গেল। খাদ্য সংকট তীব্র হয়ে উঠল। প্রশাসন ভেঙে পড়ল। একদিকে দুর্ভিক্ষের হাহাকার অন্যদিকে চলল ক্ষমতা দখলের নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা। তেজারতের পণ্য হয়ে উঠল রাজনীতিকরা। ক্ষমতার হাতবদল নিত্যনৈমিত্তক ব্যাপার হয়ে উঠল।

ক্ষমতাপাগল রাজনীতিকরা পরিষদ কক্ষকে পাগলা গারদে পরিণত করল। ২২ জুলাই স্পীকারকে পাগল সাব্যস্ত করেও প্রস্তাব গৃহীত হল। ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী দায়িত্ব নিলেন। কিন্তু তাতেও স্বার্থান্ধ ক্ষমতা পাগলদের উন্মত্ততা থামল না। যদিও ফটো সাংবাদিকরা পরিষদ কক্ষের উন্মুক্ত অবস্থার চিত্র ধারণ করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে শাহেদ আলীকে হত্যা করা হল ২৩শে সেপ্টেম্বরে। ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী হত্যা প্রসঙ্গে তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব হাশিম উদ্দিন আহমদ অতি সম্প্রতি দৈনিক ইনকিলাবে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণে তিনি বলেন- 'ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী ছিলেন শান্ত স্বভাবের লোক। অপর দিকে স্পীকার আবদুল হাকিম ছিলেন শক্ত লোক। কারো ইচ্ছা অনিচ্ছায় সংসদ চালাতেন না। আবদুল হাকিমকে ষড়যন্ত্র করে আওয়ামী লীগের সদস্যরাই সরিয়ে দেয়। শাহেদ আলী কে এস পির লোক হলেও শান্ত স্বভাবের কারণে ক্ষমতাসীনরা তাকেই পছন্দ করে স্পীকারের আসনে বসায়। এ নিয়ে মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এসেম্বলিতে। শাহেদ আলী এসেম্বলিতে ঢোকার সময় শেখ মুজিব ও মোহন মিয়া ধস্তাধস্তি করছিল। শাহেদ আলীকে ঢোকার সময় জিজ্ঞেস করলাম কেন এসেছেন? জবাবে শাহেদ আলী বললেন- আপনাদের দেখতে এসেছি। বিরোধী দলের সদস্যদের বিরোধিতায় শাহেদ আলী ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। খুব সম্ভব ভীতির কারণে তিনি আওয়ামী লীগের সদস্যদের বিরুদ্ধে কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন ও কৃষক শ্রমিক পার্টি (কে এস পি) সদস্যদের কিছু বলার চেষ্টা করেন। বাজেট নাকি অন্য কোন বিষয়ে বলতে গেলে আওয়ামী লীগ সদস্যরা ভীষণ ক্ষেপে যান শাহেদ আলীর উপর। একটা পেপার ওয়েট নিক্ষিপ্ত হয় শাহেদ আলীর কপালে। কে মেরেছিল আন্দাজ করতে পারলাম না, উনি কপালে হাত চেপে ধরেছিলেন। তবে সেদিন শেখ মুজিব হাউসকে শান্ত করার পরিবর্তে গরম করেছিলেন সবচেয়ে বেশি। প্রথমেই দেখলাম চেয়ার নিয়ে স্পীকারের দিকে তেড়ে যেতে। মুজিবের অন্য সাঙ্গ পাঙ্গরা সাথে ছিল, পুরো অধিবেশনে ভীষণ হট্টগোল

লেগে গেল। লাউড স্পীকার বন্ধ। পরে দেখলাম শাহেদ আলীকে রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিশ তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তার কয়েকদিন পরে শাহেদ আলী পাটোয়ারী মারা গেলেন। (দৈনিক ইনকিলাব ২২ এপ্রিল, ১৯৯২)

সবকিছু দেখে সাধারণভাবে মনে হয় এসব ঘটনা ক্ষমতা প্রেমিকদের অন্তর্দ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত। কিন্তু যারা এসব অপকান্ডের মাধ্যমে দেশকে হতাশার দিকে নিয়ে চলছিল তারা কিন্তু কাজ করছিল সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ছক ধরেই। উপমহাদেশের মুসলমানদের কাংখিত পাকিস্তান ছিল একটি ভুল পদক্ষেপ, এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন তারা। যুক্তফ্রন্ট শাসনামলে তারা আংশিক ভাবে সফলও হয়েছিলেন। তথাকথিত প্রগতিবাদীদের সপক্ষীয় লেখক ডক্টর এম এ হান্নান তার গ্রন্থে লিখেছেন- '১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলার রাজনৈতিক জীবনে এক ভয়ঙ্কর দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। এর পেছনে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র ছিল এ সম্পর্কে কোন বিতর্ক নেই। কিন্তু তৎকালীন রাজনীতিবিদদের ছেলেমিপনা এবং দায়িত্বহীনতা সেদিন জাতিকে যেভাবে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে নিপতিত করে দেয় তাতে একমাত্র প্রতিক্রিয়াশীলদের ঘাড়ে দোষ চাপালে আসল ঘটনা চাপা দেয়া হয় এবং বলা চলে সে সময় তাদের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা ছিল প্রতিক্রিয়াশীলতারই নামান্তর। (বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, পৃঃ ৪৯)

সমকালীন রাজনৈতিক নেতা এবং দলসমূহের দায়িত্বহীন কর্মকাণ্ড এবং আত্মস্বার্থপরতার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে সামরিক আইন জারি হল, সামগ্রিক হতাশার মধ্যে আশার আলো দেখল মানুষ। পাকিস্তানের বিরোধিতা এবং সামরিক আইনের তীব্র সমালোচনা করেও জনাব এম এ হান্নান তার গ্রন্থে স্বীকার করেছেন- 'তাই একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে প্রথম সামরিক আইন জারীর সংবাদ মানুষ শুধু মেনেই নিল না তারা এ থেকে অতিরিক্ত আশাবাদীও হয়ে উঠল। সারা দেশে কথিত দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে সামরিক শাসন, সাধারণেরা ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসেবেই গ্রহণ করল। পাশাপাশি রাজনীতিবিদ ও ছাত্র নেতাদের নির্বিচার গ্রেফতার ও নির্যাতনকে মানুষ এ থেকে আলাদা করে দেখতে চাইল না।' (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪)

বিচ্ছিন্নতাবাদী বাম তৎপরতার সাথে আওয়ামী নেতৃবৃন্দ

সামরিক বিপ্লবের সাথে সাথে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বেআইনী ঘোষিত হওয়ায় পরিস্থিতি অত্যন্ত শান্ত বলেই মনে হয়েছিল। দেশের পরিস্থিতি পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকা সত্বেও অদৃশ্য প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়াস চলছিল সর্বত্র। ছাত্ররা সাংস্কৃতিক সংগঠনের আড়ালে তাদের প্রচারাভিযান এবং সাংগঠনিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছিল। বিশেষ করে কমিউনিস্টদের তৎপরতায় প্রাণসঞ্চার হয়েছিল বেশি করে। এর কারণ এরা গোপন তৎপরতায় ছিল সিদ্ধহস্ত। এছাড়াও এদের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং আদর্শিক লক্ষ্য থাকার কারণে নিয়মিত প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে দক্ষ রাজনৈতিক কর্মী সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এরাই সময়ের স্রোতধারায় এক সময় আবেগপ্রবণ ও মেধাশূন্য আওয়ামী লীগ কর্মীদের রাজনৈতিক গুরুতে পরিণত হয়। এরাই তরুণদের মধ্যে বিপ্লবের মন্ত্র দিতে থাকে। এদের প্ররোচনায় সামরিক বিপ্লবের পরবর্তী মাসে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে ইস্টবেঙ্গল লিবারেশন পার্টি গঠিত হয়। কতিপয় আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ কর্মী সমন্বয়ে গঠিত এই গোপন সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল সসস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ববাংলাকে মুক্ত করা। ডিসেম্বরে নেত্রকোনা এবং টাঙ্গাইলে এর বিস্তৃতি ঘটে।

১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে ব্রহ্মপুত্র নদীতে একটি বড় নৌকায় সংগঠনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকায় এ পার্টি তার প্রথম শাখা খোলে।

এরপর পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মীরা ভারতে চলে যায়। অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারত থেকে তারা কিছু পোস্টার ও প্রচারপত্র ছাপিয়ে আনে। এগুলি প্রধানত রাজনৈতিক নেতা ও প্রদেশের বিভিন্ন বার লাইব্রেরী, স্কুল ও কলেজের নামে ডাকে পাঠানো হতো। শেরেবাংলা এ, কে, ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এদের তৎপরতা সম্বন্ধে অভিহিত ছিলেন। শেখ মুজিবের সাথে লিবারেশন ফ্রন্টের কর্মীরা যোগাযোগ রাখতো এবং শেখ মুজিব তাদের অর্থ সাহায্য করতেন তার একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। (স্বাধীনতার দলিল অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৩১)

অন্য এক সূত্রে জানা যায়, এদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন সোহরাওয়ার্দীর সহকর্মী আবুল মনসুর আহমদ। ১৯৫৯ সালে এইসব অতি বিপ্লবীরা সোহরাওয়ার্দী এবং ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক মিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনার কথা বলে। দু'জনেই এ ব্যাপারে নিরুৎসাহী মনোভাব প্রদর্শন করে। কিন্তু আবুল মনসুর আহমদের সহযোগিতায় তারা ভারতীয় কূটনীতিক বি এম ঘোষের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং দিল্লীতে প্রধামন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর সাথে কথা বলে। নেহেরু এ দেশের তরুণদের উৎসাহিত করলেও এজন্যে বৈষয়িক সাহায্য সহযোগিতা দেয়ার ব্যাপারে অঙ্গীকার করেননি। তবে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে প্রচারপত্র ছাপিয়ে দেয় এবং গোয়েন্দা বিভাগের সহযোগিতায় নিরাপদে সীমান্ত অতিক্রমের ব্যবস্থা করে। কিন্তু ফেরার পথে তারা তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার কথা জানতে পারে। কয়েকজন গ্রেফতারও হয়। (মেজর রফিকুল ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট)

আটককৃত তরুনদের জবানবন্দী অনুসারে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে অভিযুক্ত করা হয়। কেন্দীয় গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৬২ সালের ৩০শে জানুয়ারী সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়। এই গ্রেপ্তারীর প্রতিবাদে ১লা ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত পুলিশ কর্মকর্তার প্রতিবেদনে বলা হয়- '১৯৬১ সালের শেষার্ধ থেকে বে-আইনী ঘোষিত কমিউনিস্ট পার্টি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে কয়েক দফা বৈঠক হয়। সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী এ ব্যাপারে দুই দলের মধ্যে মধ্যস্থতা করেন। আওয়ামী লীগ থেকে শেখ মুজিব ও তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এবং কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে মনি সিংহ ও খোকা রায় এসব গোপন বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আন্দোলনের প্রশ্নে কয়েক দফা কার্যক্রমের খসড়া তারা অনুমোদন করেন। ঠিক হয় আইয়ুবের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র জারী হওয়ার সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রদের দিয়ে প্রথম আন্দোলনের সূত্রপাত হবে এবং পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থীরা সম্মিলিতভাবে সারা দেশে ছড়িয়ে দেবে।'

আন্দোলনের রূপরেখা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করেছিল কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি। (বিচিত্রা ঈদ সংখ্যা, ১৯৭৭)

বৈঠকে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব কর্মসূচীতে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবীকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি বৈঠকে বলেন- 'ওদের সাথে আমাদের আর থাকা চলবে না। তাই এখন থেকেই স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।'

'কমিউনিষ্ট পার্টি অবশ্য নীতিগতভাবে এ ব্যাপারে একমত ছিলেন। তারা মনে করতেন এ দাবীর মধ্যে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্নটি নিহিত রহিয়াছে। ভবিষ্যতে পূর্ব পাকিস্তানে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গড়িয়া উঠা আমরা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব মনে করি না।' (খোকা রায়, সংগ্রামের ৩ বছর, পৃঃ ১৮২)

লাহোর প্রস্তাবের সংশোধন এবং এক পাকিস্তানের প্রস্তাবক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পঞ্চাশ দশকে পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদী চেতনার বিকাশে মর্মাহত হলেও এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাকে ঘিরেই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পাকিস্তান ধ্বংসের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তিনি এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলেন না কেন? যে শেখ মুজিবকে সোহরাওয়ার্দী 'ইলিটারেট গ্রাজুয়েট' হিসেবে অভিহিত করতেন, যে মুজিব সম্পর্কে তিনি বলতেন- 'শেখ মুজিব যদি ঘটনাচক্রে দেশের সর্বোচ্চ নেতা হয় তাহলে সে প্রথম দেশ ধ্বংস করবে পরে তার নির্বুদ্ধিতার জন্য সে নিজেকেও ধ্বংস করবে।' (কনসেপ্ট, ১৯৮৯), অপরিনামদর্শী শেখ মুজিব সম্পর্কে সঠিক ধারণা পোষণ করা সত্বেও সোহরাওয়ার্দী তাকে শুরু থেকেই প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, তার অগ্রগতির সোপান রচনা করেছিলেন, তার সব অপকর্মে বৈধতার প্রলেপ দিয়েছেন এবং তার মাথার উপরে ছায়া বিস্তার করে রেখেছিলেন। কিন্তু কেন?

এর কারণ একটিই সেটা হল রাজনৈতিক সুবিধাবাদ। তার নিস্পৃহতার কারণে বিচ্ছিন্নতাবাদী চেতনা এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল যে, তিনি এর বিরুদ্ধে কঠোর হলেই তাকে অনেক নেতা ও কর্মীকে হারাতে হত। তিনি সর্বশেষ বার্তায় বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার আহবান জানালেও তার দলে এর কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। তিনি মরে বেঁচে ছিলেন। বিশাল জন সমর্থনের সম্মান নিয়ে তিনি আজো বেঁচে আছেন। আর এই সোহরাওয়ার্দীই যদি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতেন তাহলে হয় তাকে

বিচ্ছিন্নতাবাদের সহযোগী হতে হতো অথবা তার অনুসারীদের দ্বারাই তিনি প্রত্যাখ্যাত হতেন।

প্রয়োজন হল একটি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

পাকিস্তান বিরোধী ভিন্ন চিন্তার উদগাতা মূলত কমিউনিস্ট পার্টি হলেও তারা এগুতে চাচ্ছিল অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপে এবং সুপরিকল্পিতভাবে ধারাবাহিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। তারা পূর্ববাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার মহাপরিকল্পনা নিয়ে অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপে এদেশের রাজনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে চলছিল। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নতুন প্রজন্মের মন- মানসিকতা বিষিয়ে তুলেছিল। সব রকম ঝুঁকি এড়িয়ে এমনভাবে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছিল যাতে পাকিস্তান সরকারের আক্রোশ তাদের উপর এসে না পড়ে। তাদের প্রয়োজন ছিল একজন লঘুচেতা আনাড়ী অদূরদর্শী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যাকে দিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে সমুদয় কাজ করানো সম্ভব হবে। প্রথম তারা ভাসানীকে ব্যবহার করার চেষ্টা নেয়। তাকেই বামপন্থীরা রাজনৈতিক ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে। ঝানু কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ তার উপর কখনোই আস্থা রাখতে পারেননি। এর মূল কারণ তার ধর্মীয় অনুভূতি। এ ছাড়াও দিল্লীর স্বার্থের পক্ষে ভাসানীকে ব্যবহার করা সম্ভব হবে না এটা ভাল করেই জানতেন কমিউনিস্ট নেতৃবৃন্দ। তারা এটুকু ভাল করেই বুঝতেন যে, মওলানা ভাসানীর প্রশ্নাতীত দেশপ্রেম তাকে হিন্দুস্থানের ক্রীড়ানক হতে বাধা দিবে। এমনকি আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি বেঁকেও বসতে পারেন। সোহরাওয়ার্দীকে কমিউনিষ্টরা কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে সক্ষম হলেও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে তার মত দূরদর্শী নেতাকে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। যে কারণে উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের দিক থেকে কুচক্রীরা তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল দেশপ্রেমশূন্য আত্মস্বার্থপর অদক্ষ মাঝারী পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব। পঞ্চাশের দশকে রাজনৈতিক কর্ম প্রবাহের মধ্য দিয়ে বাবুচক্র এবং বামপন্থীরা সেই প্রত্যাশিত ব্যক্তিকে আবিষ্কার করে, যার মধ্যে ছিল উচ্চাভিলাষ এবং দুর্নিবার ক্ষমতার মোহ। বামপন্থী, বাবুচক্র এবং কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীরা মুজিবকেই লক্ষ্য অর্জনের কেন্দ্রবিন্দু করার উদ্যোগ নেয়। মুজিবকে সাধারণ মানুষের গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য ব্যাপক

প্রচার প্রোপাগান্ডার উদ্যোগ নেয়া হয়। সে সময় এদেশের মিডিয়াসমূহ বামপন্থীদের দখলে থাকায় বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং শেখ মুজিবের ভাবমূর্তি গড়ে তোলার কাজটি সহজভাবে সম্পন্ন হয়। কমিউনিষ্ট এবং বাবুচক্র পাকিস্তানকে ধ্বংস করার দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পর্যায়ক্রমে শুরু করলেও ক্ষমতালোভী শেখ মুজিব ও তার সহযোগীরা ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দেয়ার পর অপরিপক্ক বিচ্ছিন্নবাদের পরিকল্পনা আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। যেটাকে কমিউনিষ্ট পার্টি বিপদজনক মনে করতো।

স্বায়ত্তশাসন দাবীর আড়ালে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন

কমিউনিস্ট পার্টির ভাষায়- 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবী একটি হটকারী দাবী, তাই বর্তমানে আমরা পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থাপন করিব।... কিন্তু যাহারা স্বাধীন পূর্ববাংলা দাবী উত্থাপন করিবেন আমরা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকিব। (খোকারায়, সংগ্রামের তিন দশক, পৃঃ ১৮২)

মনিসিং ও অমল সেন দুটি ভিন্ন সাক্ষাৎকারে বলেন- 'সত্যকথা বলতে কি আমরা ভাবিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার বিষয়টি এত দ্রুত আগাবে। তবে আকাঙ্খা ছিল এবং বিশ্বাসও ছিল।'

'১৯৬২ সালের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান নতুন সংবিধান জারি করেন এবং সংবিধান মোতাবেক এপ্রিল মাসের ২৮ তারিখ জাতীয় পরিষদ নির্বাচন ও মে মাসের ৬ তারিখে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় নির্বাচন এবং সংবিধান বিরোধী আন্দোলনের প্রস্তুতি চলতে থাকে। সোহরাওয়ার্দী সংবিধান বাতিলের পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি নির্বাচনকেও নাকচ করেননি। অথচ রাজনীতিকদের একাংশ সরকার বিরোধী আন্দোলনের নামে দেশকে গভীর সংকটের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) দপ্তরের (১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২) প্রতিবেদনে বলা হয়- কিছু নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা বিশেষতঃ কমিউনিস্টরা এবং অন্যান্য উগ্রপন্থীরা গন্ডগোল সৃষ্টি করে আইন শৃংখলা পরিস্থিতিকে গুরুতরভাবে

ঘোলাটে করার জন্য বদ্ধপরিকর। সংবিধান বিষয়ে লেশমাত্র ধারণা না থাকা সত্ত্বেও, কমিউনিস্টরা এবং আওয়ামী লীগের সেই অংশ বিশেষ দাবী তুলতে আরম্ভ করেছে যে, সংবিধান একেবারে গ্রহণযোগ্য নয়, তা বাদ দিতে হবে। মনে হয় যে, তাদের কর্মপন্থা হবে ছাত্রদের উস্কিয়ে দিয়ে তাদের মাধ্যমে মিছিল বের করা, রাষ্ট্রপতির ছবি পুড়িয়ে নষ্ট করে তাকে অপমান করা অর্থাৎ প্রকৃত সরকারী কর্মকর্তাদের এতদূর উত্যক্ত করা যে শেষ অবধি যাতে শক্তি ব্যবহারের কথা হয় এবং তখন সেই শক্তি প্রয়োগের ঘটনাকে ভিত্তি করে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা।'

সরকার গোয়েন্দা সংস্থা রিপোর্টের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা লক্ষ্য করে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে উঠে। সাধারণ মানুষের যদিও এ ব্যাপারে কোন রকম ভ্রুক্ষেপ ছিল না। কিন্তু দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে নির্বিকার ছিলেন এমনটি বলা যাবে না। সকলেই কম বেশী পরিস্থিতি আঁচ করেছিলেন যথাসময়ে। যেমন- 'বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপে উদ্বিগ্ন পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) সভাপতি খাজা নাজিমুদ্দিন ২৭শে নভেম্বর (১৯৬২) রাত্রিতে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভায় ভাষণ দানকালে মন্তব্য করেন- 'পাঁচ বৎসর কাল ঢাকায় অবস্থানকালে বিভিন্ন স্তরের লোকজন যাহার অধিকাংশই আমার বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মী আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তাহাদের নিকট হইতে আমি জানিতে পারিয়া ব্যথিত হইয়াছিলাম যে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিচ্ছিন্ন হইবার ব্যাপারে কানাঘুষা চলিতেছে। দু'র্ভাগ্যবশত পশ্চিম পাকিস্তানীদেরও একটি অতিক্ষুদ্র অংশ এই মতের সমর্থক। (অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫- ৭৫, পৃঃ ৩৩২)

বিচ্ছিন্নতাবাদে মার্কিন ইন্ধন

চীন ভারত যুদ্ধের কারণে ভারতে মার্কিনীদের ঢালাও সাহায্যের প্রেক্ষিতে পাকিস্তান মার্কিনীদের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠে। চীনের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক স্থাপনের কারণে আমেরিকাও পাকিস্তানের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। পাকিস্তানে মার্কিন বিমান ঘাঁটি তুলে দেয়া হয়। ফলে মার্কিনীরা পাকিস্তানের প্রতি আরও ক্ষুব্ধ হয়। আইয়ুব সরকারকে বিপর্যস্ত করার উদ্দেশ্যে গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমেরিকা তার আভ্যন্তরীণ লবিকে

প্রয়োজনীয় মদদ দিয়ে সক্রিয় করে তোলে। সমাজতান্ত্রিক চীনের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন এবং রাশিয়ার সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের সৌজন্যে তাদের অভ্যন্তরীণ লবীগুলোকে সরকার প্রশ্রয় দিতে থাকে। জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগের সক্রিয়তার প্রেক্ষিতে সমাজতান্ত্রিক দলগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সরকার বিরোধিতায় পরস্পরের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। অন্যদিকে লবি বহির্ভূত নির্ভেজাল দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহ আন্দোলনে পিছিয়ে রইলো না। মোটের ওপর মার্কিন মদদপুষ্ট হয়ে আওয়ামী লীগ শক্ত অবস্থান নিতে সক্ষম হয়। পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন বৈরিতা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে আওয়ামী লীগকে অনুপ্রাণিত করে।

'১৯৬৩ সালেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত মার্কিনী সাহায্য হইতে পূর্ব পাকিস্তানীদের অংশ পূর্বাহ্নেই নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। ইহার ফলে পূর্ব পাকিস্তানীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের চাইতে অধিকতর সহানুভূতিশীল মনে করিবার ইন্ধন পাইয়া গেল। সুকৌশলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানী জনতাকে উস্কানী দান করাই ছিল উপরোক্ত মন্তব্যের লক্ষ্য। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব এই সময়ে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব চীন সোভিয়েতের সহিত ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটের প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে বেকায়দায় ফেলিবার জন্যই মার্কিন সরকার নানাভাবে প্রচেষ্টা চালাইতে থাকে। এই প্রচেষ্টায় শেখ মুজিব দাবার ঘুঁটি হইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। শক্তিশালী দোসর হিসেবে তাহার সহিত যোগ দেয় দৈনিক ইত্তেফাক।

পক্ষান্তরে আইয়ুব সরকার কর্তৃক পুনঃ পুনঃ লাঞ্ছিত হওয়া সত্ত্বেও শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের সংহতি, একাত্মতা ও অখণ্ডত্ব রক্ষায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। কোন প্রকার প্রলোভন প্ররোচনা তাহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট ও বিচলিত করিতে পারে নাই।' (প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩২)

সংহতির পক্ষে সোহরাওয়ার্দী

১৯৬২ সালে গ্রেপ্তারের পর কারাগার থেকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে লেখা এক পত্রে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেন- 'পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন

হলে পূর্ব পাকিস্তান আক্রান্ত হবে, পদানত হবে এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। সোহরাওয়ার্দী কখনই পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার কথা কল্পনাও করেননি। তার কাছে পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হওয়ার ধারণা ছিল অচিন্তনীয় অসম্ভব এক সমীকরণ। পত্রে তিনি লেখেন- 'পূর্ব পাকিস্তানকে হিন্দুস্থানের গোলামীতে আবদ্ধ করার কথা একজন মুসলমান কি কখনো চিন্তা করতে পারে?' তিনি আরো বলেন- 'ভারত বর্ষের মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির জন্য পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমরা লড়াই করেছি। তিনি সু- নির্দিষ্ট করে বলেন- পাকিস্তান এক এবং অভিভাজ্য। এই জন্য আমরা জীবনবাজি রেখেছিলাম।' (ডক্টর সৈয়দ সাজ্জাদ হোসেন, দি ওয়েষ্টেজ অব টাইম পৃঃ ২৩৮)

আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির সপক্ষে থাকা সত্ত্বেও তার মানস সন্তান শেখ মুজিব তার উচ্চাভিলাষ চরিতার্থ করার জন্য পাকিস্তান বিরোধী চক্রের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন। নিখিল পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক উত্তরণের সম্ভাবনা যাচাই করে শেখ মুজিব হতাশ হয়েছিলেন। তার অর্থ কড়ি, বিদ্যাবুদ্ধি, রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং সামাজিক অবস্থান কোনটিই ছিল না- যা রাজনৈতিক উত্তরণের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য। এ সবের বাইরে তার কিছু গুণাবলী ছিল যা তার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে। প্রথমতঃ তার ছিল দুঃসাহস এবং ঝুঁকি নেবার মত মানসিক শক্তি। দ্বিতীয়তঃ তিনি ছিলেন আবেগময় বক্তা। অসংখ্য মিথ্যাচার এবং কাল্পনিক সম্ভাবনার আলো দেখিয়ে হ্যামিলনের বংশীবাদকের মত তরুণ সমাজকে সম্মোহিত করার দক্ষতা তার মধ্যে ছিল। এছাড়াও তার সাংগঠনিক শক্তিরও কোন রকম ঘাটতি ছিল না। এ কারণে প্রথম পর্যায়ে শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দীর হাত ধরে রাজনীতির বেশ কিছুটা পথ অগ্রসর হলেন। অতঃপর যখন তার নিজস্ব প্রভাব বলয় সৃষ্টি হল তখন থেকে তিনি ভিন্ন আঙ্গিকে ভাবতে শুরু করলেন। কংগ্রেস নেতা মনোরঞ্জন ধর, মনিসিং প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অর্থাৎ কমিউনিষ্ট এবং বাবুচক্রের সাহচর্যে নতুন সূত্রের সন্ধান পেলেন। পাকিস্তান বিরোধী চক্র মুজিবের মধ্যে খুঁজে পেল তাদের ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের প্রয়োজনীয় উপাদান। দুটো অভিন্ন লক্ষ্য এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয়। মুজিব দেখলেন পূর্ববাংলাকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হলে তিনি, একমাত্র তিনিই হয়ে উঠবেন একচ্ছত্র নেতা। আর এ ব্যাপারে হিন্দুস্থান

তাকে মদদ যোগাবে তাদের নিজস্ব স্বার্থে। অর্থ সম্পদের ঘাটতি হবে না কখনো। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও ভারত তার ভাবমূর্তি গড়ে তুলবে। এছাড়াও পূর্ববাংলার দু'শতাব্দীর সীমাহীন বঞ্চনাকে পাকিস্তানের ঘাড়ে চাপিয়ে আবেগপ্রবণ জনগণকে উদ্দীপ্ত করা যাবে অতি সহজে। শেখ মুজিব তার রাজনৈতিক গুরুকে না জানিয়েই হিন্দুস্থানের পেতে রাখা ফাঁদে পা দিলেন। এটাকেও তিনি তার রাজনৈতিক উত্তরণের জন্য যথেষ্ট মনে করলেন না। অন্যদিকে ইউসুফ হারুন ভ্রাতৃদ্বয়ের মাধ্যমে আমেরিকা অর্থাৎ সিআইএর এজেন্ট হিসেবেও রাজনৈতিক ময়দানে কাজ শুরু করলেন। আমি আগেই বলেছি, আমেরিকাও চাচ্ছিল আইয়ুব সরকারকে শায়েস্তা করতে। মুজিবের মাধ্যমে সিআইএ তার কার্যক্রম শুরু করে। আপাতত মুজিবের জন্য আমেরিকা এবং ভারতের মদদ সোনায় সোহাগা বলে পরিগণিত হল। এর ফলেই শেখ মুজিব প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রাখতে সক্ষম হলেন। জাতীয়তাবাদী বামপন্থী এবং হিন্দু এলিটদের সম্মিলিত প্রয়াসে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পুরোটাতেই পাকিস্তান বিরোধী চক্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল। ১৯৪৮ সাল থেকে ভারতীয় দূতাবাস এদেশী বুদ্ধিজীবীদের উপর যেভাবে প্রভাব বিস্তার করে আসছিল সেটা ইতিমধ্যে পোক্ত হয়ে উঠেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা Two economy theory বিশ্লেষণ করার পর পূর্ব পশ্চিমের মানসিক ব্যবধান দ্রুত বাড়তে থাকে। বিশ্লেষণে পূর্ব পশ্চিমের অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকটভাবে উপস্থাপন করা হয়। অবিশ্য এটা করা হয় ১৯৪৭ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অর্থনৈতিক অবস্থান বিবেচনায় না এনে। অধ্যাপকদের এই বিশ্লেষণে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতায় আর একমাত্রা যুক্ত হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা যৌক্তিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে তাদের তৎপরতা চালানোর সুযোগ পায়।

সোহরাওয়ার্দী কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন দেশের রাজনৈতিক শূন্যতা এবং রাজনীতিকদের বিভ্রান্তিকর পদচারণা। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি ভিন্ন রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। সংবিধান বাতিলের আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্যায়ে সংবিধান গণতন্ত্রায়নের আওয়াজ তুলে দেশের বিভ্রান্তিকর উচ্ছৃংখল রাজনীতিকে গঠনমূলক আন্দোলনের দিকে ধাবিত করতে চাইলেন। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী বেশীদূর অগ্রসর হতে পারলেন না। মরণ ব্যাধি তাকে দেশান্তর করল। তিনি চিকিৎসার উদ্দেশে

লন্ডন গমন করলেন। সোহরাওয়ার্দীর অনুপস্থিতির কারণে এন ডি এফ অর্থাৎ জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের রাজনৈতিক তৎপরতা স্তিমিত হয়ে পড়ে। দেশ নিক্ষিপ্ত হয় ষড়যন্ত্র, চক্রান্ত ও বিচ্ছিন্নতাবাদের কুটিল আবর্তে। সোহরাওয়ার্দী চেয়েছিলেন জাতীয় ভিত্তিক সার্বজনীন আবেদন নিয়ে রাজনীতি করতে, চেয়েছিলেন এর মাধ্যমেই আঞ্চলিক সমস্যার সমাধান। কিন্তু তার সহকর্মী শেখ মুজিব চেয়েছেন সুদূরপ্রসারী জাতীয় ভাবনা পরিত্যাগ করে তার রাজনৈতিক উত্থানে জন্য আঞ্চলিকতাকে উৎকটভাবে ব্যবহার করতে। সোহরাওয়ার্দী চেয়েছিলেন এনডিএফ এর মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য। কিন্তু শেখ মুজিব চেয়েছিলেন আওয়ামী লীগ পুনর্জীবিত করে ঐক্যবদ্ধ শক্তিকে খন্ডিত করতে। সোহরাওয়ার্দীর ছিল সুদূরপ্রসারী ভাবনা, শেখ মুজিবের ছিল নগদ প্রাপ্তির আকাঙ্খা। এর ফলে ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে মেতে উঠলেন মুজিব। ষড়যন্ত্রের রাজনীতির সাথে জড়িত করতে চাইলেন তার রাজনৈতিক গুরু সোহরাওয়ার্দীকে। কিন্তু শেষ অবধি শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দীকে ব্যবহার করতে সক্ষম হননি।

১৯৬৪ সালে সোহরাওয়ার্দী চিকিৎসার জন্য লন্ডনে থাকাকালে শেখ মুজিব তার সাথে সাক্ষাত করেন। পূর্ববাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার আন্দোলনের জন্য অনুমোদন চাইলে সোহরাওয়ার্দী বিক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং যশোহরের মিয়া আবদুর রশিদের মাধ্যমে প্রেরিত এক চিঠিতে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে দলীয় নেতৃবৃন্দকে সাবধান করে দেন। এ ছাড়াও শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবনের প্রস্তাবের মধ্যেও সোহরাওয়ার্দী জাতীয় স্বার্থ বিরোধী এক গভীর ষড়যন্ত্র আঁচ করতে সক্ষম হন। 'তাই জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে একনিষ্ঠ সোহরাওয়ার্দী তাহার রোগশয্যা পার্শ্বে দন্ডায়মান শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে তাহাকে নির্দেশ দান করেন। ইহা সহজেই অনুমেয় যে, শেখ মুজিবর রহমান তা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।' (অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি, পৃঃ ৩৩৭)

সেই একই লন্ডন সফরে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার আন্দোলনে ফিডেল ক্যাস্ট্রোর সহযোগিতার জন্য কিউবার দূতাবাসের

সাথেও যোগাযোগ করেন। (আফসান চৌধুরী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব সাপ্তাহিক বিচিত্রা, পৃঃ ৩৩৭)

এককালের আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মিঞা আব্দুর রশিদ "দৈনিক মিল্লাত"- এ ০৫- ১২- ১৯৮৯ইং তারিখে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জীবনের শেষ দিনগুলো" নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেন। তার সংগে আওয়ামী লীগ প্রধান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর লণ্ডনের ১১ নং "ব্রুক ল্যান্ড রাইস হিল" বাসায় যে কথা হয়েছিল তা এখানে হুবহু উল্লেখ করছি।

"পরবর্তীতে গঠিত DAC-NDF এবং PDP এর নেতৃবৃন্দ তাঁর (সোহরাওয়ার্দী) নেতৃত্বে একটি Common platform গঠন করে আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য মিঞা আব্দুর রশিদকে লন্ডনে পাঠান। নভেম্বর মাসের শেষ কোন একদিন সকালে বিমান থেকে নেমে সোজা সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কামরার সামনে পৌঁছলে তিনি ভিতরে সোহরাওয়ার্দীর হুংকার শোনতে পান। তাই মিঞা সাহেব ভিতরে না ঢুকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকনে কিছুক্ষণ। যে নেতাকে তিরস্কার করা হয়েছে সেই নেতা (শেখ মুজিব) কামরা থেকে বের হয়ে গেলে তিনি (মিঞা আব্দুর রশিদ) ভিতরে ঢুকেন। ঢুকার সংগে সংগেই তাকে সোহরাওয়ার্দী সাহেব বলতে থাকেন : This scoundrel wants to destroy the country and I couldn't be a party to that. I must go back to Dhaka to save my country from the Indian conspiracy. You must be careful, he will not only destroy your country but he will destroy all of you.

(দৈনিক মিল্লাত: তারিখ ০৫- ১২- ১৯৮৯ ইং)

এককালে আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মিঞা আব্দুর রশীদকে উদ্দেশ্য করে লন্ডনের ১২নং ব্রুকল্যান্ড বাসায় যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন মুজীব সম্পর্কে, তার নেতা শহীদ সোহরাওয়ার্দী একই মন্তব্য ও সাবধান বাণী যুব নেতাদের জন্য রেখেছিলেন রাজ বিরোধী পুস্তকের ১৮৩/১৮৪ পৃষ্ঠায় রাজ বিরোধী আশরাফুদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী পাকিস্তানের আনুগত্যের সিদ্ধান্ত ছিল চূড়ান্ত। জীবন সায়াহ্নে ১৯৭০ সালের নির্বাচন কালের সেই প্রচণ্ড গণজোয়ারের মুখুমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন আশরাফুদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী। আশরাফের বাড়ীর চার পাঁচ মাইলের মধ্যে

জনসভা দেশের ছেলেরা তাকে রুখে দাঁড়ালো। ছাব্বিশটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্যে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে তাকে। নইলে জনসভা করতে দেওয়া হবে না, উত্তেজিত ছেলেদের উচ্ছৃংখলতায়। তথাকথিত বাংগালী জাতীয়তাবাদের এক দুশমণকে তারা আজ যেন পেয়ে গেছে.... একথা বলে মাইকের সামনে দাঁড়াল ও অসংযত বিদ্রুপ ধ্বনিতে ....বাধা প্রাপ্ত হলেন নেতা। এ বিচ্ছৃংখলার মধ্যে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন আশরাফ কিছুক্ষণ। হঠাৎ নিকটেই একটা ঢিল পড়লো। সংগে সংগেই প্রচণ্ড ধমক- ফেটে পড়লো আশরাফ। শোন, তোমাদের প্রশ্নের জবাব দু'মিনিটে আমি দিয়ে দিচ্ছি। ভবিষ্যতের জন্যে লিখে রাখ আমার কথাগুলোঃ (১) ইসলামের মাজহাব একটি। তা হচ্ছে মুসলিম। (২) পূর্ব্ব দিকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে ভারতীয় সীমান্ত। তোমাদের নেতা ও তোমরা সে দিকেই চলতে শুরু করেছ। তোমরা বুঝ আর না বুঝ, আমি পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি তোমরা কোথায় যাচ্ছ। আমি ১৯৪৭- এর ১৪ই আগস্ট কুমিল্লা টাউন হল প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে পাকিস্তান জাতীয় পতাকাকে তসলিম জানিয়ে ছিলাম। আজও আমি সেখানেই আছি। খোদা হাফেজ"

রাজ বিরোধী পৃষ্ঠাঃ ১৮৩/১৮৪

আশরাফুদ্দিন চৌধুরী।

যাই হোক, অব্যাহত কমিউনিস্ট ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি আর এক ষড়যন্ত্র বিকশিত হচ্ছিল। তথাকথিত ইনটেলিকচুয়ালদের ড্রইংরুমের সীমাবদ্ধ চত্বর পেরিয়ে সর্বত্র পল্লবীত হচ্ছিল ধীরে ধীরে। পর্দার অন্তরাল থেকে জাতীয়তাবাদ পা পা করে এগিয়ে আসছিল রাজনৈতিক মঞ্চের দিকে। এই জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ বৃটিশ শাসনামলে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরোধিতা করে এসেছে। শুরু থেকে শেষ অবধি এরাই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে মুসলিম লীগের সাথে একাত্ম না হয়ে স্বতন্ত্র স্রোতধারা প্রবাহিত করার চেষ্টা করে। এরা ছিল উপমহাদেশে হিন্দু প্রভুত্বের ছায়াতলে অবস্থানে বিশ্বাসী। এরা হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দু মনমানসিকতার সাথে চিন্তা চেতনার দিক দিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল। সাতচল্লিশে দেশ বিভাগের পর অর্থাৎ দ্বিজাতি তত্ত্বের বাস্তবায়ন হলে এরা রাজনৈতিক দিক দিয়ে হয়ে পড়েছিল দেউলিয়া। এদের কর্মতৎপরতা ড্রইংরুমের সীমাবদ্ধ চত্বরে বন্দী হয়ে পড়েছিল। এইসব জাতীয়তাবাদী খোঁড়া রাজনীতিকদের আগামী দিনগুলো নিক্ষিপ্ত

হয়েছিল অনিশ্চয়তার অন্ধকারে। আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ অনেকেই মুসলিম লীগে শামিল হয়ে মুক্তির নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করছিলেন।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে, জিন্নাহর মৃত্যুর পর নবাব জমিদার সামন্তশ্রেণী ও আমলাদের হাতের খেলনা হয়ে গণ সংগঠন মুসলিম লীগ রাজনীতিতে কুয়াশা আর ঘোলা পানির আবর্ত সৃষ্টি করে। এই ঘূর্ণাবর্তে পাক খেয়ে জীবনমৃত জাতীয়তাবাদীরা তাজা হয়ে ওঠে। গা ঝাড়া দিয়ে ময়দানকে মাতিয়ে তোলার প্রয়াস নেয়। পর্দার অন্তরাল থেকে বাবুচক্র তাদের সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করে।

ওদিকে সোহরাওয়ার্দীর প্রতি সরকারও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের আচরণ তাকে নতুন দল গঠনে উদ্বুদ্ধ করে।

মুসলিম লীগ নেতা মওলানা ভাসানী আসাম থেকে হিজরত করে তার প্রত্যাশিত পাকিস্তানে এলেও বৃটিশ যুগের বিদ্রোহী মানসিকতা পরিবর্তন করতে পারেননি। শীর্ষ স্থানীয় মুসলিম লীগের কর্মকাণ্ড তাকে আরও অস্থির উদভ্রান্ত করে তোলে। তিনি সদ্য স্বাধীন দেশে বিদ্রোহের আগুন না ছড়িয়ে গঠনমূলক ধীর পদক্ষেপে জাতীয় নেতৃত্বের যথাযথ পরিবর্তন আনতে পারতেন। তা না করে তিনি মুসলিম লীগ বিরোধী পাল্টা এক সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে অতি উৎসাহী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন।

গঠন হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ। চিহ্নিত জাতীয়তাবাদীরা মুসলিম লীগ বিরোধী এই মোর্চার নিরাপদ আশ্রয়ে মাথা গুঁজে তাদের পুরানো সাবেকী মানসিকতা নিয়ে। জনাব সোহরাওয়ার্দীর চিন্তা চেতনা ও মন-মানসকিতা আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী ও একপেশে ছিল বলে মনে হয় না। তিনি তার নতুন সংগঠনের মাধ্যমে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। যদিও এক সময় তার জাতীয়তাবাদী ধ্যান- ধারণা ছিল। যে কারণেই তিনি একদিন যুক্তবাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তার আজন্ম লালিত যুক্তবাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নে কায়েদে আযম তার হাত সম্প্রসারিত করলেও রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হিন্দু নেতৃবৃন্দ তার প্রস্তাবিত যুক্তবাংলার পরিকল্পনাকে ধ্বংস করে দেয়। এর পরেই তিনি তার জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণাকে গঙ্গার জলে বিসর্জন দেন। তার জীবনের অত্যন্ত বাস্তব অথচ তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে সম্ভবত পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রধান হিসেবে তিনি তার সংগঠনের নাম পরিবর্তন করতে চাননি। তিনি

জাতীয়তাবাদীদের তথাকথিত ভাষায় 'অসাম্প্রদায়িকীকরণ' অর্থাৎ মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ নামকরণের বিরোধী ছিলেন। পক্ষান্তরে সংগঠনের সাম্প্রদায়িক চরিত্র পরিবর্তনের প্রবক্তা ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

১৯৫৫ সালের ২১- ২৩ মে সদরঘাটে অবস্থিত রূপমহল সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের অধিবেশনে সংগঠনের নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রোপিত হয়েছিল ধ্বংসের বীজ। সোহরাওয়ার্দীর উপলব্ধি সম্ভবত এমনই ছিল যে সংগঠনের নাম পরিবর্তন হলে আগামী একদা এই সংগঠন পাকিস্তান ধ্বংসপ্রয়াসী হিন্দু কুচক্রীদের ক্রীড়নকে পরিণত হবে। জনাব সোহরাওয়ার্দী সংগঠনের নামের সাথে মুসলিম শব্দটি বাদ না দেয়ার ব্যাপারে ছিলেন অবিচল। কিন্তু কর্মীদের মনোভাব লক্ষ্য করে অনেক ভাবনা,অনেক চিন্তার পর ২২ মার্চ ভোর চারটায় তিনি তার আপত্তি প্রত্যাহার করেন। পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ প্রমাণ করে যে, সোহরাওয়ার্দীর আশঙ্কা মোটেও অমূলক ছিল না। আওয়ামী লীগ শুধুমাত্র এদেশী হিন্দুদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়, তা নয়। ৫০ দশকেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়ে দিল্লীর দালালীতে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে দেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ হিন্দুস্তানের হাতে তুলে দিয়ে আজ অবধি জাতীয় স্বার্থ বিরোধী সব রকম অপকাণ্ডে নিয়োজিত রয়েছে।

মওলানা ভাসানীর আবেগ ছিল, উদ্দাম কর্মস্পহা ছিল, দুঃস্থ গণমানুষের জন্য ছিল অপরিসীম দরদ ও অন্তহীন সমবেদনা। তার উন্নাদনা ছিল কিন্তু তাতে প্রজ্ঞার যোগ ছিল না। দূরদর্শিতা ও ভারসাম্যের অভাবেই ভাসানীর কর্মকাণ্ড ভায়োলেন্সমুখী হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে এই একমাত্র অনুভূতিপ্রবণ জনদরদী নেতাকে সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিস্টরা তাদের আত্মরক্ষার বর্ম হিসেবে ব্যবহার করে। মওলানা ভাসানী আমরণ অক্লান্ত পরিশ্রম করেও জাতিকে মুক্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির দোর গোড়ায় আনতে ব্যর্থ হন। আমৃত্যু তিনি বুকভরা শূন্যতা নিয়ে অসীম আকাশের দিকে তাকিয়ে বিষের বাঁশী বাজিয়ে গেলেন। গেয়ে গেলেন ভাঙার গান। আর জাতির জন্য রেখে গেলেন একরাশ হতাশা।

আসামের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্যার সদরুল্লাহকে পাকিস্তানে এসে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার জন্য সরকারীভাবে আমন্ত্রণ জানান হলে উত্তরে তিনি বলেন, মওলানা ভাসানী- রাজনৈতিক আবহাওয়াকে যেভাবে উত্তপ্ত করে চলেছে সে উত্তাপ নিরসনের ক্ষমতা আমার নেই। পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য ভাসানীর উপস্থিতিই যথেষ্ট।

যাইহোক, পাকিস্তান ধ্বংস- প্রয়াসী হিন্দুরা এবং কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীরা আওয়ামী লীগ তথা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জেঁকে বসে। অন্যদিকে সাহিত্যের নামে সংস্কৃতির নামে আর্টের নামে সমগ্র জাতিকে এমনই অন্ধমাতাল করে রাখা হয় যেন এদেশের মানুষেরা তার নিজস্ব আদর্শ ও আপন জাতীয় সত্তার গভীরে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে সমস্ত বাংলাদেশী অতল জলের আহবানে ডুবতে থাকে মহাসমুদ্রের গভীরে।

পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা দার্শনিক কবি ডঃ আল্লামা ইকবাল উপমহাদেশে সামগ্রিক মুসলিম নেতৃত্বের দুর্বলতা আঁচ করেছিলেন অনেক আগে। ১৯৩২ সালে ২১ শে মার্চ লাহোর অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম সম্মেলনে এ প্রসঙ্গে দ্ব্যর্থহীনভাবে তিনি বলেনঃ "আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, বর্তমানে যারা রাজনৈতিক সংগ্রামে ভারতীয় মুসলমানদের কার্যকলাপের পথ নির্দেশ করছেন বলে মনে করা হয়, তাঁদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে এখনও এক ধরনের বিশৃংখলা রয়েছে। এ পরিস্থিতির জন্য অবশ্য জাতির ওপর দোষারোপ করা চলে না। দেশের যেসব বিষয়ের সাথে মুসলিম জনগণের ভাগ্য জড়িত রয়েছে তার জন্য আত্মত্যাগের মনোভাব তাদের মোটেও নেই।...জাতিকে যে পথ নির্দেশ দেয়া হয় তা সবসময়ে স্বাধীনভাবে পরিকল্পিত নয়। তার ফল হচ্ছে সংকট মুহূর্তে আমাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাঙ্গন। এই কারণেই এসব প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক সংহতির জীবন ও শক্তির পক্ষে অপরিহার্য প্রয়োজনীয় ধরনের শৃংখলা সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারে না।'

৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আরও তীব্র আরও প্রকট আকার ধারণ করে। রাজনীতিতে তখন ত্রিমুখী ধারা প্রবল হয়ে উঠে। শীর্ষ নেতারা জাতীয় স্বার্থ ভুলে পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয়। হক ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রিক রাজনৈতিক নেতা ও তাদের কর্মীদের মধ্যে কতিপয় ক্ষুধার্ত শৃগালের অর্ধমৃত লাশ নিয়ে টানা হেচরার

প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক অস্থিরতা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। হতবাক দেশপ্রেমিক জনতা অনাহুত আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। নেপথ্য কুচক্রী, সমকালীন উমিচাঁদ, জগৎ শেঠদের ঘরে ঘরে তখন উৎকট আনন্দ। পরিষদ ভবনে স্পীকার শাহেদ আলীকে হত্যা করে নেতৃবৃন্দ ফ্যাসীবাদী কর্মকাণ্ডের চেয়েও ভয়াবহ বর্বতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। নেতৃবৃন্দের এই দ্বন্দ্ব সংঘাত আর হানাহানির ফাঁকে হিন্দু বুর্জোয়া এবং এ দেশী পঞ্চমবাহিনী সম্মিলিতভাবে ৯শো কোটি টাকার সম্পদ হিন্দুস্থানে পাচার করে দেয়। সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যায়, প্রত্যেক বছর এ দেশে উৎপাদিত ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের খাদ্যশস্য সীমান্ত অতিক্রম করে ওপার বাংলার গুদামে জমা হতো। সমগ্র দেশে কালোবাজারীর এত বিস্তৃতি ঘটেছিল যে, সামরিক বিপ্লবের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সাগরে অভিযান চালিয়ে সাড়ে ৪ টন সোনা উদ্ধার করা হয়। ক্রাইম বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই পরিমাণ সোনা প্রত্যেক মাসে বিদেশে পাচার হত। বাংলাদেশের পাটের ষাট শতাংশ ব্যবসা কোলকাতার মারোয়ারীদের হাতে ছিল। তারা কালোবাজারীর মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার পাট এদেশ থেকে টেনে নিত। নৌবাহিনীর Close door operation রাজনৈতিক চাপের মুখে ব্যর্থ হয়। দেশের খাদ্যশস্য মওজুতদারী কবলিত হওয়ায় সাধারণ মানুষ দুর্ভিক্ষের হাহাকারে নিপতিত হয়। দুর্ভিক্ষাবস্থা ও খাদ্য সংকট এমন তীব্র আকার ধারণ করে যে এর মোকাবিলা করার জন্য সেনাবাহিনীকে ময়দানে নামতে হয়। 'ওজারতির ২ বছর' গ্রন্থে জনাব আতউর রহমান খান একথা স্বীকার করেন। পূর্ব পাকিস্তানের চোরাচালান নির্মূলের জন্য তিনি সামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্য গ্রহণ করেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিচ্ছিন্নতাবাদে বিদেশী ইন্ধন

১৯৬৫ সালে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী কায়েদে আযমের বোন মিস ফাতেমা জিন্নাহর বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের বিজয় যেমন আইয়ুব খানকে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর করেছিল অনুরূপভাবে বিরোধী দলকে ঘিরে ধরেছিল নৈরাশ্য। বিরোধী দলের ব্যর্থতার মূল কারণ হিসেবে তারা মনে করতে শুরু করল আইয়ুব খানের প্রচলিত মৌলিক গণতন্ত্রকে। নির্বাচনে পরাজয়ের জন্য তাদের ক্ষোভ মৌলিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভূত হল। ওদিকে আইয়ুব খানের সাফল্য তাকে এতই অভিভূত করে ফেলেছিল যে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর দৃষ্টিপাত করার কোন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন না। বৈদেশিক নীতিকে সুসংহত করার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পদচারণা শুরু করলেন। এ সময় প্রেডিডেন্ট আইয়ুব একসাথে পিকিং, মস্কো, ওয়াশিংটন সফরের পকিল্পনা নেন। সাফল্যের সাথে এবং ব্যাপক প্রচারণার মধ্য দিয়ে পিকিং ও মস্কো সফর সম্পন্ন হলেও প্রেসিডেন্ট নিক্সন প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের ওয়াশিংটন সফর কর্মসূচী অসৌজন্য- মূলকভাবে বাতিল করে দেওয়ায় এতে দেশে বিদেশে আইয়ুবের মর্যাদা বৃদ্ধিই পেয়েছিল। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের ওয়াশিংটন সফর কর্মসূচী অসৌজন্যমূলকভাবে বাতিল করে দিলে পর এতে দেশে বিদেশে আইয়ুবের ব্যাপারে ওয়াশিংটন নিরুত্তাপ হয়ে পড়ে। ওয়াশিংটনের সাথে পাকিস্তান সরকারের সম্পর্কের জেল্লা হারালেও বিরোধী দলের সাথে সিআইএর সখ্যতা বৃদ্ধি পায়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের রাজনৈতিক বিপর্যয় ত্বরান্বিত করার জন্য সিআইএ তৎপর হয়ে উঠে। '১৯৬৩ সালেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত মার্কিনী সাহায্য হইতে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ পূর্বাহ্নেই নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। ইহার ফলে পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের চাইতে ওয়াশিংটনকে অধিকতর সহানুভূতিশীল মনে করিবার ইন্ধন পাইয়া গেল। সুকৌশলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানী জনতাকে উস্কানী দান করাই ছিল উপরোক্ত মন্তব্যের লক্ষ্য।... কেন্দ্রীয় সরকারকে বেকায়দায় ফেলিবার জন্য মার্কিন সরকার নানাভাবে প্রচেষ্টা চালাইতে থাকে। (অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি, পৃঃ ৩৩)

১৯৬৫ সালে জানুয়ারীর নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের নিরঙ্কুশ বিজয় এবং মার্চে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট আইয়ূবের আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কূটনীতিক পদচারণার ফলে এক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা পাকিস্তান ভারতের সমকক্ষতা অর্জন করলেও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আইয়ুবের অমনোযোগিতার কারণে আমেরিকা এবং ভারত উভয়েই এ ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে উঠে। তারা আইয়ুব সরকারের দুর্বলতা অন্বেষণ করে তাকে ঘায়েল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ ব্যাপারে উভয়েই দাবার ঘুঁটি হিসেবে সমানভাবে ব্যবহার করে শেখ মুজিবকে। অন্যান্য দলগুলোর উপরে আমেরিকার যে প্রচ্ছন্ন প্রভাব ছিল সেটাকে কাজে লাগাতেও আমেরিকা পিছিয়ে রইল না।

পাকিস্তান সরকারের উপর আমেরিকার আশীর্বাদ না থাকায় এবং আইয়ুব প্রশাসনের উপর মার্কিন বৈরিতা ও অসন্তোষ স্পষ্ট হয়ে উঠার ফলে ভারতের জন্য এক অপূর্ব সুযোগ এসে উপস্থিত হয়। পাকিস্তানের উভয় অংশে ভারত ছোটখাট সীমান্ত সংঘর্ষের সূচনা করে। পরবর্তীতে এক পর্যায়ে পাকিস্তানের উপর এক ভয়াবহ যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। সেই সময় আমেরিকা যুদ্ধ আক্রান্ত পাকিস্তানের দিকে ফিরেও তাকায়নি। পাকিস্তান তার শক্তি সামর্থ্য দিয়ে বিরোচিত প্রতিরোধ করে। আমেরিকা পাকিস্তানে সমরাস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় খুচরো যন্ত্রাংশ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। ফলে পাকিস্তানকে বিজয়ের দোর গোড়ায় এসেও পিছিয়ে আসতে হয়। অনিচ্ছা সত্ত্বেও আইয়ুব খান তাসখন্দ ঘোষণায় স্বাক্ষর দান করলেন। চীনের চাপের মুখে হিন্দুস্থান পূর্ব পাকিস্তানের দিকে চোখ তুলে তাকাল না। যুদ্ধ শেষ হল। যুদ্ধোত্তর দেশ পুনর্গঠন এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যখন আইয়ুব খান মনোযোগী হতে চাইলেন। সে সময় আইয়ুবের কর্তৃত্বের উপর যুদ্ধের প্রভাবের ব্যাপারে বলতে হয় যে, বহু সেনাবাহিনীর অফিসার এমন কি কিছু জেনারেলও এই যুদ্ধ চীনা সাহায্য নিয়ে চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন। সুকর্নোর ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানকে সাহায্য করতে রাজী ছিল। সেনাবাহিনীর তরুণ অফিসাররা অনুভব করল যে, আইয়ুব খান বাইরের চাপের মুখে যুদ্ধবিরতি ও পরবর্তীতে তাসখন্দ চুক্তি করেছেন এবং নিজের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্তকরেছেন।... আইয়ুব তার সীমাবদ্ধ রাজনৈতিক ভিত্তি নিয়ে তার নিজের ও শাসক এলিটদের কায়েমী স্বার্থকে বাদ দিয়ে চীনা সাহায্যে একটা গণযুদ্ধ চালাতে পারতেন না।... তাসখন্দ

বৈঠকে কথিত জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়ার জন্য আইয়ুবের ভাবমর্যাদা অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে- যাকে ভূট্টো ১৯৬৯ সালের রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় আইয়ুব বিরোধী ব্যাপক আন্দোলনের ভিত্তি হিসেবে ব্যবহার করেন। (অখণ্ড পাকিস্তানের শেষদিনগুলো, জি ডব্লিউ চৌধুরী, পৃঃ-৩০) সে সময় বিদেশী চক্র তাদের প্রভাবিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে ভিন্ন খেলায় মেতে উঠল।

সর্বপ্রথম মাঠে নামলেন মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী ও জামায়াতে ইসলামী। যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে আইয়ূব বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করে জামায়াতে ইসলামী। শেখ মুজিব ৬ দফা কেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতার ধোঁয়া তোলার কারণে, পরবর্তীতে কারা অন্তরীণ থাকার কারণে এবং এই সাথে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের প্রতি সরকারের কঠোরতা অবলম্বনের কারণে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক ময়দানে প্রকাশ্য কর্মকাণ্ড থেকে দূরে সরে দাঁড়ায়। এককভাবে জামায়াতে ইসলামী আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে থাকে দীর্ঘদিন ধরে। আর সব দল ছিল শুধুমাত্র নেতা সর্বস্ব।

আইয়ুবের বৈদেশিক নীতি একান্তভাবে ওয়াশিংটনমুখিতা পরিহার করায় মওলানা ভাসানী আইয়ুবকে পরোক্ষ সহযোগিতা দান শুরু করেন।

একমাত্র জামায়াতে ইসলামীর নিবেদিত প্রাণ কর্মীরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য এবং জনমত সৃষ্টির জন্য ময়দানে তৎপর হয়ে উঠে। তাসখন্দ চুক্তির বিরোধিতা দিয়েই আন্দোলনের শুভ সূচনা হয়। পূর্ব পশ্চিম উভয় অংশের জনগণ তাসখন্দ ঘোষনাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। জামায়াতে ইসলামী সাধারণ মানুষকে একথা বোঝানোর চেষ্টা নেয় যে আইয়ুব খান ডিক্টেটর হওয়ার কারণে তাসখন্দ ঘোষণায় স্বাক্ষরের আগে বিরোধীদলসমূহের সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রয়োজন মনে করেনি। বিদেশী চাপের মুখে নিশ্চিত বিজয় জেনেও রণাঙ্গন পরিহার করে।

তাৎক্ষণিকভাবে না হলেও জনমনে এর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। ধীরে ধীরে আন্দোলনের পালে হাওয়া লাগতে শুরু করে। জামায়াতে ইসলামী জনগণের আবেগ এবং ক্ষোভকে আন্দোলনের শক্তিতে পরিণত করার উদ্যোগ নেয়। ওদিকে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে জাতীয়তাবাদী শক্তি ও বামপন্থী চক্র ভিন্ন প্রক্রিয়ায় জনগণকে বিক্ষুব্ধ করার প্রয়াস নেয়। তারা

সঙ্গোপণে একথা ছড়িয়ে দেয় যে, যুদ্ধকালীন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার দিকে পশ্চিম পাকিস্তানীরা ফিরে তাকায়নি। পাকিস্তানের সমর শক্তি শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানের নিরাপত্তা বিধানে ব্যস্ত থেকেছে। তারা পূর্ব পশ্চিমের বৈষম্যটা প্রকট করে তুলে ধরে ব্যাপক প্রচারণা চালায়। পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা জনিত সমস্যা এদেশের বুদ্ধিজীবী এবং তরুণ সমাজের মনে দারুণভাবে রেখাপাত করে। ধীরে ধীরে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের মন মানসিকতায় জাতীয়তাবাদীদের প্রচারণা ক্রিয়াশীল হতে থাকে। যদিও জাতীয়তাবাদীদের সাংগঠনিক তৎপরতা ছিল না, তা সত্বেও বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্তভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ সৃষ্টির আঞ্জাম দিতে থাকে তারা। যদিও যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রশ্নে আইয়ুব খান যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছিলেন তা সত্ত্বেও জনগণের ক্ষোভ নিরসনের মত খুব বেশী কিছু করতে সক্ষম হননি। পত্র পত্রিকাসমূহে বামপন্থীদের প্রাধান্য থাকায় দেশের সংহতির বিরুদ্ধে পরিকল্পিত এবং সূক্ষ্ম প্রচারণা প্রকটভাবে চলতে থাকে। তাসখন্দ ঘোষণার প্রেক্ষিতে জনগণ এবং সেনাবাহিনীর অসন্তোষের প্রতিধ্বনি হতে থাকে বিরোধীদল সমূহের রাজনৈতিক দলসমূহের চলমান প্রক্রিয়ার মধ্যে। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ লাহোরে সর্বদলীয় সম্মেলন আহব্বান করেন। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট নেতা জনাব নূরুল আমীন লাহোর সম্মেলনের পূর্বে ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করে শাসনতান্ত্রিক জটিলতা নিরসনের আহবান জানান।

মুজিবের চাতুরীপূর্ণ অবস্থান

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান লাহোর সম্মেলনে যোগ দেন। ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত লাহোর সম্মেলনে সাংবিধানিক সমস্যা নিরসনের জন্য ৬ দফা পেশ করেন। সাংবাদিকরা তাকে ৬ দফা বিশ্লেষণের জন্য ঘিরে ধরে। তিনি করাচীতে ৬ দফা বিশ্লেষণ করার আশ্বাস দেন। সম্মেলনে সমবেত নেতৃবৃন্দের সম্মুখে ৬ দফার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করতে না পারায় তিনি বেকায়দায় পড়েন এবং সম্মেলন ত্যাগ করেন। করাচীতেও তিনি অনুরূপ বেকায়দায় পড়েছিলেন। ১১ ফেব্রুয়ারী তিনি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সাংবাদিকদের নিকট লাহোর সম্মেলনে প্রস্তাবিত দফাগুলো প্রকাশ করেন। লাহোর এবং

করাচীতে শেখ মুজিব ৬ দফার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণে ব্যর্থ হয়ে তার মেধাশূন্য কর্মীদের বাহবা নেয়ার জন্য নতুন একটা গল্পের অবতারণা করেন। তিনি বলেন, করাচীতে তাকে হত্যার প্রয়াস চলেছিল বলেই তাকে দ্রুত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসতে হয়। কথাটা দারুণভাবে বিকিয়ে ছিল সেই সময়।

আওয়ামী লীগের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অনেকে ৬ দফাকে সহজভাবে নিতে পারেনি। আবার অনেকেই দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। শেখ মুজিব আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ না করেই ৬ দফা উত্থাপন করেন। ৬ দফা শেখ মুজিবের উদ্ভাবিত ফর্মূলা নয়, আইয়ূব শাসনকে বিপর্যস্ত করার জন্য কোন বৈদেশিক শক্তি শেখ মুজিবের উপর ভর করে তাকে দিয়েই ৬ দফা উত্থাপন করে।

৬ দফার প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগের ভাঙন আশঙ্কা করে শেখ মুজিব আবেগপ্রবণ তরুণদের পুনর্গঠিত করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৩ এপ্রিল শেখ মুজিব ছাত্র নেতৃবৃন্দকে তার বাসভবনে একান্ত সাক্ষাৎকারে আমন্ত্রণ জানান। 'শেখ মুজিব এদিন ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের কাছে আওয়ামী নেতাদের রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন- 'এদের অধিকাংশই মুসলিম লীগ থেকে এসেছে, (শেখ মুজিব নিজেও মুসলিম লীগ থেকে এসেছেন) হতাশ হয়েছে সুযোগ সুবিধা না পেয়ে। তাদের দিয়ে ৬ দফার আদর্শ বাস্তবায়ন করা যাবে না। আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতাদের অধিকাংশ পাকিস্তানপন্থী বলে শেখ মুজিব এদিন তার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসেবে জেলায় জেলায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দখল করার জন্য ছাত্রলীগের তরুণ নেতাদের নির্দেশ দেন এবং ৬ দফার ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে বলেন। (বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, পৃঃ ১৮০)

পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ১৬ বছর পর এক সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাক বলেন- '... ৬ দফা কর্মসূচী ঘোষণার পর বঙ্গবন্ধু ছাত্র লীগের তৎকালীন সভাপতি মাজহারুল বাকী ও আমাকে ডাকলেন...। তিনি ছয় দফা আন্দোলন ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, সাঁকো দিলাম ওপার যাবার জন্য। তখন আমি প্রশ্ন করলাম এত বড় সংগ্রাম, কে আমাদের এই সংগ্রামে সাহায্য করবে? তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে

বললেন, আমেরিকা তোদের বিরোধিতা করবে চীন তোদের সমর্থনে আসবে না। ভারত তোদের বন্ধু। আর একটা পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন তোদের সাহায্য করবে। ১৯৬৬ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সম্ভবত আমাদের সাথে এই বৈঠক হয়। (সাপ্তাহিক মেঘনা, ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭)

অধ্যাপক মোজাফফরও একই কথা বলেছেন, ৬ দফা পরিকল্পনা পেশের সময় শেখ মুজিব তাকে এবং রুহুল কুদ্দুসকে ডেকে বলেছিলেন- 'আসলে ৬ দফা নয়, এক দফাই ঘুরিয়ে বললাম শুধু। (ডক্টর মোহাম্মদ হান্নান, পৃঃ ১৮৬)

৬ দফার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া

একটুখানি রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা যাদের মাথায় ছিল তারা ঠিকই বুঝেছেন ৬ দফার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য। মওলানা ভাসানী ছয় দফার বিরোধিতা করেছেন। জামায়াতে ইসলামী ৬ দফার বিরুদ্ধে ছিল। এমনকি আওয়ামী লীগের মধ্যেও যারা ছিল দেশপ্রেমিক তাদের অনেকেই ৬ দফার প্রতিক্রিয়ায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন অথবা দলত্যাগ করেন। সরকারের কাছেও ৬ দফার উদ্দেশ্য ছিল পরিষ্কার। শুধু দেশের সাধারণ মানুষ ধুমাশায় আচ্ছন্ন ছিল।

সে সময় পাকিস্তানের সংহতিতে বিশ্বাসী দলসমূহ এমন এক অবস্থানে দাঁড়িয়ে ছিল যেখান থেকে তাদের ফেরানো সম্ভব হয়নি। এরা ৬ দফা বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তাদের রাজনীতি ৬ দফার জন্য পথ পরিষ্কার করছিল। আওয়ামী লীগ ও বামচক্র সে সময় ঠুনকো অজুহাতে হরতাল অবরোধ চালাতে শুরু করে। এদের সাথে তাল রেখে পাকিস্তানের সংহতিতে বিশ্বাসীরাও ভিন্ন আঙ্গিকে আন্দোলনের কর্মসূচী দিতে থাকে। এতে কিন্তু লাভ হয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের। আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকে। ৬ দফা গতিশীল হওয়ার আগে একে শক্তিহীন করার উদ্যোগ নেয় সরকার শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে।

জনাব পি এ নাজির লিখেছেন- 'এরপর শুরু হল আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের গ্রেফতারের পালা। ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে মনে হয়েছিল দারুণ অবিবেচনা প্রসূত কাজ। একবার ছেড়ে দেয়া হয় আর একবার গ্রেপ্তার করা হয়, আবার ছেড়ে দেয়া হয়। উপর মহলে যারা

এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন তারা কি সুকৌশলে শেখ মুজিবকে জনপ্রিয় করে তুলতে চাচ্ছিলেন আমার মত অনেকেরই মনে এ প্রশ্ন দোলা খেতে দেখেছি।'

এই গ্রেপ্তারীর প্রক্রিয়াটা শুরু হয় রাজধানী ঢাকা থেকে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সাধারণ নিয়মে এই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হতো না। উঁচু মহলে সিদ্ধান্ত নেয়া হতো সরাসরি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের মাধ্যমে। নির্দেশ দেয়া হত গভর্ণর হাউজ থেকে। (পি এ নাজির, স্মৃতির পাতা থেকে, পৃঃ ২৩৯)

মোনয়েম খান সম্ভবত এইভাবে পঞ্চমবাহিনীর তৎপরতা প্রতিরোধ করে পাকিস্তানের অনিবার্য ধ্বস রুখতে চেয়েছেন। জনাব অলি আহাদ বলেছেন- 'দেশের আনাচে কানাচে ছয় দফার বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়ার প্রয়াসে শেখ মুজিবর রহমান বিভিন্ন জেলা সদরে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দিতে লাগিলেন। ক্ষিপ্ত গভর্ণর মোনয়েম খান বক্তৃতার কোন কোন অংশকে আপত্তিকর নির্ধারত করিয়া পেনাল কোডের বিভিন্ন ধারায় বিচারের জন্য তাহাকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেন। ঢাকার পল্টন ময়দানে বক্তৃতার জন্য খুলনা হইতে ঢাকা আগমন পথে একুশে এপ্রিল যশোহর জেলা শহরে গ্রেপ্তার, যশোহর দায়রা জজকর্তৃক জামিন মঞ্জুর। ময়মনসিংহে বক্তৃতার অপরাধে পুনঃ সিলেট জেল গেইটে গ্রেপ্তার এবং ময়মনসিংহ দায়রা জর্জ কর্তৃক জামিন মঞ্জুর প্রাপ্ত হন। এইভাবে শেখ মুজিব পুনঃপুনঃ গ্রেপ্তার এবং দৈনিক ইত্তেফাকের নিরবচ্ছিন্ন প্রচার অভিযান পূর্ব পাকিস্তানের সর্বশ্রেণীর শ্রমিক, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী চাকুরিজীবী ব্যবসায়ী, শিল্পপতি মহলে তীব্র আলোড়ন ও যুগান্তকারী আবেদন সৃষ্টি করে। (অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি, পৃঃ ৩৩)

ছোটখাট অব্যাহত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি এবং অন্যান্যরা ওয়ার্ম আপ হল। বৃহত্তর কর্মসূচী নেয়ার প্রারম্ভে ৬ দফার দাবীতে আওয়ামী লীগ সর্বাত্মক হরতালের ডাক দিলো। সেদিন রাজধানীর পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ ও মারমুখী ছিল এবং আওয়ামী ও বামপন্থী ছাত্র জনতা সমগ্র ঢাকা জুড়ে ভয়ঙ্কর তান্ডব সৃষ্টি করে। সে দিনের পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিস্তৃত আলোচনার অবতারনা না করে সংক্ষেপে একথাই বলা যায়।

৭ই জুন ঘটনার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা কারারুদ্ধ হয়েছিল। ১৫ই জুন তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৬ই জুন দৈনিক ইত্তেফাকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। এরপর ৬ দফার আন্দোলন নিস্প্রভ হয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকার দায়িত্ব নিয়ে আওয়ামী লীগের নেভা দীপ জ্বেলে রাখার প্রয়াস নেন।

ষাটের দশকের প্রথম পর্যায়ে বামপন্থীদের সৃষ্ট ছাত্র আন্দোলন যে অরাজক এবং বিশৃংখল পরিস্থিতির সূচনা করে তাতে দেশপ্রেমিক ছাত্র জনতার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। তারা অনুসন্ধান করতে থাকে এমন একটি সংগঠন যারা দেশপ্রেম এবং আদর্শবাদের উজ্জীবন ঘটাতে চায়। আমি নিজেও এ ব্যাপারে তৎপর হয়ে উঠি। অনুসন্ধান করতে থাকি অনুরূপ সংগঠন।

ইসলাম পন্থীদের সুসময়

জাতির হতাশা এবং আদর্শিক শূন্যতার দুঃসময়ে আত্মবিশ্বাসে উদ্দীপ্ত কিছু মানুষের মধ্যে দেখা গেছে ঘরে ঘরে আলো জ্বালাবার অকৃতিম প্রয়াস। জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রসংঘ প্রচলিত রাজনীতির বাইরে ভিন্ন এক ঐশী চেতনা বিতরণ করেছে। দেশপ্রেমিক এবং সমাজ কাঠামো পরিবর্তন প্রয়াসীরা এদের পতাকাতলে জড়ো হতে শুরু করে। বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম ইসলামী ছাত্র সংঘের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এর ফলে এই সংগঠন দ্রুত সম্প্রসারিত হতে থাকে। পয়ষট্টির হিন্দুস্থানের আগ্রাসী হামলার পরবর্তী পর্যায়ে ইসলামী ছাত্র সংঘের পালে হাওয়া লাগে। সংঘের জন্য প্রয়োজন ছিল রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা। কিন্তু সেটা হয়নি। জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রসংঘ প্রচলিত রাজনীতির সাথে তাল দিতে গিয়ে গোল পাকিয়ে ফেলে। নেতৃত্বের সুদূরপ্রসারী ভাবনা না থাকার কারণে দ্রুত সাংগঠনিক সম্প্রসারণ নিরীক্ষণ করে তারা অতি আশাবাদী হয়ে উঠে। এরা মনে করে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে ক্ষমতাচ্যুত করলেই তারা রাজনৈতিক অবস্থান নিতে সক্ষম হবে। আমি আগেই বলেছি ৭ই জুনের পর আন্দোলনের তৎপরতা থমকে দাঁড়ায়। আওয়ামী শিবিরে ভাঙনের ঢেউ লাগে। ইসলামপন্থীদের জন্য তখন ছিল দারুণ সু- সময়। রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা যত প্রলম্বিত হত ততই ইসলামী আন্দোলনের পথ সুগম হতে পারতো। কিন্তু না, সেই

সুদূরপ্রসারী ভাবনার ধারে কাছে গেলনা ইসলামী নেতৃত্ব। তারা আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সবচেয়ে বেশী সোচ্চার, সবচেয়ে বেশী তৎপর হয়ে উঠলেন। জামায়াতে ইসলামী ১৯৬৬ সালের শুরু থেকে তাসখন্দ ঘোষণা কেন্দ্রিক আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করে। পরবর্তী পর্যায়ে পয়ষট্টির যুদ্ধকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তাহীনতার যুক্তি দেখিয়ে আওয়ামী লীগ সূচনা করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, যে আন্দোলন ৬ দফা পর্যন্ত গড়ায়। যার অর্থ দাঁড়ায় বিচ্ছিন্নতা।

৭ই জুনের পর ৬ দফার প্রবল হাওয়া ঝিমিয়ে পড়ে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন তাদের নিরলস তৎপরতা দিয়ে সুদূর প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়। আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করার জন্য জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে পিডিএম (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট), পরবর্তী পর্যায়ে আন্দোলনের আরো ব্যাপ্তি আনার জন্য ডাক অর্থাৎ ডেমোক্রেটিক এ্যাকশান কমিটি গঠন করা হয়। এই দুই অবস্থানে জামায়াতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৬৬ সালের ১৮ই জুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভূট্টো পদত্যাগ করেন। এর আগে মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদকের পদ থেকে তিনি অপসারিত হয়েছিলেন। ৬৭ সালের নভেম্বরে ভূট্টো পিপলস পার্টি গঠন করেন।

আগড়তলা ষড়যন্ত্র উদঘাটন

১৯৬৭ সালের শেষ দিকে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার অপরাধে কিছু সংখ্যক সামরিক ও বেসামরিক অফিসারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ডিসেম্বরের ৩১ তারিখে ন্যাপ এবং আওয়ামী লীগকে বিচ্ছিন্নতাবাদী দল ঘোষণা করে। ঢাকা শহরে গ্রেপ্তারের গুজব ঘুরপাক খেলেও সরকার এ ব্যাপারে মুখ খুলেনি। '৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারী প্রকাশিত এ সংক্রান্ত সরকারী প্রেসনোটে ২৮ জন গ্রেপ্তারের কথা বলা হয়। প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা জনাব পি এ নাজির আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার পটভূমিতে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের উচ্চ পর্যায়ের অবস্থা বর্ণনা করেছেন তার গ্রন্থে। তিনি বলেন- 'কিন্তু এরই মধ্যে পাকিস্তানের রাজনীতিতে ঘটল একটি বিস্ফোরক ঘটনাঃ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। ঢাকা গুজবের শহর বলে

এমনিতেই নাম আছে তার উপর এমন একটা ঘটনা সংক্রান্ত গুজবের বন্যায় সবকিছু ভেসে গেল...

বাতাস ক্রমশ ভারী হয়ে উঠল। সরকারী বড় কর্তাদের দিকে তাকালে তাদের চেহারায় যে অভিব্যক্তি ফুটে উঠল তাতে মন হল কোথায় যেন একটা কিছু অঘটন ঘটেছে। সবাই হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। কাউকে কাউকে বেশ আতঙ্কিত মনে হচ্ছিল। 'এ সময় হঠাৎ প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের ঢাকা আগমনের খবর এলো। যথারীতি তার সফর সংক্রান্ত করণীয় বেশ গম্ভীর। এরই মধ্যে একদিন রাত ১১টার দিকে প্রেসিডেন্ট হাউজের রমনা পার্কের পাশে গেলাম। সেখানকার পরিবেশ দেখে রীতিমত অবাক হলাম। বসার কামরায় অনেক হোমরা চোমরাকে দেখলাম। নিজেদের মধ্যে কথা বলছেন, কিন্তু সবাইকে মনে হচ্ছিল ভীষণ গম্ভীর এবং চিন্তিত। লাট সাহেব (মোনয়েম খান) একবার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু আমাকে দেখার পরও তিনি আমাকে চিনতে পারলেন বলে মনে হল না। এরকম একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে যখন ভাবছি ফিরে যাব কিনা, হঠাৎ করে ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলীর লিডার সবুর খান ভিতর থেকে বাইরে এলেন এবং আমাকে দেখে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তিনি আমাকে অবাক করে দিয়ে একটা সিগারেট অফার করলেন। তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে এক কোনায় চলে গেলেন। কোন ভূমিকা ছাড়াই তিনি বললেন, নাজির সাহেব, ভিতরের অবস্থা খুবই উত্তপ্ত। প্রেসিডেন্ট আমাদের সবাইকে বিশেষ করে মোনয়েম খানকে চার্জ করেছেন যে পূর্ব পাকিস্তানের সিনিয়র অফিসারদের অনেকে আগড়তলা মামলার সাথে জড়িত। গভর্নর সাহেব অবশ্য জোরের সাথে এর প্রতিবাদ করেছেন। বলেছেন যেই রিপোর্ট দিয়ে থাকুন তা বানোয়াট। এতে প্রেসিডেন্ট আরো ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছেন যে তিনি কোন বানোয়াট মিথ্যা রিপোর্টের ভিত্তিতে কথা বলছেন না। তিনি যা বলেছেন তার সমর্থনে রয়েছে দলিল দস্তাবেজ। তারপর প্রেসিডেন্ট দোতালার এক কামরা থেকে একটা রিপোর্ট আনিয়ে তার হাতে তুলে দেন। এ রিপোর্ট পড়ার পর মোনয়েম খান নিশ্চুপ হয়ে যান।

আমি সবুর খান সাহেবকে বললাম, স্যার আপনি নিশ্চয় পিন্ডি থেকে এ রিপোর্ট সম্পর্কে জানেন। যদি আপত্তি না থাকে দয়া করে বলবেন কি কোন কোন অফিসারের নাম আছে এ লিষ্টে। তিনি কোন রকম দ্বিধা না

করে তিন চারজন অফিসারের নাম বললেন এবং দু' তিনজন প্রাক্তন অফিসারের নাম উল্লেখ করলেন। (পি এ নাজির : স্মৃতির পাতা থেকে, পৃঃ ২৪৫- ৪৬)

১৮ জানুয়ারী ('৬৮) এক সরকারী প্রেসনোটে বলা হয়, রাষ্ট্রদ্রোহী ষড়যন্ত্রে শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ১৯৬৬ সালের ৮মে থেকে শেখ মুজিবর রহমান কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক ছিলেন। ১৭ জানুয়ারী গভীর রাতে তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ক্যান্টনমেন্টে স্থানান্তরিত করা হয়। অভিযুক্তের ব্যাপারে দৈনিক পাকিস্তানে বলা হয়- 'এরা আগড়তলায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর লেঃ কর্নেল মিশ্র এবং মেজর মেমনের সাথে দেখা করেছিলেন। তাদের সাক্ষাতের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ। আগড়তলা ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তারের প্রেক্ষিতে জনগণের মধ্যে এমন ধারণা ছড়িয়ে দেয়া হয় যে, মোনয়েম খান এবং কতিপয় কেবিনেট মন্ত্রী ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বাঙ্গালীদের স্বাধিকার আন্দোলনের নায়ক শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করেছে। মুজিব- এর হুমকিকে সবচেয়ে ফলপ্রসূভাবে মোকাবেলার জন্য মোনয়েম খান ও তার সহযোগীরা ভারতীয় মদদপুষ্ট ষড়যন্ত্রে মুজিবকে জড়িয়েছে। গুজবে আরো বলা হয়, মুজিবকে রাজনৈতিকভাবে পঙ্গু করার জন্য মোনয়েম খানের প্ররোচনায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অবতারণা করেন। কিন্তু এ ধারণা জনাব জি ডব্লিউ চৌধুরী তার লেখায় বাতিল করে দেন। তিনি বলেন- 'কিন্তু মুজিবের গ্রেপ্তারের এ রকম ব্যাখ্যা আমি দৃঢ়তার সাথে বলব সত্য নয়। ১৯৬৯ সালে আমি পাকিস্তান মন্ত্রীসভায় যোগ দেয়ার পর যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল তখন আমি এ ব্যাপারে সামরিক ও বেসামরিক গোয়েন্দা রিপোর্টগুলো সযত্নে পড়ে দেখি। এ রিপোর্টগুলো অনুসারে যেগুলোর প্রতি একজন সিনিয়র বাঙ্গালী গোয়েন্দা অফিসার জোর সমর্থন জানিয়েছিলেন যার সততা ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে আমি সন্দেহ পোষণ করিনি এবং যিনি বাংলাদেশে মুজিব সরকারের একটি বড় পদ অধিকার করেন। মুজিবকে নিম্নের উপাত্তের ভিত্তিতে দোষী করা হয়ঃ

ঢাকায় ভারতীয় মিশনের মিঃ ওঝা মুজিবের একজন ঘনিষ্ঠ অনুসারীর সাথে পূর্ব নির্ধারিত বৈঠকে মিলিত হতেন। আর এ অনুসারী বর্তমানে আওয়ামী

লীগের এক গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল আছেন; যিনি মুজিব পরিবারের একজন সদস্যের মত ছিলেন এবং তার ঢাকার বাসায় প্রায় থাকতেন। ওঝার সাথে মুজিবের লোকজনের মেলামেশা গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন সাবধানতার সাথে লক্ষ্য রাখতেন এবং তার ঘোরা ফিরার ছবিও ছিল। মুজিবের লোক পুরানো ঢাকার এক অজ্ঞাত জায়গায় ওঝার সাথে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা, দেখা সাক্ষাতের পর আঁকাবাকা পথ ঘুরে ঢাকার ধানমন্ডীতে মুজিবের বাড়ী যেত। মুজিবের স্ত্রী যদিও ছিলেন একজন অশিক্ষিতা মহিলা, তিনিও ১৯৬৬ সালে মুজিবের গ্রেপ্তারীর পর রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। মুজিবের স্ত্রী ও তার ঐ অনুসারী উভয়েই ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে যেখানে মুজিব অন্তরীণ ছিলেন সেখানে নিয়মিত মুজিবের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতেন। জেলের বাঙ্গালী অফিসার ও স্টাফদেরকেও তাদের সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবের জন্য ধন্যবাদ জানাতে হয়। যার ফলে অন্তরীণ অবস্থায়ও মুজিব যে কোন রাজনৈতিক পকিল্পনা ও ষড়যন্ত্র আলোচনা করতে মোটেই অসুবিধার সম্মুখীন হতেন না। গোয়েন্দা বিভাগের লোকদের মতানুসারে এটাই ছিল মুজিবের আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলায় জড়ানোর ভিত্তি। কিন্তু জনগণ যাদের এই ভিতরের কাহিনী কখনো বলা হয়নি তারা স্বভাবতই মুজিবের গ্রেপ্তারে ক্রোধোন্মত্ত ছিল। তারা সংগতভাবে প্রশ্ন করতো যে মুজিব জেলে আবদ্ধ অবস্থায় থেকে কিভাবে ষড়যন্ত্রের অংশীদার হতে পারেন। (জ ডব্লিউ চৌধুরী, অখন্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলো, পৃঃ ৩২- ৩০)

১৯৬৮ সালের শুরুতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হন। রোগাক্রান্ত অবস্থায় তিনি দুটো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। তিনি পেশোয়ারের বেদারের মার্কিন সামরিক যোগাযোগ কেন্দ্রটি বন্ধ করার জন্য মার্কিন সরকারকে নোটিশ দেন। অন্যটি হল পাকিস্তানের জন্য রুশ অস্ত্র আমদানীর লক্ষ্যে কোসিগিনের সাথে আলাপ করেন।

এতে যুক্তরাষ্ট্র দারুণভাবে বিরূপ হয়ে উঠে এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের বিদায় ঘণ্টা বাজানোর জন্য সিআইএকে নির্দেশ দেয়। ১৯৬৫ সালের পর থেকে মার্কিন সাহায্য কমে যাওয়ায় পাকিস্তান সরকারকে অনেক পরিকল্পনা কাটছাট করতে হয়েছিল। ১৯৬৭- ৬৮ সালে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক গতিশীলতা বহুলাংশে কমে যায়। যখন উন্নয়নের দশক

উদযাপনের হিরিক চলছিল দেশব্যাপী এই সময় আমেরিকা অর্থনৈতিক সাহায্যের ব্যাপারে তার হাত গুটিয়ে নেয়। অর্থনৈতিক স্থবিরতার মধ্যে উন্নয়ন দশকের ব্যঞ্জনা সাধারণ মানুষের মনে রেখাপাত করতে পারেনি। ষাটের দশকে বিপুল অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়নি। সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের ক্ষোভ জমলেও আন্দোলনের কথা কখনো তারা ভাবেনি। তারা আইয়ুব প্রশাসনকে বিকল করে দেয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠে। তারাই উন্নয়ন দশকে বিরূপ হয়ে বিদ্রোহের আগুন ছড়াতে থাকে। এদিকে ভূট্টো ও পীরজাদা আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু করার জন্য গোপন চুক্তিতে পৌছেন। অন্যদিকে আমেরিকা ও ভারত তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের পতন ত্বরান্বিত করার জন্য তাদের লবিগুলোকে সক্রিয় করে তুলে এবং আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সবরকম বৈষয়িক সাহায্যের দ্বার অবারিত করে। জি ডব্লিউ চৌধুরী লিখেছেন,

'১৯৬৯ -৭০ সালে পাক ভারত সম্পর্ক ছিল খারাপ এবং বরাবরের মতই উত্তেজনাপূর্ণ। ১৯৬৮ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় হতে পূর্ব পাকিস্তানের চরম বিস্ফোরন্মুখ পরিস্থিতিতে ভারতের সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে বেসামরিক ও সামরিক গোয়েন্দা রিপোর্ট অব্যাহতভাবে ইয়াহিয়ার দপ্তরে আসছিল কিন্তু সেসবের প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ দেয়া হয়নি। একটি বন্ধু রাষ্ট্র ভারতীয় সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে অনুরূপ বর্ণনাই দিচ্ছিল। কিন্তু ইয়াহিয়া খান খুবই বিলম্বে ব্যাপারটা বুঝতে পারেন।'

ততদিনে পানি অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। আমি আগেই বলেছি ভুট্টোর পশ্চিম পাকিস্তানের জনপ্রিয়তার ভিত্তি ছিল তাসখন্দ ঘোষণার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সাথে কথিত মতবিরোধ এবং যুদ্ধকালীন সময়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসেবে দেশে এবং দেশের বাইরে ভারত বিরোধী জোরালো বক্তব্য। পাকিস্তানের শক্তি সামর্থ বিবেচনা সাপেক্ষে রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বাক্ষর দান করেছিলেন। কিন্তু এটা ভূট্টোর মনঃপূত হয়নি। মনপূত হয়নি পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের। বিদেশী সাহায্য ছাড়াই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন সেনাকর্মকর্তাদের অনেকে।

সেনাবাহিনীতে আইয়ুবের যে বিশাল ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল তাসখন্দ ঘোষণার পর সেটা আর অবশিষ্ট থাকেনি। পীরজাদা ভূট্টোকে স্পষ্টই জানিয়ে দেন যে সরকার উৎখাতের গণআন্দোলনে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সেনাবাহিনীর সমর্থন পাবেন না। এরপর ভূট্টো অত্যন্ত দুঃসাহসী হয়ে উঠেন। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে এমন ধারণা প্রকট হয়ে উঠে যে জোয়ানদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত জাতীয় মর্যাদা প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তাসখন্দ ঘোষণার মধ্য দিয়ে ভূলুণ্ঠিত করেছেন। বিদেশী চাপের মুখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব নতি স্বীকার করেছেন। এই ধারণা জামায়াতে ইসলামীর ব্যাপক প্রচারণা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে সুপরিকল্পিতভাবে জামায়াতে ইসলামী যে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল ধূর্ত শৃগালের মত চূড়ান্ত মুহূর্তে ভূট্টো সেসবের সম্পূর্ণটাই দখল করে নিল। পূর্ব পশ্চিম উভয় অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল জামায়াতে ইসলামী, অতঃপর অন্যান্য দল সম্মিলিতভাবে। তারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ ধরে এগুচ্ছিলেন। ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়ায় নয় গঠনমূলক প্রক্রিয়ায় আইনানুগ পন্থায় ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

'৬৮ সালের ৭ নভেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার বিরোধী তীব্র আন্দোলনের অশনি সংকেত বেজে উঠে একটি অতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। রাওয়াল পিন্ডি গর্ডন কলেজের ৭০ জন ছাত্র নভেম্বরের প্রথম দিকে লান্ডিকোটালে বিদেশী মালামাল ক্রয় করে। কাস্টমস কর্তৃপক্ষ বিধিসম্মতভাবেই ছাত্রদের কেনা বিদেশী মালামাল বাজেয়াপ্ত করে। এই তুচ্ছ ঘটনাকে নিয়ে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে। ভূট্টো ছাত্রদের উৎসাহিত করেন। ৭ নভেম্বর ছাত্ররা পুলিশের উপর হামলা চালায়। পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে রাওয়ালপিন্ডিতে একজন ছাত্র নিহত হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিম পাকিস্তানে গণ আন্দোলনের বিস্ফোরণ হয়। ভূট্টো ছাত্রদের উপর পুলিশী বাড়াবাড়ির নিন্দা করে যেমন জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন তেমনি ছাত্ররাও আন্দোলনে উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। ১০ নভেম্বর ('৬৮) পেশোয়ারে ভাষন দানকালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের জীবন নাশের চেষ্টা হয়। ১৩ নভেম্বর ভূট্টোকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিরোধীদল এবং ক্ষমতাসীনদের প্রত্যাশার বাইরে আন্দোলন উচ্চকিত হয়ে উঠে। রাজনীতিতে এয়ার মার্শাল আসগর খান এবং জাষ্টিস মোর্শেদ এই দুই আগন্তকের পদার্পণ আন্দোলনের নতুন মাত্রা যোগ করে।

সে সময় বিরোধী দলীয় জোট পিডিএম এর উদ্যোগে মিটিং মিছিলে বাংলাদেশ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল কোনরকম বিশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি না করেই। জামায়াত ছাড়া আরো ৫ দল পিডিএম এর সংগে সংশ্লিষ্ট থাকলেও বিশৃংখল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। জামায়াত এবং ইসলামী ছাত্রসংঘের বিপুল সংখ্যক কর্মী সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে পিডিএম এর আন্দোলন সুশংখলভাবে চলছিল এবং ক্রমশ গতিশীল হয়ে উঠেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলন সোচ্চার হয়ে উঠলে আন্দোলন থেকে দূরে থাকা মওলানা ভাসানী ময়দানে এসে উপস্থিত হলেন।

এরপর থেকে পূর্ব পাকিস্তানের আন্দোলন ভিন্ন রূপ নিল। নিয়মতান্ত্রিকতা উপেক্ষিত হল। আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামীর নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ হ্রাস পেতে শুরু করল। ক্রমবর্ধমান ভায়োল্যান্স আন্দোলনকে গ্রাস করল। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর এক খেলা সংঘটিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ ১১ দফা প্রনয়ণ করে। মূলত ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে এটা প্রণীত হয়েছিল। ১১ দফা ভিত্তিক দেশব্যাপী আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৯৬৯ সালের ৫ই জানুয়ারী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। আওয়ামী লীগের ৬ দফা বামপন্থীদের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মূল দাবী এবং ছাত্রদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কিছু দাবী ১১ দফায় সন্নিবেশিত হয়েছিল। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হয় ১৯৬৮- ৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে সরকার সমর্থিত ছাত্র সংঠন এনএসএফ এর প্রাধান্য ও শক্তিশালী অবস্থান থাকা সত্ত্বেও তারা কিভাবে ১১ দফার আন্দোলনে শরীক হল এটা অনেক পর্যবেক্ষককে হতবাক করে দেয়।

এমনও তো হতে পারে অনেকের মত এরাও সে সময় ভারতীয় দূতাবাস অথবা তাদের এজেন্টদের কাছে অর্থের বিনিময়ে বিবেক বন্ধক রেখেছিল। পিডিএম এর উদ্যোগ পরিচালিত দীর্ঘ দিনের আন্দোলন যখন একটা পর্যায়ে এসে পড়ল এবং যখন বেগবান হল, তখন বামপন্থী ও জাতীয়তাবাদী চক্র পিডিএম এর গতিশীল আন্দোলনের স্রোতে ১১ দফা আকস্মিকভাবে ভাসিয়ে দেয়। শুরুতেই ১১ দফা গতিশীল হয়ে উঠে। এই

সাথে পত্র পত্রিকার প্রচারণাযুক্ত হয়ে সমগ্র দেশ ১১ দফায় একাকার হয়ে যায়। হাওয়া উল্টো দিকে বইতে শুরু করে। জামায়াতের দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম হাইজ্যাক করে নেয় বামপন্থী- জাতীয়তাবাদী পঞ্চমবাহিনী চক্র। তৎকালীন শিক্ষাঙ্গনে উদীয়মান শক্তি ইসলামী ছাত্র সংঘ এটাকে মেনে নিতে পারল না। ইসলামী ছাত্র সংঘ তালাবায়ে আরাবিয়া ও ছাত্রশক্তিকে সংগে নিয়ে হাওয়ার বিপরীতে দাঁড়াল।

কিন্তু শেষ অবধি কুলিয়ে উঠলো না। কেননা সংবাদ পত্রের সবগুলোই ছিল বামপন্থী ও জাতীয়বাদীদের দখলে। তারা আইয়ুব বিরোধী সর্বদলীয় আন্দোলন ৬ দফার পক্ষের স্রোতে পরিণত করল। বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্রের নায়ককে পরিণত করল জাতীয় হিরোতে। আগড়তলা ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক শেখ মুজিব কারাগার থেকে বেরিয়ে এলো মহা নায়ক হয়ে। উগ্রবাদী আন্দোলনের তোড়ে ভেসে গেল জামায়াত ও পিডিএম এর সবধরনের প্রয়াস। আন্দোলনের সাথে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র যুক্ত হয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে বিদায় হতে হল। দুই পাকিস্তানে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আর একটিও রইল না। পাকিস্তানের দুই অংশে দুই উগ্রবাদী নেতা শেখ মুজিব ও জুলফিকার আলী ভূট্টোর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল। যদিও জেনারেল ইয়হিয়ার নেতৃত্বে সামরিক শাসন জারি করে রাজনৈতিক সন্ত্রাস আপাতত দূর করা হল। এ সত্বেও ষড়যন্ত্র থেমে থাকল না। বিচ্ছিন্নতাবাদী পঞ্চমবাহিনীর এমন একটা বিরতির প্রয়োজন ছিল তাদের রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণের জন্য, ষড়যন্ত্রকে বৈধতার মোড়কে উজ্জীবিত করার জন্য। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের ক্ষমতা ত্যাগের পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে দেখা যাবে কিভাবে পঞ্চমবাহিনী ছলচাতুরী বানোয়াট পরিসংখ্যান ও রাজনৈতিক ধোকা দিয়ে জাতিকে বোকা বানিয়ে সর্বনাশের বৃত্ত রচনা করে পাকিস্তানকে মর্মান্তিকভাবে টুকরো করেছেন। কিভাবে সমৃদ্ধ বাংলা গড়ে তোলার বদলে তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত করেছে, কিভাবে তারা হিন্দুস্তানের ক্রীড়নক হয়ে দিল্লীর আশা আকাঙ্খা পূরণ করেছে, পরবর্তী অধ্যায়ে আমি সেই বিষয়টির উপর আলোকপাত করব।

চতুর্দশ অধ্যায়

মুজিবের প্রতারণার ফাঁদে ইয়াহিয়া

পাকিস্তান আন্দোলন চলা কালে মাওলানা ভাসানী তার প্রিয় নেতা এবং সর্বভারতীয় মুসলিম জনগণের প্রাণ প্রিয় নেতা কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে সাক্ষাত করতে যান। যখন তিনি কায়দে আযমের মুখোমুখি হলেন তখন গভীর আবেগে ডুকরে কেঁদে ফেললেন। তিনি কায়েদে আযমকে বাংলার অসহায় মুসলমানদের ভবিষ্যতের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করার জন্য অনুরোধ করলেন। কায়েদে আযম তাকে আশ্বাস দিয়ে বিদায় দিলেন। তখন সম্ভবত চৌধুরী মুহাম্মদ আলী পাশে ছিলেন, তাকে কায়েদে আযম বললেন- এই আবেগ প্রবণ মানুষটা থেকে সাবধান থাকবেন। আবেগ তাড়িত হয়ে এই লোকটা এমন কিছু করতে পারে যা জাতির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম নেতা মাওলানা ভাসানীর ব্যাপারে কায়েদে আযমের মন্তব্য একেবারে অমূলক ছিলো না। আবেগ তাড়িত হয়ে তাৎক্ষণিক যা কিছু দরকার তিনি তাই করেছেন ভবিষ্যতের ভাবনা না ভেবেই।

ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানের প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম লীগের নেতৃত্বের মধ্যে জনগণের মুক্তির সম্ভাবনা না দেখে তিনি তৎকালিন নেতৃত্বের প্রতি বিরূপ হয়ে মুসলিম লীগ ত্যাগ করে প্রথমত আওয়ামী লীগ, পরবর্তীতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করেন। দেশপ্রেম এবং রাজনৈতিক আন্তরিকতা থাকা সত্ত্বেও তার ছিল সীমাবদ্ধতা। এই সীমাবদ্ধতার কারণে তিনি আঁচ করতে পারেননি কমিউনিজমের অনিবার্য পরিণতি। সম্ভবত গরীব ও খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য কমিউনিজমের মানবিক আবেগ তাকে আকর্ষণ করেছিল। উপমহাদেশের হিন্দু নেতৃবৃন্দের পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টির পাকিস্তান কেন্দ্রিক ষড়যন্ত্রের গভীরতাও তিনি সময়মত বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি বুঝেননি আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের অন্তিম ঠিকানা। এ কারণে একজন খাঁটি মুসলমান হয়েও আঞ্চলিকাতাবাদী ও কমিউনিস্টদের প্রেরণা এবং পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হয়েছিলেন। জাতীয়তাবাদীরা তাকে ব্যবহার করে অনেকটা পথ অতিক্রম করেছিল।

তিনি কমিউনিস্ট ও সমাজতন্ত্রীদের নিজের পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়েছিলেন অথচ এদের অখণ্ড পাকিস্তান কেন্দ্রিক ন্যূনতম লক্ষ্যও ছিল না। পাকিস্তান আন্দোলনে মাওলানা ভাসানীর অবদান কারো চেয়ে কম ছিল না। তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের দায়িত্বহীন কর্মকাণ্ড মাওলানা ভাসানীকে বিরূপ করে তুলেছিল। তার বক্তব্যে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এটা সত্য। কিন্তু পাকিস্তানের ধ্বংস প্রয়াসী হিসেবে তাকে চিহ্নিত করা ঠিক হবে না। সময়ের সাথে তাল রেখে তিনি যা কিছু করেছেন এর জন্য মূলত দায়ী তৎকালীন পূর্ব- পাকিস্তানের গভর্নর আহসান। ইয়াহিয়া মন্ত্রী সভার সদস্য এবং একজন খ্যাতিমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জনাব জি ডব্লিউ চৌধুরী তৎকালিন পরিস্থিতিতে ভাসানী সর্ম্পকে বলেছেন- 'ভাসানী আমাকে বলেছিলেন, যদি সরকার মুজিবকে বাংলাদেশের ৬ দফা প্রচারে স্বাধীনতা দেয় তা হলে তার স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান বলা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকবে না।'

যাই হোক শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের তৎপরতা এবং দেশী বিদেশী মিডিয়াসমূহের অপপ্রচারের কারণে ইসলামপন্থী ও ডানপন্থী এবং পাকিস্তানের সংহতিতে বিশ্বাসী সংগঠনসমূহ পাকিস্তানের দোসর হিসেবে চিহ্নিত হয়ে যায়। এর ফলে চলমান পরিস্থিতিতে তাদের বক্তব্য এবং তাদের তৎপরতা সবকিছুই জনগণের গ্রহণ যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। এ কারণে মুজিবের ধ্বংসাত্মক কর্মতৎপরতা প্রতিরোধে মাওলানা ভাসানীর বিকল্প কেউ ছিলেন না। গভর্নর আহসান নির্বুদ্ধিতার কারণে অথবা কোন অদৃশ্য সুতোরটানে ভাসানীর সাথে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বোঝা পড়ার ক্ষেত্রে সচেতন ভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন। তিনি প্রেসিডেন্টের কাছে মাওলানা ভাসানীকে গুরুত্বহীন করেছিলেন শুধু তাই না- মাওলানার অনুগামীদের প্রতি তিনি প্রত্যক্ষ নিপীড়ন চালিয়েছেন। গভর্নর আহসান কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্টে মাওলানা ভাসানী এবং পিকিং পন্থী নেতৃবৃন্দকে রাষ্ট্র বিরোধী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করেন। গভর্নর আহসান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে সব সময় এই ধারণা দিয়েছিলেন যে শেখ মুজিব অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী এবং তিনি কখনই পাকিস্তান ভাংবেন না। গভর্নরের বক্তব্যে আশ্বস্ত হয়ে ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদী বল্গাহীন প্রচারণায় বাধ সাধেননি। শেখ মুজিবও ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনার সময় প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন। ইয়াহিয়া মুজিবকে বিশ্বাস করেছেন, তার প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্বারোপ করেছেন এবং তার প্রতি সাহায্য সহানুভূতির হাত

সম্প্রসারিত করেছেন। অন্যদিকে পাকিস্তানের সংহতিতে বিশ্বাসী দলসমূহের প্রতি বিমাতাসুলভ আচরণ করেছেন। শেখ মুজিবের প্রতি ইয়াহিয়া সরকারের সহানুভূতি ও দুর্বলতার কারণে সামরিক সরকারের নাকের ডগায় শেখ মুজিব বিচ্ছিন্নতাবাদের আগুন গ্রাম বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়।

এই সাথে অল ইনডিয়া রেডিও থেকে প্রচারিত এপার বাংলা ওপার বাংলা অনুষ্ঠানে বাকচাতুরী ও মিথ্যার বুনোট দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করে চলছিল। মস্কোর রেডিও পিস এন্ড প্রগ্রেস এবং বিবিসি শেখ মুজিব ও তার দলের আত্মঘাতী আবেগকে আর একবার গতিশীল করে তোলে। এই সাথে যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল জেনারেল মিঃ ব্লাডের মুজিবের প্রতি সহানুভূতি মুজিবকে উদ্দাম করে তোলে। অবশেষে মুজিব নির্বাচনের বহু আগেই বাংলার মানুষের একমাত্র দরদী হিসেবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের একক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসেবে নিজের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

এবার পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে চোখ ফেরানো যাক। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের কোন একক নেতৃত্বের প্রাধান্য ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানে মুসলিম লীগের প্রভাব ও প্রাধান্য দুটোই বর্তমান ছিল। কিন্তু মুসলিম লীগ ছিল ত্রিধা বিভক্ত। তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে মুসলিম লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে বিজয় কেতন উড়াতে সক্ষম হতো। কিন্তু ত্রিধা বিভক্ত মুসলিম লীগ শেষ অবধি জনগণের মধ্যে সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে জামায়াতে ইসলামীর প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও জামায়াত সাধারণ জনগণের মনের গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি। এর একমাত্র কারণ জামায়াতের প্রতারণামূলক এমন কোন সস্তা শ্লোগান ছিল না যা জনগণকে উন্মাতাল করে তুলবে। জামায়াতে ইসলামী নিম্ন মধ্যবিত্ত সচেতন জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্রাংশ। আদর্শিক সংগঠন হওয়ার কারণে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করায় জামায়াত তখন পর্যন্ত দ্রুত সম্প্রসারণশীল গণ সংগঠনে পরিণত হয়নি। জামায়াতে ইসলামী শাসক এলিট শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা কোন সময় পায়নি। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এই এলিট শ্রেণীর প্রতিনিধি জনগণ থেকে দূরত্বের অবস্থান করেও আইয়ূব বিরোধী আন্দোলনের মধ্যদিয়ে জনপ্রিয় গণনেতায় পরিণত হলেন। কতিপয়

সস্তা শ্লোগান যেমন তাসখণ্ড চুক্তির মাধ্যমে পাকিস্তানের হারিয়ে যাওয়া গৌরব পুনরুদ্ধারে এবং ইসলামী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্ভট অঙ্গীকার করে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানকে আলোড়িত করে ফেললেন। সে সময় পশ্চিম পাকিস্তানের আলেমদের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পশ্চিম পাকিস্তানে রাজনৈতিক অপশক্তির উত্থান ত্বরান্বিত করে।

ইয়াহিয়ার অঙ্গীকার

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ ক্ষমতা গ্রহণ করেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের অঙ্গীকার করেছিলেন। মূলত তার অঙ্গীকার ছিল তিনটিঃ

১. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর।

২. প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটে নির্বাচন। মৌলিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা নয়।

৩. দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র তৈরি হবে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা।

অবশেষে নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৭০ সালের ৩১ মার্চ অখণ্ড পাকিস্তানের জন্য ৫টি মূলনীতি সম্বলিত কাঠামো ঘোষণা করা হয়। যা লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার অর্থাৎ এলএফও নামে অভিহিত।

◆ পাকিস্তানকে অবশ্যই ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।

◆ অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সাপেক্ষে দেশটিকে একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র পেতে হবে।

◆ আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে শাসনতন্ত্রে অবশ্যই তুলে ধরতে হবে।

◆ দেশের দুই অংশের মধ্যকার বৈষম্য দূর করতে হবে- বিশেষত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে।

◆ কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোর মধ্যে ক্ষমতা অবশ্যই এমনভাবে বণ্টন করতে হবে যাতে প্রদেশগুলো সর্বাধিক পরিমাণ স্বায়ত্বশাসন পায়। কেন্দ্রকে আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষাসহ ফেডারেল দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদানের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ হয়।

গভর্নর আহসানের দুরভিসন্ধি ও বিচ্ছিন্নতাবাদের পালে হাওয়া

আমি আগেই বলেছি বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবল স্রোতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারার মত একমাত্র ব্যক্তিত্ব তখন ছিলেন মাওলানা ভাসানী। এই ভাসানীর সাথে ইয়াহিয়ার দূরত্ব রচনা করেছিলেন গভর্নর আহসান, শুধু মাত্র মুজিবকে নির্বিঘ্ন করার জন্য। এটা কি গভর্নর আহসানের প্রতিভার দুর্বলতা না কি তিনিও ছিলেন আন্তর্জাতিক চক্রের সাথে সম্পৃক্ত।

১৯৭০ সালের নভেম্বর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে পূর্ব পাকিস্তানের সমুদ্র উপকূলে ধ্বংস যজ্ঞের পর গভর্ণর আহসান এমন একটা কাণ্ড করেন যাতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আরো বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। তখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া চীন সফরে ছিলেন। তিনি রাওয়ালপিণ্ডি ফেরার পথে ঢাকায় যাত্রা বিরতি করেন। কিন্তু গভর্ণর আহসান ঘূর্ণিঝড় সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে সঠিক ধারণা না দিয়ে পত্র পত্রিকার বিবরণকে অতিরঞ্জিত হিসেবে বর্ণনা করেন। ফলে ইয়াহিয়া বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ না করে পিণ্ডি ফিরে যান। তখন এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হয়। বিচ্ছিন্নতা-বাদীরা এই প্রসঙ্গ অবতারণা করে কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে জনমনকে বিষাক্ত করে তুলে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের এই প্রচারণা শেখ মুজিবের পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দুরভিসন্ধি সাধারণ বাঙালী অতি মাত্রিক যৌক্তিক বলে বিবেচনা করতে থাকে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তার ভুল অথবা গাফিলতি উপলব্ধি করে পুনরায় ঢাকায় আসেন এবং দুর্গতদের সংকট নিরসনে ব্যাপক সাহায্য সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেন। কিন্তু এত করেও তিনি উদ্ভূত ক্ষতির সামান্য পরিমাণ পুষিয়ে নিতে পারেননি। যদিও দুর্গতদের জন্য আওয়ামী লীগের কোন অবদানই ছিলনা। এমন কি জামায়াতে ইসলামী দুর্গতদের জন্য যতটুকু করেছিল তার ধারে কাছেও ছিল না। আওয়ামী লীগ শুধুমাত্র মিডিয়ার আনুকূল্য পেয়ে ৭০ এর ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাস থেকে রাজনৈতিক ফায়দার সবটুকু লুটে নেয়।

ঘূর্ণিঝড়ের তাণ্ডবের পর প্রত্যেকটি দলই নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে অনুরোধ করলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দও নির্বাচন স্থগিত রাখার অনুরোধ জানালেন। মাওলানা ভাসানী প্রস্তাব দিলেন যদি ইয়াহিয়া খান নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি বাদ দিয়ে তার

সমস্ত প্রশাসনকে দুর্গতের জন্য ত্রাণ কার্যে নিয়োজিত করেন এবং তখন যদি নির্বাচনে স্থগিত রাখার প্রশ্নে মুজিব চ্যালেঞ্জ করেন তাহলে তিনি এবং তার দল ইয়াহিয়াকে সমর্থন দিবেন মুজিবকে নয়। অন্যান্য দলও এ ব্যাপারে ইয়াহিয়াকে সমর্থন দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নড়াচড়া দেখে মুজিব ঘোষণা দিলেন যদি নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়- তাহলে সংঘর্ষে ১০ লক্ষ লোক নিহত হবে। মুজিবের দেরি সইছিল না। কারণ কৃত্রিম ভাবে সৃষ্ট জনমতের উত্তাপ থিতিয়ে যাবার সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন মুজিব। যে কারণে হুমকির পর হুমকি দিয়ে ইয়াহিয়াকে ভীত করে দেয়। শেষ অবধি ইয়াহিয়া মুজিবকে সন্তুষ্ট করার জন্য নির্বাচন স্থগিত না রেখে দারুণভাবে রাজনৈতিক ভুল করলেন, যে ভুলের মাশুল দিতে অখণ্ড পাকিস্তান ভেঙে গেল। মুজিবকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য নুরুল আমিনসহ ১১ জন জাতীয় নেতাকে পর্যন্ত সাক্ষাৎ দিলেন না ইয়াহিয়া খান।

জি ডব্লিউ চৌধুরী লিখেছেন- '১৯৭০ সালের আগস্ট নাগাদ সরকার মুজিবের আসল মতলব সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য খবর পান। জেনারেল আকবরের (পাক্ষিক) রিপোর্টসমূহ গোয়েন্দা সার্ভিস পূর্বপাকিস্তানে আঞ্চলিক প্রধান ছিলেন একজন বাঙালি, তিনি ইয়াহিয়াকে যথেষ্ট ইংগিত দেন যে মুজিবের কৌশল মনে হচ্ছে বাঙালিদের একচ্ছত্র নেতা হওয়ার ক্ষেত্রে নির্বাচনকে ব্যবহার করা, তারপর তিনি দাঁত খিঁচাবেন। ইতিমধ্যে এক বিদেশী সাংবাদিক সম্ভবত এন্থনি ম্যাসকারেনহাস যার সংগে মুজিবের গভীর সম্পর্ক ছিল তাকে তিনি একটি সাক্ষাৎকার দেন। এতে তিনি তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসেবে বাঙালিদের পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন এবং এতে নয়াদিল্লীর সাথে তার গোপন যোগসূত্রের কথাও বলা হয়েছে। এই সাক্ষাৎকারটি তাৎক্ষনিকভাবে প্রকাশ না করার জন্য সেই বিদেশী সাংবাদিককে শেখ মুজিব নিষেধ করেন। কিন্তু কোন এক সূত্রের মাধ্যমে গোয়েন্দা সংস্থা পুরো রিপোর্টটি হাতিয়ে নিতে সক্ষম হয়। ইয়াহিয়া হয়তো এ ব্যাপারে মুজিবকে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন। দক্ষ রাজনীতিকদের মত সময়োচিত সাহসি পদক্ষেপ নেয়ার ব্যাপারে ইয়াহিয়ার পিছুটান ছিল বরাবরই।

নভেম্বরে চীন সফরকালে ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডব এবং পরবর্তী প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে মুজিবের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা থেকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে বাধ্য হয়ে বিরত থাকতে হয়েছিল। নির্বাচনোত্তর ৬ দফা এবং বিচ্ছিন্নতার পক্ষে মুজিব যখন শক্ত অবস্থান নিলেন তখনকার পরিস্থিতি ছিল ইয়াহিয়ার জন্য বিব্রতকর।

নির্বাচনের পর মুজিব ও ভূট্টো

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। এই নির্বাচনকে অনেকেই মনে করেন অবাধ ও নিরপেক্ষ। তৎকালীন মিডিয়া ছিল বিচ্ছিন্নতাবাদের পক্ষে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নিরঙ্কুশ বিজয় হওয়ার কারণে নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়ে উঠল। প্রকৃতপক্ষে এ নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ ছিল না।

নির্বাচনের পূর্বে শুধু ঢাকায় নয় দেশের সর্বত্র সন্ত্রাস চালিয়েছিল আওয়ামী লীগ। তারা অনাহুত সংঘাত সৃষ্টি করে জামায়াত কর্র্মীদের রক্তাক্ত ও ক্ষত বিক্ষত করে। এমনকি নির্বাচনের দিন জামায়াত ও অন্যান্য দলের পোলিং এজেন্টদের বুথ থেকে বের করে দিয়েছিল আওয়ামী লীগ কর্মীরা। কিন্তু প্রশাসন ছিল নীরব। অনেক স্থানে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্যান্য দলীয় সমর্থকদের পোলিং বুথে আসতে দেয়া হয়নি। এমনকি তারা পোলিং অফিসারদের সহযোগিতায় অজস্র জাল ভোট দিয়ে বাক্স ভর্তি করে। ভোট গ্রহণের সাথে জড়িত অধিকাংশ প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসাররা নিরপেক্ষ ছিলেন না, তথাকথিত জাতীয়তাবাদের উন্মাদনায় আক্রান্ত ছিলেন তারা।

নির্বাচন হল এভাবেই। আওয়ামী লীগ ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং শক্তি প্রয়োগ করে সাফল্যের সবটুকু তার ঘরে তুলে নিতে সক্ষম হল। পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন হাতিয়ে নিল আওয়ামী লীগ এবং কাষ্টিং ভোটের ৭৪ শতাংশ অর্জন করল তারা।

পশ্চিম পাকিস্তানে অনুরূপ ভূট্টোর দল পিপলস পার্টি ১৩৮টি আসনের মধ্যে ৮১টি আসন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করে।

পূর্ব পাকিস্তানের শেখ মুজিব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভুট্টো উভয়েরই চারিত্রিক বৈশিষ্টের মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল না। দুই নেতাই

পাকিস্তানের অশিক্ষিত ভোটারদের কাছে নেতিবাচক আবেদন রেখে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। একজন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক মনোভাব জাগ্রত করে অন্যজন ভারতীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে জঙ্গী মনোভাব জাগ্রত করে জন প্রিয়তার শীর্ষে আরোহণ করে। এদের কারো মধ্যে গঠনমূলক ইতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গী ছিল না। একজনের ছিল ইউটোপীয় ধ্যান- ধারণা সমৃদ্ধ তথাকথিত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার লঘু আবেদন, অন্যজনের ছিল হাজার বছর ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার এবং তাসখন্দে হারান জাতীয় সম্মান পুনঃ প্রতিষ্ঠার বাগাড়ম্বর। মুজিব ভূট্টো উভয় নেতার বাস্তবতা বিবর্জিত অঙ্গীকার অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাস করল। এই বিশ্বাসই প্রতিশ্রুতিশীল দল সমূহের সর্বনাশ ডেকে আনল, সর্বনাস ডেকে আনল অখণ্ড পাকিস্তানের । এই দুই নেতা এবং দুটো দল এক যোগে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিমূল নাড়িয়ে দিল এবং রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ল সমগ্র জাতি।

নির্বাচনের পর মুজিব ভূট্টো উভয়েই বিকারগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থানে দু'জনের একজনও ছিলেন না। সমকালীন পর্যবেক্ষক মহল উভয় নেতাকেই পাকিস্তান বিরোধী কোন বিশেষ চক্রের ক্রীড়নক বলে ভাবতে শুরু করে।

ঊন্নিষশত বাহাত্তরের মার্চে কোলকাতায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় রূপদর্শীর কলামের বিবরণ ঐ ধারণাকে বদ্ধমূল করেছে। এতে লেখা হয় - 'আমার কাছে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যা থেকে বলা যাবে মুজিব ভূট্টো উভয়েই ছিলেন ভারতের এজেন্ট। পাকিস্তানের উভয় নেতা ভারতের ছক অনুসারে তাদের আচরণ করেছেন।'

পঞ্চদশ অধ্যায়

বৈষম্য দূরীকরণে ইয়াহিয়ার উদ্যোগ

ক্ষমতাসীন হওয়ার পরই সামাজিক সুবিচারের প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কিছু অঙ্গীকার করেছিলেন। হয়তোবা সেটা ছিল তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক প্রয়োজনে। জি ডব্লিউ চৌধুরীর অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলোর ভাষ্য অনুযায়ী যেমন তিনি বলে ছিলেন, 'পরিকল্পিত সামাজিক ইনসাফের দাবি করে পৃথক করা যায় না। যে বিরাট ব্যবধান সমাজের নানা অংশকে পৃথক করে রেখেছে তাকে সংকুচিত করতে হবে এবং যা ভারসাম্যহীনতা, সামাজিক দ্বন্দ্ব ও অসন্তোষের পথ দেখায় তা দূরীভূত করতে হবে।' প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এই আকাঙ্খা পূরণ তৎকালিন আর্থিক ও সামাজিক পটভূমিতে সম্ভব ছিল না। ১৯৬৯ সালের মে মাসে আমেরিকার সেক্রেটারী অব স্টেট পাকিস্তান সফরে এলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বর্ধিত অর্থনৈতিক সাহায্যের আবেদন জানিয়ে সাড়া পাননি। এতদসত্ত্বেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে ১৯৭০- ৭৫ মেয়াদের চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হয়েছিল আওয়ামী লীগের বিরোধিতার মুখে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য এবং বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এই পরিকল্পনা প্রণয়ন অপরিহার্য ছিল। পরিকল্পনা কমিশনের প্রতি ইয়াহিয়া খানের নির্দেশ ছিল প্রথমতঃ সামাজিক সুবিচারের প্রতি অধিকতর গুরুত্বারোপ এবং দ্বিতীয়তঃ দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনা।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে শেষ অবধি জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তাতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩৯৪০ কোটি টাকা, পশ্চিম পাকিস্তনের জন্য বরাদ্দ হয় ৩৫৬০ কোটি টাকা। সর্বমোট বরাদ্দের ৫২.৫ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে এবং ৪৭.৫ শতাংশ পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগে। এতেও মন্ত্রী পরিষদের বাংলাভাষী সদস্যরা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। এর প্রতিক্রিয়ায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পরিকল্পনা কমিশনের উদ্দেশে বলেন- 'মন্ত্রী পরিষদে আমার বাঙালি সহকর্মীরা আমার কাছে উল্লেখ করেছেন যে

১৯৭০- ৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দে আঞ্চলিক বৈষম্য কমবে না। তা যদি হয় তাহলে আমি এর পক্ষ নিতে পারি না।' প্রেসিডেন্টের এই প্রতিক্রিয়ার ফলে পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশন ঘোষণা করে যে, আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার জন্য ৭৫০ থেকে ১০০০ কোটি টাকার সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করা হবে। পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন বরাদ্দ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ৩৭ শতাংশ থেকে ৫২.৫ শতাংশে উন্নীত করা হবে। ১৯৭০- ৭১ সালের বার্ষিক পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ইয়াহিয়া খান এ ব্যাপারে আরো বরাদ্দের কথা ব্যক্ত করেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার যথেষ্ট সংখ্যক প্রকল্প তৈরি করতে ব্যর্থ হয়। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসন তখন বাঙালিদের দ্বারা পরিচালিত হতো। এটা ছিল তাদের দুর্বলতা ও অযোগ্যতা। পূর্ব ও পশ্চিমের অতীত বৈষম্য দূর করার মানসিকতা ইয়াহিয়ার মধ্যে প্রবল ছিল। এ ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যেও কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি।

এতদসত্ত্বেও একাত্তরের ঘুর্ণিঝড় পূর্ব-পকিস্তানে মরণ আঘাত হানলই। ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানে মহাকালের বিপর্যয়কর এবং মর্মান্তিক রক্তাক্ত পরিণতি দ্বিজাতি তত্বকে অনেকটা ম্লান করে দিল। কিন্তু কেন? কেনর উত্তর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে দোষারোপ করে অথবা মুজিবের ওপর দেবত্ব আরোপ করে মিলবে না। এর জবাব নিহিত রয়েছে পাকিস্তান আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাসের মধ্যে, এটা ছিল হিন্দুস্থানের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার চূড়ান্ত পরিণতি। এটা ছিল ব্রাহ্মণ্য চক্র প্রযোজিত অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা নাটকের শেষাঙ্ক।

আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন কি একাত্তরের রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে সূচিত হয়েছিল? এর জবাব আমি এই গ্রন্থে এর আগে দিয়েছি। এর প্রক্রিয়া শুরু হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েকমাস আগে। এর পেছনে ছিল হিন্দুস্থানের সক্রিয় ষড়যন্ত্র। তথাকথিত স্বাধীনতার পর অনেকেই একথা অকপটে দৃঢ়তার সাথে এবং নিলর্জ্জভাবে স্বীকার করেছেন।

১৯৭২ সালে ৮-৯ এপ্রিল শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে অকপটে বলেন যে, সর্বপ্রকারে সাহায্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তার জন্য

ভারতের সাথে পূর্বেই তার চুক্তি ছিল। সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ভারত সাহায্য ও আশ্রয় দেবে- এসব চুক্তি তিনি পূর্বেই সম্পন্ন করেছিলেন।

আওয়ামী লীগ ও বাকশাল নেতা আব্দুর রাজ্জাক সাপ্তাহিক মেঘনার (১৯৮৭) সাথে এক সাক্ষাৎকারে অনুরূপ বক্তব্য দিয়েছেন। তার বক্তব্য অনুসারে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়েছিল ৫০ দশকের শেষ দিকে। আগড়তলা মামলার প্রসঙ্গ টেনে তিনি এর সত্যতাকে স্বীকার করেন অকপটে। তার ভাষায়, এরপর আমাদের সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা। তিনি ১৯৬২ সালে একটা ডেসপারেট মুভ নিয়ে আগড়তলা গিয়ে এরেস্ট হয়ে যান। তখনও ব্যাপারটা ম্যাচিউর হয়নি। রেজাই আলী নামে এক ভদ্রলোক তাকে কুমিল্লা, কুমিল্লা থেকে নোয়াখালী সীমান্ত হয়ে আগড়তলা যেতে সাহায্য করেন। আগড়তলা থেকে দেশে ফিরে ঢাকায় এসে তিনি ধরা পড়েন।

'এর কিছুদিন পর দেখলাম ওদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর নামও আছে। তিনি আগে থেকে জেলে ছিলেন।' আগড়তলা ষড়যন্ত্র উদঘাটিত হয়েছিল ১৯৬৭ সালে। কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে জানা যায়, শেখ মুজিব এই ষড়যন্ত্রের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। আগড়তলা ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ছিল, কমান্ডো কায়দায় অতর্কিত আক্রমণ করে সামরিক ইউনিটসমূহের অস্ত্রাগার দখল করে অকেজো অথবা ধ্বংস করে দেয়া। এই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ১৯৬৭ সালে ১২ জুলাই ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিনিধিদের সংগে হিন্দুস্থানী প্রতিনিধিদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। একই বছর ডিসেম্বরে ষড়যন্ত্রকারীদের কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়। এদের একজনের দেয়া তথ্যে জানা যায় যে, হিন্দুস্থান বিপ্লবীদের অর্থ ও অস্ত্র সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এ ছাড়াও চূড়ান্ত মুহূর্তে দিল্লী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের যোগাযোগের আকাশ ও সমুদ্র পথ বন্ধ করে দেবার প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিল।

হিন্দুস্থানের সবুজ সংকেত

'মেঘনার তীর থেকে টেমসের কিনারে' গ্রন্থে লিখেছেন, হিন্দুস্থান ষড়যন্ত্র-কারীদের দেয়া তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি ফকার ফ্রেন্ডশিপ বিমান হাইজ্যাকের নাটক অবতারণা করে। দিল্লীর নির্দেশমত ভারতীয় চর কর্তৃক এই বিমানটি হাইজ্যাক করে লাহোরে অবতরণ করান হয়। হ্যাইজ্যাককারীরা তাদের দাবির ব্যাপারে আলাপ

আলোচনার সময় সুযোগ না দিয়ে বিমানটিকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়। পাকিস্তান বিমানের ক্রু এবং যাত্রীদের ভারত প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করে দেয়। এ সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায়, হিন্দুস্থানের উপর দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বিমান চলাচল বন্ধ করার একটা ছুঁতো দাঁড় করানোর লক্ষ্যে হিন্দুস্থানী এজেন্টরা এই ঘটনার অবতারণা করেছিল। পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকট সৃষ্টি না করে এই ঘটনার মাধ্যমে হিন্দুস্থান পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের এই সবুজ সংকেত দিয়েছিল যে, ভারত তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত রয়েছে।

এই সংকেত মুজিবকে অত্যন্ত দুঃসাহসী করে তুলে। সে সময় গার্ডিয়ান পত্রিকা (২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১) মুজিবের দুঃসাহসের কারণ এই ভাবে প্রকাশ করে- 'তিনি (মুজিব) বলেছেন, জনসাধারণ আমাকে ভালবাসে, সুতরাং আমাকে স্পর্শ করবেন না। তিনি এ কথা বলেছেন কারণ তিনি জানেন যে পূর্ব পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সৈন্য সংখ্যা এত কম যে, তারা বড় রকমের কিছু করার সাহস পাবে না। আর যেহেতু হিন্দুস্থানের উপর দিয়ে বিমান চলাচল বন্ধ, কাজেই সৈন্য সংখ্যা বাড়ানোও অসম্ভব।'

১৯৭১ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্রে বলা হয়েছে- 'দিল্লী ভারতের উপর দিয়ে বিমান চলাচল বন্ধ করে ক্ষান্ত হলো না পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাহায্যের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর বহু সৈন্যকে পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি আনা হল। জেট জঙ্গী বিমান ও পরিবহন বিমান সীমান্তের কাছাকাছি বিমান বন্দরে জড়ো করা হলো। পশ্চিম বাংলায় ৫ ডিভিশন সৈন্য সমাবেশ করা হল। এর আগে পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে মোতায়েনকৃত বি এস এফ এর কয়েকটি ব্যাটোলিয়ানের সাথে আরো কয়েকটি ব্যাটেলিয়ান যুক্ত করা হল। এই ভাবে প্রায় ২৫টি ব্যাটেলিয়ান পূর্ব পাকিস্তানের ভিতরে ঢুকতে পারে এ কারণে বি এস এফ এর চিহ্ন মুছে ফেলা হল। জীপ ও অন্যান্য যানবাহনের রঙ বদলে দেয়া হল। দিল্লী থেকে বিমান যোগে বি এস এফ সৈন্য আনা হল সব বি এস এফ কোর্স বাতিল করা হল। পুলিশ বিভাগের সব ছুটি বাতিল করা হল।

হিন্দুস্থানী এলাকার উপর দিয়ে পাকিস্তানী বিমান চলাচল বন্ধ করার সাথে সাথে সমুদ্রপথেও বাধার সৃষ্টি করল দিল্লী। এপ্রিলে (৭১) হিন্দুস্থানী

নৌঘাঁটি দোয়ারকার ৭০ মাইল পশ্চিমে ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি জাহাজ ওসমান এন্ডুরেন্স নামে একটি বাণিজ্যিক জাহাজকে বিব্রত করে। জাহাজটি হাজীদের বহন করছিল। হিন্দুস্থানের দক্ষিণ সীমান্তে অনুশীলনের নামে উপকূল থেকে ১২৩ মাইল দূর পর্যন্ত ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়তে থাকে। এইভাবে তারা পাকিস্তানী বেসামরিক বিমানকে আরো দক্ষিণে যেতে বাধ্য করে।'

ইয়াহিয়ার সদিচ্ছার অভাব ছিল না

আগড়তলা ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকা সত্ত্বেও শেখ মুজিব ও তার দলের সাথে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কখনও কোনভাবে অসম্মানজনক আচরণ করেননি। মুজিবকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য অন্যান্য অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী দলসমূহের ওপর তিনি অবিচার করেছেন। লিগাল ফ্রেম ওয়ার্ক অর্ডার অর্থাৎ এল এফ ও এর সীমা লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও মুজিব ও তার দলের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেননি, এমন কি এ ব্যাপারে হুঁশিয়ারীও উচ্চারণ করেননি।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়ে অভিনন্দন জানালেন। সীমালঙ্ঘন করার জন্য ইয়াহিয়ার শাসনামলে যারা বন্দী হয়েছিলেন শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ ইয়াহিয়া তাদের মুক্তির নির্দেশ দিলেন। নির্বাচন ঘোষণার পর শেখ মুজিব সীমা অতিক্রম করতে শুরু করলেন এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য চাপ বৃদ্ধি করলেন।

শুধু মাত্র ক্ষমতা হস্তান্তর নয়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী গণ প্রতিনিধিদের মধ্যে সমঝোতা এবং পারস্পরিক বোঝা পড়া। কিন্তু ক্ষমতা পাওয়ার জন্য মুজিব অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। হিংসা বিদ্বেষ আবেগ উন্মাদনা এবং সহিংসতা ছড়িয়ে পরিবেশকে দূষিত করে ফেললেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবকে ইসলামাবাদ সফরের আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু মুজিবের এ ব্যাপারে কোন প্রতিক্রিয়া না দেখে বাধ্য হয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় এলেন। ১২ জানুয়ারী মুজিবের সাথে ইয়াহিয়ার ৩ ঘণ্টা স্থায়ী বৈঠক হল। কিন্তু মুজিব

তার অঙ্গীকার মত সাড়া দিলেন না। শেখ মুজিব তার প্রতিশ্রুতি মত খসড়া শাসনতন্ত্র প্রনয়ণে রাজী হলেন না। কথাও ছিল দফা কিঞ্চিত পরিবর্তন করে অখণ্ড পাকিস্তানের উপযোগী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন। ইয়াহিয়াকে মুজিব জানিয়ে দিলেন- শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব তার, ইয়াহিয়ার দায়িত্ব হচ্ছে সংসদ ডাকা। শেখ মুজিবের অভদ্র, অকূটনৈতিক আচরণ, তার ধৃষ্টতা এবং অসৌজন্যমূলক কর্ম-কাণ্ড পাকিস্তানের সেনা প্রধান হয়েও ইয়াহিয়া হাসিমুখে সহ্য করলেন এবং ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সম্মুখে মুজিবকে পাকিস্তানের ভবিষ্যত প্রধানমন্ত্রী বলে অভিহিত করলেন।

জি ডবলিউ চৌধুরী তৎকালিন পাকিস্তানের বাস্তব অবস্থার নিরিখে বলেছেন- 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করতে বহু সেনাবাহিনী, অফিসারবৃন্দ, সিনিয়ার কর্মকর্তারা বড় রকমের ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন। সেনাবাহিনীর তরুণ অফিসারবৃন্দ এবং দূরদর্শী জেনারেলদের কাছে পাকিস্তানী জাতীয়তাবাদ কোন অস্পষ্ট ও অবাস্তব ধারণা ছিল না। বরং তাদের কাছে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্তানের বহু দেশপ্রেমিক জনগণের ন্যায় এর আদর্শ ও পতাকা যে কোন মূল্যে রক্ষা করা ছিল খুবই প্রিয়। তারা ঐ সব মূল্যবোধ ও আদর্শ রক্ষা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন।'

২৭ জানুয়ারী জুলফিকার আলী ভূট্টো ঢাকায় এলেন। শাসনতন্ত্র প্রণয়নের ব্যাপারে প্রতিনিধিত্বশীল দুই দলের দুই নেতার সমঝোতার ওপর নির্ভর করছিল ইয়াহিয়ার ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া। ৩ দিন ধরে আন্তরিক পরিবেশে তাদের আলাপ আলোচনা হল। শেষ অবধি শেখ মুজিব ভূট্টোকে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে তিনি ৬ দফার পরিকল্পনা থেকে এক ইঞ্চিও সরে দাঁড়াবেন না।

ভূট্টোও দ্ব্যর্থহীনভাবে বললেন যে, তিনি এবং তার দল ৬ দফা পরিকল্পনার গোপন দুরভিসন্ধি বিচ্ছিন্নতার পরিকল্পনায় সম্মত হতে পারেন না। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মিডিয়া ভূট্টোর বক্তব্য থেকে দুরভিসন্ধির গন্ধ আবিস্কার করলেও ৬ দফার অন্তর্নিহিত লক্ষ্যের কথা কোথাও আলোচিত হল না। সর্বাধিক স্বায়ত্বশাসন দেওয়ার জন্য যখন প্রেসিডেন্ট এবং জেনারেলরা প্রস্তুত, অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের সব ব্যবস্থা যখন পাকাপোক্ত, এমনকি বৈষম্যজনিত অতীতের ক্ষতিসমূহ পূরণের অঙ্গীকার

বাস্তবায়নের আয়োজন যখন চূড়ান্ত, এমন কি যখন সমগ্র পাকিস্তানের ভাগ্য বিধাতা বাঙালীরা, তখন মুজিব তার স্বভাবসুলভ পুরানো মেজাজ আকড়ে ধরে থাকলেন। তার একগুয়েমী ও আপোষহীনতা সমগ্র জাতিকে সংঘাতের দিকে টেনে নিয়ে চলল।

মুজিবের আপোষহীনতা ও অনমনীয়তার কারণে জেনারেলরা ভুট্টোর দিকে ঝুকে পড়ল, এর ফলে ভূট্টো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। জাতীয় পরিষদের বৈঠকের তারিখ ঘোষণার পর ভূট্টোর প্রতিক্রিয়ার মধ্যদিয়ে সেই শক্তির বহিঃপ্রকাশ প্রকট হয়ে ওঠে। তিনি হুঙ্কার দিয়ে বলে ছিলেন- 'যতক্ষণ পর্যন্ত মুজিব ও তার মধ্যে শাসনতন্ত্রের ব্যাপারে বোঝা পড়া না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বৈঠক বসতে দেয়া হবে না। এমনকি এ প্রেক্ষিতে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে গণআন্দোলন ও বিপ্লব ছড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হয় তার পক্ষে থেকে।

ফেব্রুয়ারীতে উপমহাদেশে একটি ঘটনা ঘটল, ঘটনা ছোট। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনাটি ছিল একটি ঝড়ের পূর্ব সংকেত। এই ঘটনাটি জানিয়ে দিল ভারত পাকিস্তানকে টুকরো করার ব্যাপারে কতদূর অগ্রসর হবে। ঘটনাটি ছিল দিল্লীর প্ররোচনায় একটি ভারতীয় বিমান ছিনতাই নাটক। এর উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য বিমান ছিনতাইকে গ্রহণযোগ্য অযুহাত হিসেবে দাঁড় করানো। পাকিস্তান সরকারের বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে এর রহস্য উন্মোচিত হয়। ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের কতিপয় ভারতীয় অনুচর কাশ্মীরের স্বাধীনতার দাবীতে একটি বিমান ছিনতাই করে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। এই ছিনতাই নাটকের সূত্র ধরে দিল্লী পাকিস্তানী বিমানের জন্য ভারতীয় আকাশ সীমা নিষিদ্ধ করে দেয়, এর ফলে পাকিস্তানকে সিংহল হয়ে তিন হাজার মাইল আকাশ সীমা অতিক্রম করে দেশের উভয় অংশের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। ছিনতাই সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে মুজিব বিবৃতি দেন, এটা ক্ষমতা হস্তান্তর স্থগিত করার জন্য পাকিস্তান সরকারের ষড়যন্ত্র।' মুজিব পরোক্ষভাবে ভারতীয় পদক্ষেপকে স্বাগত জানালেন। অন্যদিকে আরএক লঘুচেতা নেতা জুলফিকার আলী ভূট্টো ভারতীয় অনুচর ছিনতাই- কারীদের জাতীয় বীর হিসেবে অভিহিত করলেন। এর অর্থ দাঁড়াল তিনি ভারতীয় পদক্ষেপে এক ধরনের বৈধতার প্রলেপ দিলেন। পর্যবেক্ষক মহল বুঝে

নিলেন দুই প্রান্তের দুই নেতা মেধাশূন্য দেউলিয়া শুধু নয় ভারতীয় চক্রান্তের ক্রীড়নক।

ভূট্টোর অব্যাহত হুমকির প্রেক্ষিতে পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস পার্টি বহির্ভূত অন্যান্য সদস্যরা আসন্ন বৈঠকে যোগদানে অস্বীকার করলো। এতে ভুট্টোর অবস্থান আরো শক্ত হয়ে উঠল। চূড়ান্ত অবস্থায় বৈঠক স্থগিত ছাড়া ইয়াহিয়ার জন্য কোন বিকল্প পথ আর খোলা রইল না। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠার সম্ভাবনার কারণে তাদের সন্তুষ্ট করার মত তিনি একটি বক্তব্যের খসড়া তৈরী করলেন। কিন্তু বিবৃতিটি প্রকাশ করা হল না জেনারেল পীর জাদার চক্রান্তে। ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য বৈঠক স্থগিত রাখার ঘোষণা প্রচার করা হল অতি সাধানরণ ভাবে। ৩ মার্চের নির্ধারিত বৈঠক মূলতবী ঘোষণার সাথে সাথে ঢাকা শহর অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল। প্রতিটি এলাকা থেকে জনগণ পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে দিতে পল্টন এলাকায় সমবেত হতে শুরু করল। প্রত্যেকটি মানুষের হাতে লাঠি লোহার রড। ভাঙচুর দোকান পাট লুট হতে শুরু হল। শেখ মুজিবের অহিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল লুটপাটের মধ্য দিয়ে, অবাঙালীদের দোকান পাট ঘরবাড়ী লোপাট হওয়া শুরু হল। সরকারকে সেনাবাহিনী নামাতে হল। লুটেরাদের উদ্দেশে গুলী চালাতে হল। কিন্তু লুট-পাট এবং আন্দোলন বন্ধ হল না বরং আরো প্রবল হয়ে উঠল।

পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় শাসনের অচলাবস্থা

মার্চের শুরু থেকে পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসন বিকল হয়ে পড়ল। পুরো প্রশাসন মুজিবের নিয়ন্ত্রণে এসে গেল। রেডিও টিভি থেকে শুরু করে সব কিছু তখন মুজিবের নিয়ন্ত্রণে। মুজিব সরকারী আধা সরকারী অফিসসমূহ বন্ধ ঘোষণা করলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান শাসনের জন্য ত্রিশটির অধিক নির্দেশ জারি করলেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে টেলিফোন, টেলেক্স ও বেতার যোগাযোগ বন্ধ ঘোষণা করলেন। আর পাকিস্তানী পতাকা নয় বাংলাদেশী পতাকা উড্ডীন হল ঘরবাড়ী এবং অফিসে।

পাকিস্তানের অস্থিত্ব রক্ষার শেষ প্রয়াস নিয়ে ইয়াহিয়া ঢাকায় এলেন ১৫ মার্চ। মুজিব উস্কানীমূলক বিবৃতি দিলেন। বিবৃতিতে বলা হল-

'জনগণের বীরোচিত সংগ্রাম এগিয়ে চলছে... বাংলাদেশের জনগণ, বেসামরিক সরকারী কর্মচারী, অফিস ও কারখানার কর্মচারী, কৃষক ও ছাত্রসমাজ এটা নিশ্চিতভাবেই প্রদর্শন করেছে যে, তারা আত্মসমর্পণের চেয়ে বরং মৃত্যুকে বরণ করবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার উৎসাহ উদ্দীপনা নির্বাপিত করা যাবে না। সুতরাং সংগ্রাম নতুন উদ্দীপনাসহকারে চলবে যতক্ষণ না আমাদের মুক্তির লক্ষ্য আদায় হয়।'

একাত্তরের মহানায়ক শেখ মুজিব তখন ছিলেন ভারতীয় অর্থানুকূল্যে সংঘটিত উগ্রাবাদী জঙ্গী ভারত পন্থী দ্বারা পরিবেষ্টিত। এদের প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করত RAW (রিসার্চ এণ্ড এ্যানালাসিস উইং)। এই গোয়েন্দা সংস্থার পরামর্শে শেখ মুজিব কর্ণেল ওসমানীকে বিদ্রোহী শক্তি সমূহের দায়িত্ব দেন। কিছু সেনা কর্ম- কর্তা ওসমানীর সাথে যুক্ত হন। তিন সপ্তাহের অব্যাহত আন্দোলন পাকিস্তান সরকারকে চ্যালেঞ্জ করার ব্যাপারে মুজিবকে প্রেরণা যুগিয়ে ছিল। ওদিকে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস এর বাংলাভাষী অফিসার ও জোয়ানরা, পুলিশ ও আনসাররা মুজিবকে সমর্থন দেয়ার ব্যাপারে ছিল ঐক্যবদ্ধ।

অন্যদিকে পাকিস্তানের জেনারেলরা পরিস্থিতির ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখছিলেন। মুজিব বিচ্ছিন্নতার পথ পরিহার না করলে কি ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছিল আর্মী হেড কোয়ার্টারে।

২০ মার্চ পর্যন্ত আলোচনার অগ্রগতি হতে থাকে। ফারল্যান্ড মুজিবকে সতর্ক করে দেয়। মুজিব কিছুটা নমনীয় হলে ঢাকাস্থ ভারতীয় কনস্যুলেট সক্রিয় হয়ে ওঠে। দূতাবাস সূত্রে মুজিবকে সাহায্য সহাযোগিতার আশ্বাস দেয়া হল। ওদিকে রুশ সাহায্য ও সমর্থন মুজিবকে শক্ত অবস্থান নিতে তাগিদ দেয়। মুজিবের ওপর চাপ বৃদ্ধি করে ভারতপন্থী উগ্রবাদী তরুণরা।

দুটো শক্তির ঐশ্বর্যে লালিত হয়ে শেখ মুজিব হতাশ হয়ে পড়লেন তখন, যখন তিনি জানতে পারেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পেছনে নেই। মুজিব ইয়াহিয়ার সাথে সমঝোতার দিকে অগ্রসর হয়েও পিছিয়ে আসেন তার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ভারত এবং তার আন্দোলনের শক্তি আপোষহীন তরুণদের চাপের মুখে। তার সীমাহীন গর্জনের আড়ালে তাকে ঘিরে ধরে এক অসীম অসহায়ত্ব। ইয়াহিয়া খানের সংগে এক বৈঠকে তিনি বলেই

ফেলেছিলেন- 'আমি যদি আপনার কথামত কাজ করি তাহলে ছাত্র নেতারা আমাকে গুলি করবে। আর যদি আমি ছাত্র নেতাদের কথামত চলি তাহলে আপনি আমাকে গুলি করবেন। বলুন তো আমি কি করি।' শেখ মুজিব তার নেতৃত্বের অসহায় ও করুণ অবস্থাই ফুটিয়ে তুলেছিলেন তার উপরোক্ত মন্তব্যের মধ্য দিয়ে (অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, পৃ- ১২)

১৬ মার্চ থেকে শেখ মুজিব ও দায়িত্বশীল আওয়ামী নেতৃবৃন্দের সাথে ইয়াহিয়ার আলোচনা শুরু হয়। ২০ মার্চ আলোচনা হয় ২ ঘন্টা ১০ মিনিট। আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের মুজিব বলেন, আলোচনার অগ্রগতি হয়েছে। এতে দেশের মানুষ অনেকটা আস্বস্ত হয়।

২১ মার্চ হাওয়া উল্টো দিকে প্রবাহিত হল। মুজিব ও তাজুদ্দিন ইয়াহিয়ার সাথে এক অনির্ধারিত বৈঠকে মিলিত হন। মুজিবের উপস্থিতিতে তাজুদ্দিন ইয়হিয়াকে জানিয়ে দেন- আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার ব্যাপারে সম্মত হতে পারে না। আওয়ামী লীগ চায় পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে পৃথকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। আওয়ামী লীগের বক্তব্য পরিষ্কার, পাকিস্তান ভেঙ্গে ফেলা। ইয়াহিয়া নিরাশ হলেন। তিনি অখন্ড পাকিস্তানের সেনা প্রধান হিসেবে পাকিস্তান ভেঙ্গে ফেলার দায়িত্ব নিতে পারেননি। অবশেষে তিনি জানিয়ে দিলেন, দেশ ভাঙার কোন হুমকি চ্যালেঞ্জ বিহীন থাকতে পারে না।

বলতে গেলে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহের শেষে পকিস্তানের সামরিক সরকারের সাথে আওয়ামী লীগের বোঝাপড়া ও সমঝোতার ব্যাপারে যাবতীয় সংলাপের অবসান হয়। চতুর্থ সপ্তাহের শুরুতে দীর্ঘ সংলাপের উপসংহার রচিত হচ্ছিল নেপথ্যে। যেমন প্রস্তুতি চলছিল ক্যান্টনমেন্টে অনুরূপ প্রস্তুতি অব্যাহত ছিল আওয়ামী মঞ্চে। সার্বিক বিচারে জাতি ছিল সম্মোহিত। আওয়ামী লীগ ছাড়া আর সব রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা ছিল নীরব। তারা এক অনিবার্য ধ্বংসাত্বক পরিণতি অবলোকনের জন্য ছিল অপেক্ষমান।

২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে আওয়ামী লীগ বলতে গেলে চূড়ান্ত বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়েছিল। রেডিও টিভি পত্রপত্রিকা ও অন্যান্য মিডিয়াসমূহে প্রচারিত হল বিদ্রোহের জয়োল্লাস। ধানমন্ডিতে কর্নেল ওসমানীর নেতৃত্বে সশস্ত্র মার্চপাস্ট করিয়ে আওয়ামী লীগ অনিবার্য যুদ্ধের

ঘোষণা জানিয়ে দিল। উচ্ছৃংখল জনতার বর্বর হামলা শুরু হল অবাঙালি জনবসতির উপর। এমনকি বিচ্ছিন্ন হামলার শিকার হল সেনাবাহিনীর সদস্যরাও। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সেনাবাহিনী ক্যান্টনমেন্ট চত্বরে বন্দী হয়ে পড়ল। এমনকি তাদের খাদ্য পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হল। এত কিছুর পরেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের শুভবুদ্ধিসঞ্জাত নির্মল সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষায় রইলেন তৃষ্ণার্ত চাতকের মত। ২৪ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানের গণপ্রতিনিধিরা পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য শেখ মুজিবকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু ইতিবাচক সাড়া পেলেন না। পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে চেষ্টা তদবির যখন ব্যর্থ হল, বোঝাপড়ার মত সব পথ যখন রুদ্ধ হল যখন আর কোন বিকল্প অবশিষ্ট রইলো না, তখন অনাকাঙ্খিত সশস্ত্র পথের অর্গল খুলে গেল স্বাভাবিক নিয়মে।

ক্যান্টনমেন্টে আবদ্ধ সেনাবাহিনীর পক্ষে বাইরের ঘটনাপ্রবাহ সঠিক ভাবে আঁচ করা সম্ভব ছিল না। তাদের প্রতি সহানুভূতিশীলদের সাথেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। এর ফলে সেনা অভিযানের ব্যাপারে তারা তাদের শক্তি প্রয়োগের সীমা নির্ধারণ করতে পারছিল না।

২৫ মার্চ গভীর রাতে শেখ মুজিবকে তার ধানমন্ডির বাস ভবন থেকে সেনাবাহিনী তাদের হেফাজতে তুলে নেয়। সেই সাথে ঢাকার কৌশলগত অবস্থান গুলোতে সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়। পাক বাহিনীর সামরিক অভিযান সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন বিবরণ আজো প্রকাশি হয়নি। যা কিছু প্রকাশ হয়েছে সে সব ছিল ভারতীয় সাংবাদিকদের বানোয়াট বিবরণ। এদের সূত্র ধরে বৃটিশ সাংবাদিকরা সংবাদ প্রেরণ করেছে। ভারতীয় সাংবাদিকদের কাল্পনিক বানোয়াট বিবরণগুলোই বিশ্বময় আবর্তিত হয়েছে কাল্পনিক ভিত্তিহীন বানোয়াট বিবরণ গুজবের মত ছড়িয়ে বিশ্ব জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য। তবে এটা সত্য যে পাক বাহিনী প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। ঢাকা চট্টগ্রাম রাজশাহী সর্বত্র প্রতিরোধ ব্যুহ ভেদ করে পাক সেনাদের অগ্রসর হতে হয়েছিল। জি ডব্লিউ লিখেছেন- ‘পাকিস্তান সেনাবাহিনী যখন মিলিটারী অপারেশন শুরু করে তখন তারা যে তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল তা হতে এটা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস এবং পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ ফোর্সের সাহায্যে আওয়ামী লীগ কর্র্তৃকও একটি প্রতিরোধ পকিল্পনা

সংগঠিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের বা বর্তমান বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল সমগ্র এপ্রিল মাসব্যাপী এবং কিছু এলাকা মে মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত বিদ্রোহী বা মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল। ফলে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বিরোধী বাহিনীর কাছ থেকে বিভিন্ন এলাকা দখল ও মুক্ত করেছিল। স্পষ্টতই এরূপ প্রতিরোধ স্বতস্ফুর্ত কিংবা অসংগঠিত হতে পারে না।’

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

গনেশ উল্টে দে মা লুটেপুটে খাই

দক্ষ নটদের মত সুনিপুণ অভিনয়ের মাধ্যমে রাজনীতির দৌড়ে শেখ মুজিব ও তার দল প্রকৃত দেশ- প্রেমিকদের পিছু হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল, বললে ভুল হবে, দেশ- প্রেমিক দল নেতা কর্মী ও জনগণকে রাজনীতির ময়দান থেকে বিতাড়তি করেছিল। এরপর শূন্য ময়দানে মার্চের শুরু থেকে লুটপাট এবং সন্ত্রাসের মহড়া চলতে থাকে। অনেক টালবাহানা, অনেক আবেগ আর উত্তাপ ছড়িয়ে শেখ মুজিব গনেশ উল্টে দিলেন। পরিকল্পিতভাবে ঝড় ডেকে এনেছিলেন শেখ মুজিব। বাংলার মানুষকে রক্তাক্ত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে আত্মসমর্পন করেছিলেন। তার অনুগামীরা যারা চেয়েছিল 'গনেশ উল্টে দে মা' তারা শুরু করেছিল লুট। ভয়াবহ লুণ্ঠনের নেশা আওয়ামী নেতা কর্মীদের গ্রাস করেছিল। লূণ্ঠন আর ভোগ বিলাসের দৃষ্টান্ত একজন মুক্তি যোদ্ধা পরবর্তীতে রাষ্ট্রদূত লেঃ কর্নেল শরীফুল হক ডালিম তার গ্রন্থে (যা দেখেছি যা বুঝেছি যা করেছি) লিখেছেন- 'তারা কোলকাতায় বেশ আরাম আয়েশেই সময় কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তাদের অসৎ উপায়ে লুটপাট করার কথা প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছিল, এতে তাদের সম্মানেরই শুধু হানি হচ্ছিল তা নয়, তাদের অনেকেরই প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে পড়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। তারা যেখানে অনাহারে অস্ত্রহীন বস্ত্রহীন অবস্থায় দেশকে স্বাধীন করার জন্য জীবন বাজি রেখে রণাঙ্গনে লড়ছেন তখন এ সমস্ত অসৎ রাজনীতিবিদ ও লুটেরার দল লুটপাটের বেশুমার টাকায় বিলাসী জীবন যাপন করে বাঙালিদের বদনাম করছিলেন অতি নির্লজ্জভাবে। কোটি কোটি টাকা তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তান থেকে লুটে আনা হয়েছিল। শুধুমাত্র বগুড়ার স্টেট ব্যাংক থেকে লুট করা হয়েছিল ৫৬ কোটি টাকার উপর। এ সমস্ত লুটপাটের সাথে জড়িত ছিল রাজনৈতিক নেতা এবং আমলাদের একটি অংশ।

লুটপাট সমিতির সদস্যরা (আওয়ামী লীগাররা) তখন কোলকাতার অভিজাত পাড়াগুলোতে এবং বিশেষ করে পার্ক ষ্ট্রীটের হোটেল বার এবং রেস্তোঁরাগুলোতে তাদের বেহিসাবী খরচার জন্য জয় বাংলার শেঠ বলে

পরিচিত। যেখানে তারা যান মুক্তহস্তে বেশুমার খরচ করেন। থাকেন বিলাসবহুল ফ্লাট কিংবা হোটেলে। সন্ধ্যার পর হোটেল গ্রান্ড, প্রিন্সেস, ম্যাগস, ট্রিংকাস, ব্লু ফকস, মলিন রুৎ, হিন্দুস্থান ইন্টার ন্যাশনাল প্রভৃতি বার রেষ্টুরেন্টগুলো জয় বাংলার শেঠদের ভিড়ে জমে উঠে। দামী পানীয় খাবারের সাথে সাথে পাশ্চাত্য সংগীতের আমেজে রঙিন হয়ে উঠে তাদের আয়েশী জীবন। বয় বাবুর্চিরাও তাদের আগমনে ভীষণ খুশী হয়। এমনই একজন নেতা তার দলবল নিয়ে প্রত্যেক দিন হোটেল গ্রান্ডের বারে মদ্যপান করতেন। তিনি বগুড়া ব্যাংক লুটের টাকার একটা বিরাট অংশ কবজা করেছেন কোনভাবে। তার কাছে রয়েছে প্রায় ৪ কোটি টাকা। একদিন মধ্যরাতে তিনি হোটেল বারে গিয়ে মদ পরিবেশন করার জন্য বারম্যানদের হুকুম দেন। বারম্যান্যরা কাচু মাচু জবাব দেয়, সময় শেষ হয়ে যাওযায় বার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। জবাব শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন বাঙালি শেঠ। টলমল অবস্থায় চিৎকার করে বলতে থাকেন তিনি হোটেলটাই পুরো কিনে নিতে চান। বেসামাল কিন্তু শাসাল খদ্দের, তাই বারম্যানরা চুপ করে সবকিছু হজম করে যাচ্ছিল। শেঠ আবোল তাবোল বকে পরে একজন বারম্যানকে হুকুম দেন 'কাল বার খোলার সময় থেকে বন্ধ করার আগে পর্যন্ত তিনি ও তার সংগীদের ছাড়া অন্য কাউকে মদ পরিবেশন করা যাবে না। তারাই শুধু থাকবে বারে। তার হুকুম শুনে বারম্যানরা ম্যানেজারকে ডেকে পাঠায়। ম্যানেজার এলে শেঠ তাকে প্রশ্ন করেন রোজ আপনার বারে সেল কত টাকা? ম্যানেজার একটা অংক তাকে জানায়। শেঠ তখন তাকে তার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন পুরোদিনের সেলের টাকাই তিনি পরিশোধ করবেন, পুরো টাকার মদ খেয়ে ওরা শেষ করতে না পারলে বাকি মদ যেন তার বাথরুমের টাবে ভরে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি তাতে গোসল করবেন।'

আর একদিন আর এক জন জয় বাংলার শেঠ তার পুত্রের প্রথমারের মত জুতা পরার দিনটি উদযাপন করার জন্য ব্লু ফকস রেষ্টুরেন্টের ১০০ জনের একটি শানদার পার্টি দেন। এ ছাড়া অনেক শেঠ দিল্লী ও বোম্বেতে গিয়ে বাড়ী ঘর কিনতে থাকেন। অনেকে আবার ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। তাদের এ সমস্ত কীর্তিকলাপের উপর শহীদ জহির রায়হান একটি প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার এ অভিপ্রায়ে অনেকেই ভীষণ অসন্তুষ্ট ছিলেন তার উপর, অনেকেই

তার ঔদ্ধত্যে ক্ষেপে গিয়েছিলেন। তার রহস্যজনক মৃত্যুর পেছনে এটাও একটা কারণ হতে পারে। কোন এক নায়িকার জন্মদিনে তখনকার দিনে তার এক গুণমুগ্ধ তাকে ৯ লক্ষ টাকা দামের হীরের নেকলেস উপহার দিয়েছিলেন।

দারগা রোডের বিশু বাবুর বাড়িতে থাকতেন মন্ত্রী পরিষদের পরিবারবর্গ। প্রবাসী সরকারের টাকার প্রায় সবটাই কালো কালো ট্রাঙ্কে ভরে রাখা হয়েছিল বিশুবাবুর বাড়ীতে এবং ৩নং সোহরাওয়ার্দী এভিন্যুর তিনতলা ছাদের দুটো কামরায়। সেখানে থাকতেন অর্থ সচিব জনাব শামসুজ্জামান, তার পরিবার ও রাফিয়া আকতার ডলি। এ টাকার কোন হিসেব ছিল না।

কোলকাতার বড় বাজারের মারোয়ারিদের সাহায্যে এগুলো এক্সচেঞ্জ করা হত। এ কাজের দালালী করেও অনেকেই কোটিপতি হয়ে উঠেন রাতারাতি। কিছুসংখ্যক মুক্তিযোদ্ধা লোভ সম্বরণ করতে না পেরে অসৎ হয়ে উঠেন।

কোন এক সেক্টর কমান্ডার এক পাকিস্তানী সিএসপি অফিসারের অন্তসত্ত্বা স্ত্রীকে বেয়নটের আঘাতে মেরে তার গা থেকে সোনার অলঙ্কার খুলে নিয়েছিলেন এমন ঘটনাও ঘটেছে।

যুব শিবির, শরণার্থী শিবিরগুলো নিয়ে কেলেঙ্কারি হয়েছে অনেক। তাদের জন্য সারা বিশ্ব থেকে রিলিফ সামগ্রী, যানবাহন ভারতীয় সরকারের প্রযত্নে এসেছিল। কিন্তু তার কতটুকু বা দেয়া হয়েছিল শরণার্থীদের প্রয়োজন মেটাতে। এসব রিলিফ সামগ্রী বিতরণের দায়িত্ব ছিল যৌথভাবে ভারত ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের । বগুড়ার স্টেট ব্যাঙ্ক ছাড়াও মোটা অংকের টাকা নিয়ে আসা হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম, ভৈরব ও পাবনার ট্রেজারী থেকে, সে টাকারও কোন সুষ্ঠু হিসাব পাওয়া যায়নি।' (যা দেখেছি যা বুঝেছি যা করেছি, পৃঃ ২২০- ২২৩)

দিল্লীর সক্রিয় অবস্থান

১৯৭১ সালে প্রকাশিত পাকিস্তান সরকারের শ্বেতপত্রের সূত্র থেকে জানা যায়- 'মার্চে উদ্ভূত সংকটের আগেই পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে শিকারী জঙ্গী বিমান ও অতিরিক্ত পরিবহন বিমান মোতায়েন করা হল পূর্ব পাকিস্তানের

পশ্চিম ও উত্তর সীমা সংলগ্ন ঘাঁটিগুলোতে প্রস্তুতি আরো জোরদার করা হল। বঙ্গোপসাগরে পাকিস্তানী জাহাজগুলোর চলাচল পর্যবেক্ষণ করার জন্য কোলকাতার কাছে ব্যারাক পুরে কয়েকটি পর্যবেক্ষণ বিমান মোতায়েন করা হল। মার্চ মাসের শেষ দিকে হিন্দুস্থানী সেনাবাহিনীর সদস্যরা ইপিআর এবং সেনাবাহিনীর ছদ্মাবরণে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে। হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান অভিযোগ করে যে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বি এস এফ- এর ৭৬, ৮১, ৮৩, ১০১, ১০৩ ও ১০৪ নং ব্যাটেলিয়ান ছাড়াও আরো দুটো ব্যাটেলিয়ানকে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষে পূর্ব পাকিস্তানে কাজে লাগান হয়েছিল।

পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইসলামাবাদ সামরিক পদক্ষেপ নেয়ার সাথে সাথে রাজনীতিকরা চঞ্চল হয়ে উঠল- এবং সেখানকার হিন্দু জনগণ সরব হয়ে উঠল যেন তাদের কাঙ্খিত শুভ দিন আসন্ন। ২৬ মার্চ সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী লোক সভায় বললেন- 'আমরা এ আন্দোলনের ঐতিহাসিক গুরুত্বের ব্যাপারে গভীরভাবে সজাগ। যারা জানতে চেয়েছিল সময়মত পদক্ষেপ নেয়া হবে কিনা, আমি সেই সমস্ত সম্মানিত সদস্যবর্গকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, তা করাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য সময় পার হয়ে গেলে সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন লাভ নেই।' রাজ্যসভায় একই দিনে তিনি বলেন- 'বহু কারণে ব্যাপারটায় আমরা আগ্রহী। প্রথম যেমনটা একজন সদস্য বলেছেন শ্রী মুজিবর রহমান সেসব মূল্যবোধের পক্ষেই দাঁড়িয়েছেন, যেগুলো আমরা নিজেরাও সযত্নে লালন করি।'

১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ হিন্দুস্থানী পার্লামেন্টের উভয় পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবের পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি গভীর ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা হয় এবং তাদের আশ্বাস দেয়া হয় যে হিন্দুস্তানী জনগণ তাদের সংগ্রামে সর্বান্তকরণে সহানুভূতি জানাবে এবং সমর্থন যোগাবে। এই প্রস্তাবটি ৪ এপ্রিল সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এ প্রস্তাব সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে অল ইনডিয়া কংগ্রেস কমিটির পশ্চিম বাংলা ইউনিটের সেক্রেটারী মিঃ কেকে শুক্লা বললেন- 'শেখ মুজিবর রহমান যে যুদ্ধ করছেন সেটা হিন্দুস্থানেরই যুদ্ধ।'

বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে ভারতের প্রাদেশিক পরিষদ গুলোতে সরকারীভাবে প্রস্তাব গৃহীত হয়। পশ্চিম বঙ্গের ডিপুটি মূখ্যমন্ত্রী বললেন- 'যদিও কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন জানায়নি কিন্তু পশ্চিম বাংলায় আমরা বাংলাদেশের প্রতি এখন থেকে স্বীকৃতি জানাচ্ছি।'

৩১ মার্চ ইনডিয়ান কাউন্সিল ফর ওয়ার্ল্ড এ্যাফেয়ার্স কর্তৃক আয়োজিত এক সিম্পোজিয়ামে ভারতের প্রতিরক্ষা ইনস্টিটিউটের ডাইরেক্টর কে সুব্রামানিয়াম বললেন- 'ভারতকে এ সত্য উপলব্ধি করতে হবে যে, পাকিস্তানের ভাঙ্গন আমাদের স্বার্থের অনুকূলে। এমন সুযোগ আর আসবে না। ..... বাংলাদেশের সংকট পাকিস্তানকে ধ্বংস করার ব্যাপারে ভারতের জন্য এ শতাব্দীর সুযোগ এনে দিয়েছে।' বিহার প্রদেশের মূখ্য মন্ত্রী কর্পুরী ঠাকুর সাহায্য তহবিলে ২৫ লাখ টাকা দান করে বললেন- 'বাংলাদেশে অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে আমরা অটল।'

২ এপ্রিল (৭১) হিন্দুস্থানী পত্রিকা ফ্রি প্রেস জার্নালে লেখা হল- 'আমাদের হিন্দুস্থানের কার্যকলাপকে সচেতন ভাবে এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে পাকিস্তানকে দুর্বল করার লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে হবে।

১৫ জুন দৈনিক মাদার ল্যান্ডে প্রকাশিত নিবন্ধে ভারতের একজন ভাষ্যকার সুব্রানিয়াম স্বামী লিখলেন- 'পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতার দিকে লক্ষ্য রাখা আমাদের কাজ নয়। সেটা পাকিস্তানের মাথা ব্যাথা। আমাদের শুধু দুটো প্রশ্ন বিবেচনা করতে হবে- পাকিস্তান খণ্ড- বিখণ্ড হওয়া কি আমাদের দীর্ঘ মেয়াদী স্বার্থের অনুকূলে? আর যদি তা সত্যি আমাদের স্বার্থের অনুকূল হয় তাহলে এ ব্যাপারে আমাদের কি কিছু করার রয়েছে?

পাকিস্তানকে খণ্ড- বিখণ্ড করা কেবল আমাদের বাইরের নিরাপত্তার জন্য অনুকূল নয়, তা আমাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার অনুকূল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানকে একটি মহা শক্তি রূপে গড়ে ওঠা উচিত এবং এই ভূমিকা পালনের জন্য আমাদেরকে জাতীয় পর্যায়ে আমাদের নাগরিকদের সুসংবদ্ধ করতে হবে আর এজন্য অপরিহার্য পূর্ব শর্ত হচ্ছে পাকিস্তানকে ছিন্ন ভিন্ন করা।' ভারতের তাৎক্ষণিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে পূর্ব পাকিস্তানের সংকটের অন্তরালে ছিল দিল্লীর সক্রিয় ভূমিকা। হিন্দু নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে এম কে গান্ধী মনে করতেন পূর্ব পাকিস্তান নিজস্ব যন্ত্রণায় ভারতে ফিরে আসবে। নেহেরু মাউন্ট ব্যাটেনের ধারণা ছিল

পূর্ব- পাকিস্তান ভায়াবল নয়, যে কারণে ২৫ বছরের মধ্যে সে ভারতের সাথে একাকার হতে চাইবে। যে ভূখণ্ড ভায়াবল ছিল না সেটাকে ভায়াবল করেছিল পাকিস্তান পঞ্চম বাহিনী সৃষ্ট যন্ত্রণাকর পরিস্থিতির মধ্যে। দিল্লী উন্নয়নমুখী পূর্ব পাকিস্তানকে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে ধাপে ধাপে ক্রমশ ২৫ বছর নয় ২৪ বছরের মধ্যে কলাপ্স করে দিল রক্তাক্ত পরিস্থিতির মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে।

দায়ী কে?

একাত্তরের মর্মান্তিক সংকটের জন্য দায়ী কে? ইয়হিয়া না শেখ মুজিব। ইয়াহিয়া নয় শেখ মুজিবই একাত্তরের উত্তাল মার্চে সমঝোতা প্রয়াস ভণ্ডুল হওয়ার জন্য দায়ী। সীমাহীন জনপ্রিয়তা নিয়ে শেখ মুজিব পরিণতির কথা না ভেবে হটকারী সিদ্ধান্ত জাতির কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছিলেন এক অদৃশ্য সুতোর টানে। কোন পঞ্চমবাহিনী চক্রের পক্ষে শত্রু পক্ষের পেতে রাখা ফাঁদে পা রাখা ছাড়া ভিন্ন কোন পথ খোলা থাকে না। একাত্তরে আন্তর্জাতিক চক্রের ষড়যন্ত্রমূলক প্রচারণায় বিভ্রান্ত ও সম্মোহিত জাতি তখন না বুঝলেও পরবর্তী তত্ত্ব উপাত্ত থেকে অনুধাবন করেছে যে শেখ মুজিব স্বয়ং বিপর্যয় ডেকে এনে ছিলেন। শেখ মুজিবের একজন লেপটেন্যান্ট আব্দুর রাজ্জাকের স্বাধীনতার ১৫ বছর পর দেয়া একটি সাক্ষাৎকারই প্রমাণ করে যে, তিনি স্বয়ং একাত্তরের সংকট জাতির কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছিলেন।

১৯৮৭ সালে সাপ্তাহিক মেঘনায় দেয়া সাক্ষাৎকারটি ছিল এমন- '...এরপর শুরু হল ডায়ালগ। ডাইলগে বঙ্গবন্ধু আপোসের সিদ্ধান্ত নিলেন। ইয়াহিয়া এমন একটি অফার দেন, যা একটি কনফেডাশেনের মধ্যে এসে গেল। অফারটা ছিল বঙ্গবন্ধু প্রাইম মিনিস্টার, জুলফিকার আলী ভূট্টো ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার এবং ফরেন মিনিস্টারের চার্জ পাবেন। এ ছাড়াও বঙ্গবন্ধু যে ৬ দফা দিয়েছিলেন তার মধ্যে একমাত্র ডাবল কারেন্সী বাদ দিয়ে বাকি আর পাঁচটা দাবিও ইয়াহিয়া খান মেনে নিলেন।... ২৩ মার্চ এ প্রস্তাবকে চূড়ান্ত রূপ দেবার কথা।... তবুও সেদিন বললাম বঙ্গবন্ধু আর যাইহোক ভুট্টোর সাথে সরকার গঠন করা যাবে না। এই যেই বলেছি, অমনি তিনি ভীষণ জোরে চিৎকার করে উঠলেন। বললেন, চুপ কর। আমার চেয়ে বেশী বোঝ? ভূট্টোর সাথে সরকার গঠন করব কিনা আমাকে ভাবতে দাও।... পরে বললেন, আমি ওদের সাথে খেলতে চাই। আমাকে খেলতে

দাও। তোমরা একদিনেই সব খেতে চাও।... কিছুক্ষণ পর বঙ্গবন্ধু আমাকে উপরে যেতে বললেন। কাছে গিয়ে বসলে বললেন, আমি যা বলব পৃথিবীর কারো কাছে বলবে না, নট ইভেন টু ইউর কমরেডস।' আমি ঘাড় নাড়লাম। তারপর বললেন, তোরা ঠিক বলেছিস। কাল সারারাত ধরে আমি চিন্তা করলাম, নো রিক্স নো গেইন। তোরা পারবি না প্রাথমিক অবস্থা চালাতে। খবরদার তোরা কাউকে বলবি না, ইয়াহিয়া খানকে কি বলব ঠিক করে ফেলেছি। আমি বললাম, প্রাথমিকভাবে আমরা চালাতে পারব তারপর যদি আপনি ভারতের সাহায্য করার ব্যবস্থা করে যেতে পারেন আরো ভাল হয়।... বঙ্গবন্ধু নিচে নেমে নজরুল ইসলাম সাহেবকে ডাকলেন। তাজুদ্দিন মুশতাক সাহেবকেও। তারপর তাদের লাইব্রেরী রুমে নিয়ে গেলেন। ওরা মুখ অন্ধকার করে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমি বের হলাম গাড়ীতে। তারপর তাকে প্রেসিডেন্ট হাউসে পৌঁছে দিলাম। আমি চলে এলাম। ২৩ তারিখে আমি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গেলাম। সেখানে আগের দিনে দেয়া কথা বঙ্গবন্ধু প্রত্যাহার করলেন। বললেন, পূর্বপাকিস্তান এ্যাসেম্বলীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর কর।"

সাক্ষাৎকারে বলা হয়েছে, (মুজিব) বললেন, আমি তাদের সাথে খেলতে চাই। শেখ ওদের সাথে খেলেননি খেলেছিলেন সাড়ে সাত কোটি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ভাগ্য নিয়ে।

বিপর্যয় এড়ানো যেত

নিরোদ সি চৌধুরী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী যদিও তিনি কিশোর গঞ্জের সন্তান। একাত্তরে তিনি ছিলেন বৃটিশ নাগরিক ও লণ্ডনেই বসবাস করতেন। সেই নিরোদ সি চৌধুরী ভারতের হিন্দুস্থান টান্ডার্ড পত্রিকার (১০মে ১৯৭১) এক নিবন্ধে লিখেছিলেন- '...আমি আবারও বলতে চাই যে, এই বিপর্যয় অবশ্যই এড়ান যেত। আমি কোলকাতা থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। তাতে বলা হয়েছে যে, শেখ মুজিবর রহমান তার দাবীর কিছু ছাড় দিলেও পাকিস্তান সরকার কঠোর ভাবে বদলা নিতেই কেবল তারা একটা অজুহাত খুঁজে বেড়াচ্ছিল মাত্র। আর এটাই হচ্ছে প্রত্যেকটি বাঙ্গালীর নিজের অপরাধ বা ত্রুটি ঢাকা দেবার চিরাচরিত বাহানা। তাই যদি হবে তাহলে ইয়াহিয়া খান ১৫ তারিখে ঢাকা আসতে যাবেন কেন? সেই সময়কার

অবস্থাতো এমনি দাঁড়িয়ে ছিল যে, একটা প্রদেশ কেন্দ্রীয় শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে বলেই মনে হচ্ছিল। মার্কিন গৃহযুদ্ধ শুরু হবার সময়ের যে অবস্থা সেটাও এতটা খারাপ ছিল না। মার্চ মাসের ছয় তারিখ থেকে শেখতো সরকারের বাঙ্গালী কর্মচারীদের সহযোগিতায় পূর্ব বাংলা সরকারের সমস্ত কর্তৃত্ব দখল করে নিয়ে ছিলেন- বাস্তবে বিচ্ছিন্নতাতো ঘটেই গিয়েছিল, তাই ৬ই মার্চ এর পর যে কোন সময় তো কেন্দ্রীয় সরকার সামরিক অভিযান চালাতে পারত অতি সহজে। ২৩শে মার্চ ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক মশিয়র রহমান (জাদুমিঞা) এক জনসভায় ঘোষণা দিলেন যে, পূর্ব বাংলা ইতিমধ্যেই স্বাধীন হয়ে গেছে এবং বাঙ্গালীরা যে কোন মূল্যে সে স্বাধীনতা রক্ষা করবে। তিনি আরো বললেন- 'জনসাধারণ সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং আওয়ামী লীগ উভয়ের কাছ থেকে হুকুম পেয়েছে- আর তারা আর্মির হুকুম উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' সুতরাং সামরিক অভিযান শুরু করার জন্য শেখ আর ইয়াহিয়া খানের মধ্যেকার আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য বসে থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমার এই মন্তব্যের কি জবাব দেওয়া হবে তা আমার জানা আছে- বলা হবে যে আওয়ামী লীগকে ভুল পথে চালিত করার জন্য ইয়াহিয়া খান সমঝোতা করার ভান করে চলেছিল। কিন্তু তাই যদি হয় তাহলে শেখ মুজিব ইয়াহিয়া খানের দেওয়া যে কোন একটি প্রস্তাব মেনে নিলেন না কেন?

১। শর্তসাপেক্ষে চার দফা মেনে নিয়ে সংসদে যাওয়া।

২। বিনা শর্তে সংসদে যাওয়া।

৩। কেন্দ্রে বেসামরিক শাসন পুনঃ প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে সাময়িক ভাবে সামরিক সরকারকে মেনে নেওয়া।

উপরের এই শর্তগুলোর যে কোন একটা মেনে নিলে কি মুখোমুখি সংঘর্ষের পথে যে পরিণত হচ্ছে তার চেয়ে ফল খারাপ হত কি?

এখন আরও একটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই, অতীত এবং ভবিষ্যৎ উভয়ের জন্য এটা প্রযোজ্য- বাঙ্গালী হিন্দুরা কোন কিছু করতে চাইলে তারা তখনই তা করতে চায় ধৈর্য ধরতে পারে না।- আর এটাই তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এর জন্য তারা চরম ভাবে উত্তেজিত হয় আর না হয় চরম ভাবে মুষড়ে পড়ে। দুর্ভাগ্যের বিষয়, নতুন বাঙ্গালী মুসলমান বুদ্ধিজীবীরাও এই

রোগে আক্রান্ত, যদিও তারা ভিন্ন ধাতুর তৈরী অর্থাৎ তারা অবশ্যই দৃঢ়চেতা হওয়ারই কথা। অন্য কথায় বলা যায় যে, বাঙালী মুসলমানরা রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জন করতে গিয়ে হিন্দু চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অর্জন করে বসেছে। কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুর রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা না থাকায় বাঙ্গালী মুসলিমরা কোথায় থামতে হবে তা জানতো না। যদি প্রতিবাদের কথাই ধরা যায় তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুদের ভারত সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ পূর্ব বঙ্গের মুসলিমদের পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। তবু পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরা তাদের নির্বাচিত দু'দুটো সরকার কেন্দ্র কর্তৃক বাতিল হতে দেখলেও চুপচাপ। তারা এর জন্য কোন বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি। কিন্তু হালে গজিয়ে উঠা মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতাই তাঁদের চূড়ান্ত বিপর্যয়ের কারণ হয়ে দাড়াল।

সপ্তদশ অধ্যায়

প্ররোচিত যুদ্ধাবস্থা ও কূটনৈতিক উদ্যোগ

মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। শুরু থেকেই ক্যান্টনম্যান্ট এলাকা ছাড়া সর্বত্র আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। সিভিল প্রশাসনে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছিল না। পূর্ব- পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসন চলছিল মুজিবের নির্দেশে। যদিও আওয়ামী লীগ তাদের আন্দোলনকে বলতো অহিংস, প্রকৃত পক্ষে তাদের আন্দোলন ছিল ভয়ঙ্কর ভায়োলেন্সপূর্ণ। অবাঙালীদের উপর মনস্তাত্বিক আক্রমণ থেকে শুরু করে হত্যা লুণ্ঠন চলেছিল নির্বিচারে। ২৬ মার্চ সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার পর মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে ঢাকার উপর সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর সেনাবাহিনী আওয়ামী লীগের প্রতিরোধ ভেঙে অগ্রসর হতে থাকে। মে মাসের শেষ নাগাদ সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ সমগ্র দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ জনগণকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে ভারতে পলায়ন করে। সাথে নিয়ে যায়- ট্রেজারী ও ব্যাংক লুণ্ঠন করা বিপূল পরিমান অর্থ। পরবর্তীতে প্রাণ ভয়ে পলায়ন করে সাধারণ মানুষের কিছু অংশ দিল্লী সৃষ্ট পূর্ব পাকিস্তানের সংকটের সম্ভাব্য উদ্বাস্তুদের জন্য পূর্ব থেকে নির্মাণ করা ভারতের উদ্বাস্ত শিবিরগুলোতে স্থান নেয়। এদের সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে ছিল ২০ লাখ, যদিও হিন্দুস্তানের দাবী অনুসারে পূর্বপাকিস্তানের উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল ১ কোটি সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা সহমর্মিতা সমবেদনা এবং মহানুভূতিতে পূর্ণ ছিল না। না থাকার পেছনেও যথেষ্ট কারণ ছিল। অগ্রসরমান সেনাবাহিনী দেখেছে আওয়ামী লীগের পাশবিক নির্মমতা এবং সসস্ত্র প্রতিরোধ। তারা পথেঘাটে পড়ে থাকতে দেখেছে আওয়ামী লীগের নিপীড়নে নিষ্পেষিত অবাঙালী ও বাঙ্গালী সৈনিকদের লাশ। এর ফলে তারা সহমর্মী হওয়ার বদলে নির্মম হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষের উপর এক ধরনের প্রতিরোধ স্পৃহা তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। হিন্দুস্থানের পেতে রাখা ফাঁদে পা দিয়েছে এবং তারা যেখানে প্রতিরোধ হয়েছে সেখানে প্রতিরোধ ভেঙ্গে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে।

তৎকালীন যুদ্ধাবস্থা সম্পর্কে নিরোদ সি চৌধুরী লিখেছেন- 'ভারতীয় এবং বৃটিশ সাংবাদিকরা যে প্রতিরোধ কাহিনী সৃষ্টি করে চলেছে তার চেয়ে চরম বোকামী আর হতে পারে না। সামরিক অভিযানে বর্ষা জনিত বাধাকে ঘিরে যেসব কল্পকাহিনী প্রচার করেছেন তারা, তার নজির খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। যারা এসব কথা প্রচার করছে পূর্ববংগের বর্ষাকাল সম্বন্ধে তাদের কোন ধ্যান ধারনাই নেই। তারা জানতনা যে যখন চাকাওয়ালা যানবাহনের এতটা প্রচলন ছিল না, তখন পূর্ব বাংলায় বর্ষাকালেই হচ্ছে যাতায়াতের সবচেয়ে সুবিধাজনক সময়। আর সেজন্যই সব বিবাহিত মেয়েরা বর্ষাকালেই বাপের বাড়ী বেড়াতে যেত এবং পূজার আগে ঘরে ফিরে আসত। রেল কিম্বা স্টিমার যোগাযোগ ব্যবস্থা বর্ষায় ব্যহত হয় না। তাছাড়া বর্ষা যদি কোন অসুবিধা সৃষ্টি করেই থাকে তাহলে উভয়ের জন্যই করেছে। তাছাড়া বিমান হামলা বর্ষার জন্য খুব কমই বাধা পেতে পারে।

এসব সামরিক আঁচ আন্দাজের মূল লক্ষ্য হল পাকসেনারা যে ভূমিকা নিতে চাইছে না তাদেরকে সেই ভূমিকায় নামাবার জন্য উৎসাহ যোগান। এবার আমরা বৃটিশ প্রেস, ভারত সরকার, ভারতীয় নাগরিক এবং বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গের লোকদের দিকে একটু নজর ফেরাই। প্রথমেই বলতে হয় আমি এত দায়িত্বহীন সাংবাদিকতার কথা কল্পনাও করতে পারি না। আলোচনা ভেঙ্গে যাবার আগে থেকেই বৃটিশ সাংবাদিকরা যেভাবে বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা বা অবশ্যম্ভাবী বলে জোরে সোরে প্রচার করতে শুরু করলো তাতে নিশ্চয়ই পূর্ব বঙ্গের নেতারা উৎসাহিত বোধ করছেন আর অন্যদিকে পাকিস্তান সরকার এবং সামরিক বাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। এর পর দুইজন প্রত্যক্ষদর্শী ছাড়া অন্য সকলেই ভারতীয় আজগুবি গুজবের উপর ভিত্তি করে রিপোর্ট পাঠাতে থাকলো। কাল্পনিক শক্তিশালী প্রতিরোধের বিষয় এমন কি তারা এও প্রচার করলেন যে, পাকসেনাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং এমন অবস্থায় তারা বাঙ্গালীদের কাছে আত্মসর্ম্পন করতে যাচ্ছে যে কোন মুহূর্তে। মাঝে মাঝে তুমুল যুদ্ধের কথাও তারা তাদের রিপোর্টে প্রচার করেছে। গত কয়েক দিন যাবৎ যশোরে পাঞ্জাবীদের হত্যার এক বিভৎস কাহিনী তারা বেশ জোরে সোরে প্রচার করল এবং বলল যে, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় ঐ শহরের কিছু অংশ দখল করে নিয়েছে। তাদের দায়িত্বহীনতা চরম সীমায় পৌঁছল এই কাল্পনিক রিপোর্টিং- এর মাধ্যমে।

কারণ তারা একবারও ভেবে দেখলনা যে, পাকিস্তান সরকারের উপর এই রিপোর্টের কি প্রতিক্রিয়া হতে পারে। এ সম্বন্ধে আমার সবচেয়ে সংশয় ছিল। যারা এইসব ভুয়া খবরগুলো পাঠাচ্ছিল তারা হয় সংশ্লিষ্ট পক্ষের কেউ, না হয় তারা পেশাগত ভাবে গুজব সৃষ্টিকারী।

ইংল্যাণ্ডে বসে যে সামান্য খবরা- খবর পাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে বাঙ্গালী হিন্দুরা পূর্ব বঙ্গের ঘটনা প্রবাহে তাদের চরিত্রের দুটো জঘন্য দুর্বলতাকে বেশ উৎসাহ নিয়ে লালন করে চলেছে- প্রথমতঃ তাদের লড়াই অন্যের সাফল্যের সাথে লড়ে যাচ্ছে দেখে পৈশাচিক আনন্দবোধ আর দ্বিতীয়তঃ তাদের হীনমন্যতা আর আত্ম প্রতারণার অনুভূতি। পূর্ব বঙ্গে গণপ্রতিরোধের সাফল্যের বানোয়াট খবরা খবর প্রচার করে সহযোগী বাঙ্গালী হিসেবে আমাদের বোঝা উচিত ছিল যে, এতে পূর্ব বঙ্গের অসহায় মানুষগুলোকে আরো দুর্ভোগ ও দুর্দশার দিকেই ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। মানসিক তৃপ্তি আর পৈশাচিক উল্লাস মানবতা বিবর্জিত মনোবৃত্তিরই বহিঃপ্রকাশ। পূর্ব বঙ্গের সাফল্যজনক গণ প্রতিরোধের কল্পকাহিনী শিক্ষিত মানুষের বিবেক, তার বুদ্ধিমত্তার করুণতম ব্যর্থতাই প্রকাশ করে। (দি হিন্দু স্ট্যানডার্ড, কোলকাতা, ১৩ এপ্রিল ১৯৭১)

ছোট ছোট আক্রমন প্রতিরোধ ও ঘাত- সংঘাতের মধ্য দিয়ে বর্ষা মওসুম পেরিয়ে গেল। কিন্তু ভারতের প্রত্যাশা পূরণ হল না। ভারত আশা করেছিল বর্ষা মওসুমে মুক্তি যুদ্ধ চূড়ান্ত রূপ নিবে। দিল্লী মনে করেছিল ভারতীয় সমরাস্ত্র সজ্জিত মুক্তি যোদ্ধাদের প্রবল আক্রমনের মুখে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আত্মসমর্পনের বাধ্য হবে কেননা পূর্ব পাকিস্তানের আবহাওয়াজনিত পরিস্থিতি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অনুকুল এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য ছিল সম্পূর্ণ প্রতিকুল। এ কারণে পাকবাহিনীর পতন অবশ্যম্ভাবী মনে করাটা দিল্লীর জন্য অমূলক ছিল না। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা দাঁড়াল তাদের প্রত্যাশার বিপরীত। পাক বাহিনীর অবস্থান আরো দৃঢ় এবং মজবুত বলে পরিগণিত হল। এতে ইন্দিরা সরকার দারুণভাবে বিচলিত হয়ে পড়ল। তারা অনুভব করল দুর্নীতি অসদাচরণ ও ভোগ বিলাসে লিপ্ত আওয়ামী লীগের প্রতি প্রবাসী বাঙালীদের আনুগত্য দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। এমন আশঙ্কাও প্রকট হয়ে উঠল যে, যুদ্ধ দীর্ঘ স্থায়ী হলে আওয়ামী লীগ তাদের একক নেতৃত্ব ধরে রাখতে সক্ষম হবে না। তখন মুক্তি যোদ্ধাদের মধ্যে দুটো

সুসংগঠিত শক্তি বিদ্যমান ছিল। দুটোর একটি হল চরমপন্থী রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিপ্লবীরা অন্যটি হল বিদ্রোহী সেনাবাহিনী, ইপি আর মুজাহিদ পুলিশ ও আনসাররা। এদের কারোই ভারত সরকারের উপর দায়- বদ্ধতা ছিল না। একারণে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে সময়ের আবর্তনে এক সময় মুক্তি যুদ্ধের নেতৃত্ব এই দুটো শক্তির দখলে এসে যাবে। ভারত সরকারের দুরভিসন্ধি আওয়ামী লীগের সাথে গোপন আঁতাত এবং দিল্লীর বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্র সম্মোহিত মুক্তি যোদ্ধা জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর ফলে চলমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রকট হয়ে উঠবে।

সবচেয়ে বড় কথা পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আবহ সৃষ্টি করার ফলে এবং ভারতীয়দের এ ব্যাপারে সম্পৃক্ত করার কারণে যে গোলমেলে যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রাবল্যে ভারতের বিভিন্ন জাতি সত্তার স্বাধীনতা সংগ্রাম তাৎক্ষনিকভাবে ঝিমিয়ে পড়ে। ভারত আশঙ্কা করল মুক্তি যুদ্ধ দীর্ঘ মেয়াদী হলে ঝিমিয়ে পড়া ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নতুন করে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে। তখন মুক্তি যুদ্ধ পুর্ব পাকিস্তানের মাটিতে নয় সমগ্র উত্তর পূর্ব ভারত, কাশ্মীর ও পূর্ব পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়বে। দিল্লী দেখল তার সামনে রয়েছে দুটো পথ খোলা, হয় পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হতে হবে নয়তো মুক্তি যুদ্ধের প্রক্সি যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। সার্বিক পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণ করে দিল্লী জুলাই মাস নাগাদ যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে।

যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেও আর এক আশঙ্কা থেকে ভারত চোখ ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। চীন সফরের পর হেনরি কিসিঙ্গার ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূতকে ইংগিত দিয়েছিলেন যে, পূর্ব পাকিস্তান আক্রান্ত হলে চীন হস্তক্ষেপ করবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মধ্যস্থতায় দুই বৈরী শক্তি চীন ও মার্কিন সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করে। এর ফলে চলমান পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে থাকার সম্ভাবনাও অধিক বলে মনে করল দিল্লী। চীন মার্কিন ঘনিষ্ট সম্পর্কের কারণে দিল্লীর পাকিস্তান ভাঙ্গার স্বপ্ন অনেকটা ম্লান হয়ে পড়ে। এ সত্বেও দিল্লীর নেতৃত্ব ২৩ বছর ধরে যে স্বপ্ন দেখে আসছিল যে ষড়যন্ত্র যে পরিকল্পনা সম্ভাবনাময় করে তুলতে সূচনা পর্ব থেকে পাকিস্তানকে বিব্রত করে এসেছে, আজ সেই জাত

শত্রু পাকিস্তানের ধ্বংস পরিকল্পনার চূড়ান্ত মুহূর্তে দিল্লী তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন থেকে পিছু হটে আসবে এমনতো হতে পারে না। একারণে দিল্লী দেশে বিদেশে অন্বেষণ শুরু করল তার মিত্র এবং তার লক্ষ্য অর্জনের শক্তিশালী সঙ্গী।

ওদিকে চীন এবং আমেরিকা সংযমও সমঝোতার পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে পরামর্শ অব্যাহত রাখছিল। কিন্তু এদুটোই ছিল ইয়াহিয়ার নাগালের বাইরে। কারণ ভারত মুক্তি যুদ্ধের তৎপরতা বৃদ্ধি করে দেয়ায় সেনাবাহিনীর উপর হামলা ও অন্তর্ঘাত বৃদ্ধি পেল। এমন বৃদ্ধি পেল যে সেনাবাহিনী সংযম অবলম্বন করার অর্থ হল মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। এমতাবস্থায় সৈনিকদের উপর চাপিয়ে দেয়া ধৈর্য ও সংযম প্রদর্শনের আদেশ উপদেশ কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলল।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণ এশিয়ায় যুদ্ধ এড়ানোর জন্য, পাকিস্তানের গৃহ যুদ্ধ আপোষ রফার জন্য এবং ভারতকে সংযমী হওয়ার জন্য কূটনৈতিক উদ্যোগ নেয়। অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াও রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেন। এ কারণে জুলাই আগস্ট নাগাদ অন্তরীণ মুজিব নতূন এক সমঝোতা প্রক্রিয়ার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হন। সমঝোতার লক্ষ্যে মুজিবের সাথে আলাপ আলোচনা শুরু হল। এই সাথে মার্কিন কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সাথে সংলাপ শুরু হল। ওদিকে দেখা গেল সামরিক ট্রাইবুনালে মুজিবের বিচার শুরু হতে। একে ব্রোহীকে মুজিবের পক্ষের আইনজ্ঞ হিসেবে কাজ করার অনুমতি দেয়া হল। প্রকৃতপক্ষে এটা বর্হিবিশ্বের চোখে ধুলো দেয়ার জন্য একটা সাজান নাটক ছাড়া কিছু ছিলনা। এটা ছিল সমঝোতা প্রয়াসের একটা অংশ। অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলোতে জি ডব্লিউ চৌধুরী একথা লিখেছেন। সমঝোতা প্রয়াস নিয়ে কোলকাতার থিয়েটার রোডের প্রধানমন্ত্রীর সচিবালয় এবং পরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বিরোধিতার কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। প্রধান মন্ত্রী তাজুদ্দিন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী খন্দকার মোশতাক আহমদের মধ্যে ব্যবধান রচিত হয়। গুজব ছড়িয়ে পড়ে খন্দকার মোশতাক আহমদ নাকি গোপনে সি আই এর মাধ্যমে আমেরিকার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। অস্থায়ী সরকারের অলক্ষ্যে আমেরিকার মধ্যস্থতায় তিনি নাকি পাকিস্তান সরকার ও শেখ মুজিবের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে

গ্রহণযোগ্য সমঝোতার উদ্যোগ নিয়েছেন। এতে আওয়ামী লীগের মধ্যপন্থী অংশেরও সমর্থন রয়েছে বলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। ইতোমধ্যে জেনারেল ইয়াহিয়া সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করায় গুজবটা সত্য বলে প্রতীয়মান হল অনেকের কাছে। মুক্তিযোদ্ধা মেজর শরিফুল হক ডালিম তার গ্রন্থে, যা দেখেছি যা বুঝেছি যা করেছি লিখেছেন, 'ইয়াহিয়ার এ ঘোষণাকে কেন্দ্র করে মুজিবনগর সরকারের রাজনৈতিক নেতাদের মাঝে ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি হল, নেতাদের অনেকেই তখন পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ করে কোন দিনই দেশ স্বাধীন করা যাবে কিনা এ বিষয়ে সন্দেহ পোষণ করতেন।

দিল্লী এর সবকিছু যথাসময়ে অনুধাবন করে মোশতাক আহমদকে সরিয়ে আব্দুস সামাদ আজাদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করে। এই সাথে পররাষ্ট্র সচিব মাহবুব আলম চাষীকে তার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। .... চক্রান্তের খবর পেয়ে প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন ভারত সরকারের নির্দেশে এ পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।'

এরপর ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য আরো বেশী তৎপর হয়ে উঠে। সমঝোতার এই মার্কিন উদ্যোগ বেশী দূর এগুতে পারেনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ ছাড় দিতে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও। এ প্রসঙ্গে জি ডব্লিউ চৌধুরী লিখেছেন- তার পর ইয়াহিয়া আমাকে বললেন যে, তিনি তার সর্বশেষ সফলতার জন্য নিক্সনের উপর খুব বেশী নির্ভর করেছেন। তিনি ইরানের শাহের সাহায্যেরও উল্লেখ করেন। যখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম, সম্ভাবনা কতটুকু? তখন তার জবাব ছিল, দুই ব্যক্তি বিরাট বাধার সৃষ্টি করেছে। সেই প্রতারক মহিলা (মিসেস গান্ধী) এবং সেই অসংযত উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি (ভূট্টো)। তিনি স্বীকার করলেন যে, তার প্রথম ভুল ছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পূর্বে মুজিবের কথায় এবং প্রতিশ্রুতিতে তার শর্তহীন বিশ্বাস এবং যখন তিনি ভুট্টোর দিকে ফিরলেন সে ক্ষেত্রেও তিনি নিরাশ হলেন। আমি তাকে মুজিবের চেয়ে ভূট্টোর প্রতি কম তিক্ত দেখলাম না। তিনি বললেন যে, অখণ্ড পাকিস্তানের ধ্বংস সাধনে এবং নিছক ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ভূট্টো মুজিবের চেয়ে কম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন না।

(অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি পৃঃ ১৮৫)

ইয়াহিয়ার সর্বশেষ উদ্যোগ

পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবের সাথে প্রেসিডেন্ট সর্বোচ্চ ছাড় দিয়ে সমঝোতা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পঞ্চমবাহিনীকে সঠিক পথে ফেরান সম্ভব হয়নি। ভারতের কাছে দায়বদ্ধ আওয়ামী লীগ তার দায় পরিশোধে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এ কারণে,প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ভারতের সাথে একটা বোঝাপড়া করে পূর্ব পাকিস্তান সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি পাকিস্তানে নিযুক্ত ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী জয় প্রকাশ অটলের মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর নিকট ৫ দফা শান্তি পরিকল্পনা পেশ করেন। এর মধ্যে ছিল শেখ মুজিবের মুক্তি, বাঙালীর অখণ্ড পাকিস্তানের সাথে থাকতে চায় কিনা সেটা গণভোটের মাধ্যমে নির্ধারণ, অনতিবিলম্বে অন্তবর্তী সরকার হিসেবে সর্বদলীয় সরকার গঠন এবং জাতি সংঘের তদারকিতে ভারত থেকে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের আয়োজন। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী ইয়াহিয়ার এই গণতান্ত্রিক প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলেন নির্মমভাবে। ইন্দিরা ইয়াহিয়াকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, ১৯৭০ সালে গণভোট হয়েছে। নতুন করে গণভোট দরকার নাই। নিঃসন্দেহে এটা ছিল ইন্দিরা গান্ধীর জালিয়াতি। শেখ মুজিবের নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল স্বায়ত্তশাসনের, স্বাধীনতার জন্য নয়। ৭০ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল অখণ্ড পাকিস্তানের ভিত্তিতে।

রুশ ভারত সখ্যতার পটভূমি

সেন্টো সিয়াটোতে পাকিস্তানের যোগ দেয়ার কারণে পঞ্চাশ দশকের পূরোটাই সোভিয়েট ইউনিয়ন পাকিস্তানকে বৈরী রাষ্ট্র হিসেবে বিবেচনা করে এসেছে। ৬০ দশকের শুরু থেকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব পররাষ্ট্র বিষয়ে নিরপেক্ষতা অবলম্বনের কারণে ক্রেমলিন পাকিস্তানের ব্যাপারে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী পোষন করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তার পাকিস্তান বিদ্বেষ কেটে যায়। রাশিয়া পাকিস্তানকে সম্মানিত দক্ষিণ প্রতিবেশী বলে অভিহিত করে।

ইরানের সাথে আমেরিকার মাখামাখি এবং ইরানকে মার্কিন সমরাস্ত্রের ভাণ্ডারে পরিণত করার কারণে রাশিয়া সর্তক হয়ে উঠে। ওদিকে চীনের সাথে রাশিয়ার বিরোধ এবং আমেরিকার সাথে চীনের বৈরী সম্পর্কের বরফ

গলতে থাকায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ব্যাপারে ক্রেমলিন আগ্রহী হয়ে ওঠে। আফগানিস্তান পর্যন্ত রুশ প্রভাব বলয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পাকিস্তানকে প্রভাবিত করে বেলুচিস্তানের গোয়াদর বন্দর পর্যন্ত পৌঁছান সম্ভব হলে ভারত মহাসাগরে আধিপত্য বিস্তার করা রাশিয়ার জন্য সহজ হয়ে পড়বে।

একারণে ১৯৬৯-৭০ সালের দিকে আঞ্চলিক গোষ্টীবদ্ধকরণ পরিকল্পনা এবং এশীয় সম্মিলিত প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন মরিয়া হয়ে ওঠে। এ পরিকল্পনার মূলে ছিল চীনকে বেষ্টন করে রুশ প্রতিরক্ষা ব্যুহ রচনা করা এবং এই অঞ্চলে আমেরিকার উপস্থিতি চ্যালেঞ্জ করা। চীন এবং আমেরিকার সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক নিবিড় থাকার কারণে পাকিস্তান এই পরিকল্পনার সাথে একমত হতে পারেনি। অন্যদিকে ১৯৬৭ সালে ভারতীয় পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীনেশ সিং রাশিয়া সফর করেন এবং ক্রেমলিমের প্রস্তাবটিকে অভিনন্দন জানিয়ে ভারতের পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া দেন। এই সূত্র ধরে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি সম্পূর্ণ ক্রেমলিনমুখী হয়ে ওঠে। এদিকে পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষায় মার্কিন উদ্যোগ আঁচ করে ভারত তার পাকিস্তান খণ্ডিত করার মহাপরিকল্পনায় পাশ্চাত্যের সহযোগিতার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়ে। এ কারণে চীন আমেরিকা বিরোধী পরাশক্তি শক্তি রাশিয়ার পক্ষপটে আশ্রয় নেয় ভারত।

ভারত মহাসাগরে আধিপত্য বিস্তারে রাশিয়ার প্রত্যাশা পূরণে পাকিস্তান ব্যর্থ হওয়ায় ক্রেমলিন পাকিস্তানের প্রতি বৈরী হয়ে ওঠে এবং পাকিস্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। এক পর্যায়ে দুই বৈরি শক্তি ক্রেমলিন ও ভারতের অভিলাষ এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয়। যথা সময়ে দিল্লী ও ক্রেমলিনের মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর হয় যা ছদ্মবেশী সামরিক চুক্তি বলে অভিহিত। এই চুক্তি ভারতকে দুঃসাহসিক করে তুলে। এরপর পূর্ব পাকিস্তানকে মানচিত্র থেকে মুছে ফেলার জন্য যুদ্ধের ঝুকি নিতে বিলম্ব করেনি ভারত।

অষ্টদশ অধ্যায়
স্বাধীনতার দৃশ্যপট

পলাশী যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি এবং পূর্বপাকিস্তানের পতনোত্তর পরিস্থিতির মধ্য পার্থক্য মোটেও ছিল না। পলাশীর যুদ্ধে যারা সক্রিয় ছিল, যারা ইংরেজদের দুরভিসন্ধি আঁচ করে পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে চেয়েছিল, তাদেরকে নিক্ষিপ্ত হতে হয়েছিল মীরজাফরের কারাগারে।

বৃটিশদের নির্দেশ মত অথবা আত্মগোপন করতে হয়েছিল নির্যাতনমূলক উৎকট পরিস্থিতি থেকে আত্মরক্ষার জন্য। সেদিন শুধু তরুণ নবাবকে নির্মমভাবে নিহত হতে হয়নি, স্বাধীনতা ও সংহতির পক্ষে থাকা অসংখ্য দেশপ্রেমিককে আলিঙ্গন করতে হয়েছিল অমানবিক মৃত্যু। সিরাজের লাশ মাড়িয়ে নবাবের কোষাগার লুণ্ঠিত হল- যা ছিল বাংলার জনগণের সম্পদ। সেদিন ছিল পলাশী নাটকের শেষ পরিণতির মূল প্রযোজক বর্ণবাদী হিন্দু চক্র, শিখণ্ডি মীর জাফর ও তার সহগামীদের ঘরে ঘরে উৎকট আনন্দের উচ্ছলতা। হয়তোবা জনগণ ও উল্লসিত হয়েছিল নিছক ক্ষমতার পালাবদল মনে করে। অনুরূপ একই চিত্র আমরা প্রত্যক্ষ করেছি পূর্বপাকিস্তান পতনের পর এই বাংলার প্রতিটি জনপদে।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে পূর্বপাকিস্তানে পাকিস্তানী বাহিনীর পতন পর্যায় থেকে এই অঞ্চলে যেমন সর্বব্যাপী লূণ্ঠন শুরু হল, অন্যদিকে তেমনি চলল হত্যাযজ্ঞ; আওয়ামী পরিভাষায় দালাল নিধন। এদেশী হিন্দু শুধু নয়- হিন্দুস্থানের প্রতিটি ঘরে সেদিন চলছিল দেয়ালীর মহোৎসব। একদিকে ছিল অবারিত উল্লাস অন্যদিকে কারবালার মাতম। চলছিল হত্যাযজ্ঞ, সত্যিকার দেশপ্রেমিকদের উপর নির্মম নিপীড়ন দালাল অপবাদের বোঝা চাপিয়ে। আওয়ামী পান্ডাদের ধর্ষণের দায় চাপিয়ে দেয়া হল সবটুকু পাক বাহিনীর উপর এবং ধর্ষিতাদের বেআব্রু করার জন্য বীরাঙ্গনার তিলক পরিয়ে কলঙ্কিত করা হল এদেশের তরুনীদের। দেশের মাটি আকড়ে থেকে ৯০ শতাংশ জনগণকে রক্ষা করার জন্য যারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হল এবং লুট করা হল তাদের সম্পদ। এদের অধিকাংশ হত্যাযজ্ঞের শিকার হল অথবা নিক্ষিপ্ত হল কারাগারে। কারাগার পূর্ণ করা

হল দেশপ্রেমিকদের দিয়ে আর কারাগারে থাকা ক্রিমিনালরা আওয়ামী লীগের কল্যাণে মুক্ত আলোয় এসে আওয়ামী দুষ্কর্মের সহযোগীতে পরিণত হয়েছিল। একাত্তরের রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে এদের সাথে আওয়ামী লীগের নাড়ীর যোগ অবশ্যই ছিল এবং আজ অবধি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যারা দেশপ্রেমিক, দেশের কল্যাণকামী রাজনীতিক ও সমাজকর্মী- তারা কোন অপরাধে নিপীড়নের শিকার হল? এরা স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি একথায় হয়তো বলা হবে। কিন্তু স্বাধীনতার প্রশ্নে আওয়ামী লীগের সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল কি ছিল না। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ শুরু থেকে শেষ অবধি যে একটা গোলক ধাঁধার মধ্যে অবস্থান করছিল সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আমি এ ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করতে চাই। প্রথমত দেখা যাক আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ওয়াদা কি ছিল? যে ওয়াদার ওপর আস্থা রেখে জনগণ ভোট দিয়েছিল।

নির্বাচনী ওয়াদা ছিল পাকিস্তানের সংহতির সপক্ষে

শেখ মুজিবুর রহমান : "৬ দফা বাস্তবায়িত করা হবে। কিন্তু এর মাধ্যমে ইসলাম অথবা পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না"। (নারায়ণগঞ্জঃ ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭০)

"এই নির্বাচন প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের সপক্ষে গণভোট"। (ঢাকাঃ ২৪ সেপ্টেম্বর; ১৯৭০)

"৬ দফার অর্থ প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার অধিকারকে নিশ্চিত করা"। (সিলেট ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭০)

তাজুদ্দিনঃ "৬ দফা বাস্তবায়নের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির সম্পর্ক খুব বেশী"। (নারায়ণগঞ্জ : ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭০)

এ এইচ এম কামরুজ্জামানঃ জেনারেল সেক্রেটারী নিখিল পাক আওয়ামী লীগঃ "পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য"। (রাজশাহী, ২১ জুন : ১৯৭০)

"পাকিস্তান ভেঙ্গে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা নেই"। (লাহোর, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭০)

খন্দকার মোস্তাক আহমেদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী লীগঃ "শক্তিশালী পাকিস্তানের জন্য দাঁড়িয়েছি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন পাকিস্তানের বুনিয়াদকে শক্তিশালী করবে"। (ফেনী ২০ মার্চঃ ১৯৭০)

স্বাধীনতার জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা হয়নি

৭০ দশকের শেষ দিকে আওয়ামী লীগ লাহোর প্রস্তাবের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু এর মধ্যে স্বাধীনতার প্রচ্ছন্ন ধারণা রয়েছে এমনটি মনে করার যুক্তিসংগত কারণ নেই। তাছাড়া প্রচ্ছন্ন ধারণা দিয়ে স্বাধীনতার মত বিশাল কর্ম সম্পাদনে সমগ্র জাতিকে একই মঞ্চে টেনে আনা যায় না।

লাহোর প্রস্তাবে একাধিক রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে এটা ঠিক, সেখানে পশ্চিম বঙ্গ আসাম নিয়ে একটি জোন বলা হয়েছে। এই অখণ্ড বাংলা একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হবে এতে কায়দে আযমের অসম্মতি ছিল না। হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও বৃটিশদের ষড়যন্ত্রে বাংলাকে খণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হল, তখনই মুসলিম নেতৃবৃন্দ পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৬ সালে গণভোটের মাধ্যমে পাকিস্তানের দাবী স্বীকৃত হলে একই বছরে দিল্লীতে মুসলিম গণপ্রতিনিধি ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সমন্বিত সম্মেলনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উত্থাপিত এক প্রস্তাবে লাহোর প্রস্তাবকে সংশোধন করে এক পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং করা হয় পূর্ব বাংলার নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় এনে। তা না হলে জুনাগড়, হায়দ্রাবাদ, মলভদর, অথবা কাশ্মীরের ভাগ্য বরণ করতে হত এ অঞ্চলকে। গণভোটের মাধ্যমে অর্জিত গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা স্বীকৃত অখণ্ড পাকিস্তান যেটার স্বপক্ষে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা ও শেখ মুজিবের রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করে গেছেন সে সংহতির পক্ষে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ওয়াদা ছিল। যে সংহতির জন্য শেখ মুজিব স্বাধীনতা সংগ্রামকে এড়িয়ে যাওয়ার ঝুকি নিয়েছিলেন সেটা সমুন্নত করার প্রয়াস অপরাধ নয়।

স্বাধীনতার প্রশ্নে আওয়ামী লীগের মধ্যে ছিল অস্বচ্ছতা। এ প্রসঙ্গে আবুল বাসার বলেছেন-

'৭১ সালে যখন আমরা স্বাধীনতার জন্য জনগণকে প্রস্তুতি গ্রহণের কথা বলি, তখন ২৩ মার্চ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পাকিস্তান দিবস পালন করা হয় এবং আমাদেরকে তারা বিচ্ছিন্নবাদী বলে অভিহিত করে।' মেজর জলিল স্পষ্টতই বলেছেন- 'আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ দেশকে স্বাধীন করার কোন চিন্তা ভাবনাই করেননি, শেষ পর্যন্ত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের চিন্তাভাবনা করেছিলেন।'

এ প্রসঙ্গে তৎকালীন আওয়ামী লীগের এমপি জনাব এম এ মোহাইমেন ২৬ মার্চের পরে আগড়তলায় এক দারুণ বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন স্বাধীনতার প্রশ্নে। তিনি এইভাবে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন- 'শ্রমিক কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী প্রমোদ গুপ্তের জেরার মুখে আমি আর কোন উত্তর দিতে পারছিলাম না। তিনি বার বার প্রশ্ন করলেন, আওয়ামী লীগের ৬ দফা আন্দোলনের মূখ্য উদ্দেশ্য কি কার স্বার্থে আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছে? কি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর এটা পরিচালিত হয়েছে। ৬ দফার মানে যখন প্রায় পূর্ণ স্বাধীনতা যা পাকিস্তান সরকার মানতেই পারে না। তেমন অবস্থায় আন্দোলন চালাতে গিয়ে নিরস্ত্র জনসাধারণকে রক্ষার কি ব্যবস্থা আমরা পূর্বহ্নে করেছি এবং না করে থাকলে এ সমস্ত প্রশ্নে তিনি আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন।

... তাই কোন দৃষ্টিকোণ থেকে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল, কি নীতির অনুসরণ করে আমরা বর্তমান অবস্থায় পৌঁছলাম সেই নীতির সারবত্তা ব্যাখ্যা করে আমি অনেক চেষ্টা করেও প্রমোদ দাস গুপ্তকে আমাদের গৃহীত নীতির যৌক্তিকতা বোঝাতে পারলাম না। এ ছাড়া পুরো ব্যাপার আমার নিজের কাছেও কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল'। (বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ পৃঃ ৬৭)

এই কুয়াশা ও ধুয়াশার অস্বচ্ছতাকে যারা আঁকড়ে ধরতে পারেননি বিবেকের তাড়নায় ও ইতিহাসের ইংগিতে যারা নিজস্ব পথ ধরে এগিয়ে ছিলেন তাদেরকে আওয়ামী লীগ দাঁড় করাল আসামীর কাঠগড়ায়। এ প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন- 'মন্ত্রীরা প্রচলিত আইনে

দালালদের শাস্তি দিতে না পারিয়া নিত্য নতুন আইন প্রণয়ন করিতেছেন। ছাত্র তরুণরা এটাকে যথেষ্ট বিপ্লবী না মনে করিয়া দাবি করিতেছেন আদালত-টাদালত আবার কি, ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে ধরা না ধরা দালালদের কাতার বন্দী করিয়া নিপাত কর।'

'সম্ভাব্য দালালদের খোঁজে সরকার ও ছাত্র তরুণরা যে সময় ও অর্থ ব্যয় করিতেছেন, খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ, শান্তি শৃঙ্খলার জন্য ঐ পরিমাণ সময় অর্থ ও শক্তি ব্যয় করিলে ঐসব সমস্যার কিনারা করা যাইত।'

আবুল মনসুর আহমদ আর একটু এগিয়ে বললেন- 'আর জাতীয় ও সর্বদলীয় সরকার করিতে হইলে যারা স্বাধীনতা বিরোধী ছিলেন তাদেরও নিতে হইবে। স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত স্বাধীনতার বিরোধিতা দেশদ্রোহিতা নয়, রাজনৈতিক মত বিভিন্নতা মাত্র। ভারত স্বাধীন হইবার আগে পর্যন্ত অনেক ব্যক্তি ও পার্টি স্বাধীনতার বিরোধিতা ও ইংরেজ সরকারের সমর্থন করিয়াছিলেন। ভারত স্বাধীন ও পাকিস্তান হাসিল হইবার পর ঐ কারণে কেউ দণ্ডিত হয় নাই। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আগের দিন পর্যন্ত বাংলার স্বাধীনতা ও পাকিস্তানের অখণ্ডতা ছিল রাজনৈতিক মতপার্থক্যের প্রশ্ন, এখন সেটা হইয়াছে আনুগত্যের প্রশ্ন। মত বিভিন্নতা দন্ডনীয় নয় আনুগত্যের অভাবই দন্ডনীয়।' (বেশী দামে কেনা কম দামে বেচা/ পৃঃ২২-২৩)

জনাব আব্দুল মোহাইমেনের ভাষায়- 'সবচাইতে দুঃখের ও ক্ষতির কারণ হল তখন, যখন শেখ মুজিব বাংলাদেশ হওয়ার পরই ঘোষণা করলেন, ১৯৪৮ সাল থেকে তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। স্বাধীনতার পর পরই কে কত পাকিস্তান বিরোধী ছিল প্রমাণ করার জন্য যেন একটা মারাত্মক প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছিল। পাকিস্তান বিদ্বেষের পরিণাম তখন যেন স্বদেশপ্রেমের গভীরতার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিল। শেখ মুজিবের সে দিনের উক্তি যে কত অসত্য ও ভিত্তিহীন ছিল ১৯৫৪ এবং ৫৫ সালে শিল্পমন্ত্রী থাকাকালিন তার ১৪ আগস্ট প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির পুরানো রেকর্ড দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। (বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ/পৃঃ ৪০)

স্বাধীনতার প্রথম প্রভাত থেকে আওয়ামী লীগের আত্মঘাতী পদক্ষেপ অরাজনৈতিক বক্তব্য ও হটকারী সিদ্ধান্ত সমগ্র জাতির মধ্যে একটা

ভেদরেখা টেনে দিয়েছে। সম্প্রসারণবাদী দিল্লীর প্ররোচনায় স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষ শক্তি হিসেবে জাতিকে বিভক্ত করে ফেলেছে। একদিকে যেমন জাতি পুনর্গঠনে জনগণের বিরাট অংশকে দালাল হিসেবে চিহ্নিত করে নিষ্ক্রিয় রাখা হল অন্যদিকে অনুরূপ তরুণ সমাজকে পুনর্গঠনের ভাবনা থেকে দুরে সরিয়ে রাখা হল। পাকিস্তান বিরোধী প্রচারণার বিষ বাষ্প ছড়িয়ে পাকিস্তান পন্থী হিসেবে চিহ্নিত করে সত্যিকার দেশপ্রেমিকদের মাঠ থেকে দুরে সরিয়ে রাখা হল সুকৌশলে। এসব করা হল সম্প্রসারণবাদী দিল্লীর প্ররোচনায়।

স্বাধীনতার পর নির্বিচার লুণ্ঠন

একদিকে যখন দেশ প্রেমিকদের ধাওয়া করছে আওয়ামী লীগ অন্যদিকে তখন চলছে লুণ্ঠন। মিত্রবাহিনী ভারতীয় বেনিয়া চক্র দেশী- বিদেশী লুটেরা এককভাবে অথবা যৌথ উদ্যোগে লুণ্ঠন শুরু করল। বাংলার মানুষ আবার দেখল ২১৪ বছর পর লুণ্ঠনের ভায়াবহতা। এ লূণ্ঠণ ১৭৫৭ সালে মুর্শিদাবাদ লুণ্ঠনকে ছাড়িয়ে গেল। লর্ড ক্লাইভ যেমন উমি চাঁদ জগৎশেঠ এবং মীর জাফরের সামনে বাংলার সম্পদ লুট করছিল, অনুরূপ লুট শুরু হল আওয়ামী লীগের স্বাধীন সরকারের সম্মুখে। কারো মুখে কোন কথা নেই। বরং ইন্দিরা গান্ধীর পদমূলে সবকিছু সমর্পণ করার জন্য তারা মানসিকভাবে তৈরী হয়েছিল। প্রতিবাদী হয়ে উঠল সেনাবাহিনীর একজন মেজর, নবম সেক্টরের প্রধান মেজর জলিল, ১৯৭২ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে তাকে গ্রেফতার করা হল। ১১মার্চ ১৯৭২ বৃহত্তর বরিশালের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সেনাবাহিনীর তরফ থেকে মেজর জলিলের মুক্তির আবেদন জানান হয়। কিন্তু পুতুল সরকার ছিল প্রতিক্রিয়াহীন। ভারতের চাপের মুখে মেজর জলিলকে সামরিক আইনে বিচারের হুমকি দেয়া হয়। জনগণ ও সম্মিলিত মুক্তিযোদ্ধাদের চাপের মুখে পুতুল সরকার অবশেষ মেজর জলিলকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। সেই মেজর জলিল ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলার সম্পদ লুণ্ঠনের বিবরণ দিয়েছেন তার এক পুস্তিকায়। তিনি লিখেছেন-

'দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা ডিসেম্বরের পরে মিত্রবাহিনী হিসেবে পরিচিত ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নব্য স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্পদ ও মালামাল লুণ্ঠন করতে দেখেছে। সে লুণ্ঠন ছিল পরিকল্পিত লুণ্ঠন, সৈন্যদের

উল্লাসের বহিঃপ্রকাশস্বরূপ নয়। সে লুণ্ঠনের চেহারা ছিল বীভৎস বেপরোয়া, সে লুণ্ঠন ছিল একটি সচেতন প্রক্রিয়ারই ধারাবাহিক তৎপরতা।

খুলনা শহরে লুটপাটের যে তান্ডব নৃত্য চলেছে তা তখন কে না দেখেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক সেই লুটপাটের খবর চারিদিক থেকে আসছিল। পাকিস্তানী বাহিনী কর্তৃক পরিত্যক্ত গোলাবারুদসহ আরো মূল্যবান জিনসিপত্র ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

যশোর সেনানিবাসের প্রত্যেকটি অফিস এবং কোয়াটার তন্ন তন্ন করে লুট করছে। বাথরুমের মিরর এবং অন্যান্য ফিটিংসগুলো পর্যন্ত সেই লুটতরাজ থেকে রেহাই পায়নি। রেহাই পায়নি নিরীহ পথযাত্রীরা। কথিত মিত্রবাহিনীর এ ধরনের আচরণ জনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল'। (অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা/ পৃঃ ৩৭)

ভারত অথবা আওয়ামী লীগ এই লুণ্ঠনের কথা কখনো স্বীকার করেনি। তবে ১৯৭৪ সালের ১২ মে দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকায় ছোট একটি সংবাদ বেরিয়েছিল। এতে বলা হয়েছিল- ভারত সরকার আড়াইশ' রেলওয়ে ওয়াগণ ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র হিন্দুস্তানের পদলেহি বাংলাদেশের পুতুল সরকার স্থানান্তরিত করিয়াছে। দেরীতে হলেও অমৃত বাজার লুট অথবা লোপাটের কথা স্বীকার করেছে। বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধক্রমে কথাটি যোগ দিয়ে বৈধতার আইনগত ভিত্তি দাঁড় করিয়েছে। যাইহোক বাংলাদেশ সরকার অর্থাৎ তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার তার দায় পরিশোধ করেছে আনুগত্যের উপঢৌকন হিসেবে পাকিস্তানের পরিত্যক্ত অস্ত্র সম্ভার হিন্দুস্থানের হাতে তুলে দিয়ে। দিল্লী তার সামরিক প্রয়োজনে এসব নিয়ে গেছে তাও নয়। বাংলাদেশকে শুধুমাত্র সামরিক দিক দিয়ে পঙ্গু অথবা দুর্বল করে রাখার জন্য এসব করা তার প্রয়োজন ছিল। অলি আহাদ লিখেছেন- ১৯৭১ সালে স্বর্ণের ভরি ১৭১ টাকা মানে অস্ত্রশস্ত্রের দাম ৪৫০ কোটি। বর্তমান স্বর্ণের ভরি ২৫,০০০ টাকা মূল্য মানে অস্ত্রশস্ত্রের দাম ধারায় ৩৬,০০০ হাজার কোটি টাকা। (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫- ৭৫, পৃঃ ৪৩১)

১৬ই ডিসেম্বর পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাত্র দু'সপ্তাহের ব্যাবধানে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নববর্ষ এল। নব বর্ষের প্রথম প্রভাতে মনে হল গঙ্গার পানি উজানে বইছে। বাংলার জনগণের স্বার্থ বিবেচনায় না এনে দিল্লীর মোহরাঙ্কিত মসনদে বসে তাজুদ্দিন দিল্লীকে খুশী

করার জন্য বাংলাদেশের মুদ্রামান হ্রাস করলেন শতকরা ৬৬ ভাগ। একই সাথে ভারতে পাট বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলেন। আওয়ামী লীগের যোগ সাজশে পাট থেকে শুরু করে সোনা কাশা পিতলসহ যাবতীয় মূল্যবান সম্পদ বিদেশে পাচার হয়ে গেল।

ইতোমধ্যে শেখ মুজিব পাকিস্তান থেকে ফিরে এসেই ক্ষমতার হাল ধরলেন। তিনি তখন নিরঙ্কুষ ক্ষমতার মহান অধিপতি, হয়তোবা ভারতের চাপের মুখে এমন কিছু পদক্ষেপ নিলেন যাতে পাচার প্রক্রিয়ায় নতুন মাত্রা যোগ হল। এ সম্পর্কে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা এম এ মোহাইমেন লিখেছেন- '১৯৭২ সালের ২৭ মার্চ দিল্লীকে খুশী করার জন্য শেখ মুজিব ভারতের সাথে অবাধ বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করে। ওপেন বর্ডার ট্রেড আরম্ভ হল এবং অল্প দিনেই এটা বাংলাদেশের অর্থনীতির পক্ষে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা গেল। সীমান্ত শুল্ক ঘাঁটিতে এক পয়সাও জমা থাকলো না। এদিকে লক্ষ লক্ষ মন ধান চাল ও পাট পাচার হয়ে ভারতে চলে গেল। বাধা বিপত্তির ফলে পূর্বে যে প্রকার মাল সীমান্ত অতিক্রম করতো এখন তার দশ বিশ গুণ মাল ভারতে চলে গেল।' (বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ- এম এ মোহাইমেন, পৃঃ ২৩)

এ ব্যাপারে আর একজন প্রবীণ নেতা ও আওয়ামী বুদ্ধিজীবী আবুল মনুসর আহমদ শেখ মুজিবের এই অদূরদর্শী পদক্ষেপ সম্পর্কে লিখেছেন- 'এই সীমান্ত বাণিজ্যের বিধানটা যেন বাংলাদেশের পক্ষ হতে চোখ বন্ধ করিয়া সব করা হইয়াছে। বহু ত্রুটির মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ত্রুটি ১০ মাইল এলাকাকে সীমান্ত আখ্যা দেওয়া। এই চুক্তি যে বিপুল আয়তনের চোরাচালান বিপুল শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে সংঘবদ্ধ হইবার সুযোগ দিয়াছে তার কবজা হইতে বাংলাদেশ আজো মুক্ত হইতে পারে নাই। (আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বছর, পৃঃ ৫৯৮)

এদেশ থেকে ব্যাপক হারে বিরামহীনভাবে সম্পদ পাচার হল। বিনিময়ে এদেশ পেল কিছু কাগজের টুকরো অর্থাৎ জাল নোট, জাল নোটে ছেয়ে গেল দেশ। মুদ্রা পাচারের ভয়াবহতা এত তীব্র হয়েছিল যে সমকালীন অর্থমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন স্বীকার করলেন যে, মুদ্রা পাচারের ফলে জাতীয় অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। এটা হয়েছিল কিভাবে। বাংলাদেশ সরকার তার বন্ধু দেশ ভারতের কাছে ৪২১৬ মিলিয়ন নোট ছাপানোর অর্ডার দেয়। অল্প

দিনের মধ্যে সবাই জানতে পারল ১৫০০ কোটি টাকার জাল নোট বাংলাদেশে চালু রয়েছে। (অমৃত বাজার পত্রিকা ১৩ এপ্রিল ১৯৭৩)। অমৃতবাজার পত্রিকা বলেছে, রিজার্ভ ব্যাংক বাংলাদেশের কর্মকর্তারা ভয় করছেন যে ১২০০ মিলিয়ন ভারতে ছাপা নোট বাংলাদেশে চালু রয়েছে, আর এটা হয়েছে জালিয়াতির কারণে। ভাবতে অবাক লাগে ৪২১৬ মিলিয়নের জায়গায় ১২০০ মিলিয়ন জাল নোট বাংলাদেশের বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে ভারতের নাসিক ছাপনাখানায় যা ছাপার অর্ডার দেয়া হয়েছিল তার তিনগুণ নোট ছাপান হয়েছিল।

দৈনিক ইত্তেফাকের তৎকালিন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আখতার- উল আলম লিখলেন- 'টাকা বদলের নামে বাংলার অর্থনীতিকে ফোকলা করে ফেলা হয়েছিল। বর্ডার বাণিজ্যের নামে বাংলাদেশকে পরিণত করা হয়েছিল ভারতের বস্তাপচা মালামালের বাজারে ও পাটের রাজা বাংলাদেশ হয়ে পড়েছিল পাটহীন। পক্ষান্তরে পাটহীন আগরতলায় স্থাপিত হয়েছিল গোটা পাঁচেক পাটকল। কোলকাতার পাটকলগুলি কয়েক শিফট চালিয়েও কুলাতে পারছিল না।'

দৈনিক ইত্তেফাকে (৫ই মে ৭৩) লেখা হল- 'গত কয়েক বছরে ৪ হাজার কোটি টাকার বিদেশী সাহায্যের জাহাজ চোরা পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়া ডুবিয়া গিয়াছে। অন্যূন ৬ হাজার কোটি টাকার সম্পদ পাচার হইয়া গিয়াছে। চট্টগ্রামগামী ত্রাণ সামগ্রীর জাহাজ অদৃশ্য ইঙ্গিতে কোলকাতার বন্দরে ভিড়তো এবং সেখানেই মাল খালাস হত। পানির দামে বিক্রয়লব্ধ অর্থ জমা হত নেতাদের একাউন্টে।'

শিল্প সেক্টর ধ্বংস করা হল

ভারতের প্রয়োজনে শিল্প সেক্টরকে ধ্বংস করা হল। পরিকল্পিত উপায়ে। ১৭৫৭ সালে সিরাজের পতন পরবর্তী ইতিহাস এবং স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য মোটেও চোখে পড়ে না। বৃটিশ বেনিয়ারা এদেশের শিল্প ছলে বলে কৌশলে ধ্বংস করেছিল বৃটিশ পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্য। তখন কিন্তু রাষ্ট্র ক্ষমতায় বৃটিশরা ছিল না ছিল মীর জাফর। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশের শিল্প ও অর্থনীতি অব্যাহত

ধ্বংসের জন্য ভারতীয়দের থাকার প্রয়োজন হয়নি। শিখণ্ডি ও আশ্রিত সরকারের মাধ্যমে এদেশের সম্পদ লুট করা হয়েছে। এদেশের সন্তানদের দিয়ে এদেশের প্রশাসন দিয়ে শিল্প কারখানাগুলো অচল ও অকেজো করে দেয়া হয়েছে। এসব কিভাবে করা হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করব।

পূর্বপাকিস্তান শতাব্দীকাল ধরে ছিল কোলকাতার পশ্চাৎভূমি কাঁচামাল সরবরাহকারী। এখানে শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়নি কখনো। ফলে দেশ বিভাগের সময় পূর্ব- বাংলায় শিল্প স্থাপনা ছিল শূন্যের কোঠায়। অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী অধ্যুসিত পূর্ব বাংলায় ছিল অদক্ষ জনগোষ্ঠী, শিল্প উদ্যোক্তার সংকট এবং পুঁজির ঘাটতি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা অনুরূপ ছিল না। সেখানে বৃটিশ আমলেই অনেক শিল্প স্থাপনা গড়ে উঠেছিল। ফলে সেখানে ছিল দক্ষ শ্রমিক শিল্প উদ্যোক্তা এবং উদ্ধৃত পুঁজি যা শিল্প নির্মাণের জন্য অতি জরুরী।

দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান আমলে উন্নয়নের সব রকম সুযোগ সুবিধা অবারিত হলে পশ্চিম পাকিস্তানী অথবা ভারত থেকে আগত অবাঙ্গালী মুসলমানরা যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প স্থাপনা গড়ে তুলেছিল অনুরূপ পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প স্থাপনা গড়ে তুলল। নারায়ণগঞ্জে পৃথিবীর বৃহত্তম পাটকল গড়ে তুলেছিল অবাঙালী মুসলমান। এই সাথে শত শত শিল্প কারখানা পূর্ব পাকিস্তানে নির্মাণ করেছিল তারা। পাকিস্তানের নীতি কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে অভ্যন্তরীণ চাহিদা নির্ভর শিল্প স্থাপন দেশে উভয় অংশে গড়ে উঠে। এ কারণে পাকিস্তানের উভয় অংশের শিল্প স্থাপনা ছিল পারস্পরিক পরিপূরক। যেমন পূর্ব পাকিস্তানে ৭০- ৮০টি বড় পাট কল স্থাপিত হলেও পশ্চিম পাকিস্তানে একটি পাটকলও নির্মাণ করা হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের চা শিল্প গড়ে উঠলেও পশ্চিম পাকিস্তানের চা শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা নেয়া হয়নি। এ কারণে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প স্থাপনা ও অর্থনীতি ছিল পারস্পরিক পরিপূরক। অখণ্ড পাকিস্তানের মানচিত্র থেকে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হলে স্বাভাবিকভাবে উভয় অংশ সংকটে পড়ে। স্বাধীনতা- উত্তর বাংলাদেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করতে গিয়ে ওয়াশিংটন পোস্ট লিখেছিল- 'স্বাধীন হবার ফলে বাংলাদেশ শুধু গুরুত্বপূর্ণ অভ্যন্তরীণ বাজারই হারায়নি রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনার

উপযোগী একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা এবং প্রধান প্রধান আমদানি পণ্যের অভ্যন্তরীণ উৎসও হাতছাড়া করেছে।'

এর ফলে যা হবার তাই হল। এ অঞ্চলে আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের সবটুকু ভারত নির্ভর হয়ে পড়ল এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির সব সেক্টর ভারতের শোষণের নাগালের মধ্যে এসে গেল। পাট এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড হওয়ার কারণে পাট শিল্পকে ধ্বংস করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হল সর্বপ্রথম। ভারত বাংলাদেশে তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে পাট শিল্প স্থাপনা ধ্বংসে মারাত্মক কর্ম- কাণ্ড চালাতে সক্ষম হয়েছিল স্বাধীনতার প্রথম পর্যায়ে। প্রথমে তারা পাট বিশেষজ্ঞদের অথবা এ সংক্রান্ত অভিজ্ঞ কর্ম- কর্তাদের প্রতিষ্ঠান ছাড়তে বাধ্য করে। যেমন জিএম করীম ছিলেন আদমজীর জেনারেল ম্যানেজার। তাকে প্রতিষ্ঠান ছাড়তে শুধু বাধ্যই করা হয়নি। ঢাকা ভার্সিটি হলে আটকে রেখে হত্যার উদ্যোগ নেয়া হয়। অথচ এই করীম সাহেবকে জীবনের নিরাপত্তা দিয়ে অতিরিক্ত সম্মানী ও মর্যাদা দিয়ে ভারত তার দেশে বিশেষজ্ঞ হিসেবে নিয়োগ দেয়। এর ফল হল কি? আদমজীর মত বিশাল স্থাপনা রক্ত ক্ষরণ হতে হতে নিঃশেষ হয়ে গেল। পাট শিল্পের উৎপাদন গতি হারাল। এই সাথে হারাল পাট শিল্পের বিশ্ব বাজার। বাংলাদেশ সর্ববৃহৎ পাট উৎপাদনকারী দেশ হয়েও পাটের বিশ্ব বাজার নিয়ন্ত্রণ ভারতের হাতের মুঠোয় এসে পড়ল। আওয়ামী লীগের সাথে গোপন সমোঝতার মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশের পাট বিদেশে রপ্তানীর সুযোগ পেল। পাট শিল্প অচল অথবা নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ায় পাট উৎপাদনকারী চাষীরা এদেশের উৎপাদিত পাট সীমান্তের ওপারে পৌছে দিয়ে এল। পাটের রাজা হয়ে গেল ভারত। পাট শিল্পকে ধ্বংস করার জন্য ৭১টি পাটের গুদামে আগুন লাগান হয়েছিল পরিকল্পিতভাবে। এই অপকর্মের সাথে জড়িত ছিল আওয়ামী নেতারা। শুধুমাত্র ভারতে পাট পাচার করার উদ্দেশ্যে এসব করা হয়েছিল। আওয়ামী আমলের মাত্র কয়েক বছরে ভারতে পাট পাচার হয়েছিল ৫০ লক্ষ বেল। সোনালী আঁশপাট থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেল। রাষ্ট্রায়াত্ব পাটকলগুলো লোকসান গুণতে গুণতে রুগ্ন শিল্পে পরিণত হল। পাটের রাষ্ট্রায়াত্ব সেক্টরে দেনার পরিমাণ দাঁড়াল ২শত কোটি টাকা।

সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার অভাবে দেশের ৮০ শতাংশ চা বাগানের উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেল। বেকার হয়ে পড়ল লক্ষ লক্ষ শ্রমিক। চা থেকে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের পথ রুদ্ধ হল।

তাঁত শিল্পকে ধ্বংস করা হল পরিকল্পিতভাবে ভারতের বাজার সমুন্নত রাখার জন্য। ক্ষমতাসীনদের এবং এই সেক্টরে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অর্থের জোগান দিতে লক্ষ লক্ষ কারিগর বেকার হয়ে পড়ল। চার লাখ হস্তচালিত তাঁতের মধ্যে কোনমতে টিকে রইল দেড় লাখ।

চিনি শিল্প লুটেরাদের আখড়ায় পরিণত হল, চিনিতে স্বনির্ভর দেশকে আমদানী করতে হল ৩২ কোটি টাকার চিনি। এইভাবে চামড়া শিল্পকেও সংকটাপন্ন করে তোলা হল। এইভাবে সার, নিউজ প্রিন্ট, টেক্সটাইল, লবণ, জ্বালানী সব সেক্টর আওয়ামী দুর্নীতিবাজদের কবলে পড়ে কৃত্রিম সংকটের আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে জনজীবনকে বিপন্ন করে তুলল। আট আনা কেজি লবণ খেতে হল ৬০ টাকা কেজি দরে। লবণের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে ভারতীয় লবণে সয়লাব করে দেয়া হল।

বাংলার সম্পদ লোপাট করার জন্য চোরাচালানের দুয়ার উন্মুক্ত করেই ক্ষান্ত হলনা সোনার বাংলার সোনার সন্তানরা। পাকিস্তান ধ্বংস প্রক্রিয়ার মূল উদ্যোক্তা ভারতের দায় পরিশোধ করার জন্য আওয়ামী লীগ শিল্প বাণিজ্য এবং অর্থনীতির সব সেক্টরকে স্থবির করে দিল। এক অদৃশ্য ইংগিতে সোনার বাংলার সোনার সন্তানরা তাদের সোনালী স্বপ্ন বিকিয়ে দিল পানির দরে। মেজর রফিকুল ইসলামের ভাষায়- 'স্বাধীনতার পর কি হল, এক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চলল বাংলার অর্থনীতিকে ধ্বংস করার। উৎপাদন কমে গেল, বেড়ে গেল শ্রমিক অসন্তোষ। অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ বেড়ে গেল। বেড়ে গেল গুপ্ত হত্যা। শিল্প কারখানা ধ্বংস হল। কোন অদৃশ্য অশুভ শক্তি যেন বাংলার মানুষকে নিয়ে রক্তের হোলিখেলায় নেচে উঠল। ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত হল অনেকে। সেই সব সৌখিন দেশপ্রেমিক সবাই মিলে ছারখার করেছিল বাংলার মানুষের স্বপ্নসাধ। চোরাকারবারের লাইন ওরা আগেই ঠিক করে রেখেছিল। পুরোদেশ ছেয়ে গেল অবৈধ ব্যবসায়। প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হল জাদরেল সরকারী কর্মচারী ব্যবসায়ী আর কিছু রাজনৈতিক কর্মী। শক্তিশালী মহলের সমর্থন না হলে এ বিরাট আকারে এ

অবৈধ ব্যবসা সম্ভব নয়। তাহলে কি এ কথা বলা যায় না যে কোন প্রকার প্রভাবশালী মহলের প্রচেষ্টায় ধ্বংস হয়েছে এদেশের অর্থনীতি।'

দেশটা পরিণত হল পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে। সর্বত্র শুরু হল হরিলুট। তৎকালিন আওয়ামী লীগের নীতিজ্ঞানসম্পন্ন নেতা এবং বুদ্ধিজীবী জনাব আব্দুল মোহাইমেন এ প্রসঙ্গে লিখেছেন- দু'দিনেই আরম্ভ হল লুট। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এডমিনিস্ট্রেটর পারচেজ অফিসার ম্যানেজারগণ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক নেতাদের যোগসাজশে প্রায় প্রত্যেকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে লুট করতে আরম্ভ করল। ফলে দফায় দফায় জিনিসের দাম বাড়তে লাগল। এক একটি পাটকল ও বস্ত্রকলে দ্বিগুণ আড়াই গুণ শ্রমিক নিয়োজিত হল। শ্রমিক ভাতার ব্যাপারেও কারচুপির অন্ত রইল না। বহুস্থানে অস্তিত্বহীন শ্রমিকের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা মাহিনা নেওয়া হতে লাগল। পাটকলগুলিতে অপচয় হতে লাগল। সার্বিক অব্যবস্থার ফলে পাটের দর অসম্ভব কমে গেল।

বিশ্ববাজারে আমরা পাটের বাজার হারাতে লাগলাম। সেই স্থান দখল করল ভারত, বস্ত্রশিল্পের ব্যাপারে একই ব্যাপার ঘটেছে। তুলা কেনা ও সুতা বিক্রির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা লুট হল। জাতীয়করণকৃত বস্ত্র কলের এক একজন ম্যানেজারের মাসিক আয় ৫০ হাজারে এসে দাঁড়াল। অধিকাংশ সুতা কালো বাজার মারফত সরকারী মূল্যের উপর বেল প্রতি দেড় থেকে ২ হাজার টাকা অধিক মূল্যে তাঁতীদের হাতে পৌঁছাতে লাগল। বাড়ল তাঁতীদের দুর্গতি। জাতীয়করণ করতে গিয়ে জাতীয় অর্থনীতিকে লন্ডভন্ড করে দেয়া হল।' (বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ পৃঃ ১৪)

শেখ মুজিবের সংগ্রামের মূলে যেমন দেশপ্রেম ছিল না অনুরূপ এদেশের মানুষের কড়ির কাঙাল হওয়ার মূলে কোন আকস্মিকতা ছিল না। 'আওয়ামী লীগ জেনে বুঝে সচেতনভাবে জাতিকে স্বর্গের প্রলোভন দেখিয়ে টেনে এনেছিল অনিবার্য ধ্বংসের দিকে। লুণ্ঠনের সব ব্যবস্থা নীল নক্সা তাদের আগে থেকে তৈরী ছিল। তা না হলে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর এর সাথে জড়িতদের দেশ প্রেম উধাও হয়ে যায়, কি করে। তারা আত্মঘাতী ধ্বংসের জন্য উন্মাতাল হয়ে যায়। পাকিস্তান আমলের সমৃদ্ধ প্রাণ চঞ্চল কারখানাগুলোতে আওয়ামী লীগ যেভাবে ধ্বংস ডেকে এনেছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতা এম এ মোহাইমেন। তিনি লিখেছেন- ১৯৭২

সনে অবাঙালীদের পরিত্যক্ত শিল্প কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠনাগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে এনে কোন প্রকার ইনভেন্ট্রী তৈরি না করেই যাকে তাকে পরিচালক বানিয়ে সেগুলি চালাতে দেয়া হল। ইনভেন্ট্রী তৈরী না করে চালাতে দেয়ার দরুন কারখানা চালু করার সময় তৈরি মালের স্টক কত ছিল তা জানবার উপায় রইল না। ফলে আরম্ভ হল লুট। তখন এক একটি কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কোটি কোটি টাকার তৈরি মাল ছিল। একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশব্যাপী যুদ্ধ চলার দরুন উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রি সম্ভব না হওয়ার কারণে বহু কারখানাতে প্রচুর উৎপাদিত মাল জমা হয়েছিল। ৭২ সালের প্রথম থেকেই এসব মাল লুট হতে আরম্ভ হল। লুট প্রথমে আরম্ভ করল ১৬ ডিভিশনের নামে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধারা। তারপর আরম্ভ করল পরিচালনায় যারা নিয়োজিত হয়েছিল তারা এবং তাদের সাঙ্গ পাঙ্গরা। এত সম্পদ বাঙালী যুবকরা কখনো এক সাথে দেখেনি। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই লুটের একটি সর্বগ্রাসী বন্যায় তলিয়ে গেল দেশ। সে বন্যায় কোথায় ভেসে গেল বাঙালী যুবকদের দেশপ্রেম, মূল্যবোধ, স্বাধীনতা এবং চেতনা। তারপর আরম্ভ হল লুণ্ঠিত অর্থ নিয়ে কাড়াকাড়ি। (বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ/ পৃঃ ৩২)

শ্রমিক শ্রেণীকে প্রভাবিত করার জন্য মুজিববাদের অবতারণা

শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের উত্থানের মূলে রয়েছে শ্রমিক শ্রেণীর সক্রিয় ভূমিকা। কিন্তু যেভাবে শেখ মুজিব সমগ্র জাতিকে প্রতারিত করেছিলেন অনুরূপ একই পন্থায় প্রতারিত করেছেন শ্রমিক শ্রেণীকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে তিনি সমাজতন্ত্রকে সামনে আনলেও তার নিজের এবং তার দল আওয়ামী লীগের চরিত্র ছিল পুঁজিবাদী। মূলনীতি হিসেবে সমাজতন্ত্রকে বেছে নেয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক শ্রেণীকে প্রতারিত করা যেমন করে ইন্দিরা গান্ধী ভারতের শ্রমিক শ্রেণীকে প্রতারিত করেছিলেন ঠিক অনুরূপ পন্থায় অগ্রসর হলেন শেখ মুজিব। ক্ষমতাসীন হয়েই শেখ মুজিব সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ হিসেবে ঘোষণা করলেন। সত্যিকার সমাজন্ত্রীরা প্রতারক মুজিবকে বিশ্বাস করেনি। কিন্তু ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের প্রত্যাশায় কমিউনিষ্ট পার্টি বলল

মুজিব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রের পাশাপাশি মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার শ্লোগান তুলল। কিন্তু সমাজতন্ত্র কি এ জিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে উঠলে বিশেষজ্ঞ হিসেবে তোফায়েল এগিয়ে এলেন, বললেন- 'আব্রাহাম লিঙ্কন গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা দিয়েছেন কিন্তু সমাজতন্ত্র দিতে পারেননি। কিন্তু মুজিববাদে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র পাশাপাশি অবস্থান করছে। সুতরাং মুজিববাদই বিশ্বের তৃতীয় মতবাদ। সমগ্র জাতিকে তারা মনে করল অন্ধ অর্বাচীন বলে। হিন্দুস্থান প্ররোচিত তথাকথিত জাতীয়তাবাদের অন্ধ আবেগে উন্মাতাল জাতির এটা ছিল প্রাপ্য। ৭২ সালের ৬ জুন শেখ মুজিব সমাজন্ত্রের নতুন সংস্করণ দাঁড় করিয়ে বক্তব্য রাখলেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। বললেন- সমাজতন্ত্র কায়েম করা হবে স্থানীয় অবস্থা ভিত্তিক। এটা ছিল সুবিধাবাদী চরিত্রের উদ্ভট বিশ্লেষণ। এর মধ্যে নিহিত ছিল শুভঙ্করের ফাঁকি। ফল হল বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের যাত্রা শুরু হল খেয়াল খুশী মেজাজ মর্জির আকা- বাঁকা পিচ্ছিল পথ ধরে। ১৯৭২ সালে ১ ফেব্রুয়ারী মুজিববাদকে গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য আওয়ামী লীগের শ্রমমন্ত্রী বললেন- শ্রম শিল্প প্রতিষ্ঠানের ৩০ শতাংশ শ্রমিকদের ৩০ শতাংশ মালিকদের ৪০ শতাংশ থাকবে সরকারের। এটা ছিল তাৎক্ষণিকভাবে মুজিববাদকে জনপ্রিয় করে তোলার মুখরোচক ঘোষণা। সাড়ে তিন বছর একক ও নির্বিরোধ ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় কোন দিনও ঘোষিত দৃষ্টিভঙ্গী কার্যকর করার কোন পদক্ষেপ নেয়নি। ১৯৭২ সাল থেকে ৭৫ পর্যন্ত দুর্নীতির প্লাবন এনে সমৃদ্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেউলিয়া ও ফোকলা করে দেয়া হল। শ্রমিক শ্রেণীর ন্যূনতম অবলম্বন যখন ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে এসে উপনীত হল তখন বাঁচার তাগিদে গণতান্ত্রিক অধিকার ধর্মঘট এবং প্রতিবাদে সোচ্চার হল। আওয়ামী সরকার এর প্রতিক্রিয়ায় ৭২ সালের ২৮ মে ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। বাওয়ানীর শ্রমিকরা আন্দোলন মুখর হয়ে উঠলে সরকার কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করল। রাষ্ট্রপতির নোটে বলা হয়, এ ধরনের তৎপরতা কঠোর হস্তে দমন করা হবে। আওয়ামী লীগের এধরনের গণ বিরোধী পদক্ষেপের জবাবে আওয়ামী লীগেরই অঙ্গ সংগঠন শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক বললেন, মিলটির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান জনৈক এমসিএ। মিল ম্যানেজার এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা চোরা পথে গোপনে লাখ লাখ টাকার সুতা যন্ত্রপাতি ও কাপড় আত্মসাত করে মিল শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। এই অভিযোগের

ব্যাপারে কখনো কোন তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি। তৎকালীন পত্র পত্রিকার পাতায় পাতায় দুর্নীতির অসংখ্য ঠাসা খবর এখনো বিদ্যমান রয়েছে।

এমন কি কোন এক অদৃশ্য সুতার টানে কোন অন্তর্ঘাত নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবার সাহস করেনি আওয়ামী লীগ, যেমন ৭১টি পাটের গুদামে অগ্নি কাণ্ডের কোন প্রতিকার হয়নি। যেমন অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ডে সারখারখানার কন্ট্রোল রুম বিধ্বস্ত হয়ে ৫০ কোটি টাকা ক্ষতি হলে তদন্ত কমিটি একে নাশকতা বলে উল্লেখ করে। এই নাশকতার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে আওয়ামী সরকারের কোন আগ্রহ দেখা যায়নি। ১৯৭২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর শ্রমনীতি ঘোষণা করা হল। বলা হল, শিল্পগুলো শ্রমিক সমবায়ের কাছে বিক্রি করা হবে। ১৯৭৪ সালে এক নির্ভরযাগ্য তথ্যে প্রকাশ হল মিলগুলোতে ২৫ হাজার শ্রমিক অতিরিক্ত রয়েছে। এই অতিরিক্ত শ্রমিক ছিল অদক্ষ দলীয় কর্মী যারা ঠ্যাঙারে বাহিনী হিসেবে কাজ করেছে। শ্রমিক আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য এরা সন্ত্রাস করেছে। ৭২ সালের আগস্টে আদমজীতে সংঘর্ষ বারাবকুন্ডে শতাধিক শ্রমিক খুন, ৭৩ এর এপ্রিলে টঙ্গীতে এ সবের এরাই উদগাতা।

স্বজন প্রীতির প্লাবন

১৯৫৬-৫৭ সালে শেখ মুজিব শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়ে ক্ষমতার প্রভাব খাটিয়ে তিনি তার প্রিয়জন ও পার্টির লোকদের অবৈধ পন্থায় অনেক পারমিট, ব্যাংক লোন, ইনডেন্টিং লাইসেন্স এবং শিল্পকারখানা গড়ে তোলার অনুমোদন দেন। তখনই শেখ মুজিব ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে ব্লাকমার্কেটিং মওজুতদারী এবং আইন বহির্ভূত পন্থায় অর্থোপার্জনের নেশা আওয়ামী নেতা কর্মীদের পেয়ে বসেছিল। এদের কারণে সে সময়ও দুর্ভিক্ষ কড়া নেড়েছিল। অনিয়ম ও অর্থনৈতিক বিশৃংখলা নিয়ন্ত্রণের জন্য সেনাবাহিনীকে মাঠে নামতে হয়েছিল।

তখনকার পূর্বপাকিস্তানে আওয়ামী মূখ্যমন্ত্রী প্রশাসনকে দল নিরপেক্ষ রাখতে চেয়েও মুজিবের কারণে ব্যর্থ হন। মুজিবের প্রশ্রয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে থাকা অপশক্তি দলের সম্মুখ সারিতে এসে পড়ে। নিঃস্বার্থ ও সত্যিকার দেশপ্রেমিকরা ক্রমশ পিছু হটতে থাকে। তখন থেকে শুরু হয় আওয়ামী লীগের অস্ত্রের পথ ধরে এগিয়ে চলা এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী

নেতা হিসেবে শেখ মুজিবের উত্থান। অবশেষে বাহাত্তরে এককভাবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হলে মুজিবও তার দলের সকলের পুরানো অভ্যাসের অনুশীলন ব্যাপকভাবে শুরু হয়। মুজিব নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সবকিছু দলীয় কর্মীদের হাতে তুলে দেয়। দলীয় কর্মীদের ঢালাও চাকুরিতে নিয়োগ, জাতীয়করণকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অর্পণ করে জাতীয় অর্থনীতিকে ধূলিসাৎ করে দেয়া হয়। আওয়ামী নেতা-কর্মীদের প্রায় সকলে মধ্য স্বত্ব ভোগীতে পরিণত হয়। পরিণতিতে দেশটা বিশৃংখল শূন্য ভান্ডে পরিণত হয়। পাকিস্তানী নাগরিকদের ৬০ হাজার বাড়ি ও অন্যান্য পরিত্যক্ত সম্পদ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। লাইসেন্স পারমিট বিলি বণ্টন করা হয় এমন অসংখ্য দলীয় কর্মীদের মধ্যে যাদের ব্যবসার সাথে কোন ধরণের সম্পর্কই ছিল না। ৭৩ সালে ১১ই মে বাণ্যিজমন্ত্রী কামরুজ্জামান জানান, ২৫ হাজার আমদানীকারকদের মধ্যে ১৫ হাজার ভুয়া।

অনুগত স্বজনদের প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে আওয়ামী নেতৃবৃন্দের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হলে শেখ মুজিব অতীষ্ট হয়ে নির্দেশ জারি করলেন, চাকুরিতে নিয়োগ বদলি ও পদোন্নতির জন্য কেউ সুপারিশ করবেন না। এ নির্দেশ কোন কার্যকারী ভূমিকা না রেখে স্বজনপ্রীতির দুয়ারে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো। যেমন ১১মার্চ সিগারেটের পারমিট সংক্রান্ত খবরে বলা হল, বাংলাদেশের টোবাকো কোম্পানীর ২৫ জন ডিষ্ট্রিবিউটর নিয়োগের জন্য কর্তৃপক্ষ ৩ হাজার সুপারিশ পত্র পেয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগের ইসলাম বিদ্বেষ ও মুসলিম বৈরিতা

স্বাধীনতার প্রথম প্রভাত থেকে শুরু হল আওয়ামী লীগের ইসলাম বিদ্বেষ ও মুসলিম বৈরিতা। জাতীয় জীবনের সামগ্রিক অবস্থান থেকে ইসলামকে নির্বাসিত করার সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে কুরআনের আয়াত তুলে দেয়া হল। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে মুসলিম শব্দটি তুলে দেয়া হল। ইসলামিয়া কলেজের নাম রাখা হলো কবি নজরুল কলেজ, জাহাঙ্গীরনগর মুসলিম

বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক আলী আহসান মুঘলদের সাম্রাজ্যবাদী আখ্যায়িত করে বললেন যে, তারা শত শত বছর ধরে বাংলাকে লুট করেছিল। তার মতে, পাকিস্তানীরাও এই কাজ করেছে। ভাইস চ্যান্সেলার হওয়ার পর তিনি অনুরোধ করলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম শব্দটি কেটে দিতে। অনুরোধ কার্যকরী করা হল।

ঢাকা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের মনোগ্রামে লেখা ছিল ইকরা বিসমে রাববেকাললাজি খালাক, সেটাকে বাদ দেয়া হল। ঢাকার ইসলামিয়া কলেজের নামকরণ করা হয় বঙ্গবাসী কলেজ। কিন্তু রাজশাহীর ভোলানাথ হিন্দু একেডেমী হিন্দু একেডেমীই রয়ে গেল। হিন্দু দেবী মনষার প্রতীক শাপলা ফুলকে জাতীয় ফুলে পরিণত করা হয়। বঙ্গ ভঙ্গ রদের প্রেক্ষিতে লেখা রবীন্দ্রনাথের আমার সোনার বাংলা গানটিকে 'জাতীয় সংগীতে পরিণত' করা হল।

যে দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর বাংলাদেশের অস্তিত্ব নির্ভরশীল অথচ এই দ্বিজাতি তত্ত্বের মৃত্যু ঘোষণা করল আওয়ামী লীগ। দ্বি- জাতি তত্ত্বের মৃত্যুর অর্থ কি দাঁড়াল? অখণ্ড ভারতের মধ্যে লীন হয়ে যাওয়া। এই সহজ কথাটা কি আওয়ামী লীগের বিজ্ঞ রাজনীতিকরা বোঝেন না? বোঝেন ঠিকই। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য সুতোর টানে বিবেক- বুদ্ধি দীল দেমাগ শৃংখল পরিহিত হয়ে পড়েছে। আওয়ামী লীগের তর্জন গর্জনের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে এক ধরণের অসহায়ত্ব, চিন্তাশীলরা এটা অনুভব করেন।

রাজাকার আলবদরের নামে ইসলাম প্রিয় মানুষদের উপর সীমাহীন নিপীড়ন শুরু হল। বাংলার মানুষ দেখল নিপীড়িত হতে তাদের, যারা সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি এবং যারা ইসলামের প্রতিনিধিত্বকারী। স্বাধীনতার প্রাথমিক পর্যায়ে অধিকাংশ মসজিদ জনমানবহীন হয়ে পড়ল। মুসুল্লিরা মসজিদে যাওয়া বন্ধ করল। মসজিদে আযান দেয়া বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি সালাম বিনিময়ের সাহসটুকুও মানুষের মধ্যে আর রইল না। অনেক মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে গেল। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ইমান আকীদা ও তাহজিব তমুদ্দুনকে পরিকল্পিতভাবে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার প্রচেষ্টা চলল সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে। বাংলাভাষা ও সাহিত্য থেকে ইসলামী শব্দ প্রতিশব্দ ও পরিভাষাকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা চলল। ইতিহাসকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন শুরু হল। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে ধর্ম নিরপেক্ষতা আনা হল। আর ধর্ম

নিরপেক্ষতার মূল টার্গেট হয়ে দাঁড়াল ইসলাম। সর্বস্তরে সর্ব পর্যায়ে ইসলাম বিরোধিতা চলল সমানে।

কমিউনিস্টরা ইসলাম বিরোধী পদক্ষেপসমূহ কার্যকরী করার ব্যাপারে সহযোগী শক্তি হিসেবে সক্রিয় ছিল। লঘুচেতা মেধা বিবর্জিত আওয়ামী নেতৃত্বের পেছনে বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতা দিতে শুরু করল কমিউনিষ্টরা। তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতায় প্রতিভাবান ও সম্ভাববনাময় তরুণদের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রসমূহ সফর এবং শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল আগামী প্রজন্মকে পথ ভ্রষ্ট করে তোলা। মুজিব ও আওয়ামী লীগের এ ধরনের কর্ম- কাণ্ড তাদের চূড়ান্ত বিপর্যয় ত্বরান্বিত করেছে বলে অনেকের ধারণা। এন্থনি ম্যাসকারেনহাসের ভাষায়- 'মুজিবের পতনের প্রধান কারণ ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা থেকে সরিয়ে দেয়া। ইসলামের মর্যাদার এই অবমাননা অনিশ্চয়তা সূচক প্রমাণিত হয়েছে।

এক হাজার মসজিদের শহর বলে ঢাকা বরাবরই গর্ব করেছে এবং বাঙালীরা ঐতিহ্যগতভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানীদের চেয়ে বেশী ধর্মানুরাগী। অপরদিকে বাঙালী মুসলমানরা উপমহাদেশে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্রের পরিকল্পনা অবিচলিতভাবে সমর্থন করেছিল বলেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল। এই পটভূমিতে মুজিবের অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাংলাদেশের জনগণের বৃহত্তর অংশকে আহত করেছিল।'

বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধ

গণতন্ত্র ও বাকস্বাধীনতার পক্ষে আওয়ামী লীগ সোচ্চার ছিল শুরু থেকেই। ষাটের দশকে আইয়ুব খানের প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স এর বিরুদ্ধে ছিল আওয়ামী লীগ। মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণমুক্ত ও অবাধ করার ব্যাপারে ছিল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ওয়াদা। কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়ে তার নৌকা চালিয়ে ছিল উল্টো দিকে। ক্ষমতাসীন হয়ে আওয়ামী লীগ নতুন করে যে প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স জারি করেছিল সেটা আইয়ুবের অর্ডিন্যন্সের চাইতে জঘন্যতম ছিল। এর মূলে

ছিল আওয়ামী লীগের মানসিক ভীতি। এই মানসিক ভীতিটা ছিল তাদের ব্যর্থতা। রাজনীতির অন্ধগলি চোরাপথ এবং ষড়যন্ত্রের সড়ক ধরে অকল্পনীয় মিথ্যাচার এবং অতি আশাবাদের ফিরিস্তি দিয়ে আওয়ামী লীগের উত্থান। অতঃপর সামান্য সময়ের ব্যাবধানে অকল্পনীয় ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে জনগণের মোহভঙ্গ হয় এবং বারুদে পরিণত হয় সমগ্র দেশ। আওয়ামী লীগ আঁচ করেছিল এ বারুদে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে একটি স্ফুলিঙ্গ। আর অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে থাকে সংবাদপত্র ও বাক স্বাধীনতা। এ কারণেই আওয়ামী লীগ কালাকানুনের বৃত্ত রচনা করে সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছে।

আওয়ামী লীগ সব সময় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বলত, কিন্তু বাস্তবে তাদের আচরণ ছিল স্ববিরোধী। একদিকে যখন আওয়ামী নেতৃবৃন্দ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ব্যাপারে সোচ্চার কণ্ঠ সেই সময় ২২মে সাতক্ষীরায় একজন সাংবাদিকের গ্রেপ্তারের কথা জানা গেল। তার অপরাধ, তিনি একজন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যের সাথে বচসা করেছিলেন। ৭২ সালে ২১ জুন 'হক কথার' সম্পাদককে গ্রেপ্তার করা হয়। ৭ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে দেশ বাংলা অফিস জ্বালিয়ে দেয়া হয়। সাংবাদিক ইউনিয়ন এর জোর প্রতিবাদ জানায়। অক্টোবর (৭২) এক সরকারী নির্দেশে বলা হয়, সরকারী আধাসরকারী স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান বেতার টিভি রাষ্ট্রায়ত্ত প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মতামত প্রকাশের পূর্বে সরকারী অনুমোদন নিতে হবে। পূর্বানুমতি ছাড়া তারা তাদের লেখা কোথাও ছাপাতে পারবে না।

৭২ সালের ২২ ডিসেম্বর তথ্যমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী সংবাদপত্র সেবীদের আশ্বস্ত করে বলেন- 'সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতাতেও সরকার বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করবে না। সরকার এসব সংবাদপত্রের আর্থিক দিকই দেখবে শুধু।' অথচ এ কথা বলার ৯ দিনের মাথায় ঘটল এর বিপরীত ঘটনা।

৭৩ সালের ১ জানুয়ারী প্রেসক্লাবের সড়কে আওয়ামী লীগ সরকার দু'জন ছাত্রকে গুলি করে হত্যা করার প্রেক্ষিতে দৈনিক বাংলা একটি টেলিগ্রাম বের করে। এই অপরাধে দৈনিক বাংলার সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি হাসান হাফিজুর রহমান এবং সম্পাদক তোয়াব খান চাকরিচ্যুত হন। ৪ জানুয়ারী দৈনিক বাংলার শ্রমিক কর্মচারীরা শেখ মুজিবের কাছে

চাকুরিচ্যুত দু'জন সাংবাদিককে চাকুরিতে পুনর্বহালের দাবি জানালে শেখ মুজিব পত্রিকাটি হাতে নিয়ে বলেন- 'আমার কাগজে এসব কি লিখেছ? তোমাদের নীতি প্রেসক্লাবে ফলিও, নিজের ড্রইংরুমে ফলিও, আমার কাগজে এসব চলবে না।' সবাই জানল সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। শেষ অবধি চাকুরিচ্যুত দুই সাংবাদিককে চাকুরিতে বহাল করা হয়নি।

১৩মে, ১৯৭৩ দৈনিক স্বদেশ বন্ধ করে দেয়া হয়। দৈনিক পয়গামের শ্রমিক কর্মচারীরা ঐ একই প্রতিষ্ঠান থেকে দৈনিক স্বদেশ প্রকাশ করতেন।

১৮ জুন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স বলে সরকার নবযুগ সম্পাদককে গ্রেপ্তার করে। এর আগে হক কথা, মুখপত্র, স্পোকসম্যান, লালপতাকা, গণশক্তি প্রভৃতি পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়।

১২ আগস্ট চট্টগ্রামের দেশবাংলা পত্রিকাটিকে সরকারী নির্দেশে জোর করে বন্ধ করে দেয়া হয় এবং এর সম্পাদককে রাষ্ট্রপতির ৫০ নম্বর আদেশ বলে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৪ আগষ্ট আওয়ামী লীগের তথ্যমন্ত্রী বুক উচিয়ে বলেন- 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আওয়ামী সরকারের ঈমানের অঙ্গ।' কি দুঃসহ নির্লজ্জতা। ২৩ নভেম্বর সাপ্তাহিক ওয়েভ পত্রিকাকে আদালতের ইনজাংশন উপেক্ষা করে উচ্ছেদ করা হয়।

২৭ আগস্ট ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বলেন, সত্য প্রকাশে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে। চোরাচালানীদের জন্য রাষ্ট্রপতির ৫০ নং ধারা বলে সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করা চলবে না। এর জবাবে ২৮ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার প্রিন্টিং প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স (রেজিস্ট্রেশন এন্ড ডেক্লারেশন) ৭৩ নামে নতুন আর একটি গণবিরোধী কালাকানুন জারি করে। ১৯ সেপ্টেম্বর অর্ডিন্যান্সটি সংসদে পাস করিয়ে নেয়া হয়। একই সংসদ অধিবেশনে স্পীকার আব্দুল মালেক উকিল বলেন- 'কাউকে নৈতিকতা ও সৌজন্যের পরিপন্থী আলোচনা বা সংবাদ পরিবেশন করতে দেয়া হবে না।' হলিডে সম্পাদক এনায়েতুল্লা খানকে নিয়েও মালেক উকিল খিস্তি খেউর করেন। ২৩ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগের এসব অশালীন উক্তির প্রতিবাদ করে ডিইউজে।

প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে আওয়ামী নেতৃবৃন্দের সকলেই সমস্বরে বলতে থাকেন, ভারতের বিরুদ্ধে কাউকে কথা বলতে দেয়া হবে না। ভারতবিরোধী লেখা প্রকাশের জন্য বিভিন্ন পত্রিকার উপর নিপীড়ন শুরু হয়। সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রকাশের জন্য গণকণ্ঠের উপর বার বার হামলা হতে থাকে।

১৬ জানুযায়ী (১৯৭৪) ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের এক বিবৃতিতে বলা হয়- বিভিন্ন মহলের নিকট হতে সাংবাদিকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, ঘোষিত ও অঘোষিত নানা রকম হুমকির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই বলেই এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সংসদে বিশেষ ক্ষমতা আইন পাস করে আওয়ামী লীগ বিরোধীদল ও ভিন্ন মতপোষণকারী সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী দলনের ব্যবস্থা চূড়ান্ত করে। ১০ ফেব্রুয়ারী ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন এক বিবৃতি প্রকাশ করে বলে, বিশেষ ক্ষমতা আইন পাস করে আওয়ামী লীগ সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর নয়া বিধি নিষেধ আরোপের ব্যবস্থা করেছে।'

এই আইনে সংবাদ প্রকাশে বাধা আরোপসহ যে কোন সংবাদ প্রকাশের জন্য এমনকি এই আইন রচনার পূর্বে প্রকাশিত কোন সংবাদের জন্যও ছাপাখানা মুদ্রাকর প্রকাশক রিপোর্টার এবং সম্পাদকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাবে। এই আইনের শর্তানুযায়ী সরকার দৃশ্য অদৃশ্য সত্য বা মিথ্যা যে কোন সংবাদ আইন শৃংখলাবিরোধী মনে করলে ব্যবস্থা নিতে পারবে।

৭৪ সালের ১৭ মার্চ জাসদের জনসভাকে কেন্দ্র করে দৈনিক গণকণ্ঠ বন্ধ করে দেয়া হয়। গণকণ্ঠ সম্পাদক আল মাহমুদসহ বহু সাংবাদিক কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ২৯ জুন ঢাকার রাস্তায় সাংবাদিকদের ঠেঙান হয়। ১ জুলাই মওলানা ভাসানীর জনসভাকে কেন্দ্র করে গণকণ্ঠ অফিসে আর এক দফা হামলা চালান হয়। পুলিশ অফিসে এসে গণকণ্ঠের ফর্মা ভেঙে দেয়। মওলানা ভাসানীর প্রাচ্যবার্তা ও চট্টগ্রামের ইস্টার্ন একজামিনার বন্ধ করে দেয়া হয়।

১৯৭৩ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিলের জন্য আন্দোলন শুরু করে। ২৮

আগস্ট অর্ডিন্যান্সটি বাতিল ঘোষিত হয়। কিন্তু এরই মধ্যে একটি সংবাদকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামের দৈনিক দেশবাংলাকে বন্ধ করে দেয়া হয়। এ ছাড়াও নিউজপ্রিন্ট ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ করে সংবাদপত্র দলন অব্যাহত রাখা হয়।

সরকার ২৮ জুলাই নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারি করে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে সরকারের আশির্বাদবিহীন সংবাদপত্রগুলো মৃত্যু যন্ত্রণায় ধুঁকতে থাকে। জনৈক বিদেশী সাংবাদিক একটি প্রখ্যাত ম্যাগাজিনে রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে সমালোচনা করার পর স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, রক্ষী বাহিনী বাংলাদেশে সরকারের কাছে প্রিয় আলোচ্য বিষয় নয়। নিরব হুকুম জারি হল, উক্ত সাংবাদিককে পুনরায় বাংলাদেশে ঢুকতে দেয়া হবে না।

তৎকালীন সংবাদপত্র ও বাকস্বাধীনতার নাজুক পরিস্থিতি বর্ণনা করে পত্রিকাটিতে বলা হয়- 'ঢাকায় অবস্থানরত একজন ভারতীয় সাংবাদিক যেমন বলেছেন, ঢাকার বিখ্যাত প্রেসক্লাবে যারা সবরকম বিষয়ে কথা বলতেন এখন তারা শুধু আবহাওয়া কানাডা এসব বিষয়ে কথা বলেন। অভ্যন্তরীণ মতবিরোধ দমন করা ছাড়াও সরকার কঠোর ভাবে সাংবাদিকতা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছেন যা বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তির পক্ষে মোটেও শুভ নয়। হংকং নিউজ ম্যাগাজিনে মুজিবের বিরুদ্ধে লেখার কারণে জনৈক সাংবাদিককে বাংলাদেশের নিউজ এজেন্সী থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

যারা বিদেশী সংবাদপত্রের খবরাদি প্রকাশ করবে তাদের অনুরূপ প্রতিশোধের সম্মুখীন হতে হবে। যেমন হয়েছেন বাংলাদেশে সিভিল লিবার্টির একজন প্রধান আইনজীবী। তিনি সোনার বাংলা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তা মুখরোচক ছিল না। হদিস পাওয়ার পর তাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে।

সংবাদ সম্পর্কিত বাধানিষেধের ফলে বাঙালীরা আহতবোধ করছেন। এ ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বনের সার্থকতা থাকত যদি বাংলাদেশের ভয়াবহ সমস্যার উপশম হত।'

অবশেষে ৭৫ এর ৩ জানুয়ারী জারি করা হল বিশেষ ক্ষমতা বিধি। ২৪ জানুয়ারী (৭৫) ঘোষণা করা হল একদলীয় শাসন। একই বছরের ১৬ জুন জারি করা হল সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিল অধ্যাদেশ। এই একটি অস্ত্র প্রয়োগ করে গণতন্ত্রের অপরিহার্য উপাদান সংবাদপত্রের স্বাধীনতা শুধু

অপহরণই করা হলো না, ৪টি সংবাদপত্র ছাড়া বাকি সব পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল ঘোষণা করা হল। প্রায় ৪ শতাধিক পত্র পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ প্রমাণ করল যে, দলটি আসলে গণবিরোধী। স্বাধীনতার নামে গণতন্ত্রের নামে গণস্বার্থের দোহাই দিয়ে সত্যিকার স্বাধীনতাপিয়াসী জনগণের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে আদিম স্বৈরাচার।

মন্বন্তরের ছোবল

১৭৫৭ সালে সিরাজের পতনের পর শোষণ লুণ্ঠনের মধ্যদিয়ে সমগ্র বাংলা দুর্ভিক্ষাবস্থায় পৌঁছতে সময় লেগেছিল ১৩ বছর- যা বাঙলার ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হিসেবে পরিচিত। এই মন্বন্তরে প্রাণ হারিয়েছিল সমগ্র জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। কিন্তু পূর্ব বাংলার সর্বশেষ মন্বন্তর সংঘটিত হয়েছিল আওয়ামী শাসনের ৩ বছরের মাথায়। এ থেকে আন্দাজ করা যায় কি ধরনের শোষন লুট ও দুঃশাসন চলেছিল শেখ মুজিবের শাসনামলে। ১৯৫৭ সালে আওয়ামী শাসনামলেও দুর্ভিক্ষাবস্থার সূচনা হয়েছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য দিয়ে সেটার মুকাবিলা করা সম্ভব হয়। সেই সময়ও চোরাকারবারি মজুতদার ও মুনাফা খোররা জাতীয় স্বার্থবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছিল আওয়ামী আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে। সেই কট্টর অভিজ্ঞতা সত্বেও আওয়ামী প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে যে ভুল করেছিল বাংলার জনগণ, তারই প্রায়শ্চিত্য করতে হয়েছে জাতিকে চুয়াত্তরের মন্বন্তরে।

পূর্বপাকিস্তানের পতনের পর একাত্তরোত্তর বাংলাদেশে বীভৎস লুণ্ঠন ও নারকীয় সন্ত্রাস চলেছিল এদেশের মানুষ দ্বারা জনগণের মধ্যে এক নবতর সম্ভাবনাময় স্বাধীনতার আবেশ সৃষ্টি করে। সেই আবেশ নিমিত্ত হয়ে সামগ্রিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে সমগ্র জাতি।

১৯৭২ প্রতিটি জনপদে পরিলক্ষিত হয়েছে দ্বিমুখী চিত্র, একদিকে ছিল ভারতের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ছোবল অন্যদিকে চলছিল ভাগ্য বিড়ম্বিত সংখ্যাগুরু জনগণের বেঁচে থাকার লড়াই। মুদ্রাস্ফীতির চাপ, বল্গাহীন শোষণ ও লুণ্ঠনের সাথে পাল্লা দিয়ে পিছিয়ে পড়ছিল খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষগুলো। ৭৪ এর আকালে লক্ষ লক্ষ কঙ্কালসার মানুষ ক্ষুৎপিপাসার

যন্ত্রণা নিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে মহাকালের গর্ভে হারিয়ে গেল। পঞ্চাশের মন্বন্তর ম্লান হয়ে গেছে চুয়াত্তরের কাছে। চুয়াত্তরের আগস্টে বন্যা শুরু হল। এই সাথে শুরু হল মন্বন্তরের মর্মান্তিক কাহিনী। একদিকে চলছিল দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষের হাহাকার করুণ ক্রন্দন, অন্যদিকে তাদেরই মুখের গ্রাস নিয়ে আওয়ামী লুটেরাদের নির্বিকার লুণ্ঠন। লুট-পাট চলে বন্যা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষদের ডাল, চাল খাদ্য সামগ্রী রিলিফ এবং কম্বল নিয়ে।

ডেইলী মেল পত্রিকায় জন পিলজার লিখেছিলেন- 'এই দুর্ভিক্ষের আর একটি ভয়ঙ্কর পরিসংখ্যান হল এই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) এর হিসেব মতে ৫০ লাখ মহিলা আজ নগ্ন দেহ। পরিধেয় বস্ত্র বিক্রি করে তারা চাল কিনে খেয়েছে।'

সরকারী শাসনযন্ত্রের অতি সাবধানতার মধ্যেও ২২ সেপ্টেম্বর ৭৪ বায়তুল মোকাররমে দুই শতাধিক উলঙ্গ, অর্ধ উলঙ্গ নারী পুরুষ অন্ন- বস্ত্রের জন্য মিছিল বের করেছিল। আর এ সময়ে মহাসমারোহে ৫৫ তম জন্মবার্ষিকীতে ৫৫ পাউণ্ড ওজনের কেক কাটেন শেখ মুজিব নিজেই। ২৩ সেপ্টেম্বর সারাদেশে ৪৩০০ লঙ্গরখানা খোলার ঘোষণা করা হয়। এ প্রসঙ্গে ১৩ নভেম্বর প্রকাশিত নিউইয়র্ক টাইমসের এক নিবন্ধে লেখা হল- 'সরকারী পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেছে। কেননা দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের সংখ্যা সরকার অনুমিত সংখ্যার ৩ গুণ বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগস্ট মাসে যখন সরকার লঙ্গরখানা খোলার পরিকল্পনা করেন তখন ধরে নেয়া হয়েছিল যে দেশে আনুমানিক ২০ লাখ লোককে খাওয়ানোর জন্য ৪ হাজার লঙ্গরখানা যথেষ্ট হবে।'

ডেইলি টেলিগ্রাফের পিটারগিল গ্রামবাংলার খেটে খাওয়া মানুষগুলোর অসহায় অবস্থা বর্ণনা করে লিখেন- 'গ্রামবাংলার ছিন্নমূল মানুষেরা আজ ঢাকার পেশাদার ভিখারিতে পরিণত হয়েছে। পিতা শিশুদের নিয়ে রাস্তার চত্বরে নির্জীবের মত বসে আছে আর ফুপিয়ে কাঁদছে।'

দৈনিক ইত্তেফাকের একটি ছবিতে গ্রাম বাংলার দুর্ভিক্ষাবস্থার চিত্র প্রকট হয়ে প্রকাশ হয়েছে। ছবিটি ছিল কোন এক বাসন্তীর মাছ ধরা জাল দিয়ে লজ্জা নিবারণের প্রয়াস।

দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা আরো প্রকট করে তুলেছিল একটি মর্মান্তিক সংবাদ। সংবাদটিতে বলা হয়, গাইবান্ধা প্লাটফর্মে একজন অসুস্থ মানুষ বমি করলে সেই বমি একজন ক্ষুধার্ত মানুষ ভক্ষণ করে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করে।

আওয়ামী বিরোধীরা তো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকে। অবশেষে আওয়ামী ঘারানার জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীরাও প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। ৮ আগস্ট আবুল ফজলসহ চট্টগ্রামের ৮৪ জন শিক্ষকের বিবৃতি প্রকাশ হয়। এতে বলা হয়- 'জাতির জীবনে দুর্যোগ মোকাবিলার প্রতি এত অনাসক্তি, এত অবজ্ঞা, এত অদ্ভুত রকম ঔদাসীন্য কখনো দেখা গেছে বলে বিশ্বাস হয় না। নিজের প্রতি আস্থাহীন জাতি যে কি পরিমাণ জড় পদার্থে পরিণত হতে পারে, বর্তমান বাংলাদেশ তার জ্বলন্ত উদাহরণ। স্বাধীনতা সংগ্রামের সেই একাত্মতা ত্যাগের সহজ শক্তির সেই প্রচন্ডতা পরবর্তীকালের সিদ্ধান্তহীনতায়, ভুল সিদ্ধান্তে, প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তায় আর গুটি কয়েক লোকের লাগামহীন দুর্নীতির সয়লাবে সব ধুয়ে গেছে। দেশের নেতৃত্বের প্রতি এই জাতীয় দুর্দিনে আমাদের আকুল প্রার্থনা জাতি হিসেবে আমাদের শক্তিতে আস্থাবান হওয়ার পরিবেশ ফিরিয়ে দিন।'

সে সময় শুধুমাত্র খাদ্যশস্যের আকাল ছিল তাই নয়। নিত্য প্রয়োজনীয় সবকিছু দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল। যেমন আট আনা কেজির লবণ ৬০ টাকা হয়েছিল, কাঁচা মরিচের কেজি হয়েছিল ৭০ টাকা। দুর্ভিক্ষের এই সুযোগে লবণ বিক্রি করে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বিশাল অংকের টাকা বাংলাদেশ থেকে হাতিয়ে নিল।

আওয়ামী লীগের দুর্নীতি দুর্গতদের খাদ্য ও রিলিফ সামগ্রী নিয়ে লুটপাটের খণ্ডিত চিত্র বিদেশী পত্রিকা শিকাগো ডেইলি নিউজ (২৩ জুন ৭৫) প্রকাশ করে। এতে লেখা হয়েছিল- 'বিদেশী সাহায্য সামগ্রীর অধিকাংশ বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রি হয়। কম্বল, জামপার, টিনের খাদ্য, গুঁড়া দুধ সবকিছুই ঢাকার দোকানপাটে পাওয়া যায়। একটি দূতাবাসের হিসেব (দূতাবাসটি পশ্চিম দেশীয় নয়)। অনুযায়ী বিদেশী সাহায্যের ১৫ শতাংশেরও কম জনসাধরণের হাতে পৌঁছায়। শেখ মুজিবের ভাগ্নে শেখ মনিকে গত দুর্ভিক্ষের কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জোর দিয়ে বলেন,

দোষ আমাদের সরকারের নয়। দোষ সেসব সরকারের যারা প্রতিশ্রুতি দিয়েও সময়মত খাদ্যশস্য পৌঁছে দেননি। শেখ মনি অবশ্যই উপাদেয় খাবার খায়। স্বাধীনতার পর একজন ক্ষমতাসম্পন্ন যুব রাজনৈতিক নেতা বলেছেন, তিনি দুটি সংবাদপত্রের সম্পাদক, দুটি গাড়ি ও দুটি দখল করা বাড়ির মালিক। মামা মুজিব ক্ষমতায় আসার পর শেখ মনি, যাকে বিদ্রুপকারীরা জাতীয় ভাগ্নে বলে অভিহিত করেন হঠাৎ করে অজস্র টাকার মালিক বনে গেছেন।'

অবশেষে মুজিবের গলাবাজির সম্মোহনী শক্তি যখন অকার্যকর ও নিস্তেজ হয়ে পড়ল, জনগণ যখন মনে করতে শুরু করল মুজিবের বক্তৃতা মানেই দ্রব্যমূল্যের আর একধাপ বৃদ্ধি, তখন তিনি জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য চাতুরীর আশ্রয় নিলেন। প্রথমেই তার আঘাতের লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করলেন তাজুদ্দিনকে, তাকে মন্ত্রীত্ব ও কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে অপসারণ করলেন। মুজিবের ধারণা ছিল তাকে বাদ দিলেই জনগণের আস্থা ফিরে আসবে। কিন্তু লঘু চেতা মুজিবের জনপ্রিয়তার ধস নামা মোটেও কমেনি।

৩০ অক্টোবর লবণ মওজুতের জন্য আওয়ামী এমপি ডাঃ শামসুদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হলে এতে মুজিবের প্রতি জনগণের ধারণার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। জনগণ এটাকে দেখেছে আই ওয়াস হিসেবে। বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজ আবার নড়ে উঠল।

১৯৭৪ সালে ১ নভেম্বর দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় বায়তুল মোকাররমে। এই সমাবেশে মন্বন্তর পরিস্থিতি ও মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ১৭টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয়, এই মন্বন্তরের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতাকে অতিক্রম করছে এবং মন্বন্তর বন্যা অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্টি হয়নি। বরং এটা ছিল শাসক শ্রেণী ও তাদের সহযোগীদের গণবিরোধী নীতি ও কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ পরিণতি। সমাবেশের প্রস্তাবে এই মন্বন্তরকে প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা বলে বর্ণনা না করে একে মন্বন্তর বলে ঘোষণা করার দাবি জানানো হয়। প্রস্তাবে বৈদেশিক সাহায্যের এক শ্বেতপত্র ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানানো হয়।

এই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা শুধু মাত্র জাতীয় অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করেছিল তা না, সামাজিক অবকাঠামো ধসিয়ে দিয়েছিল। বুভুক্ষার যন্ত্রণা নিবারণের জন্য কুলবধু অথবা নিষ্পাপ তরুণীদের অকাতরে দেহ বিক্রি করে খাদ্যোপকরণ সংগ্রহ করতে হয়েছে। বুভুক্ষ জননীরা সন্তানের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতে না পেরে গলাটিপে হত্যা করে নিজ সন্তানকে। সমকালীন ফিনান্সিয়াল টাইম (৬ জানুয়ারী ১৯৭৫) পত্রিকাতে বলা হয়- শুধুমাত্র নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দুর্নীতির মাধ্যমে যে আওয়ামী লীগ দেশকে ধ্বংস করছে তা নয়, ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতি ও গ্রামবাংলার দুর্ভিক্ষ গ্রামের সামাজিক কাঠামোর উপরে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। অনেক জেলায় বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে কৃষকরা তাদের জমি-জিরাত বিক্রি করে খাদ্য কিনতে বাধ্য হচ্ছে। হিসেব করে দেখা গেছে যে, উত্তরাঞ্চলে এক লাখ বিঘা জমি হস্তান্তরের দলিল সম্পাদিত হয়েছে। এসব জমি প্রধানত আওয়ামী লীগের স্থানীয় চাঁইরা সস্তায় কিনে নিয়েছে।'

এত আলোচনার পর ও ৭৪ এর মন্বন্তরের পূর্ণাঙ্গ চিত্র প্রকাশ হয়নি। এখানে যা কিছু বলা হয়েছে এটা মন্বন্তরের খণ্ডিত অসম্পূর্ণ চিত্র। বিষয়টি আলোচনার জন্য গ্রন্থ নয় মহা গ্রন্থের প্রয়োজন হবে। এখানে সেই অবকাশ নেই। তবে বিষয়টির উপর একটি ধারণা আগামী বংশধরদের মনে রেখাপাতের এই আলোচনা যথেষ্ট হবে বলে আমি মনে করি।

এইভাবে শেখ মুজিব ও তার দল অনেক প্রত্যাশার স্বপ্নময় পৃথিবী থেকে গোরস্থানের কিনারে এনে দাঁড় করাল জাতিকে। ১০ লক্ষ মানুষ আওয়ামী দুর্নীতির খেসারত দিল। এক টুকরো রুটির বিনিময়ে দুর্নীতিবাজ লুটেরাদের যৌন লালসা মেটাতে হল এ দেশের অসংখ্য কুলবধু এবং নিষ্পাপ তরুণীদের, সর্বস্ব হারিয়ে পথে নামতে হয়েছে কত অসংখ্য পরিবারকে। গ্রামবাংলার মেহনতি মানুষের হাতে উঠলো ভিক্ষার ঝুলি। সম্ভাবনাময় অসংখ্য শিশুকে আলিঙ্গন করলো হিমশীতল অকাল মৃত্যু। সর্বনাশা মন্বন্তর ও মহা- আকালে ক্ষুধার্ত মানুষের আর্তনাদে যখন আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল, বেওয়ারিশ লাশে যখন গোরস্থান উপচে পড়েছিল, সেই দুঃসহ দুরবস্থার সময় শেখ মুজিব মহাসমারোহে তার সন্তান শেখ কামালের বিয়ে দিয়েছিলেন, শেখ মুজিব রাজকীয় বিয়ের অনুষ্ঠানে বধু বরণ করেছিলেন হীরকের মুকুট দিয়ে। মহামন্বন্তরে বিপর্যস্ত জাতির সাথে কি

বেদনাদায়ক মস্করা ছিল এটা অথচ একই আর এক দৃশ্য দেখেছি আমরা ষাটের দশকে। তখন পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর ছিলেন শহীদ আব্দুল মোনয়েম খান। খাদ্য সংকট মেটানোর জন্য তখন বিপুল পরিমাণ ভুট্টা আমদানি করা হয়েছিল। গভর্নর বিকল্প খাদ্য হিসেবে ভুট্টাকে খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সে সময় তিনি জগণের প্রতি আহ্বান জানালেন। শুধু বক্তব্য দিয়েই ক্ষান্ত না হয়ে নিজেও ভুট্টাকে খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। গভর্নর মোনয়েম খান তার তৃতীয় কন্যার বিয়েতে অতিথি আপ্যায়ন করেছিলেন ভুট্টার রুটি দিয়ে। কিন্তু এর উল্টো চিত্র দেখেছি মন্বন্তরে দুঃসময়ে বাংলার দরদী 'বঙ্গবন্ধু' শেখ মুজিবকে হীরকের মুকুট দিয়ে বধুবরণ করতে। জাতির সাথে মুজিবের এই নির্লজ্জ তামাশা কোন দিনই ভুলবে না এদেশের মানুষ।

মুজিবের নির্বাচন প্রহসন

'ফার ইস্টার্ন ইকোনমিক রিভিউ'এর ডেভিড হার্ট লিখেছেন- '১৯৭২ সালের জানুয়ারীতে পাকিস্তানী জেল থেকে ফিরে এসে শেখ মুজিব তার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে দেশবাসীর কাছে ৩ বছর সময় চেয়েছিলেন যে সময় তিনি তাদের কিছুই দিতে পারবেন না। হয়তো তাদের অনাহারে অর্ধাহারে থাকতে হবে। এক লক্ষ লোক যারা নেতার বক্তৃতা শোনার জন্য সমবেত হয়েছিল তারা জয়বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধ্বনিতে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল। কিন্তু শুভানুভূতির উল্লাস বছর না যেতে উবে গেল। তারা জানতে চাইল, ক্ষুধা অনাহার জরা পুষ্টিহীনতা এবং রক্ষী বাহিনীর নামে পরিচিত বাছাই করা প্যারামিলিটারী দলের নির্মম দৌরাত্ম্যের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে "৩০ লাখ" লোক প্রাণ দিয়েছিল কিনা।'

বাংলার প্রতিটি মানুষের মনে যখন এ জিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে উঠল তখন মুজিব হয়তো ভেবে থাকতে পারেন যে তিনি নির্বাহী ক্ষমতা হাতে পেলে বাংলার তাবৎ সমস্যার সমাধান করা তার পক্ষে সম্ভব হবে। অথবা আরো বেশী ক্ষমতার মোহ পেয়ে বসেছিল তাকে। প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিনকে সরিয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী হলেন। এতে অবস্থার পরিবর্তন হল না। ক্রম হ্রাসমান আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা আরো দ্রুতগতিতে নিম্নগামী হতে শুরু করল।

ক্ষমতার প্রতি মুজিবের মোহ এবং আকর্ষণ ছিল তার রাজনীতির শুরু থেকে। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হলেন। প্রেসিডেন্ট হয়ে দেখলেন তিনি ঠুটো জগন্নাথ। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এতে তার নিজেকে ছোট মনে হল। তিনি আরো আরো অধিক ক্ষমতার অধিকারী হতে চাইলেন। যে কারণে তাজুদ্দিনকে প্রধান মন্ত্রীত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে হল। সংসদীয় গণতন্ত্রে তিনি প্রেসিডেন্ট হলেও প্রকৃতপক্ষে তার ক্ষমতা ছিল অসীম। ১৯৭১ সালে যেমন তার অঙ্গুলি হেলনে সমগ্রজাতি উঠা বসা করতো, তখনো সেই অবস্থা বর্তমান ছিল। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরও তিনি আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে ব্যর্থ হলেন। জনপ্রিয়তার দ্রুত অবক্ষয় তাকে ভাবিয়ে তুলল। তখনও শেখ মুজিবের ইমেজে ভাটা পড়েনি। তিনি বিজ্ঞ রাজনীতিকের মত নির্বাচন দিলেন। নির্বাচন দিলেন এই কারণে যে তার ইমেজ বর্তমান থাকতে যেন আওয়ামী লীগের ক্ষমতা ৫ বছর বেড়ে যায়। ৭৩ সালের ৭ মার্চ নির্বাচন ঘোষিত হল। নির্বাচনের মুখে ন্যাপ নেত্রী মতিয়া চৌধুরী ৩ মার্চ ঢাকার এক জনসভায় অভিযোগ তুলে বললেন- 'গত এক বছরে অবাধ লুটতরাজ দুর্নীতি স্বজন প্রীতি আর রিলিফ চুরির রেকর্ড ভঙ্গ করে আওয়ামী লীগ এবার বঙ্গবন্ধুকে পুঁজি করে জনতার কাছে ভোট চাইতে এসেছে। একদিকে মুখে গণতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে অন্যদিকে 'আজো আছে জোর লড়াই বঙ্গ বন্ধু অস্ত্র চাই' বলে শ্লোগান দিয়ে আওয়ামী লীগ ভয়- ভীতি প্রদর্শন করছে।'

নির্বাচনে ৩০০টি আসনের ২৯১ টিতে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী ঘোষণা করা হল। ন্যাপ নেতা মোজাফফর আহমদের অভিযোগ হল, কমপক্ষে ৫০টি আসনে ন্যাপ ও অন্যান্য বিরোধী দল প্রার্থীকে পরাজিত করা হচ্ছে কারচুপির মাধ্যমে জোর করে।

মেজর জলিলের অভিযোগ ছিল মারাত্মক। তিনি বলেন- 'নির্বাচনের দিন গণ ভবনেই কন্ট্রোল রুম স্থাপিত হয়েছিল এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করেছেন। বিরোধী দলের প্রার্থীরা যখন ভোট গণনায় এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশেই অকস্মাৎ বেতার টেলিভিশনে এই সকল কেন্দ্রের ফলাফল প্রচার বন্ধ করে দেয়া হয় এবং সন্দেহজনক দীর্ঘ সময় পর নিজেদের পছন্দমত হিসেব অনুযায়ী ভোটের সংখ্যা প্রকাশ

করে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের বিজয়ী ঘোষণা করা হয়। ভাসানী ন্যাপের ডক্টর আলীম আল রাজীও অনুরূপ সরকারের নির্বাচনী কার চুপির কথা জোরে সোরে উচ্চারণ করেছেন। শেখ মুজিবের ইমেজে অবক্ষয় তখনো তেমন হয়নি, এ কারণে আওয়ামী লীগের বিজয় তখনও নিশ্চিত ছিল। এসত্ত্বেও শেখ মুজিব কেন নির্বাচনে কারচুপির আশ্রয় নিয়েছিলেন এটা অনেকের কাছে বিস্ময়কর মনে হলেও কারচুপি করা হয়েছিল এটা নিশ্চিত।'

নির্বাচনে কারচুপি করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এটা প্রমাণ করার জন্য যে, তখনো আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তায় ধস নামেনি। মূলত উদ্দেশ্য ছিল দেশের মানুষকে বোকা বানিয়ে বিশ্ব বিবেককে প্রতারিত করা। এ ছাড়াও ক্ষমতায় থেকে অথবা না থেকে নির্বাচনে কারচুপি করা আওয়ামী লীগের চিরাচরিত অভ্যাস। রাজদণ্ড হাতে নিয়ে এতটুকু না করা আওয়ামী লীগের প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি বিরুদ্ধ। ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯১টি আসন দখল করেও আওয়ামী লীগের ইমেজ ফিরে এলো না। বরং আরো ধস নামা শুরু হল। এমনকি শেখ মুজিবের ইমেজ এবং তার প্রতি মানুষের ভালবাসা শ্রদ্ধার অবক্ষয় শুরু হল তখন থেকেই।

কোলকাতার ফ্রন্টিয়ার পত্রিকায় লেখা হল- 'এটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে যে সরকারের একচ্ছত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেই দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের মোকাবিলা করা যায় না। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের দুঃখ- কষ্ট নব্য শাসকের সৃষ্ট শ্রেণীগত অসঙ্গতির ফল। কিন্তু বাংলাদেশের শাসক ও নব্য শাসকেরা অধিকতর অযোগ্য দুর্নীতিপরায়ণ ও লোভী। এরা রাতারাতি বড় হতে চায়। ধুরন্ধর ব্যক্তি উচ্চাশার টোপ ফেলেছিল যে স্বাধীন বাংলাদেশ অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে এবং সরল মানুষরা তা বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু ভারতীয় হস্তক্ষেপের ফলে যারা বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসীন হল তাদের মত স্বার্থপর নেতৃত্ব কোন দেশে সত্যিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পর আর দেখা যায়নি। দেশটি যে অর্থনৈতিক ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে তা অবশ্যম্ভাবী ছিল। বন্ধু রাষ্ট্রগুলির সাহায্য সহযোগিতা বাংলাদেশের কোন কাজে আসেনি। আরামদায়ক বন্দীদশা থেকে শেখ মুজিব প্রত্যাবর্তনের পর দেশের অবস্থা মন্দ থেকে মন্দতর হয়েছে। হাজার হাজার লোক বন্যা দুর্ভিক্ষ ও বিকৃত গৃহযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। জাঁকজমকের বিভ্রান্তিতে মুজিব যা করেছেন তাতে

তার নিজের এবং তাদের দলের লোক ছাড়া কারো উপকার হবে না। হতে পারে গ্রামবাঙলার কিছু সরলপ্রাণ লোক তাকে জাতির পিতা হিসেবে দেখে আর মনে করে যে একজন ভাল লোক ডিক্টেটরদের হাতে পড়ে গেছে। মুজিব সরল লোকদের এই আবেগের উপর নির্ভর করেছেন।'

বাকশাল গঠন ও গণতন্ত্রের অপমৃত্যু

একাত্তরে মুজিবের প্রতি ভালবাসার যে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়েছিল সেই আবেগ পুনরুদ্ধারের প্রয়াস শেখ মুজিব অব্যাহত রাখা সত্বেও সেটা আর ফিরে এলো না। শেখ মুজিব তার ব্যর্থতাকে ঢেকে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। তার ব্যর্থ নেতৃত্বের ভাবমুর্তিকে ঘসে মেজে জনগণের গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে রাখতে ব্যর্থ হলেন। আওয়ামী নেতৃত্বের বিধিবদ্ধ নিয়ম হল নিজেদের ব্যর্থতাকে অন্যদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া। পাকিস্তান আমলে পাঞ্জাবীও পশ্চিমাদের উপর দোষারোপ করা হয়েছিল। অতঃপর একাত্তরে নিজেদের অপকর্মও চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল পাক সেনাদের উপর। তারপর সব অপকর্মের দায়িত্ব চাপান হল পাকিস্তানের সংহতিতে বিশ্বাসী দল, নেতা ও কর্মীদের ওপর। একাত্তরের পরবর্তীপর্যায়ে রাজনৈতিক দৃশ্যপটে যখন তাদের কেউ অবশিষ্ট রইল না, তখনও তার প্রয়োজন হলো কারো না কারো ওপর দোষারোপ করা। অবশেষে তারা সহকর্মীদের দোষারোপের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করল। চুয়াত্তরের অক্টোবরে শেখ মুজিব তার সব ব্যর্থতা অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং সামাজিক সব বিপর্যয়ের দায় তাজুদ্দিনের কাঁধে চাপিয়ে তাকে দুরাত্মা রূপে চিহ্নিত করলেন। খুব জোরে সোরে প্রচারনা শরু হল তাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে। পর্যবেক্ষক মহল অবাক বিস্ময়ের অপেক্ষা করতে থাকলেন শেখ মুজিবের নতুন কোন পদক্ষেপের দিকে। সেই নতুন নাটক মঞ্চস্থ হতে মোটেও বিলম্ব হলো না।

২৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ উল্লাহ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলেন মুজিবের নির্দেশে। ডেভিড হার্ট লিখেছেন- 'সরকার কী কার্যক্রম গ্রহণ করতে যাচ্ছেন তা জরুরী ঘোষণায় স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তবে জরুরী আইনে ন্যাস্ত স্পেশাল ক্ষমতার বলে শেখ মুজিব ও তার দল যাকে বিপজ্জনক মনে করবেন তাকে জেলে পুরতে পারবেন। আর এভাবে

বাংলাদেশে আজও যতটুকু সরকার বিরোধিতা টিকে আছে তা সমুলে ধ্বংস করে দেয়া হবে।

এই বিশেষ ক্ষমতা আইনের দ্বারা প্রতিপক্ষ বিরোধী দলের ওপর শরু হল গ্রেপ্তারী অভিযান। প্রতিপক্ষের সব কিছু নির্মূল করে রাজ- সিংহাসন নিষ্কন্টক করতে চাইলেন। সিরাজ সিকদারকে গ্রেপ্তার ও হত্যা করা হল। হত্যার পর আঙুল উচিয়ে ক্রুর হাসি হেসে মুজিব সদম্ভে প্রকাশ করলেন আজ কোথায় সিরাজ সিকদার। অস্থায়ী ক্ষমতার দাপটের কি নিষ্ঠুর আনন্দ। কোথায় সিরাজ সিকদার বলার মধ্যে দিয়ে তার প্রতিপক্ষদের জানিয়ে দিলেন মুজিবের বিরোধীতা করার নির্মম পরিণতি। হিতৈশী এক নায়কের লেবাস পরে গণতন্ত্রী মুজিব শহরের গৃহকর্তাদের দেয়ালে অঙ্কিত রাজনৈতিক শ্লোগানগুলো মুছে ফেলার নির্দেশ দিলেন। সকাল ১০টায় সেক্রেটারিয়েটের গেট বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হল। রক্ষী বাহিনীকে ব্যবহার করা হল ঠ্যাঙানোর জন্য। মোসাহেবদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল এক নেতা এক দেশ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ। এই শ্লোগান সম্বলিত প্লাকার্ড ফেষ্টুনে ভেসে গেল দেশ। মুজিবের মুখে অন্তহীন তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। তার ক্ষমতার ক্ষুধা আরো আরো তীব্র হয়ে উঠল। তার তোষামোদকারী পারিষদবর্গ তাকে ক্ষমতা আরো বেশী কুক্ষিগত করার জন্য প্ররোচিত করল। এই কারণে যেন মুজিবকে সামনে রেখে জনগণ এবং জাতীয় সম্পদকে আরো লুট করা সম্ভব হয়। মুজিব ক্ষমতা কুক্ষিতগত করার ব্যাপারে অনেক দূর এগিয়ে গেলেন। রাশিয়ার আদলে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। চাইলেন একারণে যে তিনি ক্ষমতার শীর্ষ বিন্দুতে অবস্থান করে জনগণকে অকটোপাশের মত বেধে রাখতে পারবেন। এ উদ্দেশ্যে ১৯৭৫ সালের ১৮ জানুয়ারী এক দলীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব সংসদীয় দলের সভায় উত্থাপন করা হল। অধিকাংশ সদস্য বিপক্ষে মত প্রকাশ করলেন।

সংসদে বিলটি উত্থাপিত হলে। নূরে আলম সিদ্দিকী বাকশাল গঠনের বিরোধিতা করে ৫৫ মিনিট বক্তৃতা রাখলেন। সংসদ সদস্যরা করতালি দিয়ে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেন। এই বক্তব্যের পর কাউকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেয়া হয়নি। ২০ জানুয়ারী পরের অধিবেশনের শুরুতে মুজিব তার পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন, শামসুল হক দাঁড়ালেন কিন্তু ফ্লোর পেলেন না। মুজিব বললেন, তোমরা আমাকে চাও কি চাও না একথা শুনতে

চাই। মুজিবের বিরোধিতা করার দুঃসাহস তখন কারো ছিল না। এসত্ত্বেও এ বিলের বিরোধীতা করে তিনজন সংসদ সদস্য ওয়াক আউট করেন। আতাউর রহমান খান আগেই বেরিয়ে যান। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন চীফ হুইপ শাহ মোয়াজ্জেম। বিলটি কণ্ঠ ভোটে পাস হয়ে যায়।

২৫ জানুয়ারী দুপুরে এক সংক্ষিপ্ত অধিবেশনে জারীকৃত চতুর্থ সংশোধনীতে বলা হয়- আইন প্রণয়নের অব্যবহিত পর যিনি রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি রাষ্ট্রপতি পদে থাকবেন না। রাষ্ট্রপতি পদ শূন্য হবে। শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হবেন এবং রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণ করবেন এবং উক্ত আইন প্রবর্তন হলে তিনি রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকবেন যেন তিনি এই আইন দ্বারা সংশোধিত সংবিধানের অধীনে নির্বাচিত হয়েছেন।' কি দারুন জালিয়াতি শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের।

২৪ ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবর রহমান এক আদেশ বলে দেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা বাকশাল গঠন করেন এবং নিজেকে চেয়ারম্যান ঘোষণা করেন।

ঘোষণার ৩নং আদেশে বলা হয়, রাষ্ট্রপতি অন্য কোন আদেশ না দেয়া পর্যন্ত জাতীয় সংসদের আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী উপমন্ত্রী সকলেই বাকশালের সদস্য বলে গণ্য হবেন।

২৬ ফেব্রুয়ারী মুজাফফার ন্যাপ এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানায়। ২৫ এপ্রিল আতাউর রহমান খান বাকশালে যোগদান করেন। ৪টি দৈনিকের ছাড়া, ৪শ পত্রপত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষিত হল এ সত্ত্বেও ৯টি দৈনিক ৯জন সম্পাদক বাকশালে যোগদানের জন্য আবেদন পেশ করে তাদের দৈন্যতা ও হীনমন্যতার স্বাক্ষর রাখলেন।

৬ জুন বাকশালের সাংগঠনিক কাঠামো ঘোষণা করা হল। দলের মহা সম্পাদক, তিন জন সম্পাদক এবং ১১৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির নাম ঘোষণা করা হল।

শেখ মুজিব দেশের সব অশুভ শক্তিকে নিজের পক্ষপুটে ধারণ করে বাকশালের কঠিন শৃংখলে বেধে ফেলেন সমগ্র জাতিকে। বাংলাদেশ পরিণত হল গণতন্ত্রের বধ্য ভূমিতে। সুখ আর ঐশর্য্যরে স্বপ্নিল প্রত্যাশা নিয়ে বাংলার মানুষ বন্দী হয়ে পড়ল নিজের জন্মভূমিতে।

ডেইলি টেলিগ্রাফের (২৭ জানুয়ারী ১৯৭৫) পিটার গিল লিখলেন- 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান তার দেশে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু লাথি মেরে ফেলে দিয়েছেন। গত শনিবার ঢাকায় পার্লামেন্টের এক ঘণ্টা অস্থায়ী অধিবেশনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শেখ মুজিবকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছে এবং এক দলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে ক্ষমতার্পণ করেছে। অনেকটা নিঃশব্দে গণতন্ত্রের কবর দেয়া হয়েছে। বিরোধী দল দাবি করেছিল, এ ধরনের ব্যাপক শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ব্যাপারে আলোচনার জন্য তিন দিন সময় দেয়া উচিত। জবাবে সরকার এক প্রস্তাব পাস করলেন যে, এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক চলবে না।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৯ মাস যুদ্ধের পর বিধ্বস্ত কিন্তু গর্বিত স্বাধীন বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিব এমপিদের বললেন যে, পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অবদান। তিনি দেশের স্বাধীন আদালতকে ঔপনিবেশিক ও দ্রুতবিচার ব্যাহতকারী বলে অভিযুক্ত করেন। প্রেসিডেন্ট এখন খেয়াল খুশিমত বিচারকগণকে বরখাস্ত করতে পারবেন। নাগরিক অধিকার বিন্দুমাত্র যদি প্রয়োগ করা হয় তা প্রয়োগ করবে নতুন পার্লামেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত স্পেশাল আদালত।

এক্সিকিউটিভ অর্ডারের মাধ্যমে একটি জাতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন শাসনতন্ত্র মুজিবকে ক্ষমতা দিয়েছে। এটাই হবে দেশের একমাত্র বৈধ পার্টি। যদি কোন এমপি যোগদান করতে নারাজ হন অথবা এর বিরুদ্ধে ভোট দেন, তাহলে তার সদস্যপদ নাকচ হয়ে যাবে। এহেন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ঢাকায় সমালোচনা বোধগম্য কারণেই চাপা রয়েছে। কিন্তু ৩১৫ সদস্যবিশিষ্ট পার্লামেন্টের ৮ জন বিরোধী দলীয় সদস্যের ৫ জনই প্রতিবাদে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। আওয়ামী লীগের ১১ জন সদস্য ভোট দিতে আসেননি। তার মধ্যে ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর নায়ক জেনারেল এম এ জি ওসমানী। শোনা যায় তিনি আওয়ামী লীগ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন। শেখ মুজিবের নিযুক্তি ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে পার্লামেন্ট বছরে মাত্র দু'বার স্বল্প মেয়াদে বসবে। ভাইস প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও কাউন্সিল অব মিনিস্টার এর মাধ্যমে সরকার পরিচালিত হবে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভাইস প্রেসিডেন্ট

এবং মনসুর আলী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন। নতুন প্রেসিডেন্টের যে আদৌ প্রশাসনিক ক্ষমতা নেই গত তিন বছরে যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। তার স্টাইল হচ্ছে ডিক্টেটর স্টাইল।'

রক্ষী বাহিনীর সন্ত্রাস

শেখ মুজিবকে যারা পুতুলের রাজা সাজিয়ে ছিল তারা আশঙ্কা করলো জনগণের সম্মোহন অথবা স্বপ্নের ঘোর এক সময় কেটে যাবে তখন বাংলাদেশকে নিয়ে দিল্লীর যে সুদূর প্রসারী ভাবনা ছিল সেই ভাবনাগুলোর ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে। একারণে পুতুলের রাজা শেখ মুজিবের নিরাপত্তার জন্য তার অন্ধস্তাবকদের নিয়ে একটি শক্তিশালী এলিট ফোর্স গড়ে তোলার উদ্যোগ নিল দিল্লী।

এনায়েতুল্লাহ খান লিখেছেনঃ 'একটি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই এলিট ফোর্স সৃষ্টির ইতিহাস আরো বিচিত্র। মুজিব বাহিনীর নেতৃবৃন্দের পরিকল্পনা অনুযায়ী শেখ মুজিবর রহমানের স্বহস্তে লিখিত পত্রের ওপর ভিত্তি করে এবং তারি উত্তরাধিকারীদের নেতৃত্বে এই রাজনৈতিক বাহিনী গঠন করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, দেরাদুনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এই বিশেষ প্রতিবিপ্লবী সংগঠন জেনারেল ওসমানী পরিচালিত মুক্তিবাহিনী এমন কি তাজুদ্দিনেরও নিয়ন্ত্রণে ছিল না। জনৈক ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল ওবানের প্রত্যক্ষ পরিচালনায় এর সাংগঠনিক কাঠামো এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে একথাই নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সংগে এই বাহিনীর মৌলিক বিরোধ ছিল।'

বিপর্যয়কর অর্থনীতির অতি বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জনগণের আবেগ যখন থিতিয়ে আসে, যখন গণ অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠে তখন মুজিব কেন্দ্রিক পৌত্তলিক রাজনীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য সেই কায়েমী স্বার্থবাদী অশুভ চক্র মুজিববাদী ধূয়া তুলে জনগণের আবেগকে নতুন করে উদ্দীপ্ত করার উদ্যোগ নেয়। অন্যদিকে মোহভঙ্গ আশাহত জনগণের রুদ্ররোষ থেকে নিজেদের এবং পুতুল রাজা শেখ মুজিবকে সুরক্ষার জন্য গড়ে তোলা হয় নতুন নতুন বাহিনী।

সেনাবাহিনী গড়ে তোলার আগ্রহ শেখ মুজিবের কখনো ছিল না, তাছাড়া এ ব্যাপারে দিল্লীর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধে

সেনাবাহিনীর সর্বাধিক অবদান থাকার কারণে এবং তাৎক্ষণিক বিদ্রোহ ও অন্যান্য উটকো বিড়ম্বনা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য সেনা বাহিনীর গঠন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হয়েছিল। মুজিবের লক্ষ্য ছিল সেনাবাহিনীকে ঠুঁটো জগন্নাথ করে রেখে পর্যায় ক্রমে একে অপ্রয়োজনীয় করে তোলা। এ কারণে দিল্লীর পরামর্শে সেনাবাহিনীর একটি সমান্তরাল বাহিনী গড়ে তোলা হল দেরাদুনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দলীয় কর্মীদের নিয়ে। এক বিদেশী সাংবাদিক লিখেছেন,

'ভারতীয় জনৈক সমরনায়কের প্রত্যক্ষ তত্বাবধানে সৃষ্টি হয়েছিল কুখ্যাত নাৎসী বাহিনীর অনুকরণে রক্ষীবাহিনী। আসলে রুশ ভারত চক্রের হাতেই এই রক্ষী বাহিনীর মূল পরিচালনার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু বাইরে বলা হয় শেখ মুজিবের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে এই রক্ষীবাহিনী পরিচালিত।

সর্বোপরি স্বাধীনতার পর থেকেই মুজিব সেনাবাহিনীকে আঘাতের পর আঘাত করে আসছিলেন। শুরু থেকেই ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তি বাহিনীর অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত রক্ষীবাহিনী বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল। রক্ষীবাহিনী একই সঙ্গে প্রেসিডেন্টের প্রহরী, গোয়েন্দা পুলিশ ও বিকল্প সেনাবাহিনী ছিল। আয়ারল্যান্ডের ব্লাক এন্ড টেন্স ও জার্মানীর ব্রাউন শার্টের সঙ্গে এর তুলনা করা যায়।

১৯৭৩ সাল পর্যন্ত রক্ষীবাহিনীতে ভারতীয় উপদেষ্টা ছিল। এরপরেও রক্ষীবাহনীর অফিসাররা ট্রেনিং-এর জন্য ভারতের দেরাদুনে যেত। রক্ষী বাহিনীর সংখ্যা ২০ হাজার দাঁড়িয়েছিল। লক্ষ্য ছিল আরো বেশী।

রক্ষী বাহিনীর সংখ্যার জন্য নয়, যেভাবে সরকার তাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখাত তাতেই সেনাবাহিনী ক্ষুব্ধ হয়েছিল। প্রচুর টাকা খরচ করা হত রক্ষীবাহিনীর ব্যারাক তৈরী করার জন্য। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের বেশীর ভাগই পেত রক্ষীবাহিনী। আর সেনাবাহিনীকে থাকতে হত সেকেলে অস্ত্রপাতি নিয়ে।'

১৯৭৩ সালের ২৭ জুলাই প্রেসিডেন্টকে দেয়া হয় নতুন ক্ষমতা। এই ক্ষমতায় জাতীয় রক্ষী বাহিনীর ডেপুটি লিডার এবং তার উপরস্থ সকল অফিসারকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছাড়া অপরাধ করেছে সন্দেহে যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের অধিকার দেয়া হয়। এর ফলে রক্ষী বাহিনীর দাপট

সীমাহীন হয়ে ওঠে, রক্ষী বাহিনী কর্তৃক গণ নিপীড়নের মাত্রা উত্তরোত্তর বেড়ে চলে। এ সম্পর্কে কোলকাতার ফ্রন্টিয়ার পত্রিকা (ভলিউম বি নং- ২) লিখেছিল- 'বাংলাদেশের রাজনীতি এতটা একদলীয় হয়ে গেছে যে, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্টের অভিযানের অস্ত্র হচ্ছে তার গুপ্ত পুলিশ ও আধা সামরিক মিলিশিয়া রক্ষীবাহিনী। গ্রাম বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এরা ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছে।

ময়মনসিংহ জেলার একটি থানাতেই (নান্দাইল) শত শত তরুণ চাষী ও ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে। এই এলাকার গরীব চাষীদের মধ্যে সিরাজ সিকদারের বিশেষ প্রভাব ছিল এবং গত তিন বছরের শেষেও তারা কার্যত এ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করছে।

প্রতক্ষ্যদর্শীর হিসেব মতে গত জানুয়ারীতে এক ময়মনসিংহ জেলাতে অন্তত এক হাজার পাঁচশ' কিশোরকে হত্যা করা হয়। এরা অনেকেই সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পাটির সদস্য ছিল। অন্যদের মার্কসবাদী ও লেলিনবাদী দলের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। এমন কি অনেক বাঙালী যুবক যারা রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল না তারাও সন্ত্রাস অভিযানে প্রাণ হারিয়েছে। রক্ষীবাহিনী কি করে সিরাজ সিকদার নামাঙ্কিত পোষ্টার পেরেক দিয়ে এটে লাশ সদর রাস্তায় ফেলে দিয়েছে তার বর্ণনা তাদের আত্মীয় স্বজনদের মুখে শোনা যায়। নিষ্ঠুরতার অভাব নেই। যারা সৌভাগ্যবশত রক্ষী বাহিনীর ক্যাম্প থেকে ছাড়া পেয়েছে তাদের মুখে মধ্য যুগীয় অত্যাচার পদ্ধতি অনুসৃত হতে শোনা যায়। অত্যাচারের সাধারণ হাতিয়ার লৌহদন্ড, সূচ, গরম পানি ও অন্যান্য গার্হস্থ সামগ্রী। কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দল সম্পর্কে তথ্য উদঘাটনে এগুলো যথেষ্ট কার্যকরী। তাছাড়া এসব হাতিয়ার প্রয়োগের ফলে শরীরের যে ক্ষতি সাধিত হয় তার জের চলে সারা জীবন।'

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে আইন শৃংখলার অবনতি হয়েছিল চরম। সরকারী হিসেব অনুযায়ী ১৯৭২ সালের জানুয়ারী থেকে ৭৩ সালের জুন পর্যন্ত গুপ্তহত্যা হয়েছে ২০৩৫টি, অপহরণ হয়েছে ৩৩৭টি, ধর্ষণ হয়েছে ১৯০টি, ডাকাতি হয়েছে ৪৯০৭টি এবং আততায়ীর হাতে খুন হয়েছে

৪৯২৫ ব্যক্তি। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনেও শেখ মুজিব সৃষ্ট অপশক্তি, অসূরশক্তি ও অবৈধ অস্ত্র নির্বিচার ব্যবহার হয়েছিল।

এছাড়াও আওয়ামী শাসনামলের সাড়ে তিন বছরে রক্ষীবাহিনী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী, লালবাহিনী, নীলবাহিনী ও অন্যান্য আওয়ামী গুন্ডাদের হাতে ২৭ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। রাজনৈতিক হত্যা হয়েছিল ১৯ হাজার। রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনে পঙ্গু হয়েছিল ২৬শ'। গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল ২ লক্ষ লোক। হাইজ্যাক ও ছিনতাই হয়েছিল ২২ হাজারটি। চুরি ডাকাতি, রাহাজানি ও ছিনতাই হয়েছিল ৬০ হাজারটি। অস্ত্র লুট হয়েছিল ১৫ হাজার। ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল ১৫ হাজার। অবৈধ দখল হয়েছিল শিল্পকারখানা ঘরবাড়িসহ ১৩ হাজার। জমি দখলের পরিমাণ ছিল ৫০ হাজার একর। এই ছিল আওয়ামী দুঃশাসনের কালো অধ্যায়। হত্যা লুট ধর্ষণ ছিনতাই অবৈধ দখল এবং গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল ৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত।

উনবিংশ অধ্যায়

দুঃশাসনের যবনিকাপাত

শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে সোনার বাংলা স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। সেই স্বপ্নের ঘোর কেটেছিল বাংলাদেশের সূচনা পর্বে। হ্যামিলনের বাঁশির সুরে যেমন সম্মোহন ছিল অনুরূপ সম্মোহন ছিল মুজিবের ভাষণে। মুজিব আঞ্চলিকতার আবেশ ছড়িয়ে শোষণ বঞ্চনার কল্প কাহিনী দিয়ে সহজ সরল বাংলার মানুষকে যখন ক্ষুধা দারিদ্র আর সন্ত্রাসের দ্বার প্রান্তে টেনে আনলেন তখনই তাদের সম্মোহন কেটে যায়। কাটলেও নিরূপায় ছিল সকলে। পিছু হটবার সব পথ রুদ্ধ থাকার কারণে শয়তানকে আলিঙ্গন করে জপ করতে হয়েছিল এক নেতা একদেশ বঙ্গ বন্ধু বাংলা দেশ। শেখ মুজিব বাংলার লুণ্ঠিত শোষিত ক্ষুধার্ত মানুষকে দেবতার মত বলেছিলেন, তিন বছর কিছুই দিবার পারুমনা'। কোন বাদ প্রতিবাদ না করে তিন বছর অপেক্ষা করেছিল মানুষ। মুজিব তিন বছর বাংলার মানুষকে দিয়েছিলেন সন্ত্রাস বিশৃংখলা মৃত্যু ও ক্ষুধা। ১০ লক্ষ ক্ষুধিত মানুষ আলিঙ্গন করেছিল মৃত্যুকে। তবুও বাংলার জনগণ তলা বিহীন ঝুড়িকে আঁকড়ে ধরে উত্তম সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু তিন বছর পরে শেখ মুজিব তার সাড়ে সাত কোটি অনুরাগী ভক্তকে কি দিলেন? মুজিব তার জনগণকে সেটাই দিলেন যা একজন আত্মসর্বস্ব নির্মম একনায়ক তার জনগণকে দিয়ে থাকে।

১৯৭৫-এর ২৫ জানুয়ারী পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু লাথি মেরে গুড়িয়ে দিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মাত্র ১৩ মিনিটের মধ্যে শাসনতন্ত্র বদলে দিলেন। বাকশাল গঠন করলেন। রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করলেন। সামরিক বেসামরিক সকলকে বাকশালে যোগদানে বাধ্য করলেন। বাকশালে যোগদান ছাড়া নির্বাচিত এমপিদের সদস্য পদ বাতিল করলেন। সুপ্রিম কোর্টের মৌলিক মানবাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা খর্ব করলেন। স্বাধীন চেতা রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের শায়েস্তা করার জন্য ৬১টি জেলায় গভর্ণর নিয়োগ করলেন বরকন্দাজী করার জন্য। মুজিব দেবতার প্রশংসা করার জন্য বাঁচিয়ে রাখা হল মাত্র চারটি পত্রিকা। ভারতীয় মেজর জেনারেল সুজান সিং উবান পরিচালিত রক্ষী বাহিনীকে শক্তিশালী করা হল জনগণকে

ঠেকানোর জন্য। সেনাবাহিনীকে ঠুঁটো জগন্নাথে পরিণত করা হল। অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক ভাবে বিধ্বস্ত জাতিকে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে শেখ মুজিব মস্কো ও দিল্লীর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য স্বাধীন বাংলার মহান অধিপতির মেকি লেবাস পড়ে ক্ষমতার রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন কিন্তু বেরিয়ে আসার পথ খুলে রাখলেন না।

ফারুক তার বন্ধু রশিদকে নিয়ে অভ্যুত্থানের যে পরিকল্পনা করেন তাতে সম্ভাব্য অভ্যুত্থানের সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল সেপ্টেম্বরের কোন এক সময়ে। কিন্তু অভ্যুত্থান সংঘটিত হল ১ মাস আগে। কিন্তু কেন? এই কেনর উত্তর খুঁজতে হলে ১৫ আগস্টের পূর্বাপর পরিস্থিতির দিকে চোখ ফেরাতে হবে। আমরা সমকালীন সংবাদের দিকে চোখ রাখলে দেখতে পাব বাঙলাদেশ সীমান্তে দুটো ভারতীয় হেলিকপ্টর বিদ্ধস্ত হওয়ার এবং এতে কয়েকজন ভারতীয় জেনারেল নিহত হওয়ার খবর, কেন কি উদ্দেশ্যে জেনারেলরা বাংলাদেশে আসতে চেয়েছিলেন?

ইন্দিরা গান্ধী ২৫ বছর চুক্তির শৃংখলে বাংলাদেশকে আবদ্ধ করেও স্বস্থি পাচ্ছিলেন না। গান্ধী থেকে শুরু করে নেহেরু প্যাটেল সবারই প্রত্যাশা ছিল পাকিস্তান একদা হিন্দুস্থানের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভায়াবল না হওয়ার কারণে সেখানকার জনগণ ভারতে অন্তর্ভুক্তির জন্য দাবী তুলবে। প্রায় দুটো যুগ অতিবাহিত হলেও তেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি কখনো। ভায়াবল নয় এমন ভূখণ্ডকে পাকিস্তান ভায়াবল করে তুলেছিল। এ সত্ত্বেও ভারত পূর্ব পাকিস্তানে পঞ্চমবাহিনীকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ধারাবাহিক শোষণ লুণ্ঠনের মধ্যে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করে। স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশ দিল্লীর প্রত্যাশার কাছাকাছি এসে পৌঁছে। একারণে ১৫ আগস্ট ('৭৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহাসমারোহে আয়োজিত মুজিবের অভিষেক অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে জেনারেলদের পাঠিয়েছিলেন। একটি নতুন পরিকল্পনায় শেখ মুজিবের সম্মতি আদায়ের জন্য। এ পরিকল্পনা অনুসারে বাংলাদেশ ভারতের মানচিত্রের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং বাংলাদেশ হবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশ। মুজিব হবেন ভারতের ভাইস প্রেসিডেন্ট।

কিন্তু মহান আল্লাহ ভারতের দীর্ঘ দিনের চূড়ান্ত পরিকল্পনা গুড়িয়ে দিলেন মুজিবের মর্মান্তিক পরিণতি রচনা করে। কর্নেল ফারুক কতিপয় জানবাজ তরুণদের নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। ভারতের পুরোপরিকল্পনা ভেস্তে গেল। ১৩৩৮ দিন পর পাল্টে গেল ইতিহাসের গতি।

বাংলার সাদ্দাদ শেখ মুজিব নিহত হলেন। তিন জন ভারতীয় জেনারেল লাশ হয়ে ফিরে গেলেন তাদের দেশে। হিন্দুস্থানের সম্ভাব্য গোলামী থেকে নাজাত পেল বাংলাদেশ। ১৫ আগস্ট অভযখ্যানের দিন এক নিবিড় প্রশান্তি এবং আল্লাহর রহমত ও বরকতে আচ্ছন্ন হয়েছিল দেশ। মুহূর্তেই আইন শৃংখলা পরিস্থিতি বাজারের অগ্নি মূল্য সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে গেল। তিন বছর আট মাস ধরে জ্বলন্ত জাহান্নামের আগুনের লেলিহান শিখা নিভে গেল নিমেশে। সেদিন অগ্নি গহ্বরের তীরে দাঁড়িয়ে থাকা জাতি সত্যিকার আযাদীর নিঃশ্বাস ফেলেছিল। ধীকৃত মুজিবের পতনকে ফেরাউনের পতন বলে তখনকার সংসদের স্পীকার আব্দুল মালেক উকিল মন্তব্য করেন লণ্ডনে।

ইন্দিরা রচিত নাটকের শেষ দৃশ্যের মহড়া শরু হল দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের লাশের উপর দিয়ে। শুরু হল বাকশাল গঠনের প্রক্রিয়া। এক নেতা এক দেশ গঠনের প্রস্তুতি চলল সমগ্র জাতিকে ভারতীয় শৃংখলে আবদ্ধ করার জন্য। সেদিন ভারতের বরকন্দাজ ও ঠ্যাঙারে বাহিনীর সম্মুখে সমগ্র জাতি জিম্মি হয়ে পড়েছিল। তখন কোন নেতা ছিল না যে সংকট উত্তরণের জন্য শক্ত হাতে হাল ধরতে পারে; কোন দল ছিল না, যে দল মানুষের সংকটে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে জনগণকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিবে। সমস্ত নেতা, সমস্ত বুদ্ধিজীবী নতজানু হয়ে আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য লাইন ধরে হাজির হয়েছিল মুজিবের দরবারে। আর যাদের মধ্যে ইমানের কিছু মাত্র অবশিষ্ট ছিল তারা আত্মগোপন করেছিল। শাদ্দাদী জুলুম নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার জন্য জাতি তখন দিশাহারা, নির্বাক কণ্ঠ অবরুদ্ধ। সর্বত্র দুঃশাসনের বিভীষিকা। বোবা কান্না ও অশ্রু বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ পরিণতির অপেক্ষায় অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে ছিল দেশের মানুষ। দিল্লীর দোসর ও দালালদের ঘরে ঘরে চলছিল উল্লাস। অদৃশ্যে অবস্থান করে সবকিছুর নিয়ন্ত্রা মহান আল্লাহ কোটি মানুষের নীরব কান্না সেদিন শুনেছিলেন, দিল্লীর প্রযোজনায় নাটকের শেষ দৃশ্য আর মঞ্চস্থ হল না।

পনেরই আগস্ট শেষ রাতে বিদ্যুতের চমক দেখল সমগ্র পৃথিবী। শাদ্দাদের স্বপ্ন ভেঙে খান খান হল। একটা বেদনাদায়ক কলঙ্কিত ইতিহাসের পরিসমাপ্তি হল। নদীর গতি প্রবাহিত হল উল্টো দিকে। শ্বাসরুদ্ধ জনগণ কেবলি নিঃশ্বাস নিতে শুরু করেছে কিন্তু তখনো মুক্ত মানুষগুলোর কণ্ঠ রোধের ষড়যন্ত্রগুলো থেমে থাকেনি। ১৩৩৮ বিনিদ্র রজনীর ধকলে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত জাতি গা ঝাড়া দেয়ার আগেই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ষড়যন্ত্র শুরু হল বঙ্গ ভবন থেকে সেনা ছাওনি পর্যন্ত।

মসনদের মোহ ছিলনা কর্নেল ফারুকের। একটি সফল বিপ্লবের কৃতিত্ব নেয়ার জন্য আত্মপ্রচারের ক্ষীণতম প্রয়াসও তার মধ্যে ছিল না। একজন মোমিন হিসেবে মহান আল্লাহরই সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তিনি বিপ্লবের ঝুকি নিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে জাতির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। কিন্তু চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের দেশে সেটা সম্ভব হল না। সময়ের অভিযানে তাকে সরে যেতে হল দৃশ্যপটের বাইরে।

আগস্ট বিপ্লবের পটভূমি

শেখ মুজিবের বিশ্বাস ঘাতকতা সচেতন বিবেকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। সকলেই বুঝে ফেলেছিল যে শেখ মুজিব সমগ্র জাতিকে স্বর্গীয় সুখের স্বপ্ন দেখিয়ে জাহান্নামের দ্বার প্রান্তে টেনে এনেছে দিল্লীকে সন্তুষ্ট করার জন্য। ৯০ শতাংশ মানুষ নিরূপায় হয়ে নিয়তির উপর নির্ভর করে সন্ত্রাস বিভিষীকা ক্ষুধা ও দারিদ্র্যকে আলিঙ্গন করে বোবার মত নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছিল। বাকী ১০ শতাংশ মানুষ আওয়ামী নৃশংসতাকে সহজ ভাবে গ্রহন করে মুজিববাদী পাশবিকতার সাথে একাকার হয়েছিল সুবিধাবাদী স্বার্থপরের মত। তবে শেখ মুজিবকে উৎখাতের ভাবনাও ছিল অনেকের মধ্যে।

সে সময় শেখ মুজিবকে উৎখাতের অন্তত ৫টি সম্ভাব্য চক্রান্তের তদন্ত শুরু করেছিল তৎকালীন গোয়েন্দা বিভাগ। বাকশালী অক্টোপাশ থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য সচেতন কিছু কিছু গ্রুপ নেপথ্যে তৎপর হয়ে উঠেছিল, যেমন মাওবাদী সর্বহারা পার্টি ও অন্যান্য বাম গ্রুপ, জাসদ এমন কি আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে কিছু রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি। এদের অনেকেই মার্কিন দুতাবাসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু

দূতাবাসের অনীহা অনেককে নিরাশ করেছিল। সবচেয়ে বড় কথা ক্যান্টনম্যান্টে শৃংখলার মধ্যে আবদ্ধ থাকা কতিপয় মেজরের অভ্যুত্থান প্রয়াস কারো রাডারে ধরা পড়েনি।

একাত্তরের বাংলাদেশে শেখ মুজিবের দুঃশাসন এবং সমকালীন ধারাবাহিক শোষণ লূণ্ঠন জুলুম ও অত্যাচারের প্রেক্ষাপটে একজন মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল ফারুকের মধ্যে তার নিপীড়িত নিষ্পেষিত ও ভাগ্যাহত জাতির জন্য এমন এক দারুণ ভাবান্তর হয়েছিল যে, পরিণতির কথা চিন্তা না করে তিনি একা হলেও শেখ মুজিবকে উৎখাতের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন। তার ভাষায়, 'তখনকার বিরাজমান পরিস্থিতি এবং অবলুপ্ত সকল পন্থার প্রেক্ষিতে আমার এবং সকলের সামনে এক কথায় সমগ্র জাতির সামনে শুধুমাত্র একটি পথই খোলা ছিল, আর তা হচ্ছে- শেখ মুজিব যিনি আমাদের জনগণকে এবং জনগণের সকল কোরবাণী আর আশা আকাঙ্খা এবং স্বপ্নকে ভয়ঙ্করভাবে প্রতারণা করেছিলেন, সেই কথিত দেবতাকে ধ্বংস করা, অথবা ধ্বংস সাধনের চেষ্টা করা।'

এন্থনি ম্যাসকারেনহাস এ সম্পর্কে লিখেছেন- 'ইতিমধ্যে সেনাবাহিনীর অফিসারগণ নানা রকমের নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছেন। দেখা গেলো, তাঁরা বহু কষ্টে যে শত শত চোরাচালানী, খুনী এবং ডাকাতদের আটক করছেন, ঢাকা থেকে একটি টেলিফোন এলেই তারা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। এ ছিল এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। ফারুক আমাকে এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, যখনই আমরা কোন দুষ্কৃতকারীকে আটক করি, তখনই দেখা যায়, হয় আওয়ামী লীগের নয়তো আওয়ামী লীগের কোন ক্ষমতাসীন সমর্থকের লোক সে। ফলে উপরওয়ালাদের ইচ্ছে অনুযায়ী এদের ছেড়ে দিতে হতো। বিনিময়ে ঝামেলা পোহাতে হতো আমাদের।'

'এটা ছিল এক ধরনের প্রহসন'- ফারুক বলেছিলেন। ঠিক এই সময়ে সেনাবাহিনীকে বলা হলো নক্সালদের উৎখাত করার জন্যে। এই নির্দেশের পেছনে যার হাত ছিল তিনি শেখ মুজিব। মুজিব আসলে চেয়েছিলেন নক্সালদের নামে সিরাজ সিকদার এবং কর্ণেল জিয়াউদ্দিন প্রমুখদের খতম করতে। ফারুক এ জাতীয় নির্দেশ পালনে উৎসাহী হলেন না।

ফারুক বলেছিলেন- 'আমি মার্ক্সিস্টদের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলাম না। আদর্শগতভাবে তারা হয়তো ভুল পথে ছিল- কিন্তু তারা দেশের খুব বেশি ক্ষতি করেনি।'

একবার টঙ্গীতে মেজর নাসির তিন ব্যক্তিকে আটক করেন। এরা তিনটি খুনের সঙ্গে জড়িত ছিল। নববিবাহিত এক দম্পতি তাদের গাড়িতে টঙ্গী যাওয়ার পথে মোজ্জাম্মেল নামে দুর্ধর্ষ আওয়ামী লীগার ও তার সহকর্মীরা তাদের উপর হামলা চালায়। গাড়ির ড্রাইভার এবং আরোহীকে মেরে তারা মেয়েটিকে ধর্ষণ করে। তিনদিন পর রক্তাক্ত অবস্থায় মেয়েটির মৃতদেহ পাওয়া যায়।

মেজরের হাতে ধৃত এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত মোজাম্মেল মেজর নাসিরকে তিন লক্ষ টাকার বিনিময়ে মুক্তি দেওয়ার অনুরোধ জানায়। কিন্তু নাসের তাদের কোর্টে চালান করেন। কিছু দিন পর তিনটি নৃশংস খুনের আসামী মোজাম্মেলকে জনসম্মুখে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

এই ঘটনাটি সেনাবাহিনীতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ফারুক পরে জানান যে, আমরা তখন নিশ্চিত যে দেশ ধ্বংসের দিকে এগুচ্ছে এবং সে সময় আমি এতো উত্তেজিত হয়ে পড়ি যে তক্ষুণি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি শেখ মুজিবকে না মারা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। আমি তখন ক্যাপ্টেন শরিফুল হক (ডালিম)- কে বলেছিলাম, 'শরিফুল চলো, মুজিবকে খতম করে দেই।' তিনি বলেছিলেন, 'ওই ঘটনার পর প্রমোশন, ক্যারিয়ার এসব ব্যাপারে আমার আর কোন মোহ ছিল না। শেখ মুজিবের প্রতি আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলো। আমার তখন একটাই চিন্তা- কিভাবে এই সরকারকে উৎখাত করা যায়।'

এ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস লিখেছেন- '১৯৭৫ সালের ফ্রেয়ারীর মধ্যেই ফারুকের চূড়ান্ত পরিকল্পনা স্থির হল এবং একটি ক্যুর জন্য তিনি তৈরী হলেন। তখন মেজর রশিদ দেশের বাইরে ছিলেন।'

রশীদ যখন দেশে এলেন তখন ফারুক তাকে বললেন- 'তোমাকে আমার প্রয়োজন। তুমি জাননা ঢাকায় কি ঘটেছে?' দুই বন্ধু তখন শেখ মুজিবকে সরিয়ে দেয়ার দুঃসাহসিক পরিকল্পনার মধ্যে ডুবে গেলেন।'

অভ্যুত্থান পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য শেখ মুজিবের বিকল্প রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েন ফারুক রশিদ।

ফারুক অবশেষে অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে জেনারেল জিয়ার সাথে যোগাযোগ করলে জিয়া পরিষ্কার নেতিবাচক জবাব দিয়েছিলেন। ফারুক আশা করেছিলেন দেশের কোটি কোটি নিরন্ন নিষ্পেষিত হতদরিদ্র নৈরাশ্যে ভেঙে পড়া মানুষের অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষার জন্য দেশের গর্বিত সৈনিকেরা সাগ্রহে এগিয়ে আসবে। কিন্তু বাস্তবে ফারুকের এ প্রত্যাশা ম্লান হতে শুরু করল। ম্যাসকারেনহাস লিখেছেন- 'মেজর হাফিজ এবং কর্ণেল আমিন আহমদ চৌধুরীর মত আরো অনেকে শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিলেন। কার্যত কেউ এগিয়ে এলেন না।'

ফারুক বলেন- 'দেশের দুরাবস্থার দিকে তাকিয়ে আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। নিজের জীবন নিজেদের ভবিষ্যতের ভাবনা আমার মন থেকে একেবারে মুছে গেল। নিজের প্রতি কোন মায়া অবশিষ্ট রইলো না। শেষ পর্যন্ত একা হলেও মুজিবকে উৎখাতের কাজ আমাকেই করতে হবে। সবাই সরে গেলেও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আকাঙ্খা আমার কমলো না, বরং আরো দৃঢ় আরো মজবুত হল। কিন্তু তাৎক্ষণিক কৌশল হিসেবে নীরবতা অবলম্বন করলাম। সামাজিক অনুষ্ঠানে আর পাঁচ জনের মত যাতায়াত শুরু করলাম। যাদের সাথে আমার এ সংক্রান্ত আলাপ হয়েছিল তাদেরকে প্রসঙ্গটি ভুলে যেতে বললাম।

এসবের কোন একটি অভ্যুত্থান অকার্যকর এবং বিফল হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ফারুক ছিলেন নির্বিকার। সীমিত শক্তি নিয়ে পাহাড়ের সাথে টক্কর দেবার দুঃসাহসিক অভিযানের নীলনক্সা যথাসম্ভব নিখুঁত করে তোলার চেষ্টা করলেন। এ প্রসঙ্গে ম্যাসকারেনহাস লিখেছেন- 'ফারুকের ডায়েরীতে উল্লেখ ছিল যে ১৪ আগস্ট রাতে বেঙ্গল ল্যানসার এবং সেকেণ্ড ফিল্ড আর্টিলারীর পরবর্তী ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হবে। দিনটি শুক্রবার। শুক্রবার দিনটি ফারুকের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ তার জন্ম শুক্রবারে। তার জীবনে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে এই দিনে। তিনি বিয়েও করেছেন শুক্রবারে, ধর্মীয় কারণেও শুক্রবার তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি মনে করেন শুক্রবার

এবারও তার জন্য শুভ হবে কারণ ইসলাম ও দেশের স্বার্থে তিনি কাজ করে চলেছেন।'

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট শুক্রবার ভোর চারটা ৪০ মিনিট। সমগ্র ঢাকা নগরী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ফারুকের বাহিনী বাংলার ভাগ্যাহত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে আত্মনিবেদনের জন্য প্রস্তুত। মাত্র ২৮টি ট্যাঙ্ক ১২টি ট্রাক ৩টি জিপ ১০৫টি মি মি হাউইটজার ৪শ' সৈন্য। ফারুক ঢাকার ম্যাপ বিছিয়ে অধিনায়কদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দিলেন। ঘণ্টার কাঁটা ৫ অতিক্রম করল। রাত্রির গাঢ় অন্ধকার ক্রমশ ফিকে হতে শুরু করেছে। সুবে সাদেক সমাগত। মসজিদের মিনার থেকে আযানের ধ্বনি সমস্বরে প্রতিধ্বনি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র ঢাকায়। যেন আযানই ছিল কুদরতের নির্দেশ। ট্যাঙ্কগুলো নড়ে উঠল এগিয়ে চলল অকুতোভয় সৈনিকরা।

অভিযানের মূল নায়ক ফারুকের নির্দেশ মত যে যার দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য নির্ধারিত টার্গেটে পৌঁছে গেল সূর্যোদয়ের আগে। অপারেশন সফল হল। শেখ কামাল জামাল প্রতিরোধ করার কারণে মুজিব সপরিবারে নিহত হলেন। সপরিবারে নিহত হলেন সেরনিয়াবত এবং ফজলুল হক মনি। ৫ টার পর অভিযান শেষ হল। সকাল হওয়ার সাথে সাথে মুজিবের নিহত হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র দেশে। তেরশত আটত্রিশ রজনীর নিকশ অন্ধকারের বুক চিড়ে নতুন একটি সুর্য্যোদয় হয় সে সূর্য্য মুক্তির ১৫ই আগস্টের প্রভাত সমীরাণে নিয়ে এল বসন্তের আমেজ। মুজিব হত্যার সংবাদ সমগ্র দেশে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল। দুর্নীতি ও দুষ্কর্মের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টা ধসে পড়ায় আওয়ামী সন্ত্রাসীদের চিন্তা শক্তি রহিত হল। কিছু বুঝে উঠার আগেই তারা গণ আক্রোষ থেকে বাঁচার জন্য আত্মগোপন করল। রক্ষী বাহিনী হারিয়ে ফেলল মনোবল। অভিযানের প্রথম পর্যায়ে তাদের নিউট্রাল করা সম্ভব হল। উচ্চ পর্যায়ে কিছু কর্মকর্তা ছাড়া সামগ্রিকভাবে সমগ্র সেনাবাহিনী উল্লসিত হল। কোন প্রতিরোধ হলো না কোথাও। মুজিবের জন্য একটি প্রাণীও অশ্রু বিসর্জন করেনি সেদিন। দুপুরে মুজিবের শুন্য স্থান পূরণ করলেন খন্দকার মোস্তাক। সেনা প্রধান বিমান বাহিনী ও নৌবাহিনী প্রধানরা মোস্তাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন। ১৩৩৮ রজনী পর নদীর স্রোত উল্টো দিকে প্রবাহিত হল। বাংলার অবলুপ্ত

ও লুণ্ঠিত স্বাধীনতার পুনরুত্থান হল সেদিনই। দেশের স্থবির রাজনীতি স্পন্দিত হল। বিধ্বস্ত জাতি সত্ত্বার আত্মবিশ্বাস ও দেশপ্রেম পুনর্জ্জীবিত হল।

বাকশাল সরকারের ১৮জন মন্ত্রীর ১০জন এবং প্রতিমন্ত্রীর ৯জনের ৮জনই বিপ্লবোত্তর মোশতাক সরকারে যোগ দিয়ে আগস্ট বিপ্লবের সফল অভ্যুত্থানের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন। অভ্যুত্থানের প্রথম দিনেই পাকিস্তান বাংলাদেশকে সমর্থন দেয়। স্বাধীনতার পর ইসলাম ও ইসলামের সত্যিকার অনুসারীদের প্রতি অব্যাহত নির্যাতনের কারণে সউদী আরব স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলেও ১৫ আগস্ট বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পরের দিন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। চীনও আগস্ট বিপ্লবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করল বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়ে। ২৫ বছরের চুক্তির সুবাদে বাংলাদেশে সেনা অভিযানের বৈধতা থাকা সত্বেও ভারত সে পথে পা বাড়াল না। এর নেপথ্য কারণ ছিল, সে সময় পিকিং বেতার এবং ভয়েস অব আমেরিকা আগস্টের অভ্যুত্থানকে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে ব্যাপক প্রচারণা চালায়। এই সাথে এই হুশিয়ারী উচ্চারণ করে, বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতিতে কোন বিদেশী হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করবে না এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য তারা প্রয়োজনীয় সব রকম পদক্ষেপ নিতে বিলম্ব করবে না। একদিকে ভারতের সম্ভাব্য হামলা প্রতিহত করার জন্য চীন তার সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে, অন্যদিকে পাকিস্তান ও তার সেনাবাহিনীকে সতর্কাবস্থার নির্দেশ দেয়। এসব কারণে দিল্লীকে তার সহযোগী শেখ মুজিবের পতনকে মেনে নিতে হয় কোন রকম প্রতিক্রিয়া না ব্যক্ত করে। অভ্যুত্থানের ১২ দিনের মাথায় জাপান ইরান ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ ৩৬টি রাষ্ট্র মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দেয়।

১৯৭৫ সালের ২২ আগস্ট খন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতির ৯নং আদেশ বাতিল করে এক অধ্যাদেশ জারি করে। দুর্নীতিবাজ রেডক্রস চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফাকে তার দায়িত্ব থেকে অপসারণ করে বিচারপতি বি এ সিদ্দিকীকে তার পদে নিযুক্ত করা হয়। একই দিনে দৈনিক ইত্তেফাককে তার মালিকদের নিকট হস্তান্তর করা হয়। সমস্ত পত্র পত্রিকা থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ২৪ আগস্ট জেনালের ওসমানীকে রাষ্ট্রপতির নয়া সামরিক উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয় একই দিনে ভাসানী ন্যাপের মশিউর রহমান এবং জাতীয় লীগের অলি আহাদকে মুক্তি দেয়া

হল। মেজর জেনারেল খলিলুর রহমানকে জয়েন্ট চীফ অব ডিফেন্স এবং মেজর জেনারেল সফিউল্লাহর স্থলে জেনালের জিয়াউর রহমানকে আর্মী চীফ অব স্টাফ হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। বিমান বাহিনীর চীফ অব স্টাফ হিসেবে নিযুক্ত হন এয়্যার ভাইস মার্শাল এম জি তোয়াব।

বাংলাদেশকে ৬১ জেলায় ভাগ করে প্রত্যেক জেলায় যে গভর্ণর নিয়োগ দিতে চেয়েছিলেন তার ৬১টি বরকন্দাজকে, বিপ্লবী সরকার সেটাকে বাতিল করে দেয়। বিপ্লবী সরকার আগের মত ১৯টি জেলা পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে জেলা প্রশাসকের হাতে সংশ্লিষ্ট জেলার দায়িত্বভার অর্পণ করে। দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে সাবেক উপরাষ্ট্রপতিসহ মুজিব সরকারের ৬ জন মন্ত্রী ১০ জন সংসদ সদস্য ৪ জন আমলা এবং ১২জন ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সামরিক বাহিনীর ৩৬ জন দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়। মুজিব আমলে আটক দলীয় নেতা ও কর্মীদের মুক্তিদানের জন্য রাজনৈতিক দল সমূহকে তালিকা পেশ করার আহ্বান জানান হয়।

১৫ আগস্টের বিপ্লবী তৎপরতার অধিনায়ক কর্নেল ফারুকের স্টেটমেন্ট

শয়তানের প্রতারণা ও ছলনা থেকে মহান আল্লাহর আশ্রয় ভিক্ষা চেয়ে আমার সকল প্রচেষ্টা, কর্মকাণ্ড ও প্রয়াসে মহান আল্লাহর নিকট সঠিক দিক-নির্দেশনা দানের বিনীত আবেদন রেখে এবং মানবিক দুর্বলতা ও জ্ঞানের অভাবপ্রসূত আমার সকল অনিচ্ছাকৃত আর অপরাপর ভ্রান্তি ও মিথ্যা অহংকারের জন্য মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সকল সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক পরম করুণাময় ও সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছিঃ

কেন ১৫ আগস্ট ১৯৭৫?

শেখ মুজিব এবং তার সহকর্মীবৃন্দ আমাদের মুক্তি ও আত্মমর্যাদার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমরা অর্থাৎ বাংলাদেশের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে মরণপণ যুদ্ধ করেছিলাম মুক্তি অর্জন আর আত্মসম্মানবোধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ইয়াহিয়া খানের পরিবর্তে শেখ মুজিব কিংবা ইন্দিরা গান্ধী অথবা

অন্য কোন ক্ষুদে নবাবকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিয়ে সমাজের বিরাজমান অভিশাপ বয়ে বেড়ানো কিংবা আরো গভীরতর সংকটে নিপতিত হওয়ার জন্য তো আমরা মুক্তি- সংগ্রাম করিনি।

কিন্তু শেখ মুজিবের ক্ষমতায় আরোহণের ফলে জাতি হিসেবে কি পেয়েছিলাম আমরা। আল্লাহর পরিবর্তে জবরদস্তিমূলকভাবে মুজিবকে বানানো হলো দেবতা আর আমাদের অস্তিত্বের স্পন্দন ইসলামের স্থলে আমরা পেলাম মুজিববাদ। কাঙ্খিত মুক্তি এলো না। গোলামের অবস্থান থেকে আমরা হয়ে পড়লাম নতুন এক শ্রেণীর ক্রীতদাস। আত্মমর্যাদাবোধ আমাদের অর্জন করতে দেয়া হলো না। তার পরিবর্তে করুণা আর উপহাসের পাত্র হয়ে বিশ্বসমাজে আমাদের পরিচিতি হলো 'তলাবিহীন ঝুড়ি' হিসেবে। সমগ্র জাতিকে যে ভয়াবহ আর জঘন্য প্রতারণার জালে আবদ্ধ করা হলো, তার সমুচিত জবাব কি ছিল? সেই বিশ্বাস- ঘাতকতার প্রেক্ষিতে স্বাধীনতা পিয়াসী চির সংগ্রামী জনগণের সামনে আত্মমর্যাদা আর সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য আর কোন পথ কি খোলা ছিল? স্বাধীনতা, মুক্তি, আর নতুন একটি জাতির আত্মমর্যাদাবোধের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা আর বেঈমানী যারা করেছে, তাদের কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না?

মুজিব ভক্তরা যেভাবে প্রচার করতো শেখ মুজিব যদি তেমন কোন দেবতাই হতো তাহলে তার মৃত্যু হয় কিভাবে? অথবা মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কেউ তাকে কিভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে? আর শেখ মুজিব যদি দেবতা না হয়ে রক্ত মাংসের মানুষ হয়, তাহলে তো তাকে মানবতা আর আল্লাহর বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের বিচারের সম্মুখীন হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে মাত্র। কোন মানুষেরই তো এমন কোন ক্ষমতা নেই যার উপর নির্ভর করে অন্য কোন ব্যক্তি অথবা কোন গোষ্ঠী নিজের জীবন কিংবা মৃত্যুর উপরে কোন এখতিয়ার, ক্ষমতা আর নিয়ন্ত্রণ আছে বলে দাবী করতে পারে।

আর পাঁচ জনের মত সাধারণ মানুষ হিসেবে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে, অন্য কোন ব্যক্তির জীবন অথবা মৃত্যুর উপরে আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তবে অন্যান্য আর সব মানুষের মত আমার সত্তা আর আমার আত্মসম্মানবোধ সংরক্ষণের অধিকার আমারও আছে। স্বাধীনতা আর আত্মমর্যাদাবোধ ব্যতিরেকে মানব জীবন নিরর্থক

এবং তা যদি না থাকে তাহলে মানুষ হিসেবে আশরাফুল মাখলুকাত সৃষ্টির সেরা হিসেবে বেঁচে থাকাটাই অসম্ভবের পর্যায়ে উপনীত হয়।

তখনকার বিরাজমান ভয়াবহ পরিস্থিতি আর অবলুপ্ত সকল পন্থার প্রেক্ষিতে আমার এবং যারা আমাকে ১৫ আগস্ট '৭৫- এ প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করেছিল আর যারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে দোয়া করেছিল, তাদের সকলের সামনে এক কথায় সমগ্র জাতির সামনে শুধুমাত্র একটি পথই খোলা ছিল; আর তা হচ্ছে শেখ মুজিব যিনি আমাদের জনগণকে এবং জনগণের সকল কুরবানী আর আশা- আকাঙ্খা- স্বপ্নকে ভয়ংকরভাবে প্রতাণা করেছিলেন, সেই কথিত দেবতাকে ধ্বংস করা কিংবা কমপক্ষে ধ্বংস সাধনের চেষ্টা করা।

পনের বছর পর আজকে ব্যাপারটি কারো কারো কাছে খুব সহজ মনে হতে পারে। কিন্তু নরকের অতল থেকে উৎসারিত শোচনীয়ভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন মুজিববাদের সেই বিভীষিকাময় দিনগুলোতে এমন পরিবর্তনের কথা চিন্তা করতেও সাধারণ মানুষতো দূরের কথা, অতি সাহসী বিপ্লবীরাও আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। আমদের জন্য বিষয়টি ছিল ভীতিকর এবং ব্যর্থতার আশংকায় ভরপুর- আমাদের বলগাহীন কল্পনাতে কিংবা স্বপ্নেও আমরা ভাবিনি আমরা সফল হতে পারবো। আমরা ধরে নিয়েছিলাম আমরা মরব এবং সে মৃত্যু হবে আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মুক্তি ও স্বাধীন মানুষের গৌরবময় শাহাদাত। মুজিবী দুঃশাসনের পশুত্বের জীবন মেনে নিয়ে ক্রীতদাসের মত বেঁচে থাকার চেয়ে আমরা আমাদের নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য কোন পরিকল্পনাই করিনি। কারণ, আমরা জানতাম না অথবা চিন্তাও করিনি যে, মৃত্যুর অনিবার্য পরিণতিকে অতিক্রম করে আমরা জীবিত থাকব এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকবে। আমাদের সাহায্য করার জন্য, আমাদের পথ দেখানোর জন্য, আমাদের মনে সাহস সঞ্চয়ের জন্য আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যদিও আমরা তখন নিশ্চিত ছিলাম না সর্বশক্তিমান স্রষ্টা আমাদের এই ক্ষুদ্র জাগতিক জীবনের দৈনন্দিন কর্মধারাকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন কিনা, কারণ জাতির সেই অসহায় দিনে আমরা আল্লাহ ব্যতিরেকে আর কারো দিকে সাহায্যের প্রত্যাশায় হাত পাতার কথা ভাবতেই পারিনি।

আমরা বিশ্বাস করি, হতাশার অতল তিমিরে নিক্ষিপ্ত জাতির আশাহীন একটি হেতু আর প্রচেষ্টা (cause)- কে সফল করার প্রয়াসে একমাত্র আল্লাহই পারেন সাহায্য করতে। সীমাহীন নৈরাজ্যজনক হেতু আর উদ্দেশ্যে (cause) আমরা ঝুঁকি নিয়েছিলাম আমাদের তখনকার বিবেচনায় সর্বোত্তম যে ফলাফল আমরা আশা করেছিলাম তা ছিল মুক্তির প্রয়াসে আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মানুষের গৌরবময় মৃত্যু।

পনের বছর পূর্বের জাতির গৌরব ও শৌর্যমণ্ডিত সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত যা ঘটেছে তার জন্য কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু দুঃশাসনের পরাকাষ্ঠা অপদেবতা মুজিবের পতন ঘটেছে। তার তৈরী পূজা পদ্ধতি অর্থাৎ মুজিববাদ আজ বেঁচে আছে শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুজিবভৃত্য আর মুজিববাদের কারণে তখনকার দিনে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত মুজিবী- পুরোহিতদের মনে। জাতির সাথে বেঈমানী করে বৈষয়িক ক্ষেত্রে উপকৃত, ভোগ দখলকারী কায়েমী স্বার্থবাদী সেসব হাতেগোনা বেনিফিসিয়ারী ব্যক্তিবর্গ এখন মুজিব কন্যার উপর দেবত্ব আরোপ করে নতুন এক দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত করে আরেকবার জাতিকে প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে লুণ্ঠন করার সুযোগ করে নিতে চায়।

ভবিষ্যত কোনদিকে ?

পনের বছর পূর্বের সেই ঘটনাবহুল দিন থেকে আমার সমস্ত বিশ্বাস আর সকল প্রকার আনুগত্য নিঃশর্তভাবে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য। আমার দেশের জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রামের পথে আমার জীবনকে নিয়োজিত করেছি। নিঃস্বার্থ কুরবানীর এই পথে পনের বছর পূর্বে একজন মানুষ হিসেবে আমি আমার আত্মমর্যাদা পুনরুদ্ধার করতে পেরেছি এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি সেই মর্যাদাবোধ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা আমার থাকবে। এই পৃথিবীতে আল্লাহ যতদিন আমাকে রাখবেন, আমি আমার দেশের মানুষের মুক্তি অর্জন আর আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আল্লাহ এবং একমাত্র আল্লাহর এবাদত করে যাব। আমি জানি না আমি সফল হবো কিনা, সফলতা কিংবা ব্যর্থতা নিয়ে কোন পরিকল্পনাও করতে চাই না। কারণ, আমি বিশ্বাস করি ফলাফল নির্ধারণ করবেন মহান

আল্লাহ। আমার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে সাধ্যাতীত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারছি।

১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ এমনই একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন, যা আমার জন্য এবং বাংলাদেশের যন্ত্রনাবিদ্ধ নির্যাতিত মানুষের জন্য আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস স্থাপন আর সুখী- সুন্দর- শান্তিপূর্ণ- সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অসামান্য আলোকবর্তিকা হিসেবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। নির্লজ্জ শঠতা, প্রকাশ্য প্রবঞ্চনা আর সীমাহীন দুর্নীতির কুয়াশাচ্ছন্ন জীবনে এবং নিপীড়ন আর অবিচারের তমসাচ্ছন্ন ইতিহাসে একমাত্র এই দিনটিই হচ্ছে আশ্বাসের রূপালী রেখা। যারা মানুষকে দুর্যোগের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজেদের দেবতা অথবা দেবীরূপে প্রতিভাত করতে চায়, তাদের জন্য এই দিনটি একটি সতর্ক সংকেত। তাদের জানা উচিত আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং নিপীড়ক আর মুনাফেক গোষ্ঠী সীমালংঘন করলে দ্বিতীয় কোন সতর্কবাণী ব্যতিরেকেই আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দেন। সর্বোপরি, এই দিনটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহর সাহায্য মুক্তি আর আত্মমর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রামরত জাতির দ্বারপ্রান্তেই অপেক্ষা করছে।

আজকের দিনে বিরাজমান আশাহীন অস্থির পরিস্থিতি, অনিশ্চয়তার জালে আবদ্ধ যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের আহাজারি আর শঠতা, দুর্নীতি এবং সর্বোচ্চ আইন ও অবিচারের অভিশাপ আপাতঃদৃষ্টিতে সমাজকে পরিবেষ্টিত করতে চললেও মুজিবী দুঃশাসনের দিনগুলো ছিল আরো ভয়াবহ। সেই অভিশপ্ত দিন যাতে আর ফিরে না আসে এবং বিরাজমান জরাগ্রস্ত সমাজব্যবস্থা যাতে সর্বগ্রাসী ধ্বংসত্মক রূপ পরিগ্রহ করতে না পারে, তার জন্য সর্বপ্রথমে জাতির জীবন থেকে মুজিববাদ হোক, এরশাদবাদ হোক কিংবা আর অন্য কোন মতবাদ হোক- সবকিছু থেকে হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন ও নিষ্পাপ করতে হবে। মুক্তি অর্জন আর আত্মসম্মানবোধ পুনঃজাগ্রত করার শক্তি ও সাহস অর্জনের নিমিত্তে একমাত্র আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

আমার জীবন, আমার মৃত্যু, আমার মুনাজাত, আমার কর্ম, আমার প্রয়াস, আমার কুরবানী- সবকিছু মিলিয়ে আমার সত্তা এবং-

◆আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন দেবতা, দেবত্বলোভী ব্যক্তি, নিপীড়নমূলক পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যবস্থাকে আমি মানি না

এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নিকট কিংবা অন্যকিছুর নিকট আমি মাথা নত করি না।

◆আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ আমার প্রভু ও জীবনের নিয়ন্ত্রক, আমার আশ্রয়দাতা ও রক্ষাকারী, নিশ্চিত ও শর্তহীনভাবে আমার অস্তিত্বের রক্ষক এবং আমার রিজিকের মালিক।

◆আমি সাক্ষ্য দেই যে, হযরত মোহাম্মদ (সা) (আল্লাহ তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদের শান্তি ও সম্মান প্রদান করুন) হচ্ছেন শেষ নবী এবং আল্লাহর রাসূল।

◆আমি সাক্ষ্য দেই যে, পবিত্র কুরআন হচ্ছে মানুষের জন্য আল্লাহর বাণী এবং সর্বোচ্চ আইন।

(দৈনিক মিল্লাত বিশেষ ক্রোড়পত্রঃ ১৫ আগস্ট, ১৯৯১)

একাত্তরোত্তর দক্ষিণ এশিয়া

বাংলাদেশ

স্বাধীনতার স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ১৯৭০ সালের বহুল প্রচারিত পাকিস্তানী শোষণ সংক্রান্ত ধারণা তার গভীরতা হারিয়ে ফেলে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বিস্তর ব্যবধানের কারণে। ৭০ দশকে স্বাধীনতার মূলনায়ক শেখ মুজিব ও তার অনুগামীদের প্রচারণা গণ মনে যে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল সেটা স্বাধীনতার প্রথম পর্যায়ে তার শক্তি হারিয়ে ফেলে। মুজিব ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন যে স্বাধীনতার পর বাংলার জনগণ পাকিস্তানের অর্ধেক মূল্যে চাউল কিনতে পারবে। অথচ ১৯৭৪ সালে স্বাধীনতার তিন বছরের মধ্যে ১০ গুণ চড়া মূল্যে এখানকার মানুষকে চাউল কিনতে হয়েছে।' শেখ মুজিবের বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তানী শোষণ ছাড়াই সবচেয়ে গরীব, স্বাধীনতার কয়েক বছরের মধ্যে তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত হয়েছে। তাদেরই কল্যাণে টিআইবি এর রিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশ দুনিয়ার সবচেয়ে দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ বলে চিহ্নিত হয়েছে।

১৯৭১ সালে এখানকার মাথা পিছু গড় আয় ছিল ৪৭ ডলার ১৯৯২ সালে মাথা পিছু গড় আয় ২০২ ডলারে উন্নীত হলেও পাকিস্তানের মাথা পিছু গড় আয়ের অনেক নীচে। ১৯৬৯- ৭০- এর দিকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে মাথা পিছু গড় আয়ের অনুপাত ছিল ২ : ১। এদেশে তথাকথিত পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ না থাকা সত্বেও এখানকার মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি, মাথা পিছু গড় আয়ের অনুপাত আগের মতই রয়ে গেছে। এখনো পাকিস্তানে ৫ লক্ষ বাঙালী পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত রয়েছে যাদের আয় বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের সাথে যুক্ত হচ্ছে। সিমেন্ট, কম্বল, সামরিক সরঞ্জাম এবং অন্যান্য অনেক কিছু আমদানী হচ্ছে, যদিও এসব ভারত থেকে আমদানী করা সম্ভব। ভারতের সামরিক বিশ্লেষক সুব্রানিয়ামের প্রত্যাশা ছিল যে স্বাধীন বাংলাদেশ নির্ভেজাল ধর্ম নিরপেক্ষ নীতি ও আদর্শের মধ্যে অবস্থান করবে। কিন্তু তার ধারণা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়নি। বাংলাদেশ শেখ মুজিবের চাপিয়ে দেয়া ধর্ম নিরপেক্ষ নীতি থেকে সরে এসেছে- এখন বাংলাদেশের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম। এখন ভারতকে সার্কের তিনটি মুসলিম রাষ্ট্রের মুখোমুখি হতে হবে। বর্তমানে শুধুমাত্র কায়েমী স্বার্থবাদী চক্র ছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যে পাকিস্তান বিদ্বেষ তেমন প্রকটভাবে নেই। পাক ভারত ক্রিকেট খেলা হলে বাংলাদেশের মানুষের সত্যিকার অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায়।

পাকিস্তান

একাত্তরের যুদ্ধে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের মানচিত্র থেকে পূর্ব পাকিস্তান বিলীন হয়ে যায়, যার ফলে এর প্রতিক্রিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে ভয়াবহ রূপ নেয়। সার্বিক সেনা কমান্ড ভেঙে পড়ে এবং তরুণ অফিসাররা জেনারেলদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সেনাসদর দপ্তরে ইয়ংটাক হিসেবে পরিচিত তরুণ অফিসাররা প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ এবং তার নিকটতম সহযোগী জেনারেলদের বিচারের দাবী করেন।

নতুন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভূট্টো পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য টিভি ঘোষণার মাধ্যমে ১১ জন সিনিয়র জেনারেলকে তাদের দায়িত্ব থেকে অপসারণ করেন। নেভীর পুরো কমাণ্ড বরখাস্ত করা হয়। সেনা

অফিসাররা অপমানিত হতে থাকেন, যে কারণে উর্দী পরিহিত অবস্থায় কেউ জন সমক্ষে যেতে সাহস করতো না। কিন্তু ক্রমশ পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার যন্ত্রণা তিথিয়ে আসে। সেনাবাহিনীর সাথে বেসামরিক জনগণের সম্পর্ক আগের মত সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। খণ্ডিত পাকিস্তান শুধুমাত্র টিকেই রইল না ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে তার গর্বিত শির তুলতে শুরু করল। লাহোরে প্রতিষ্ঠিত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন পাকিস্তানকে অন্ধকার থেকে আলোর দিগন্তে টেনে তুলল।

ভারতের সামরিক বিশ্লেষক কে সুব্রানিয়াম ১৯৭২ সালে ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন- 'পাকিস্তান পরাজিত হয়েছে এবং বিশ্ব রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে স্থায়ীভাবে বিদায় হয়ে গেছে। পাকিস্তান আর কখনই তেমন বিশাল বাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হবে না, ফলে পশ্চিম ফ্রন্ট ভারতের জন্য আর কখনো হুমকি হয়ে উঠবেনা।' কিন্তু সুব্রানিয়ামের এ ধারণার বিপরীত চিত্র দেখা গেল পাকিস্তানে। এখানে আগের তুলনায় অনেক বেশী সামরিক স্থাপনা গড়ে উঠল। অনেক বেশী আধুনিক সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হল। পাকিস্তান ভারতের জন্য হুমকি এ কথাটা কিছু দিনের জন্য অবাস্তব মনে হলেও পাকিস্তানের সামরিক শক্তি আবারো ভারতের জন্য হুমকি হয়ে উঠল।

১৯৭১ সালের যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে সুব্রানিয়াম বলেছিলেন, পাকিস্তান ভারতের প্রবল প্রতিপক্ষ হিসেবে আর কখনো মাথা তুলতে সক্ষম হবে না এ কথাটা ভুল প্রমাণিত করেছে। পাকিস্তানের বিকাশমান সামরিক শক্তির ব্যাপারে দিল্লীর ক্রমবর্ধমান উদ্বেগ। পূর্ব পাকিস্তানকে হারানোর পরও দেখা গেল ইসলামাবাদ তার আয়ের বিরাট অংশ সামরিক শক্তি পুনর্বিন্যাসে ব্যয় করছে অকাতরে।

পারমাণবিক সম্ভাবনার ক্ষেত্রে সুব্রানিয়ামের বিশ্বাস ছিল খণ্ডিত পাকিস্তান তার প্রতিবেশীদের জন্য কখনো পারমাণবিক হুমকি হয়ে উঠবেনা। কিন্তু পরবর্তীতে ভারতের সামরিক বিশ্লেষক এমনকি সুব্রানিয়াম স্বয়ং পাকিস্তানকে ভারতের জন্য পারমাণবিক হুমকি বলে বিবেচনা করেন।

পাকিস্তান তার পূর্বাঞ্চল হারানোর পরও ১৯৭৯ সালের ১৯.৭ বিলিয়ন ডলার জিডিপি ১৯৯১-৯২ সাল নাগাদ ৪৮.০৯ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। এর রপ্তানী আয় (পাট ছাড়াই) ১,২৬২ মিলিয়ন থেকে উন্নীত

হয়ে ১৯৯২ সালে ৬ বিলিয়ন ডলারে দাঁড়িয়েছে যা ভারতের রপ্তানী আয়ের এক তৃতীয়াংশ। পাকিস্তানের মাথা পিছু গড় আয় ১৯৭২ সালের ৯০ ডলার থেকে ১৯৯০ সালে ৪০৯ ডলারে উন্নীত হয়েছে। এই একই বছরে পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাড়ায় ১ বিলিয়ন ডলার। সুব্রানিয়ামের ধারণা ছিল একাত্তরে পরাজিত পাকিস্তান ধর্ম নিরপেক্ষতার পথ ধরবে কিন্তু দেখা গেছে- তার ধারণা বিপরীত অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে।

ভারত

ভারতের ব্যাপারে সুব্রানিয়াম বিশ্বাস করতো যে সেখানে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা দূরীভূত হবে, কিন্তু ঘটেছে এর উল্টোটা। আদভানীর বিজেপি হিন্দুদের ধ্বংসের দেবী কালীকে সামনে এনেছে নবোদ্দমে ধ্বংস যজ্ঞের প্রস্তুতির জন্য। নির্ভেজাল হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিজেপির অঙ্গীকারই সাম্প্রদায়িক বিষবাস্প ছড়িয়েছে ভারতে।

সুব্রানিয়াম পূর্ব পাকিস্তান সমস্যা সমাধানে সামরিক হস্তক্ষেপ করার জন্য ইন্দিরা গান্ধীকে ধন্যবাদ জানান এ কারণে যে, পূর্ব পাকিস্তান ভারতের প্ররোচনা ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় স্বাধীন বাংলাদেশের উত্থান হওয়ার কারণে নাগা মিজো ও অহমিয়াদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পশ্চাৎ ভূমি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যবহৃত হবে না। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ২০ বছর পর সেই একই অভিযোগের পুনরাবৃত্তি হতে শুরু করেছে যেমনটি বলা হত মিজো নাগাদের আশ্রয় হল পাকিস্তান। অনুরূপ আজকে বলা হচ্ছে বাংলাদেশ ভারতের বিদ্রোহীদের আশ্রয় ও প্রশয় দিয়ে আসছে। ভারত থেকে বাংলাদেশে উদ্বাস্তুদের পুশ ব্যাক করে চলেছে। একাত্তরের পর ভারত প্রত্যাশা করেছিল যে, তাদের জন্য পূর্বাঞ্চলীয় হুমকি স্থায়ী ভাবে তিরোহিত হয়ে যাবে। ১৯৬৯ সালে যেখানে পূর্ব- পাকিস্তনে ১ ডিভিশন সৈন্য অবস্থান করত সেখানে বর্তমানে বাংলাদেশের রয়েছে ৫ ডিভিশন সৈন্য এবং বিমান বাহিনীর যে শক্তি বর্তমান রয়েছে তার মোকাবিলায় ভারতের বিমান বাহিনীর ১১ স্কোয়াড্রন প্রয়োজন হবে।

স্বাধীনতার প্রথম দিন থেকে বাংলাদেশের জনগণের মন মানসিকতা ভারত বিরোধী হয়ে উঠে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ভারতের প্রতি

এদেশের মানুষের যে দুর্বলতা ছিল স্বাধীনতার প্রথম দিনেই সেটা দূর হয়ে যায়, এর কারণ হল এদেশের হিন্দু এবং ভারতীয় হিন্দুদের ধৃষ্টতা ও ঔদ্ধত্যপূর্ণ আচার-আচরণে এদেশের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। এছাড়াও ভারতীয় সেনাবাহিনীর নির্বিচার লুণ্ঠন পরিত্যক্ত অস্ত্র সস্ত্র ও সামরিক সাজ-সরঞ্জাম এমন কি শিল্প কারখানার যন্ত্রপাতি ভারতে স্থানান্তর করার কারণে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ ক্রমশ ভারত বৈরী হয়ে উঠে। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর টাইম ম্যাগাজিনে ভবিষ্যতবাণী করা হয়েছিল যে, স্বাধীনতার সহযোগী ভারতীয় সেনাবাহিনী অবশেষে দখলদার হিন্দু বাহিনীতে পরিণত হবে। এই ভবিষ্যৎ বাণী তখন সত্য বলে পরিগণিত হয়েছিল।

ভারতীয় বিশ্লেষকরা পূর্বাভাস দিয়ে ছিলেন, চীন এবং যুক্ত রাষ্ট্রের প্রভাব কমে যাবে, তাদের এ ধারণাও মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে। ভারত আমেরিকার যৌথ নৌ মহড়া এবং টেকনোলজি স্থানান্তর ইত্যাদি এখনো অব্যাহত রয়েছে।

সুব্রায়িনামের মতে পূর্ব পাকিস্তানের পতনের মধ্যদিয়ে আঞ্চলিক অথবা জাতিগত আন্দোলন থিতিয়ে যাবে, কিন্তু সেটা হয়নি। শিখরা স্বাধীন খলিস্তানের দাবীতে সোচ্চার, শ্রী নগর উপত্যকায় কাশ্মীরীদের জন্য স্বাধীনতার এই আওয়াজ প্রতিধনিত হচ্ছে। ইন্দিরা গান্ধী পূর্ব পাকিস্তানে আঞ্চলিকতার যে বীজ বপণ করেছিলেন সেটা পাকিস্তানকে তো টুকরো করেছে, সেই আঞ্চলিকতাবাদের নব দানব এখন ভারতের উপর ভর করেছে।

সুব্রানিয়ামের একটি বক্তব্য সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে সেটা হল, ভারত জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে এমন একটা ইমেজ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে যে, বড় বড় পরাশক্তির নাকের ডগায় তাদের পছন্দ নয় এমন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ভারত সক্ষম।

পাকিস্তানকে টুকরো করতে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধী ভারতের বিপুল অর্থ ব্যয় করেছেন। কিন্তু তার জনগণের কল্যাণে তার গরীবী হটাও প্রকল্প এক মিলি মিটারও অগ্রসর করতে পারেননি। পাকিস্তান টুকরো হওয়ার ৩ যুগ পর ১৯৯১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের নির্লজ্জ ভূমিকার পুনর্মূল্যায়নের

ব্যাপারে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উচিত ছিল আবেগ বিবর্জিত পদক্ষেপ নেয়া। একাত্তরে কে কতটুকু লাভবান হয়েছে এটা বিচার বিশ্লেষণ হওয়া জরুরী।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল পাকিস্তানকে ভাঙবার জন্য যারা মূলত দায়ী তাদের একজনেরও স্বাভাবিক মৃত্যুও হয়নি। শেখ মুজিব সবংশে নিপাত হয়েছে, তাজুদ্দিন সোনার বাংলার সোনার সন্তানদের দ্বারা বেয়নেট বিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছে। ভুট্টোর ভাগ্যে জুটেছে ফাঁসির দড়ি আর ইন্দিরা গান্ধী দেহরক্ষীর ব্রাশফায়ারে তলপেট ঝাজড়া হয়ে মারা যায়। চট্টগ্রামে জিয়াউর রহমান তার উপরস্থ অবাঙালী আফিসারদের হত্যা করে যেভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন সেই চট্টগ্রামের মাটিতে তার অধস্তন অফিসারদের গুলিতে জিয়ার বুক ঝাঝরা হয়ে যায়, এটাই হল ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি। আর এখানেই ইতিহাসের শেষ নয়।

রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীদের প্রবণতা

১৯৯১ সালের নির্বাচনের সময় পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ থেকে বিপুল সংখ্যক পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিক বাংলাদেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য আসেন। এটা কোন স্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠনের পরও এই ধারা বিদ্যমান ছিল। নির্বাচনের পরও ঐ বিশেষ একটি মহল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীতুলে বিদেশী শক্তির দ্বারস্থ হয়। এদেশের পঁচে যাওয়া বখে যাওয়া বুদ্ধিজীবীরা সরকারী ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করে স্মারক লিপি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস, যুক্ত রাজ্যের হাইকমিশন এবং আরো কতিপয় আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রের দূতাবাসসমূহে ধর্ণা দিতে দেখা গেছে। এরা বিশেষ একটি লবির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং বিশেষ রাজনীতির ধারক। এরা সব সময় ঔপনিবেশিক শক্তির দালাল হিসেবে এদেশের রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে রাখতে চায়।

১৯৯৪ সালের অক্টোবরে অস্ট্রেলিয়ার এক সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিনিয়েন স্টিফেন বৃটিশ কমন ওয়েলথ সেক্রেটারী এমেকার প্রতিনিধি হিসেবে ঢাকায় এসে ১ মাস ৪ দিন ধরে আওয়ামী লীগ বিএনপি এবং আরো কোন কোন দলের নেতাদের, সেই সাথে এনজিও কর্তাদের নিয়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন।

বিদেশীদের ডেকে আনার ব্যাপারে তখনকার বিরোধী দল অনেক দূর এগিয়ে যায়। জনগণের কাছে ধরণা না দিয়ে আধিপত্যবাদী শক্তিসমূহের আশ্রয় কামনা করে। ১৯৯৬ সালে অনুরূপ নির্বাচনের মধ্যদিয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হলে বিএনপি বিরোধী দলের অবস্থানে থেকে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে অধিপত্যবাদী শক্তিসমূহের দ্বারস্থ হয়।

বিগত ২৭ অক্টোবর রাত ১২টায় বিএনপি সরকারের ক্ষমতায় থাকার মেয়াদ ৫ বছর পূর্ণ হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ আন্দোলন শুরু করে এর দু'ঘণ্টা পূর্বে। আন্দোলনের রূপ ছিল চরম উত্তেজনাপূর্ণ সহিংস ও ভয়াবহ। আন্দোলনের প্রথম দিনেই অন্তত ৬০ জনের প্রাণহানি ঘটেছে। সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তিও প্রচুর নষ্ট হয়েছে, আওয়ামী লীগ অবরোধ আন্দোলন দিয়ে ঢাকা শহরকে সারাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চেয়েছে। প্রতিরোধ আন্দোলন চলেছে প্রায় এক মাস।

২৮ অক্টোবর ২০০৬ইং জোট সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা চারদলীয় জোটের নেতা- কর্মীদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। রাস্তায় লাঠি পেটা করে হত্যা করে। বেশ কয়েকজনকে হত্যা করে লাশের ওপর নৃত্য করতে থাকে। এ দৃশ্য টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছে দুনিয়ার মানুষ। দুনিয়ার বিবেকবান মানুষই শুধু নয় আমিকার রাষ্ট্রদূত এ দৃশ্য দেখে চোখের পানি ফেলে ধিক্কার জানিয়ে ছিলেন আওয়ামী বর্বরতাকে। এখন বাংলাদেশের রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মার্কিন কর্তৃত্ব প্রকট। এইসাথে রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। দেশের সবরকম সংকটের মূলে রয়েছে, সেইসব রাজনৈতিক দল যাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে বিদেশী দূতাবাসসমূহের সাথে রয়েছে সেইসব বুদ্ধিজীবী, কথায় কথায় যারা বিদেশী কূটনীতিকদের সাথে সলা পরামর্শে ব্যাকুল হয়ে থাকে। বিদেশী কূটনীতিকরাও এসব মেরুদণ্ডহীন দালালদের নিয়ে খেলা করতে আনন্দ পায়।

আওয়ামী লীগের ধারণা, নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, হাসান, আজিজ, জাকারিয়াকে সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া, সব শেষে প্রেসিডেন্ট ডঃ ইয়াজউদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পদ থেকে বিদায়; সব কিছু রাজ পথের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সুরাহা করতে পেরেছে। আওয়ামী লীগের ধ্বংসাত্মক আন্দোলন জ্বালাও পোড়াও ও হত্যা বিদেশী কূটনীতিকদের

মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পেরেছে বলে মনে হয় না। তাদের এক তরফা চাপ ছিল প্রেসিডেন্টের উপর। প্রেসিডেন্ট চাপের মুখে বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি।

দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর একটি দলের পক্ষ হয়ে বিবৃতি প্রদান ছাড়াও ২২ জানুয়ারীর নির্বাচনে তাদের পর্যবেক্ষক প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।

কোন দেশের রাজনীতিতে কূটনীতিকদের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ নেই

মিশন প্রধানদের বাসায় দলের নেতাদের চায়ের আমন্ত্রণ জানিয়ে শলা পরামর্শ উপদেশ অথবা নির্দেশ দান করা শুধুমাত্র বাংলাদেশই সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোথাও এমন নজীর আছে বলে মনে হয় না। প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমারে এক যুগের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সেনা শাসন চলছে। নির্বাচনে বিজয়ী নেত্রী ওয়াংসান সুকীর কারাবরণ রয়েছে অব্যাহত, সেখানে কোন অবস্থায় কূটনৈতিক মিশনগুলো মিয়ানমার সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে পারছে না। এমনকি থাইল্যাণ্ডের সেনা শাসন নিয়েও বিদেশী রাষ্ট্র ভারতের অঙ্গ রাজ্য পশ্চিম বাংলার মূখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য কোন এক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কারণে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের প্রধানকে ক্ষমা চাইতে হয়েছে। মূখ্যমন্ত্রী বলেছেন- আপনাদের কর্মকাণ্ড কূনৈতিক পাড়ায় সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রের কোন কাজ তদারকি করার দায়িত্ব আপনাদের ওপর বর্তায় না, এটা কূটনৈতিক শিষ্টাচার বর্হিভুত। দূতাবাস প্রধান তার দেশের রাষ্ট্র প্রধানকে জানালে রাষ্ট্র প্রধান বিষয়টি নিয়ে মনমোহন সিং- এর সাথে কথা বলেন, তাতে তাদের লাভ হয়নি কিছুই। মনমোহন সিং ও সোনিয়া গান্ধী উভয়েই জবাব দেন বুদ্ধদেব যা বলেছে সেটা রাষ্ট্রীয় ধৃরাষ্ট্র প্রধানের বলার কিছু থাকে না। কিন্তু আমাদের দেশের চিত্র সার্বভৌমত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, এরপর মিশন প্রধান ও সংশ্লিষ্ট ভিন্ন দেশ আমাদের অনৈক্যের সুযোগটা পুরোমাত্রায় নিচ্ছে। বিদেশী দূতাবাসগুলো কারণে অকারণে সংকটে অসংকটে যেভাবে আমাদের নেতৃবৃন্দ বিদেশী দূতাবাসগুলোতে ধর্ণা দেয় ক্ষমতা লাভের হীন স্বার্থ

চরিতার্থ করার জন্য, তাতে মনে হয় বাংলাদেশকে সুন্দর ও সাবলীল ভাবে চালিয়ে নেয়ার যোগ্যতা কোন দলের কোন নেতৃবৃন্দেরই নেই।

ভারতের প্রত্যাশা ও বাংলাদেশের পানি সংকট

যখন যুক্ত বাংলার বিভাজন অনিবার্য করে তুলল ভারত তখন পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের জন্য সমকালীন মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ও মুসলিম গণ প্রতিনিধিরা ১৯৪৬ সালে দিল্লীতে এক যৌথ অধিবেশনে মিলিত হলে সোহরাওয়ার্দী এক পাকিস্তানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে সেটা গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব অনুযায়ী খণ্ডিত বাংলার একটি অংশ পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়। পাকিস্তান তার সীমিত সামর্থ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে ভায়াবল করে তুলে। নেহেরু, গান্ধী, মাউন্টব্যাটেন মনে করত, পূর্ব পাকিস্তান viable হবে না। হিন্দু নেতৃবৃন্দের সৃষ্ট সব ধরনের সংকট মুকাবিলা করে যখন পূর্ব পাকিস্তান সত্যিকার অর্থে viable হয়ে উঠল তখনই পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে দিল্লী। এদেশের পঞ্চমবাহিনীকে (অপশক্তি তাদের ভাষায়) ব্যবহার করে পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ এ অঞ্চলকে এ দেশকে বিচ্ছিন্ন করে ক্ষ্যান্ত হল না ভারত, একে তলাবিহীন ঝুড়িতে পরিণত করল। আজো সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের অগ্রগতির অন্তরায়, এ ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত হওয়া জরুরী।

বাংলাদেশের কাছে ভারতের অনেক প্রত্যাশা। ত্রিপূরা ও আসামের সাথে দ্রুত যোগাযোগের জন্য ভারত চায় একদিকে শিয়ালদহ জয়দেবপুর যাত্রীবাহী ট্রেন যোগাযোগ অন্য দিকে আখাওড়া রেলওয়ে লিঙ্ক। ভারত চায় বাংলাদেশী গ্যাস, এজন্য বাংলাদেশ থেকে ভারত পর্যন্ত গ্যাস লাইন এবং বিদ্যুৎ লাইন। আরো চায় চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করতে। এছাড়াও আরো অনেক প্রত্যাশা রয়েছে ভারতের। কিন্তু বাংলাদেশ ভারত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক সাবলীল করে তোলার ব্যাপারে ভারত স্বয়ং অসংখ্য বিঘ্ন সৃষ্টি করে রেখেছে। স্বাধীনতার প্রথম প্রভাত থেকে ভারত বাংলাদেশের সাথে অসম ঔপনিবেশিক আচরণ করার ফলে দুটো সার্বভৌম রাষ্ট্রের সম্পর্ক কখনই সাবলীল হয়ে উঠেনি। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে এখনো অন্তরায় হয়ে রয়েছে বাণিজ্যিক ঘাটতি। বাংলাদেশী পণ্যের শুল্ক মুক্ত প্রবেশাধিকারের

প্রশ্ন, তিস্তা, পদ্মার পানি বণ্টন, আন্তঃনদী সংযোগ প্রকল্প, ভারতের টিপাই মুখ বাঁধ সমস্যা সমাধানের কোন উদ্যোগ আজো নেয়া হয়নি। বাংলাদেশ ভারত বাণিজ্য অসম এবং ভারতের অনুকূলে। ভারত বাংলাদেশে যা রপ্তানী করে আমদানী করে অনেক কম। ভারতে বাংলাদেশের কিছু কিছু পণ্যের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরনের ট্যারিফ এবং প্যারা ট্যারিফের কারণে ভারতের আমদানী কারকরা সেসব পণ্য আমদানী করতে উৎসাহ বোধ করে না। এ কারণে বাংলাদেশ তার পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশের দাবী জানিয়ে সেটা আদায় করতে পারেনি আজ অবধি। এর ফলে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েই চলেছে। নব্বই এর শুরুতে বাংলাদেশে ভারতীয় রপ্তানী ছিল ১৪/১৫ কোটি ডলার, এখন সেটা ২০০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। বাণিজ্য ঘাটতি পূরণের জন্য ভারতে বাংলাদেশী পণ্যের ব্যাপক রপ্তানী প্রয়োজন। কিন্তু সেটা হয়ে উঠছে না। ইতোমধ্যে অবাধ বাণিজ্যের কথা বলা হচ্ছে। যেটার পরিণতি মুজিব আমলের সীমান্ত বাণিজ্যের অনুরূপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। ওদিকে বিশ্ব ব্যাঙ্ক বলছে, ভারতের সাথে অবাধ বাণিজ্যে বাংলাদেশের তেমন লাভ হবে না। বিশ্ব ব্যাঙ্কের বক্তব্য হল, দুই দেশের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক অবৈধ বাণিজ্য বন্ধ করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য ভাল হবে। আনুষ্ঠানিক বাণিজ্যের তুলনায় অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্যের পরিমাণ ৩ গুণ, ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমশ ফোকলা হয়ে যাচ্ছে।

ভারত আজ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে পণ্য সরবরাহের জন্য ট্রান্সশিপমেন্ট দাবী করছে অথচ বাংলাদেশ বাংলাবান্ধা ও নেপালের কাকর ভিটার মধ্যে যোগাযোগের ট্রানজিট সুবিধা পাচ্ছে না। তারা এখানে নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলছে। বাংলাদেশ তার জন্ম থেকে ভারতের পানি আগ্রাসনের সম্মুখীন। তিস্তাসহ অভিন্ন নদীগুলোর ন্যায্য পানি বণ্টনের এবং দীর্ঘ মেয়াদি গঙ্গা পানি চুক্তির ওপর বাংলাদেশ গুরুত্বারোপ করলেও ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সদিচ্ছার অভাবে পানি সংক্রান্ত সমস্যা জটিল থেকে আরো জটিল হচ্ছে। ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকার নদী কমিশনের বৈঠকে তিস্তার পানি বণ্টন নিয়ে সর্বশেষ আলোচনায় ভারত জানায়, ৬টি নদীর (ধরলা, ধুধকুমার, মনু, খোয়াই, গোমতী ও মুহুরী) সমীক্ষা শেষ করতে চায়। এর অর্থ আর কিছু নয়, ভারতের সময় ক্ষেপনের কৌশল। সাবেক প্রধানমন্ত্রী বেগম জিয়া পানি সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য ভারত সফরে গেলে গজল ডোবায় এক তরফা পানি প্রত্যাহার করে দিল্লী তার সদিচ্ছা

জ্ঞাপন করেছিল। এতে তিস্তা ব্যারেজের পানি কমেছিল অস্বাভাবিক ভাবে সেচ নির্ভর ১ লাখ ১২ হাজার হেক্টর জমি বিপর্যয়ের মুখে পড়েছিল। গঙ্গার পানি বণ্টনের চুক্তির প্রথম কিস্তিতে ভারত বাংলাদেশকে ২৯ হাজার কিউসেক পানি কম দিয়েছে, হার্ডিঞ্জ ব্রিজের ১৫টি গ্রাডারের ৯টি পানি নয় বালির উপর দাঁড়িয়ে আছে। পানি সম্পদ মন্ত্রনালয় থেকে বলা হয়েছে, চলতি বছর অর্থাৎ ২০০৭ এর জানুয়ারী থেকে বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে পানি বণ্টন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সিডিউল অনুযায়ী ভারত বাংলাদেশকে ২৯ হাজার ৫৫০ কিউসেক পানি কম দিয়েছে। এবার ১ লাখ ৭ হাজার ৫১৬ কিউসেক পানির প্রবাহ নিশ্চিত করার কথা ছিল। কিন্তু পানি সরবরাহ করা হয় ৭৭ হাজার ৯৬৬ কিউসেক। পানি উন্নয়ন বোর্ডের হাইড্রোলজি বিভাগ সূত্রে জানা যায়, গত ১০ বছর থেকে বাংলাদেশ পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত। যৌথ নদী কমিশনের পক্ষ থেকে ভারতের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। জিকে প্রজেক্টে এখন আর পানি নেই, পদ্মার বুকে এখন চাষাবাদ হচ্ছে।

ভারতের আন্তঃ নদী সংযোগ প্রকল্প ও টিপাই মুখ বাঁধ বাংলাদেশের পানি সমস্যা আরো প্রকট করে তুলছে। টিপাই মুখে বাধ নির্মাণের কারণে সুরমা নদীর পানি প্রবাহ গত দশ বছরে ৮০ শতাংশ কমেছে। আর সুরমা নদীর ভাটিতে কম পক্ষে ৩ কিলোমিটার মরে গেছে। আন্তঃ নদী সংযোগ প্রকল্পের কাজ শুরু হলে বাংলাদেশ মুখী পানি প্রবাহ শূন্যের কোঠায় এসে পৌঁছাবে।

হুমকির মুখে বাংলাদেশের নিরাপত্তা

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এদেশকে অকার্যকর করে তোলার ব্যাপারে দেশী- বিদেশী যড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। এদেশের অস্তিত্ব বিপন্ন না হওয়া পর্যন্ত ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব ভারতের হিন্দু নেতৃবৃন্দের মাথা ব্যথা। অখণ্ড ভারতের অবয়বে বাংলাদেশকে বিলীন করার স্বপ্ন এখনো হিন্দু নেতৃবৃন্দকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছে। দক্ষিণ এশিয়া থেকে বাহ্মণ্যবাদীরা বৌদ্ধদেরকে যেভাবে উৎখাত করেছে অনুরূপ পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে উপমহাদেশের মুসলমানদের ক্ষেত্রে। ব্রাহ্মণ্যবাদী সমাজ কাঠামোর মধ্যে বৌদ্ধবাদের জন্ম। বলতে গেলে বৌদ্ধবাদ ছিল

ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ। এটা ছিল তৎকালীন ঘুণে ধরা সমাজে প্রগতিশীল ব্যবস্থা। উপ- মহাদেশের নির্যাতিত জনগোষ্ঠী বৌদ্ধবাদে আশ্রয় নিয়ে মুক্তির নিঃশ্বাস নিতে থাকে এমনকি উপমহাদেশের রাষ্ট্র কাঠামোও দখল করে বৌদ্ধবাদীরা। চতুর ব্রাহ্মণ্যবাদীর বৌদ্ধবাদ উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা প্রকাশ্য বিরোধীতাকে এড়িয়ে বৌদ্ধবাদীদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়।

প্রথমত তারা বৌদ্ধবাদীদের মধ্যেকার অধৈর্যদের সন্ধান করে এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ করা হয়। এমনকি মসনদে আরোহণের ব্যাপারেও মোহাবিষ্ট করা হয়। ধীরে ধীরে তাদেরকে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির ধারকে পরিণত করা হয়। অবশেষে বৌদ্ধবাদীদের দ্বিধাবিভক্ত করা হয়। মহাযান ও হীনযান এই দুই ভাগে বৌদ্ধবাদীরা বিভক্ত হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি ও হিন্দু সংস্কৃতি যারা গলাধকরণ করেছিল তারা মহাযান হিসেবে পরিচিত। আর যারা নির্ভেজাল বৌদ্ধবাদ আকড়ে ব্রাহ্মণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল তাদেরকে বলা হত হীনযান। মহাযানদের ব্রাহ্মণ্যবাদীরা প্রগতিশীল হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করে এবং তাদেরকেই বৌদ্ধবাদ উৎখাতে পঞ্চমবাহিনী হিসেবে ব্যবহার করে। যেমন করে মুসলিম শক্তিকে বিপর্যস্ত করার জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্র শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগকে পঞ্চমবাহিনী হিসেবে ব্যবহার করেছিল, প্রকৃতপক্ষে এরা মহাযানের ভূমিকা নিয়েছিল। আর যারা তাদের আদর্শকে সমুন্নত করতে চেয়েছিল এবং নিঃস্বার্থভাবে দেশ ও জাতির জন্য সংগ্রাম করেছিল তাদেরকে দালাল হিসেবে চিহ্নিত করে হত্যা নির্যাতন করেছিল এবং দৃশ্যপটের বাইরে ঠেলে দিয়েছিল। আজো ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বাংলাদেশের মানুষকে ছলেবলে কৌশলে এবং মিডিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করে চলেছে। জাতিকে বিভক্ত করে ফেলেছে দুটো শিবিরে। একটি পক্ষ প্রকাশ্য অথবা নেপথ্যে তাদের অনুগত ভৃত্যের ভূমিকায় রয়েছে। এরা চায় বাংলাদেশকে ভারতের হাতে তুলে দিতে। অর্থাৎ এইসব পঞ্চমবাহিনী মহাযানদের দিয়ে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার অসমাপ্ত কর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা

২০০৭ সালের ১০ জানুয়ারী নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘের উদ্যোগে কোলকাতায় বাংলাদেশ উপ হাইকমিশনের সামনে বাংলাদেশ বিরোধী কিছু দাবী দাওয়া বাস্তবায়নের দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করা হয়। ইংরেজী ও বাংলায় লেখা প্লাকার্ড ছিল তাদের হাতে। প্লাকার্ডগুলোতে লেখাছিল, প্রেসিডেন্ট ডক্টর ইয়াজউদ্দিন আইএসআই এর চর। বাংলাদেশ ভেঙ্গে সংখ্যালঘুদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চাই। Bangladesh centre of Islamic terrorist, Destroy the terrorist Bangladesh. ইত্যাদি ধরনের শ্লোগান। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তী বলেন, বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে যাওয়া উদ্বাস্তুদের বাংলাদেশ সরকারকে ফেরত নিতে হবে। বাংলাদেশে বসবাসকারী ৩ কোটি সংখ্যালঘুদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় বাদ পড়া সংখ্যালঘুদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই বিক্ষোভ মিছিলের সময় পশ্চিম বঙ্গ সরকার কোলকাতাস্থ বাংলাদেশ উপ হাইকমিশনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিলেও কেন্দ্রীয় সরকার ও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র'এর আশির্বাদ রয়েছে এদের কর্মকাণ্ডের প্রতি। হিন্দু সন্ত্রাসীদের একটি সংগঠন ভারত সেবাশ্রম সংঘ এদের অনেক কর্মকাণ্ডে বৈষয়িক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশ বিরোধী এ ধরনের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে অনেক সংগঠন। যেমন : (১) স্বাধীন বঙ্গভূমি (বঙ্গ সেনা), (২) বিএলও (বঙ্গভূমি থেকে ভেঙে আনা অংশ), (৩) বাংলাদেশের রিফিউজি সমিতি, (৪) ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতি, (৫) ক্যাম্প, (৬) সোনার বাংলা ডেমোক্রেটিক পার্টি, (৭) স্বদেশীগণ জাগরণ মঞ্চ, (৮) বাংলাদেশ উদ্বাস্ত সংগ্রাম পরিষদ, (৯) অখণ্ড ভারত ঐক্য পরিষদ, (১০) বাংলাদেশ ভারত ভ্রাতৃত্ব মঞ্চ, (১১) বাংলাদেশ উদ্বাস্তু উন্নয়ন সংসদ, (১২) বাংলাদেশ সংখ্যালঘু বাঁচাও কমিটি, (১৩), গণতন্ত্র অধিকার রক্ষা সমন্বয় কমিটি, (১৪) গ্লোবাল হিউম্যান রাইটস ডিফেন্স, (১৫), অল ইনডিয়া রিফিউজি ফ্রন্ট, (১৬) হিন্দু বাঙালীগণ পরিষদ, (১৭) বিবেকানন্দ সাহিত্য পরিষদ, (১৮) নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘ।

প্রত্যেক বছর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস এবং ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস এলেই এসব বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন তৎপর হয়ে ওঠে।

নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘের বাংলাদেশ বিরোধী সমাবেশের ৫দিন পর ১৫ জানুয়ারী কোলকাতার বাংলাদেশ উপ- হাইকমিশনের সামনে পশ্চিম বঙ্গ রাম্য সিপিএস এর যুব সংগঠন ও ছাত্র সংগঠন বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। যুব সংগঠন নেতা আভাস রায় চৌধুরী বাংলাদেশ জরুরী অবস্থা জারি হওয়ার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এতে নাকি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হবে। এ কর্মসূচীর পেছনে রয়েছে পশ্চিম বঙ্গের বাম ফ্রন্ট সরকার।

গত বছর (২০০৬) ১৬ ডিসেম্বর পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি থানার অদূরে ত্রিমোহনী বাজারে নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘের এক সমাবেশে স্বাধীন ভঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠার দাবী জানান হয়। এর আগে ১১ নভেম্বর চব্বিশ পরগণা জেলার মুকুন্দপুরে বঙ্গ সেনাদের এক সমাবেশে নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘের সাধারণ সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তী বাংলাদেশের ৪ দলীয় জোট এবং শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের কর্মসূচী বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে চাপ প্রয়োগের জন্য ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশে সংখ্যা লঘুদের নিরাপত্তা ও তাদের সু- রক্ষার অযুহাতে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৩৭টি জেলাকে নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের আওয়াজ তুলেছে লিবারেশন টাইগার অব বেঙ্গল। তারা এই ৩৭টি জেলাকে মনে করে তাদের জন্য অভয়ারণ্য। এই জেলাগুলো হলঃ পঞ্চগড়, লালমনিরহাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর, রংপুর, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, নওগাঁ, নবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, পাবনা কুষ্টিয়া, মেহেরপুর রাজবাড়ী, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা, ফরিদপুর, মাদারীপুর, শরিয়তপুর, যশোর, নড়াইল, গোপালগঞ্জ, সাতক্ষীরা, খুলনা, বরিশাল, পিরোজপুর, বাগেরহাট, বগুড়া, পটুয়াখালী, ভোলা ও ঝালকাঠি। লিবারেশন টাইগার অব বাংলাদেশ মনে করে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটির ওপর। এখানে বাস করে ৩ কোটি সংখ্যা লঘু। এদের নিরাপদ বসবাসের জন্য ৩৭টি জেলা সমন্বয়ে গঠিত স্বাধীন বঙ্গদেশ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে তারা বঙ্গদেশ মুক্তিপরিষদ গঠন করেছে। এদের সসস্ত্র শাখা হিসেবে কাজ করছে লিবারেশন টাইগার অব বেঙ্গল এরা হতে চায় শ্রী লঙ্কার এলটিটিই অর্থাৎ লিবারেশন টাইগার অব তালিম ইলম। শ্রী লঙ্কা আজ যে সঙ্কটাপন্ন এমন সংকট আমাদের জন্যও ডেকে আনতে চায় ব্রাহ্মণ্যবাদীরা।

Bangladesh Mukti Parisad & Liberation tigers of Bengal What and Why? –নামক একটি বুকলেট এবং সংগঠনের প্যাডে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর বরাবর একটি চিঠি কোলকাতার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঠিকানায় এবং বাংলাদেশের উপ হাইকমিশনে পাঠান হয়। সংগঠনের প্যাডে সদর দপ্তরের ঠিকানা পাইকপাড়া ব্রাহ্মণ বাড়িয়া উল্লেখ করা হয়। লিবারেশন টাইগারের কমান্ডার ইনচীফ এবং মুক্তি পরিষদের প্রধান হিসেবে স্বাক্ষর করেন জনৈক দুর্গা চরণ। এসব কাগজপত্র বিভিন্ন দেশ এবং সার্কভুক্ত দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে পাঠান হয়। এমনকি জাতিসংঘ এবং কমলওয়েলথ মহাসচিবদের নিকট প্রেরণ করা হয়। বুকলেটে বঙ্গদেশে পুরো পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। বঙ্গদেশের রাজধানী কোথায় হবে পতাকা কেমন হবে জাতীয় সংগীত কেমন হবে সব কিছুর পরিষ্কার বর্ণনা রয়েছে।

বঙ্গভূমি গঠনের ষড়যন্ত্র

২০০৩ সালের ২৩ জানুয়ারী বীর বঙ্গ/বঙ্গভূমি রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়া হয়। সুপ্রিম রেভ্যুলিউশনারী কাউন্সিল এবং ১৭ সদস্যের একটি অন্তর্বর্তী প্রবাসী সরকার গঠন করা হয়। বাংলাদেশের দক্ষিণ ও পূর্বের কিয়দাংশ নিয়ে এ রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়। এর সম্ভাব্য রাজধানী হবে পার্বত্য চট্টগ্রামের শক্তি গড়ে। তবে শক্তি গড়ের অবস্থান কোথায় সেটা সুনির্দিষ্ট করে বলা হয়নি। এর জন্য সশস্ত্র সংগ্রামের কথা বলা হলেও জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রবীণ তেড়াড়িয়া বলেন, ভারতে প্রবাসী এবং বাংলাদেশে অবস্থিত হিন্দু জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে বাংলাদেশ বিভক্তির মাধ্যমে একটি পৃথক হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের পক্ষপাতি। বাংলাদেশকে খণ্ড বিখণ্ড করার পরিকল্পনা প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সকলের। একে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে চলছে 'র'। এখন এসব ষড়যন্ত্র গুরুত্বহীন মনে হলেও আগামী একদা এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ মহীরুহে পরিণত হবে না এমনটি বলা যাবে না। এ কারণে এসব বাংলাদেশের জন্য অশনি সংকেত।

সীমান্তে বিএসএফ- এর অপতৎপরতা

বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ- এর পরিকল্পিত অপতৎপরতা আজকের নয়। দীর্ঘ দিন ধরে এ অপতৎপরতা চলে আসছে। যখন থেকে বাংলাদেশ ভারতের আশ্রিত অবস্থান থেকে সোজা ও স্বনির্ভর হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে তখন থেকে এই অপতৎপরতা চলে আসছে। বাংলাদেশের বিডিআর এসব অপতৎপরতার জবাবও দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। বিনা উস্কানীতে নিরীহ বাংলাদেশীদের গুলী করে হত্যা নিত্যকার ব্যাপার। গত বছর ২০০৬ সালের আগস্টে জকিগঞ্জ সীমান্তে এরা বড় ধরনের একটি হামলা চালায়। বিডিআর জোয়ানরা বীরত্বের সাথে প্রতিহত করলেও বিভিন্ন সীমান্তে বিএসএফ তাদের তৎপরতা আগের চেয়ে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। সীমান্তে ভারতীয় গুপ্তচরদের আনাগোনা বেড়ে গেছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের কূটনৈতিক উদ্যোগ জোরদার করা হলেও অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।

গত ২৯ নভেম্বর (২০০৬) বার্ষিক সংবাদ সম্মেলনে বিএসএফ এর মহা পরিচালক ভারত বাংলাদেশ সীমান্তকে প্রবলেম এরিয়া উল্লেখ করে সীমান্তে বিএসএফ ব্যাটেলিয়ান ৫০ থেকে ৬৬ এ উন্নীত করার কথা বলছেন।

গত বছর ৩০ নভম্বের (২০০৬) ইন্ডিয়ান ওয়েব সাইট জানায় ভারতের দুই ক্যাম্পে দূরত্ব ১০ কিলোমিটার থেকে কমিয়ে ৩-৫ কিলোমিটার করা হয়েছে প্রতি ক্যাম্পে অন্তত ৫জন সদস্য থাকবে। সীমান্ত ফ্লাড লাইট দিয়ে আলোকিত করা হবে।

২০০৬ এ ভারত ইসরাইল চুক্তির পর ভারত সেনাবাহিনীর বিভিন্ন রেজিমেন্ট থেকে ৩১ হাজার সৈন্য নিয়ে ২৫টি স্পেশাল ফোর্স গঠন করেছে। ইসরাইলী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত এবং তাদের অস্ত্রে সজ্জিত এ বাহিনী ভারতীয় সেনা অফিসারের নেতৃত্বে বিশেষ রুলস অব এনগেজমেন্টের অধীনে বাংলাদেশ সীমান্তে গুলী বর্ষণ, হত্যা, সীমান্ত অতিক্রম, সীমান্ত পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করা, পুশ ইন ও ভূমি দখল ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

ইসরাইলীরা যেমন মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসেবে মনে করে অনুরূপ হিন্দু জনগোষ্ঠীর প্রায় সকলেই মুসলমানদেরকে তাদের জাত

শত্রু হিসেবে মনে করে। শত্রুর মিত্র এই ফরমূলা অনুযায়ী দুই মুসলিম বিরোধী শক্তি সংঘবদ্ধ হয়েছে মুসলমাদের বিনাশ করার জন্য। ফিলিস্তিনীদের উপর নিত্য নব নব পন্থায় নিপীড়ন চালানোর সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা উপমহাদেশের মুসলমানদের উপর প্রয়োগ করার জন্য ইসলাইলীদের কাছে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে ভারতের বিশেষ বাহিনী। আগামী একদা এই বিশেষ বাহিনী হয়তোবা চড়াও হতে পারে বাংলাদেশের উপর। বাংলাদেশ হতে পারে আর এক ফিলিস্তিন, তখনকার জন্য এখনি প্রস্তুতি নিতে হবে বাংলাদেশের। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা এখানকার মেরুদণ্ডহীন রাজনীতিক ও বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবীরা যারা পঞ্চমবাহিনীর ভূমিকা নিতে এবং পানির দরে জাতীয় স্বার্থকে বিক্রি করতে মোটেও কুণ্ঠিত হবে না।

উপসংহার

জাতির ক্রমবর্ধমান অধঃপতন নৈতিক অবক্ষয় ও স্বাধীনতা উত্তর প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বিস্তর ব্যাবধান থেকে উৎসারিত গভীর হতাশা সমগ্র জাতিকে টেনে নিয়ে চলেছে সীমাহীন সংকটের দিকে। দেশের অতি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবী চিন্তাবিদ রাজনীতিবিদ শিক্ষক সমাজসেবী সকলকে গ্রাস করেছে একই হতাশায়। আমাদের কারোই গন্তব্য জানা নেই, দুর্গতির অতল গহ্বরের দিকে চোখ বন্ধ করে আমরা এগিয়ে চলছি। টাইটানিক ডুবছে, ডুবছে এর নাবিক আরোহী সকলে।

ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন আল মুকাদ্দিমার দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন- জনগণের ওপর অর্থনৈতিক শোষণ ও নির্যাতন চালানো হলে তাদের সম্পদ উপার্জনের স্পৃহা নস্যাৎ হয়ে যায়। যখন স্পৃহা নষ্ট হয়ে যায় তখন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শ্রম ও সাধনা থেকে তারা হাত গুটিয়ে নেয়। আর জনপদ যখন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে শ্রম বিমুখ হয়ে পড়ে তখন বাজারে মন্দা দেখা যায়। দেশের বাসিন্দা হয়ে ওঠে কর্ম বিমূখ এবং উজাড় হয়ে যায় নগর বন্দর আর জনপদ। দৃষ্টান্ত হিসেবে বলা যায় ১৭৫৭ সালে সিরাজের পতনের পর যে সীমাহীন শোষণ ও জুলুম চলে এর প্রতিক্রিয়ায় মাত্র ১ যুগের ব্যবধানে বাংলার মন্বন্তরে দেড় কোটি অর্থাৎ সমগ্র জনগোষ্ঠীর এক তৃতীয়াংশ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ে। এই মৃত্যু ও ধ্বংসের অন্তরালে সক্রিয় ছিল ঔপনিবেশিক শক্তি ও তাদের দালালদের সীমাহীন শোষণ ও দুর্নীতি। একাত্তরোত্তর বাংলার পরিস্থিতির দিকে তাকালে একই চিত্র আমরা দেখতে পাব। একাত্তরোত্তর ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ও তাদের সহযোগীদের নির্বিচার লুণ্ঠন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মাত্র ৩ বছরের মধ্যে মন্বন্তরের মুখোমুখি হতে হয়েছিল এদেশের মানুষকে। ভিয়েতনাম আমাদের অনেক পরে স্বাধীনতা লাভ করেও তাদের অগ্রগতির পালে হাওয়া লাগাতে সক্ষম হয়েছে, মাহাথিরের গতিশীল নেতৃত্ব মালয়েশিয়াকে বিশ্বের উন্নত জাতিতে পরিণত করেছে। শুধুমাত্র আমরা স্বাধীনতার মেকি চেতনা থেকে প্রেরণা লাভের চেষ্টা করছি আর দুর্নীতির বিষাক্ত উদ্ভুত অবয়ব ধারণ করে মৃত্যু যন্ত্রণায় ধুকছি।

আমরা ২শ' বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের উত্তরাধিকারী হয়ে সাবেকী কাঠামোর ক্ষয়ে যাওয়া খোলসটা আকড়ে মুক্তি ও প্রগতির পথ অন্বেষণ করছি। কিন্তু মরীচিকার মত উন্নতি ও প্রগতির স্বপ্ন ক্রমশ দুরে সরে যাচ্ছে। যতদিন যাচ্ছে ততই অধঃপতিত হচ্ছি। সর্বগ্রাসা দুর্নীতি জাতির সর্বনাশ ত্বরান্বিত করে চলেছে। দুর্নীতিবাজ ঔপনিবেশিক দালাল ও তাদের সহযোগীরা জনগণের সম্পদ অব্যাহত শোষণ এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় লুণ্ঠণের মধ্য দিয়ে এদেশের ৯০ শতাংশ মানুষকে দারিদ্র্য সীমার নীচে টেনে নিয়ে চলছে। সরকার পৃষ্ঠাপোকতা দান করে চলেছে সে সব লুটেরাদেরকে যারা সরকারকে ক্ষমতাসীন করেছে লুণ্ঠিত সম্পদের ক্ষুদ্রাংশ বিনিয়োগ করে। ক্ষমতাসীনরা যদিও জনগণের ভোটে নির্বাচিত তা সত্ত্বেও গণ স্বার্থের ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপ হীন হয়ে দুর্নীতিবাজ লুটেরাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে চলেছে। লুটেরাদের স্বার্থ এবং ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতা বহির্ভূত নেতৃবৃন্দের স্বার্থের অভিন্নতা রয়েছে।

ইবনে খালদুন লিখেছেন- 'জুলুম ব্যাপক অর্থবহ, যারা কোন অধিকার ছাড়া সম্পদ আহরণ করে তারা জালিম। যারা অন্যের সম্পদে অন্যায় হস্তক্ষেপ করে তারা জালিম এবং যারা মানুষের ন্যায্য অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করে তারাও জালিম। মালিকানা হরণ কারীরাও সাধারণত জালিম। এসবের খারাপ প্রতিক্রিয়া পড়ে রাষ্ট্রের উপর সামাজিক বিকৃতির আকারে। সর্বস্তরে জনগণের সম্পদ লোপাট ও সর্বাবস্থায় জনগনকে শোষণ করার অনিবার্য পরিণতি থেকে উদ্ভব হয়েছে ব্যক্তি সমষ্টি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় বিকৃতি। আজ ব্যক্তি চেতনা ক্লেদাক্ত সংকীর্ণ এবং সার্বজনীন আবেদন ও ঔদার্য থেকে অনেক দূরে। সামষ্টিক চেতনায় বিরাজ করছে তীব্র প্রতিযোগিতা পরস্পরের ঘাড়ে পা রেখে আকাশ ছোয়ার আকাঙ্খা সামাজিক বিপর্যয়ের সূচনা করছে প্রতিনিয়ত। রাষ্ট্রীয় চেতানায় রয়েছে প্রভূত্বের দাপট, জনগণের সম্পদ লুণ্ঠনের দুর্নিবার, আকাঙ্খা; আর প্রভূত্বের আসন নিরাপদ করার জন্য লুটেরা মাস্তান দুষ্কৃতকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা দানের অলিখিত কার্যক্রম। যে কারণে আজ ৯০ শতাংশ শোষিত বঞ্চিত লুণ্ঠিত মানুষ হতাশা ও বঞ্চনা নিয়ে নিরুপায় হয়ে নির্বিকার চিত্তে দুর্গতির শেষ সীমার দিকে এগিয়ে চলছে।

২০০২ সালের ডিসেম্বরে ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল অব বাংলাদেশ অর্থাৎ টি আইবি এর রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশে ৭টি দুর্নীতিগ্রস্ত খাত বছরে ঘুষ বাবদ জনগণের কাছ থেকে মোট ৭ হাজার ৮০ কোটি টাকা আদায় করে। এই ৭টি খাতের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে পুলিশ বিভাগ। এই বিভাগ দুর্নীতি বাবদ বছরে আদায় করে ২ হাজার ৬৬ কোটি টাকা, অন্য খাতগুলির মধ্যে নিম্ন আদালত ১ হাজার ১শ ৩৫ কোটি টাকা, সরকারী হাসপাতালগুলো তথা স্বাস্থ্য খাত ১ হাজার ২শত ৫০ কোটি টাকা, শিক্ষা খাত ৯শত ২০ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ খাত ১৮২ কোটি টাকা, কর বিভাগ ১২ কোটি টাকা দুর্নীতি বাবদ আয় করে।' টি আই বি এর আঞ্চলিক চ্যাপ্টার গুলোর দুর্নীতি বিষয়ক জরিপে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। জরিপে বাংলাদেশের ৭টি খাতের পরিসংখ্যান তুলে ধরা হয়। পুলিশ বিভাগ কর্তৃক ৮৩.৬ শতাংশ নিম্ন আদালত কর্তৃক ৭৫.৩২ শতাংশ, ভূমি প্রশাসন কর্তৃক ৭২.৭৮ শতাংশ, স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক ৫৫.৫০ শতাংশ কর বিভাগ কর্তৃক ১৯.২৫ শতাংশ জনগণ দুর্নীতি বা ঘুষের শিকার হয়। ২০০৪ সালে প্রকাশিত বিশ্ব ব্যাঙ্কের এক প্রতিবেদনে বলা হয়, প্রতি বছর সরকারের কেনা কাটায় প্রায় ২৭০০ কোটি টাকার দুর্নীতি করা হয়। সরকার প্রতি বছর প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা মূল্যের পণ্য ও সেবা কেনে। বিশ্ব ব্যাংক পরিচালিত জরিপে তথ্য পর্যালোচনা করে বলা হয়, সরকারী খাতের ক্রয় ব্যবস্থায় যথেষ্ট লুকোচুরি রয়েছে। বাংলাদেশের অর্জন ও চ্যালেঞ্জ শিরোনামে প্রকাশিত এ প্রতিবেদনে ব্যাপক দুর্নীতি ও চাঁদাবাজিকে সরকারের দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীসহ সকল অর্জনের পথে বড় বাধা বলে চিহ্নিত করা হয়।

রাজস্ব আয়ের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম কাষ্টমস হাউসে প্রতিদিন ৩০-৩৫ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়ে থাকে, এখানে অবৈধ লেনদেন হয়ে থাকে আড়াই কোটি টাকা। কতিপয় কাষ্টমস কর্মকর্তা এখানে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে বিপুল সম্পদের মালিক হয়ে গেছেন। বিগত আওয়ামী সরকারের ৪১ জন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার তালিকা প্রস্তুত হলেও তাদের বিরুদ্ধে আজো কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অথচ ঐসব দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সম্পদের পরিমাণ আড়াই হাজার কোটি টাকা।

দারিদ্র্য বিমোচনের নামে এনজিওদের সুদী কারবার দারিদ্র্যকে আরো প্রকট করে তুলেছে। প্রত্যেক বছর এনজিওরা ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে থাকে দারিদ্র্য বিমোচন, দরিদ্র জনগণকে ৪০ শতাংশ সুদ উৎসর্গ করতে হয়। এনজিওদের উদ্দেশ্যে। স্বাভাবিকভাবে তাদের শক্তি সামর্থ ব্যয় করেও দারিদ্র্যের দুঃসহ সীমানা পার হতে পারেন না এদেশের দুঃস্থ জনগণ। এনজিওদের সুবাদে তারা দরিদ্র থেকে হত দরিদ্রে পরিণত হয়। এ ব্যাপারে এদেশের দায়িত্বশীল কর্মকর্তরা নির্বাক।

গত ১২ ফেব্রুয়ারী (২০০৭) ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল টিআইবির এক সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত টিআইবির এক গবেষণা প্রতিবেদন অষ্টম জাতীয় সংসদে কোরাম সংকটের কথা উল্লেখ করে বলা হয়- 'সংসদ সদস্যদের অনুপস্থিতির জন্য সংসদ কার্যক্রমের ২২৭ ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়েছে, এর ফলে সংসদের ২০ কোটি ৫০ লাখ টাকা অপচয় হয়েছে। ২৭৩ কর্ম দিবসের মাত্র ৯টি কর্মদিবসে নির্দিষ্ট সময়ে অধিবেশন শুরু হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোট কার্যদিবসের মধ্যে ১৭৮ দিন এবং প্রধান বিরোধী দলীয় নেত্রী মোট কর্ম দিবসের ২৪৮ দিন অনুপস্থিত ছিলেন। প্রধান বিরোধী দল ২২৩ কর্মদিবস সংসদে অনুপস্থিত ছিল। প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, এ সংসদে ১৩ হাজার ১৫১ কোটি ৫৪ লাখ টাকার অডিট আপত্তির মধ্যে ১২ হাজার ৫৩৫ কোটি ৭৮ লাখ টাকা অনাদায়ী পড়ে আছে। ১৮৩ জন সংসদ সদস্যের টেলিফোন বকেয়া বিলের পরিমাণ ১ কোটি ২৬ লাখ টাকা।

টিআইবি এর প্রতিবেদনে জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত দায়িত্বহীনতা প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সদস্যরা জনগণের ভাগ্য নির্মাণে যে অমনোযোগী ছিলেন এটাই প্রমাণ করেছে টিআইবি'এর গবেষণা প্রতিবেদন এ অমনোযোগিতার পেছনে রয়েছে ব্যক্তি স্বার্থ। রাজনীতি অর্থ তাদের কাছে এমন একটা উপকরণ যা দিয়ে অতি সহজে প্রভাব প্রতিপত্তি অর্থ সম্মান ও সম্পদ অর্জন করা সহজ। নির্বাচিত হয়ে একারণে তারা গণ স্বার্থের কথা বিবেচনা না করে সম্পদ আহরণে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আর সম্পদ আহরণের অবৈধ পথ দুর্নীতির পথে অগ্রসর হয়েছে নির্দ্বিধায়, অগ্রসর হয়েছে কোন রূপ বাছ বিচার না করে। এদের সংসদ অধিবেশনে অংশ গ্রহণের সময় কোথায়।

শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভুখা নাঙ্গা দেশবাসীর প্রতি কি দারুণ দরদ সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাদের লোভ লালসায় পরিপূর্ণ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। খালেদা জিয়া সরকারের কাছ থেকে দান হিসেবে ক্যান্টনমেন্টে সাড়ে ১০ বিঘা জমির উপর সুবিশাল ভবন রাজি এবং গুলশানে আর একটি ভবন নিয়েছেন। শেখ হাসিনাও অনুরূপ সরকারী দান হিসেবে নিজের নামে গণভবন এবং বোনের জন্য একটি বিশাল ভবন জাতীয় সংসদে আইন পাস করে নিয়ে নিয়েছিলেন। যদিও নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করতে না পারায় ভবন দুটি তাদের নিজেদের দখলে রাখতে সক্ষম হননি। হাসিনা তার মাতাল মদ্যপ প্রবাসী সন্তান জয়কে রাজনীতিতে টেনে এনেছেন, খালেদা জিয়া তার অযোগ্য, অপদার্থ, অর্ধশিক্ষিত, লোভী সন্তান তারেক জিয়াকে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব হিসেবে নিয়োগ দিয়ে তাকে রাজনীতিক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন এটা আর কিছু নয়, বংশানুক্রমিক ক্ষমতার রাজনীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। এর মধ্যেও রয়েছে খালেদা- হাসিনার হীনস্বার্থ। এরা দুজনেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা দান করে রাজনীতিতে ছড়িয়ে দিয়েছেন- ভোগবাদী নীতি। এর ফলে রাজনৈতিক দলসমূহের শীর্ষ নেতা থেকে পাতি নেতা পর্যন্ত সকলেই দুর্নীতির পাঁকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এমন কোন সংসদ সদস্য নেই যাকে দুর্নীতি স্পর্শ করেনি। দুর্নীতি করার নিত্য নতুন পথ উন্মুক্ত করেছে সরকার। দুর্নীতির সুযোগ করে দেয়া হয়েছে গাড়ী আমদানীর লাইসেন্স দিয়ে, অন্যায় আরো বহুবিধ সুযোগ- সুবিধা দিয়ে। সেসব এখন ধরা পড়ছে সেনাবাহিনী ব্যাক্টড তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে। এ সরকারই গণদেবতাদের চোখ খুলে দিয়েছে কয়েকশ' রাজনীতিকের তালিকা প্রদান করে।

এখন এক অথবা দু'কোটি টাকা মূল্যের একাধিক গাড়ীর মালিকের সন্ধান মিলেছে। সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রীর ক্যাডিলাক গাড়ী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যানের বিলাস বহুল বিএম ডব্লিউ, অনুরূপ গাড়ী সিলেটের এক সাবেক এমপি এবং প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিবের ইনফ্যানিটি কি এক্স- ৫০ তিনটি গাড়ি। ঢাকার সাবেক এক এমপির এবং জনৈক সাবেক প্রতিমন্ত্রীর বাড়ী থেকে পাঁচটি করে বিলাসবহুল গাড়ী জব্দ করা হয়েছে। দুর্নীতির বৈচিত্র আমরা প্রতিদিন খবরের কাগজ থেকে জানতে পারছি। বরিশাল বানাড়ী পাড়ার সাবেক এমপি ও হুইপ শুধু তার ব্যবহারের

জন্য ১০ বছর ধরে সড়ক ও জনপদের একটি ফেরী নিজ দখলে রেখেছিলেন।

বাংলাদেশ ব্যাংকের এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে যে, দেশের ব্যাংকিং খাতে খেলাপী ঋণের পরিমাণ ২০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের ৪ বাণিজ্যিক ব্যাংকের ১১ হাজার ৫শ ৩ কোটি টাকা। অন্যদিকে ২০০৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাংকসহ দেশের সবগুলো ব্যাংক ১১ হাজার ৬০৭ কোটি টাকার খেলাপী ঋণ মওকুফ করেছে। এর মধ্যে ৪ রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের মওকুফ কৃত ঋণের পরিমাণ ৪ হাজার ৯০ কোটি ৫৪ লাখ টাকা।

সম্প্রতি দুর্নীতির দায়ে যাদের ব্যাঙ্ক একাউন্ট জব্দ করা হয়েছে তাদের প্রদর্শিত আয়ের চেয়ে অপ্রদর্শিত আয়ের পরিমাণ ৪০ গুণ বেশী। এ ৫৫ জনের অপ্রদর্শিত আয়ের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকার ও বেশী।

গত ২৭ মার্চ জাতীয় প্যারেড ময়দানে মুক্তি যোদ্ধাদের সম্মানে আয়োজিত এক চা চক্রে সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল মইন ইউ আহমদ বলেন, দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকরা দেশের সম্পদ লুট করে বিদেশে পাচার করেছে। তিনি বলেন, বিগত সরকারের আমলে কেবল বিদ্যুৎ খাত থেকেই বিদেশে পাচার হয়েছে ২০ হাজার কোটি টাকা।

গিয়াস উদ্দিন আল মামুন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার জ্যেষ্ঠ পুত্র তারেক রহমানের বন্ধু হওয়ার সুবাদে কত অজস্র টাকা অবৈধ পন্থায় অর্জন করেছে তার সঠিক হিসাব এখনো মিলেনি। মামুন স্বীকার করেছে যে, বিদেশী ব্যাংকে তার ৩০০ কোটি টাকা রয়েছে যা সে অবৈধ পন্থায় উপার্জন করেছে এবং অবৈধভাবে পাচার করেছে। এর বাইরেও তার রয়েছে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি।

দুদকের নির্দেশ মোতাবেক সম্পত্তির হিসেব দাখিল করা বিশিষ্ট ব্যক্তি ও তাদের ৬ পরিবারের কাছে ৮০০ কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে। তাদের হিসেব বহির্ভূত আরো যে অনেক সম্পত্তি রয়েছে সেটা এখনো অনাবিস্কৃত। তবে এই ৬ পরিবারের কাছে ব্যাংক পাবে ৪ হাজার কোটি টাকা। এই ৬ জন হলেন বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহ আলম, আওয়ামী নেতা আকতারুজ্জামান বাবু, আওয়ামী নেতা আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ,

সাবেক আওয়ামী এমপি হাজী সেলিম, হাজী মকবুল হোসেন, যুবলীগের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর কবির নানক। দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে যে শতাধিক লোকের নাম ও বিবরণ আমাদের সামনে এসেছে এটাকেও বলা যায় যৎকিঞ্চিত। জনগণের বিশাল সম্পদ এখন কয়েক শ' অথবা কয়েক হাজার লোকের কুক্ষিগত আর এরা সকলেই রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। এই দুর্বৃত্তরা জনগণকে মনে করে তাদের গোলাম। হাসিনার বিরুদ্ধে কয়েকটি দুর্নীতি মামলা ঝুলছে। এখন পর্যন্ত খালেদার নামে দুর্নীতির মামলা দায়ের না হলেও তার সন্তান অসংখ্য দুর্নীতির বোঝা কাঁধে নিয়ে কারাগারে। বিগত সময়গুলোতে রাজনীতির নামে হিংসা বিদ্বেষ ছড়িয়ে দ্বন্দ্ব সংঘাতের দিকে তাড়িয়ে নেয়া হয়েছিল জনগণকে এবং সব সময় চলছিল জনগণকে বিভক্ত রাখার প্রয়াস আর যখনই রাজনীতি বন্ধ করা হল তখন আর হিংসা বিদ্বেষ দ্বন্দ্ব সংঘাত হাওয়া হয়ে গেল। এর কারণ কি? এর কারণ হল, জনগণের নামে কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা এখন ক্রিয়াশীল নয়। প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার সাহস তারা হারিয়ে ফেলেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষক ডক্টর মইনুল হোসেন ঠিকই বলেছেন- 'ব্যাংকগুলো সারাদেশ থেকে আমানত কুড়িয়ে এনে ৫০০ লুটেরাদের হাতে ব্যাংক ঋণের মাধ্যমে তুলে দিচ্ছে এখন ৩০ হাজার কোটি টাকা ব্যাংক খ্যাতে। ১২ হাজার কোটি টাকা অপসরণ অথবা অন্যখাতে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। ব্যাংকগুলোও দুর্নীতিবাজদের সহযোগী এবং তাদেরকে অধিকতর দুর্নীতিতে নিমজ্জিত করেছে। অর্থনীতিবিদ সমিতির এক ওয়ার্কসপে আইন উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন যা বলেছেন, সেটা মোটেও ফেলে দেয়ার নয়। তিনি বলেছেন, দুর্নীতি ও অপচয় না হলে দেশের প্রবৃদ্ধির হার দুই অঙ্কে পৌঁছে যেত। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অভিযান এখনো অব্যাহত রয়েছে। এ সংক্রান্ত ফিরিস্তি অনেক লম্বা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে চলমান এই দুর্নীতি বিরোধী অভিযান থেকে যে মজার তথ্য বেরিয়ে আসছে সেটাই এখানে তুলে ধরা দরকার।

বাংলাদেশের ৩৬ বছর অতিবাহিত হলেও পঞ্চমবাহিনী ও দিল্লীর সেবাদাসরা সংঘবদ্ধ হয়ে সমস্বরে আওয়াজ তুলছে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি এবং বিপক্ষের শক্তি বলে। এটা করা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে জাতিকে বিভক্ত রাখার জন্য। তারা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি যাদেরকে বলছে তাদের উপস্থাপন করা হচ্ছে ধোয়া তুলসীর পাতা হিসেবে। যাদেরকে তারা বলছে

স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি তাদের উপস্থাপন করা হচ্ছে চরিত্রহীন লম্পট ও খলনায়ক হিসেবে। কিন্তু চলমান দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে যাদের পাকড়াও করা হচ্ছে তারা সকলেই স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি। স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তির একজনের নামও খবরের কাগজে দেখতে পাওয়া যায় না। শেখ মুজিব স্বাধীনতার মূল নায়ক এবং অনুসারীরা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি। জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক অতএব এর অনুসারীরা ও স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি। আওয়ামী লীগ বিএনপির নেতা কর্মীরাই যে সীমাহীন দুর্নীতির পাঁকে নিমজ্জিত এটা প্রমাণিত সত্য এবং দিবালোকের মত পরিষ্কার।

ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো টিকে থাকার কারণ

সিরাজের পতনের মধ্য দিয়ে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পত্তন হয়েছিল এই বাংলায়, তারা ১৯০ বছর শাসন করেছিল এদেশ। ঔপনিবেশবাদী বৃটিশদের ধারাবাহিক শোষণের মধ্যদিয়ে এদেশে ভয়াবহ দরিদ্র অবস্থার সৃষ্টি হয় স্থানীয় দালালদের সহযোগিতায়। শোষণকে পাকা পোক্ত করে তোলার জন্য তারা ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো গড়ে তোলে। এই শোষণমূলক শাসন কাঠামো বিন্যস্ত করার জন্য তিনটি কৃত্রিম স্তর গড়ে তোলে।

(১) সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করে বৃটিশরা জনগণকে শোষণ করার জন্য।

(২) মধ্যবর্তী স্তর গঠিত হয়েছিল বৃটিশদের অনুগত দালালদের নিয়ে। এরাই হল জমিদার ও রাজকর্মচারী। শোষণ সুসংহত করার জন্য মধ্যবর্তী স্তরে দেয়া হয় মেকি আভিজাত্যের প্রলেপ। এরাই জনগণকে শোষণ পীড়ন করার জন্য বৃটিশদের হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।

(৩) সর্বনিম্ন স্তরে রাখা হয় ৯৯ শতাংশ মানুষকে। যারা তাদের মেধা সৃজনশীলতা ও মেহনত দিয়ে সম্পদ সৃষ্টি করে। এরাই ঔপনিবেশবাদী চক্রের নির্মম শোষণের শিকারে পরিণত হয়।

শেষ কথা

মুর্শিদাবাদের সেই ঐতিহাসিক পলাশী এবং কুষ্টিয়া মেহেরপুরের আম্রকানন খুব বেশী দুরে নয়। মাত্র কতক মাইলের ব্যবধান। দুই আম্রকাননের মধ্যে বিস্তর সাদৃশ্য রয়েছে বলে পর্যবেক্ষকরা মনে করেন। দুই আম্রকাননের ঐতিহাসিক চরিত্রের কোন ভিন্নতা নেই। সমগ্র ভারতে মুসলিম শাসন অবসানের নিমিত্ত সর্ব ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য ষড়যন্ত্রের প্রথম সাফল্য দৃশ্যমান হয় পলাশীতে। কুষ্টিয়া মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় আম্রকাননেও অনুরূপ উপমহাদেশে মুসলিম শাসন অবসানের লক্ষ্যে দীর্ঘ মেয়াদী সর্ব ভারতীয় নেপথ্য ষড়যন্ত্র স্বাধীন বাংলার ছদ্মাবরণে বিমূর্ত হয় ১৯৭১ সালে।

উপমহাদেশের খণ্ডিত অংশ সিন্ধুতে ৭১২ খৃঃ মোহাম্মদ বিন কাসেমের সফল অভিযানের মধ্য দিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বৈষম্যমূলক সমাজ কাঠামো প্রকম্পনের শুভ সূচনা হয়। পরবর্তীতে সুলতান মাহমুদ ও মুহাম্মদ ঘোরীর সমরাভিযানের ফলে ভারতের অধিকাংশ এলাকায় মুসলমানদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর ১১৯৭ থেকে ১৫২৫ সাল অবধি তুর্ক আফগান মুসলমানরা সমগ্র ভারতের ওপর তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত রাখে। পরবর্তীতে অনৈক্য ও ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে ক্রমশ তারা দুর্বল হয়ে পড়ে। এই সুযোগে মধ্য এশিয়ার জহির উদ্দিন মুহাম্মদ বাবর মধ্য এশিয়া থেকে ভারতে সমরাভিযানে এসে ১৫২৬ সালে পানিপথের যুদ্ধে ইব্রাহিম লোদীকে পরাস্ত করে রাজধানী দিল্লীকে তার কবজায় নিতে সক্ষম হন। দিল্লী দখলে এলেও তখন পর্যন্ত তার অবস্থান শক্তিশালী হয়নি এমতাবস্থায় তাকে ভয়াবহ সঙ্কটের সম্মুখীন হতে হয়।

মুসলমানদের ভ্রাতৃঘাতী লড়াই চলাকালীন সময়ে হিন্দু রাজা মহারাজারা ভারতে মুসলিম আধিপত্য বিনাশ করার জন্য সঙ্গোপণে সংঘবদ্ধ হতে থাকে। এটা ছিল তাদের হিন্দু আধিপত্য পুনরুদ্ধার প্রয়াস। বাবর দিল্লী কবজা করার এক বছরের মধ্যে ভারতের ১২০ জন রাজা মহারাজা সংঘবদ্ধ হয়ে মুসলিম শক্তি উৎখাতের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেন। বাধ্য হয়ে বাবরকে আকস্মিক সংঘাতের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। বাবর তার মাত্র ১০ হাজার সৈন্য নিয়ে প্রতিপক্ষের ৫০ হাজার অশ্বারোহী ৫শ' রণহস্তী এবং লক্ষ লক্ষ

পদাতিক সৈনিকের মুকাবিলা করে আগ্রার অদূরে খানুয়ায় সম্মিলিত হিন্দু শক্তিকে বিধ্বস্ত করে দেয়। সেই থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মুসলিম শক্তিকে মুকাবিলার উচ্চাশা নিঃশেষ হয়ে যায়। এমতবস্থায় থেকে তারা কৌশল বদলে ফেলে এবং সম্মুখ সমর পরিহার করে। যে কৌশলে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বৌদ্ধবাদীদের উপমহাদেশ থেকে উৎখাত করেছে সেই কূটকৌশল দিয়ে মুসলমানদের উৎখাতের উদ্যোগ নেয়। মুসলিম শক্তির সাথে বৈরিতা নয় সখ্য বজায় রেখে চলার নীতি অবলম্বন করে। তারা আপোষে কন্যা দান করে, তোষামোদ ও এক ধরনের মেকি আনুগত্য প্রদর্শন করে তৎকালীন রাজনীতির নিয়ন্ত্রকে পরিণত হয় এবং অন্দর মহল ও রাজ দরবারকে অক্টোপাশের মত বেধে ফেলে এ ছাড়াও পরিকল্পিতভাবে ঠান্ডা মাথায় অতি সন্তর্পণে মুসলমানদের মধ্যে অনৈক্যের বীজ বপন করে চলে। তাদেরই প্ররোচনায় মুসলমানরা ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধে লিপ্ত হয়। এসবের অনিবার্য পরিণতি দৃশ্যমান হয়ে ওঠে পলাশীতে। মুসলিম শক্তি বিনাশের ব্যাপারে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের কূটকৌশল খানুয়ার যুদ্ধোত্তর ১৯৫ বছর ব্যবধানে সাফল্যের মুখ দেখে পলাশীতে। সেটাও বিশ্বাসঘাতকতার মাধ্যমে অন্যের ঘাড়ে বন্দুক রেখে এবং মীর জাফরকে শিখণ্ডি বানিয়ে।

অন্যদিকে কায়দে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর অনমনীয় নেতৃত্ব তার দূরদর্শিতা এবং তার ক্ষুরধার যুক্তির কাছে হার মেনে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন যখন ভঙ্গ হল তখনই তারা পাকিস্তানকে অখণ্ড ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার পরিকল্পনা নেয়। পরিকল্পিতভাবে ধাপে ধাপে তারা আগ্রাসনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। জুনাগড় মানভাদার এবং হায়দারাবাদ দখল করে কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু সেটা আগের মত বিনা যুদ্ধে জয় সম্ভব হয়নি। প্রবল গণ প্রতিরোধের মুখে থমকে দাঁড়াতে হয় দিল্লীকে। সহজে কাশ্মীরকে গেলা সম্ভব হল না। গলার কাঁটা হয়ে আজো কাশ্মীর ভারতকে যন্ত্রণা দিচ্ছে।

কাশ্মীরের পর তাদের লক্ষ্য ছিল পূর্ব পাকিস্তানের দিকে। ১৯৫০ সালে পূর্ব পাকিস্তান দখলের নীল নক্সা প্রণয়ন করেও দিল্লী তার লক্ষ্য থেকে ফিরে আসে। কারণ সেই সময় আর এক কাশ্মীর সৃষ্টি করে যন্ত্রণার আগুনে ঝাপ দেয়া প্রধানমন্ত্রী নেহেরু ভারতের জন্য কল্যাণকর বিবেচনা করেননি। তখন পূর্ব পাকিস্তান দখলের উদ্যোগ নিলে হয়তো আসাম ত্রিপুরাও বিচ্ছিন্ন

হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত পূর্ব পাকিস্তানের মুসলমানরা হিন্দুস্তানের তৎকালীন আগ্রাসনকে একাত্তরের মত সাদর সম্ভাষণ জানাত এমনটি নয়। অনেক ত্যাগ তিতিক্ষা ও সংগ্রামের বিনিময়ে অর্জিত পূর্ব পাকিস্তানের মাটিতে হিন্দুস্তানী আক্রমণ প্রবল প্রতাপে প্রতিরোধ করতো। এমন কি এ যুদ্ধ গণ যুদ্ধের রূপ নিত এবং বিক্ষুব্ধ অহমিয়ারাও জড়িয়ে পড়ত তাদের সাথে। পরবর্তীতে এ আগুন ছড়িয়ে পড়ত ভারতের সর্বত্র। একারণে ব্রাহ্মণ্যবাদী নেতৃবৃন্দের প্রবল চাপ থাকা সত্ত্বেও ঠান্ডা মাথায় নেহেরু পূর্ব পাকিস্তানে আগ্রাসনের সিদ্ধান্ত নিয়েও কার্যকর করেননি।

সেই সময় তারা যুদ্ধ পরিহার করলেও এমন একটা কৌশল অবলম্বন করলেন যে, প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জনগণের একটা অংশকে কায়দে আযম, পাকিস্তান এবং মুসলিম লীগের প্রতি বিরূপ করে তোলা যায়। শুরু হল অপ- প্রচার, কায়দে আযম পাকিস্তান ও মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে। বলা হল বাংলা বিভক্ত হয়েছে মুসলিম লীগের কারণে। বলা হল জিন্নাহ কোলকাতা নেয়নি করাচীকে রাজধানী বানানোর জন্য ইত্যাদি ইত্যাদি। ইতিহাসের বিপরীত চিত্র অবলম্বন করে প্রচারাভিযান চলতে থাকল। পাকিস্তান ভুমিষ্ট হওয়ার আগেই পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে পাকিস্তান বিরোধী করার নীল নক্সা তৈরী করে রেখেছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী বিশেষজ্ঞরা, কোলকাতা থেকে পরিচালিত কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট পার্টির মাধ্যমে। ভারতের প্ররোচনায় ভারতের আর্থিক সহযোগীতায় ভাষা আন্দোলনের সূচনা হল। ভারতীয়রা এমন কি পশ্চিম বঙ্গের বাংলা ভাষীরা হিন্দি ভাষাকে সমগ্র ভারতের রাষ্ট্র ভাষা হিসেবে মেনে নিলেও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে রাষ্ট্র ভাষা উর্দুর বিরুদ্ধে বিক্ষুব্ধ করে তোলার জন্য ইন্ধন যোগাতে লাগল, নৈতিক ও বৈষয়িক সহযোগিতা দান করে। কোলকাতা থেকে পরিচালিত কংগ্রেস এবং কমিউনিস্ট পাটি এবং দিল্লীর সাহায্য পুষ্ট লঘুচেতা বুদ্ধিজীবিরা সুকৌশলে পূর্ব পাকিস্তানের অবহেলা ও বঞ্চনার সব দায়- দায়িত্ব মুসলিম লীগ ও পাকিস্তানের ঘাড়ে চাপিয়ে কিস্তিমাত করে তুলল। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকারী দল মুসলিম লীগের অনিবার্য পতনের মধ্য দিয়ে প্রকৃত পক্ষে শুরু হল ভারতের অগ্রাভিযান।

এভাবে পেরিয়ে গেল পাকিস্তানের কয়েকটা বছর। রাজনৈতিক অরাজকতার প্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আইয়ুব খান, গভর্ণর আব্দুল

মোনয়েম খান দীর্ঘকালের বৈষম্য দূর করার উদ্যোগ নিলেন। অজস্র কলকারখানা স্থাপিত হতে থাকল। জনগণের জীবনের মান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাওয়া শুরু হল। পরিকল্পনা মাফিক ১৯৭০ সাল নাগাদ সব রকম বৈষম্য অবসানের কথা ছিল। কিন্তু দিল্লী সেটা হতে দিতে চাইল না। এ কারণে ভারত পঞ্চমবাহিনী নির্ভর কোন পরিকল্পনা না নিয়ে স্বনির্ভর কর্মসূচী নিল। সেটা শক্তি প্রয়োগ করে পাকিস্তানের ওপর তার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা। পরিকল্পিতভাবে পাকিস্তানের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়া হয়। এটা এই কারণে করা হল যে সুস্থ ও স্বাভাবিকভাবে পাকিস্তানকে এগিয়ে যেতে দেয়া হলে পাকিস্তানের ঐক্য অটুট থাকবে এবং শীসাঢালা প্রাচীরের রূপ নিবে, যা হবে এমনই দুর্ভেদ্য যে দিল্লী এখানে কখনই তার গোপন অভিলাষ চারিতার্থ করতে সক্ষম হবে না। পরিকল্পিত যুদ্ধের সহায়ক হিসেবে ১৯৬২-৬৪ সালে ভারতে মুসলিম নিধনযজ্ঞ শুরু করা হল। ভারত থেকে বিতাড়িত সর্বহারা মুসলমানদের পুনর্বাসন নিয়ে পাকিস্তানের অর্থনীতির উপর প্রবল চাপের সৃষ্টি করা হল।

এরপর ১৯৬৫ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর ৮০০শত ট্যাঙ্ক এবং বিশাল নৌবহর ও বিমান বহর নিয়ে দিল্লী লাহোর ওয়াগা সেক্টর দিয়ে পাকিস্তানের ওপর ঝাপিয়ে পড়ল। উদ্দেশ্য ছিল ২৪ ঘণ্টার মধ্যে লাহোর দখল করা এবং পাকিস্তানের মূল ভূখণ্ডকে তছনছ করা। এটা সম্ভব হলে পঞ্চমবাহিনী প্রভাবিত পূর্ব পাকিস্তান তো তাদের জন্য নস্যি। কিন্তু আল্লাহর রহমতে ১৭ দিন লড়াই করার পরও ভারত বেশী অগ্রসর হতে পারল না। ভারত যতখানি এলাকা দখল করল পাকিস্তান দখল করল তার চেয়ে অনেক বেশী।

খানুয়ায় বাবরের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের যে অভিজ্ঞতা হয়েছিল দিল্লী অনুরূপ অভিজ্ঞতা অর্জন করল ৬, সেপ্টেম্বর, ১৯৬৫ লাহোর আক্রমন করে। তখন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার দূর্ভেদ্য ঐক্য দেখে দিল্লী যুদ্ধ পরিহার করল। শুরু হল ষড়যন্ত্রের রাজনীতি। পূর্ব পাকিস্তানে ভারত সৃষ্ট পঞ্চমবাহিনীদের সক্রিয় করে তোলা হল। পত্র পত্রিকায় ঘাপটি মেরে থাকা পঞ্চমবাহিনী সক্রিয় ও সরব হয়ে উঠল। তিলকে তাল বানিয়ে তারা তাদের প্রচারনাকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তুলল। মুসলিম লীগ, জামায়াতে ইসলামী ও নেজামে ইসলামী পিডিপিসহ অন্যান্য আরো দেশপ্রেমিক সংগঠনগুলোও প্রচারনার তোড়ে ভেসে গেল।

তারা আন্দোলনের অংশীদার হয়ে উঠল পরিণতির কথা বিবেচনায় না এনে। ভারতের জন্য এই সময় প্রয়োজন ছিল মীর জাফরের মত একজন সর্বজন গ্রাহ্য শিখণ্ডির- যাকে সামনে রেখে আন্দোলনকে তুঙ্গে নেয়া যায়। সেটাও ম্যানেজ হল। শেখ মুজিব পঞ্চমবাহিনীর বরপুত্র হিসেবে আবির্ভূত হলেন। পাকিস্তান নব্য মীর জাফর সনাক্ত করতে ভুল করেনি। ইতোমধ্যে আগড়তলা ষড়যন্ত্র উদঘাটিত হল। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান, গভর্ণর আব্দুল মোনয়েম খান মুজিবকে আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী করলেন। কিন্তু তার বিচার পর্যন্ত অগ্রসর হওয়া সম্ভব হল না। একপেশে প্রচারণা এবং উত্তরোত্তর আন্দোলনের তোড়ে আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রধান আসামী পরিণত হলেন সমকালীন রাজনীতির প্রধান ব্যক্তিত্বে। কি দূর্ভাগ্য আমাদের, যে ভারত পূর্ব বাংলার স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে শুরু থেকে আজ অবধি স্বীকার করেনি, সেই ভারতের একজন ক্রীড়নক পরিণত হল জাতীয় হিরোতে। কি বিচিত্র এই দেশ সেলুকাস!

১৯৭০- এ নির্বাচন হল। সীমাহীন প্রচারনা ও শক্তি প্রয়োগের মধ্য দিয়ে দিল্লীর শিখণ্ডি শেখ মুজিবেরই হল নিরঙ্কুষ বিজয়। নির্বাচনের পর যে কোন মূল্যে পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার কাছে কৃত অঙ্গীকার থেকে মুজিব সরে দাঁড়ালেন। এমন কি সমগ্র পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী হওয়াকেও এড়িয়ে আঞ্চলিক রাজনীতির মহানায়ক হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। তার বিবেক বুদ্ধি দিয়ে নয়- দিল্লী প্রণীত নীল নক্সার ছক অনুযায়ী। যে কোন মূল্যে পাকিস্তান টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে ইয়াহিয়ার সদিচ্ছা প্রসূত অনুরোধ শেখ মুজিব উপেক্ষা করলেন- মঞ্চে সরব ভাবাবেগে আপ্লুত জনগণ মুজিবের নেপথ্য কর্মকান্ডের ব্যাপারে রয়ে গেল অন্ধকারে। এটা সম্ভব হয়ে ছিল কমিউনিষ্ট ও আঞ্চলিকতাবাদী বাম সাংবাদিকদের মিডিয়ায় প্রাধান্য থাকার কারণে। মুজিবের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের দাবী তথাকথিত স্বাধীন বাংলার দাবীতে পরিণত হল। ইয়াহিয়া বিতর্কিত ৬ দফা মেনে নিয়ে হলেও- যে কোন মূল্যে পাকিস্তানকে টিকিয়ে রাখার সদিচ্ছা নিয়ে ঢাকায় এলেন। মুজিব, ইয়াহিয়ার কাছে নির্বাচন পূর্ব এবং নির্বাচনোত্তর অঙ্গীকার এড়িয়ে সরাসরি স্বাধীনতার দাবী উত্থাপন করলেন। নির্বাচনের আগে মুজিব কখনো স্বাধীনতার কথা বলেননি। স্বাধীনতার প্রশ্নে মুজিবের আপোষহীন অবস্থানের কারণে সংলাপ ব্যর্থ হল। ওদিকে মুজিব ও আওয়ামী লীগ অসহযোগ আন্দোলনের নামে

প্রশাসনিক অচলাবস্থা সৃষ্টি করে, অরাজকতার শেষ প্রান্তে নিয়ে এলেন দেশকে। খুনী ও লুটেরাদের সংঘবদ্ধ করে আওয়ামী লীগ অবাঙালীদের সম্পদ লুট করল। নির্বিচার গণহত্যা ও ধর্ষণ চালিয়ে কম পক্ষে ৬০ হাজার অবাঙালী বনি আদমকে নিঃশেষ করা হল ঠাণ্ডা মাথায়। এতে হিন্দুস্তানের বর্বর খুনী লম্পটদেরও ব্যবহার করা হয়েছিল। সবকিছু জেনেও সমকালীন মানবতাবাদীরা ও মিডিয়াসমূহ নীরব ছিল। এই অবাঙালী মুসলমান গণহত্যাও ছিল দিল্লীর সুদূর প্রসারী নীল নক্সা। দিল্লী জানতো যে ব্যাপারটা এখানেই থেমে থাকবে না। দিন বদলের পর নির্যাতীত অবাঙালী ও অবাঙালী সৈনিকরা ভয়ঙ্কর হয়ে উঠবে এবং বাঙলাভাষীদের ওপর চড়াও হবে। হলোও তাই, পাক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হওয়াকালীন কিছু হত্যা ও কিছু নিপীড়নের ঘটনা ঘটল। এসব ঘটনা তিলকে তাল করে প্রচারিত হল বহির্বিশ্বে ভারতীয় মিডিয়ার কল্যাণে যাতে তরুণদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার হয়। এর ফলে প্রাণ ভয়ে পালিয়ে আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীসহ সব ধরনের অগণিত মানুষ ভারতে আশ্রয় নিল। অবশেষে এরাই পরিণত হল তৎকালীন রাজনীতির দাবার ঘুটিতে। এদের ব্যবহার করে দিল্লী পূর্ব পাকিস্তানে ধ্বংসাত্মক কর্মকান্ড শুরু করল। যাদের দেশ তারাই হিন্দুস্তানের ক্রীড়নক হয়ে স্বদেশে আত্মঘাতী কর্মকান্ডে লিপ্ত হল। দিল্লী রয়ে গেল নেপথ্যে। কি দারুন সূক্ষ্ম পরিকল্পনা। অবশেষে ২৪ বছরের ধারাবাহিক পরিকল্পনার ইতি টানতে চাইল ভারত কুষ্টিয়ার মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায় যা এখন মুজিব নগর হিসেবে খ্যাত। সেখানে বাংলাদেশ সরকার গঠন করে। আপোষের পথ বন্ধ হয়ে গেল। ভারতে আশ্রয় নেয়া নেতৃবৃন্দ সেনাবাহিনী বিডিআর অফিসার, জোয়ান ও অন্যান্য তরুণদের সামনে লড়াই ছাড়া বিকল্প কিছু রইলো না। ভারত যুদ্ধের যোগান দিল অস্ত্র ও রসদ সরবরাহ করে। শুরু হল ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ উভয় পক্ষে নিহত হল মুসলমান। ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধ তুঙ্গে নেয়া হল পাক বাহিনীকে বেসামাল করার জন্য। এক পর্যায়ে ভারত পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করে বসলো। অবশেষে পাক বাহিনীর আত্মসমর্পনের মধ্য দিয়ে সবকিছুর সমাপ্তি হল। ভারতীয় বাহিনীর বুটের নীচে নিস্পিষ্ট হয়ে নীরবে কাঁদতে থাকল আমাদের পূর্ব পুরুষদের অর্জিত পূর্ব পাকিস্তান। হাজার বছর পর বিজয়ী হল ব্রাহ্মণ্যবাদীরা খানুয়ার যুদ্ধের ১৯৫ বছর পর ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাদের পরাজয়ের গ্লানী দূর করল পলাশীতে, মুসলিম আধিপত্যের অবসান ঘটিয়ে। অন্যদিকে অখণ্ড

ভারত প্রতিষ্ঠার ব্যর্থতা এবং ১৯৬৫ সালে পাকিস্তান দখলের ব্যর্থতা ও পরাজয়ের গ্লানী দূর করতে সক্ষম হল মাত্র ৭ বছরের ব্যবধানে। দিল্লীর এ বিজয় ও সাফল্যের ব্যাপারে সব কিছুর যোগান দিলাম আমরা।

বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা'র পতন ও তার হত্যাকাণ্ডের পেছনে ছিল তারই সেনাবাহিনীর অধিনায়করা এমন কি তখনকার জনগণও। অনুরূপ পূর্ব পাকিস্তানের পতনেও এদেশের সামরিক কর্মকর্তা, জোয়ান এবং জনগণের অধিকাংশকে দেখা গেছে আনন্দে উদ্বেল হতে, পলাশীতে মুসলিম আধিপত্যের অবসান হলেও ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি প্রত্যক্ষভাবে বিজয়ী হওয়ার গৌরব অর্জন করেনি। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তান পতনের মধ্যে দিয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা মুসলিম শক্তির ওপর প্রত্যক্ষভাবে বিজয়ী হয়েছে। তাদের এ বিজয় হাজার বছরের মধ্যে এই প্রথম। পলাশীতে সিরাজের পতনের পর গণ মানুষের সম্পদ, রাজকোষ লুণ্ঠন নৈরাজ্য এবং সীমাহীন শোষণের সূচনা হলে রাজনৈতিক বিশৃংখলা ও অনাচারের ফলে সমগ্র বাংলায় দুর্ভিক্ষ কড়া নাড়তে ১৩ বছর সময় নিয়েছিল। কিন্তু এখানে ভারতীয় সেনা বাহিনী ও আওয়ামী লীগের লুণ্ঠন এমন বেপরোয়া হয়েছিল এবং সামাজিক বিশৃংখলা নৈরাজ্য ও রাজনৈতিক অনাচার এমন তুঙ্গে উঠেছিল যে বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহ অব্যাহত থাকা সত্ত্বেও মাত্র ৩ বছরের ব্যবধানে শেখ মুজিবের স্বাধীন বাংলায় মন্বন্তর ও দুর্ভিক্ষ উলঙ্গ নৃত্য করেছে।

এবার আর এক বিষয়ের ওপর আলোকপাত করা যাক সেটা হল সিরাজের পতন এবং পূর্ব পাকিস্তানের নেপথ্য ষড়যন্ত্রকারী এবং ষড়যন্ত্রের সহযোগীদের মর্মান্তিক পরিণতির মধ্যে সাদৃশ্য।

প্রথমে পলাশী ট্রাজেডীর নেপথ্য নায়কদের পরিণতির কথা স্মরণ করা যাক। সিরাজ হত্যার মূল নায়ক ছিলেন মীর জাফর তনয় মীর মোহাম্মদ সাদেক আলী খান মিরন। মিরন সিরাজের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। সিরাজের মাতা আমেনা বেগম এবং ঘষেটি বেগম হত্যার নায়কও তিনি। মিরন নিহত হয় ইংরেজদের হাতে। মেজর ওয়ালেস তাকে গোপনে হত্যা করে।

সিরাজকে প্রত্যক্ষভাবে হত্যা করে মুহাম্মদী বেগ। পরবর্তীতে তার মস্তিস্ক বিকৃতি হয় এবং অকারণে কুপে ঝাপিয়ে মৃত্যুবরণ করে।

পলাশী ট্রাজেডির শিখণ্ডি এবং সিরাজের প্রধান সেনাপতি ছিলেন মীর জাফর আলী খান তিনি পবিত্র কুরআন হাতে নিয়ে সিরাজের পাশে থেকে লড়াই করার অঙ্গীকার করেছিলেন। কিন্তু সেই অঙ্গীকার পূরণ করেননি তিনি। রণাঙ্গণে পুতুলের মত দাড়িয়ে থেকে তিনি ইংরেজদের বিজয়ের প্রতিক্ষা করছিলেন। প্রকৃতি এর নির্মম প্রতিষোধ নিয়েছিল। তিনি দুরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

পলাশী ট্রাজেডির নীল নক্সা প্রণয়নকারী হলেন জগৎশেঠ। ইংরেজদের সাথে মীর কাসেমের যুদ্ধ বাধলে বার বার পরাজিত হওয়ার পর মীর কাসেম উপলব্ধি করেন স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার প্রয়াসে তার ব্যর্থতার মূলে রয়েছে জগৎশেঠ। তিনি তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত নিয়ে জগৎশেঠকে মুঙ্গেরের অতুচ্চ দূর্গ শিখর থেকে গঙ্গা গর্ভে নিক্ষেপ করেন। সেখানেই তার সলিল সমাধী হয়।

ইয়ার লতিফ ছিলেন সিরাজের আর একজন সেনাপতি। তিনি ষড়যন্ত্রের সাথে গভীরভাবে সম্পৃক্ত ছিলেন। রনাঙ্গণে তিনি সকল সৈন্যসহ ছবির মত দাঁড়িয়ে সিরাজের পতনের প্রতীক্ষা করছিলেন। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস তিনি সিরাজের পতনোত্তর উৎসবে যোগ দিতে পারেননি, যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে তিনি নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যান। হতে পারে কোন দেশপ্রেমিক সৈনিক তাকে হত্যা করেছিল। আর এক ষড়যন্ত্রকারী নন্দকুমার তহবিল তছরূপ এবং অন্যান্য কারণে আদালত কর্তৃক প্রাণদণ্ডে দন্ডিত হন।

রায় দুর্লভ নবাবের একজন সেনাপতি মীর জাফরের সহযোগী হয়ে নীরব দর্শকের ভূমিকা নেন। কিন্তু যুদ্ধ ক্ষেত্রে আততায়ীর হাতে তিনি নিহত হন। উমিচাঁদ ইংরেজ কর্তৃক প্রতারিত হয়ে মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন এবং উন্মাদ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। রাজা রাজ বল্লভ তার কীর্তি সহকারে পদ্মা গর্ভে বিলিন হয়ে যান। দানিশ শাহ বিষাক্ত সর্প দংশনে মুত্যুবরণ করেন।

রবার্ট ক্লাইভ ছিলেন ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব। বিজয়ের পর তিনি অনেক সম্পদের মালিক হয়ে ইংল্যান্ডে ফিরে যান। সেখানে তিনি যে কোন কারণেই হোক আত্মহত্যা করেন। কেউ বলে গলায় ক্ষুর চালিয়ে কেউ বলে টেমসে ঝাপ দিয়ে। যাই হোক তার মৃত্যু হয়েছিল অস্বাভাবিক।

ওয়ার্টস মীর জাফরের সাক্ষ্য এনে ষড়যন্ত্রে উল্লেযোগ্য ভূমিকা রাখেন। পরবর্তীতে কোম্পানী তাকে বরখাস্ত করে। দেশে ফিরে তিনি মনের দুঃখে আত্মহত্যা করেন।

ষড়যন্ত্রের পেছনে ক্র্যাফটনের বিশেষ ভূমিকা ছিল। বাংলার বিপুল সম্পদ লুণ্ঠন করে লণ্ডনে যাবার সময় জাহাজ ডুবিতে তার মৃত্যু হয়। ষড়যন্ত্রকারী ওয়ালটন ভগ্ন স্বাস্থ্য হয়ে কোলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

মীর কাসেম পলায়ন পর নবাব সিরাজকে ভগবান গোলা থেকে বেধে এনেছিলেন মুর্শিদাবাদে। এক পর্যায়ে মীর জাফরকে সরিয়ে ইংরেজরা মীর কাসেমকে নবাবের আসনে সমাসীন করেন। অল্প দিনের মধ্যে ইংরেজদের সাথে মীর কাসেমের দ্বন্দ্ব শুরু হয়। ইংরেজদের সাথে কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তিনি নিরুদ্দেশ যাত্রা করেন। অবশেষে দিল্লীতে তাকে এক বেওয়ারিশ লাশ হিসেবে সনাক্ত করা হয়, তার চাপকানে মীর কাসেম লেখার সূত্র ধরে।

উপমহাদেশের নির্যাতিত সংখ্যালঘু মুসলমানদের শেষ ভরসা এবং সর্বশেষ আশ্রয় স্থল হিসেবে পাওয়ার জন্য পাকিস্তান আন্দোলন হয়েছিল। সংখ্যা গরিষ্ঠ বৈরী হিন্দু জনগোষ্ঠীর নিষ্পেষন থেকে আত্মরক্ষার জন্য এবং আমাদের অনাগত ভবিষ্যৎ নিরাপদ করার জন্য আমাদের পূর্ব পুরুষরা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের বিরোধীতার মুখে অখণ্ড ভারতের মানচিত্র কেটে দুই ডানা বিশিষ্ট পাকিস্তান ছিনিয়ে এনেছিল। আমাদের পূর্ব পুরুষদের এই আমানত ধ্বংস করার জন্য যারা ষড়যন্ত্র করেছে তারা পলাশী ষড়যন্ত্রের নায়কদের চেয়ে কোন অংশে কম নয়, বরং তা থেকে আরো বেশী মর্মান্তিক আরো বেশী ভয়ঙ্কর পরিণতির সম্মুখীন হয়েছে।

পূর্ব পাকিস্তানের দুঃসহ ট্রাজেডীর মূল হোতা তিন কুচক্রী মুজিব, ভুট্টো এবং ইন্দিরা। এই তিন জনের মৃত্যু অস্বাভাবিক, মর্মান্তিক ও হৃদয়বিদারক এর মধ্যে শেখ মুজিবকে হত্যা করেছে তারই সহগামী মুক্তি যোদ্ধা সৈনিকরা যারা এক সময় ছিল মুজিবের সম্মোহনী শক্তির আওতায় নিয়ন্ত্রিত নেশা গ্রস্তের মত বুদ হয়ে। তথাকথিত সোনার বাংলার যে অলীক স্বপ্ন মুজিব দেখিয়েছিলেন সেই স্বপ্ন ভঙ্গের যন্ত্রনায় তারই অনুগামী মোহাবিষ্ট সৈনিকরা তাকে হত্যা করেছে। পচাত্তরের ১৫ আগস্ট একাত্তরের সেই জনপ্রিয় মহানায়কের সবংশ হত্যাকান্ডের ব্যাপারে কোন ধরনের মৃদু

প্রতিক্রিয়া কোথাও হয়নি। এদেশের কোন একজন ও অশ্রু বিসর্জন করেনি বরং জনগণের ওপর চেপে থাকা জগদ্দল পাথর উপড়ে ফেলার জন্য উল্লসিত হয়েছে। সবচেয়ে বড় কথা ষড়যন্ত্রকারী মীর জাফরদের বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিশোধ অথবা তার অপকর্মের সাজা সমকালীন কোনো দেশপ্রেমিক সচেতন বিবেক দিতে সক্ষম হয়নি। মীর জাফর দুরারোগ্য কুষ্ঠ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু মুখে পতিত হন। এটা ছিল কুদরতী ফয়সালা, প্রকৃতির নির্মম প্রতিশোধ। কিন্তু মুজিবের ক্ষেত্রে ঘটেছে ভিন্ন, তিনি যাদের একদিন তার অপকর্মের সহযোগী হওয়ার জন্য উন্মাতাল করেছিলেন তারাই তাকে হত্যা করে দেশটাকে শেষ রক্ষা করেছেন। মুজিব হত্যার পর পরই দিল্লীমুখী স্রোত উজানে বইতে শুরু করে। মুজিবের অপকর্মের সহযোগী এসব মুক্তি যোদ্ধারা বিভ্রান্তির পাঁক থেকে বেরিয়ে এসে প্রমাণ করেছেন যে তারা সত্যিকার অর্থে দেশপ্রেমিক।

আর এক কুচক্রী পশ্চিম পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো নিহত হয়েছেন তারই মনোনীত সেনাবাহিনী প্রধান জিয়াউল হকের শাসনামলে। আদালতের বিচারে তার ফাঁসির নির্দেশ দেয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানের দুঃসহ ট্রাজেডীর জন্য তার চাতুরীপূর্ণ অবস্থান কম দায়ী নয়।

পূর্ব পাকিস্তানে ভ্রাতৃঘাতী লড়াই অকারণ হত্যাযজ্ঞের নীল নকশাকারক তো ছিল তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর- মুজিব ছিলেন তার ক্রীড়নক মাত্র। ইন্দিরার পরিণতি কি হয়েছিল? অতি সতর্কতার পরও তার দেহ রক্ষীদের ব্রাস ফায়ারে একেবারে ঝাঝরা হয়ে গিয়েছিল তার সর্বাঙ্গ।

জেনারেল ভগবৎ সিং নিজে একজন উচ্চপদস্থ সেনা শিখ কর্মকর্তা ছিলেন। তিনি একাত্তরে জেনারেল ওবানের সাথে বাংলাদেশের মুক্তি বাহিনীর ট্রেনিং এর পরিকল্পনা বাস্তব ট্রেনিং প্রদান ইত্যাদি কাজে যুক্ত ছিলেন। জেনারেল অরোরা যিনি কিনা একাত্তরে পূর্ব পাকিস্তান আক্রমণ করার সেনা নায়ক ছিলেন। তিনিও একজন শিখ ছিলেন। শিখদের মুসলিম বৈরীতার ইতিহাস সুদীর্ঘ। হয়ত এ কারণেই জেনারেল অরোরাকে ইন্দিরা পূর্ব পাকিস্তান আক্রমন করার প্রধান সেনা নায়ক নিযুক্ত করেছিলেন। যাহোক ভগবৎ সিং ও একই কারণে মুক্তিযোদ্ধাদের ট্রেনিং দান ও পাকিস্তান

ভাঙ্গার জন্য তাদের যথেষ্ট উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। কিন্তু ভাগ্যের কি পরিহাস যে এই ভগবৎ সিং পরে ১৯৮৪ সালের ৫ই জুন যখন ভারতীয় সেনাবাহিনী অপারেশন ব্লু স্টার এর মধ্যে দিয়ে শিখদের অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দির ও আকালতখত ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়। খালিস্তান আন্দোলনের নেতা বিন্দ্রানওয়ালেসহ অনেক শিখ স্বাধীনতা কর্মীকে ভারতীয় সৈন্যরা হত্যা করে, তখন বিন্দ্রানওয়ালে ভগবৎ সিং ও সেখানে ভারতীয় সেনাদের হাতে গুলিতে প্রাণ হারান। বাংলাদেশ স্বাধীন করায় ভগবৎ সিং- এর অবদান থাকলেও নিজেদের দেশ খালিস্তান ভারতীয় বাহ্মণ্যবাদী দখলদারিত্ব থেকে আজও স্বাধীন হয়নি। দেখুন জেমস জে নোভাক এর বাংলাদেশ রিফ্লেকশান্স অন দি ওয়াটার, ইউপিএল, ঢাকা, ২০০৮, পৃ, ১২৪ ও ১৩০)

মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলার আম্রকাননে যারা প্রবাসী সরকার গঠন করেন- তাদের প্রভাবশালী ৪ জনকে হত্যা করা হয়েছিল- ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে। আর এক নতুন ষড়যন্ত্র করার সুযোগ দেয়নি দেশপ্রেমিক সৈনিকরা। নিহতদের মধ্যে ছিলেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজুদ্দিন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী এবং কামরুজ্জামান।

শেখ মুজিব পাক বাহিনীর কাছে আত্মসমর্পনের পর- হয়তো বা স্বাধীন বাংলার আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যেত। মুজিবও হয়তো এটাই চেয়েছিলেন। তিনি 'র' নিয়ন্ত্রিত জঙ্গী ছাত্র ও তরুণদের বেষ্টনী থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য আত্মসমর্পন করেছিলেন। অনেক পর্যবেক্ষকদের ধারণা পাকিস্তান আন্দোলনের একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে তাদেরই সংগ্রামের ফসল পাকিস্তানকে শেষ পর্যন্ত ধ্বংস হতে দিতে চাননি শেখ মুজিব। শেখ মুজিবের আত্মসমর্পনের পর মেজর জিয়া চট্টগ্রামের কালুর ঘাটে স্বাধীনতার ঘোষণা দিয়ে স্তিমিত হয়ে যাওয়া আন্দোলনকে শুধুমাত্র চাঙ্গা করলেন বললে ভুল হবে, আন্দোলনে নতুন মাত্রা যোগ করেছিলেন। সশস্ত্র সংগ্রামের আহবান জানিয়ে দ্বিধাগ্রস্ত বাংলা ভাষী পাকিস্তানী সেনা সদস্য, ইপিআর, পুলিশ ও আনসারদের স্বাধীন বাংলার জন্য লড়াই করতে উদ্বুদ্ধ করেছে তার এ ঘোষণা। বাংলাদেশোত্তর পরিস্থিতিতে মেজর, পরবর্তীতে জেনারেল জিয়া মীর কাসেমের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। মীর কাসেম যেমন বিজয়ী বৃটিশদের হুকুম তামিল না করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছিলেন অনুরূপ জেনারেল জিয়া দিল্লীর নেপথ্য কর্তৃত্ব থেকে বাংলাদেশকে রক্ষার আপ্রাণ

চেষ্টা করেছিলেন। তাকেও নির্মমভাবে নিহত হতে হল তারই সহকর্মী অথবা তারই নিম্নস্থ অফিসারদের হাতে। সংগ্রামের শুরুতে তিনি যেমন করে চট্টগ্রাম ক্যান্টনমেন্টে তার উপরস্ত অফিসার শিশু নারীকে নির্দয়ভাবে ব্রাস ফায়ারে হত্যা করেছিলেন অনুরূপভাবে তিনিও নিহত হলেন তার সহকর্মী অথবা তার নিম্ন অফিসারদের ব্রাস ফায়ারে একেবারে ঝাঝরা হয়ে। আল্লাহর বিচার কি নির্মম নিক্তিতে মাপা। নিউটনের তৃতীয় সূত্র প্রত্যেক ক্রিয়ার সম- মূখী বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

পরিশিষ্ট- ১

ইন্দিরা- মুজিব চুক্তি

সংযুক্তিঃ '২৩শে জুন' এর মীর জাফরীর ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতাঃ

দুইটি অসম চুক্তিঃ সেবাদাসত্বের অনন্য নজীর

১৯৭২ সালের ১৯শে মার্চ স্বাক্ষরিত হয় তথাকথিত ভারত- বাংলাদেশ পঁচিশসালা মৈত্রী চুক্তি। বাংলাদেশের মানুষের কাছে দাসত্ব কিংবা বশ্যতামূলক চুক্তি হিসেবেই পরিচিত। ১৭৫৭ সালের ৩ জুন ক্লাইভ ও মীর জাফরের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তির মতই এটিও একটি অসম চুক্তি। ১৯৫৭- এর চুক্তি মোতাবেক ইংরেজরা যেমন মীর জাফরকে সিংহাসন রক্ষায় সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই তেমনি ১৯৭২ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির প্রতি ভারতীয়রা এক কানাকঁড়ি মূল্যও প্রদর্শন করছে না। মুজিব- ইন্দিরা চুক্তির ১ নম্বর অনুচ্ছেদে একে অপরের ভৌগলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা বলা থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদী চাকমা যুবক ও তথাকথিত বঙ্গভূমি দাবীওয়ালাদের ভারত আশ্রয়, প্রশ্রয় ও প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে। ৫ নম্বর অনুচ্ছেদে সম- অধিকারের ভিত্তিতে বাণিজ্যের কথা থাকলেও ভারত- বাংলাদেশ বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দুই হাজার কোটি টাকা। ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী অববাহিকার উন্নয়নে যৌথ সমীক্ষার কথা বলা হলেও ফারাক্কায় এক তরফাভাবে গঙ্গার পানি প্রবাহ পরিবর্তনসহ বিভিন্ন নদ- নদীর উৎসমুখে বাঁধ ও স্পার নির্মাণে ভারতীয় দুরভিসন্ধি বাংলাদেশের মানুষ এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। চুক্তির ৮, ৯, ও ১০ অনুচ্ছেদে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে অবমাননাকর ও পীড়াদায়ক ধারাগুলোর সমার্থ মীর জাফর স্বাক্ষরিত চুক্তির ২ নম্বর ধারার অনুরূপ।

মীর জাফরের স্বাক্ষরিত চুক্তির ৩ নম্বর ধারার মতই '৭১ সালে ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশে পাকিস্তানীদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র- গোলাবারুদ নিয়ে যায়। মীর জাফরের স্বাক্ষরিত চুক্তির ৮ নম্বর ধারার মতই শেখ মুজিব চুক্তি করেই বাংলাদেশের বেরুবাড়ী ইউনিয়ন ভারতকে দান করে কিন্তু প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ভারত তিন বিঘা জমি বাংলাদেশকে দেয়নি।

সবেচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, মীর জাফর ও শেখ মুজিব স্বাক্ষরিত উভয় চুক্তিই ১২টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। পাঠকের সুবিধার্থে ক্লাইভ- মীর জাফর ও মুজিব- ইন্দিরা স্বাক্ষরিত চুক্তি দুইটি নিম্নে প্রকাশ করা হলো।

মুজিবের চুক্তিঃ

১ নম্বর অনুচ্ছেদ-

উভয় দেশের জনগণ যে উদ্দেশ্যে সম্মিলিত সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গ করেছে, সেই উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় ঘোষণা করেছে যে, তাদের দুটি দেশ এবং দুই দেশের জনগণের মধ্যে স্থায়ী শান্তি বজায় থাকবে। প্রত্যেক পক্ষ অপর পক্ষের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রর্দশন করা এবং অপর পক্ষের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবে।

চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় উপরে বর্ণিত নীতিমালা এবং সমতা ও পারস্পারিক কল্যাণকর নীতিমালার ভিত্তিতে তাদের মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সুপ্রতিবেশীসুলভ ও সকল ক্ষেত্রে সহযোগিতা আরও জোরদার ও সুদৃঢ় করবে।

২ নম্বর অনুচ্ছেদ-

জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল জনগণ ও রাষ্ট্রের সম- অধিকারের নীতিমালায় উজ্জীবিত ও পরিচালিত হয়ে চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় সকল প্রকার উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ এবং বৈষম্যকে নিন্দা করে এবং এ সবের সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত নির্মূলের লক্ষ্যে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে তারা বদ্ধপরিকর।

উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় অপরাপর রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা করে যাবে এবং উপনিবেশবাদ ও বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বিশ্বের সকল অঞ্চলের জনগণের ন্যায়সঙ্গত আশা- আকাঙ্ক্ষার প্রতি এবং তাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দিয়ে যাবে।

৩ নম্বর অনুচ্ছেদ-

চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় জোট নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির প্রতি তাদের দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা পুনর্ব্যক্ত করছে এবং তারা এই বিশ্বাস

পোষণ করে যে, বিশ্বে উত্তেজনা হ্রাস, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং জাতীয় স্বার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রেই উপরোক্ত নীতিই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

৪ নম্বর অনুচ্ছেদ-

চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় সকল পর্যায়ে বৈঠক ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে উভয় রাষ্ট্রের স্বার্থের ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টিকারী প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী নিয়ে একে অপরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবে।

৫ নম্বর অনুচ্ছেদ-

চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি ক্ষেত্রে পারস্পরিক সুযোগ- সুবিধা প্রদান ও সার্বিক সহযোগিতা জোরদার ও সমপ্রসারণ অব্যাহত রাখবে। এই দুটি দেশ সম- অধিকার, পারস্পরিক কল্যাণ ও সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত জাতির নীতির ভিত্তিতে নিজের মধ্যে বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহোযাগিতা বৃদ্ধি করবে।

৬ নম্বর অনুচ্ছেদ-

চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় বন্যা নিয়ন্ত্রণ, নদী অববাহিকার উন্নয়ন এবং পানি বিদ্যুৎ শক্তি ও সেচের উন্নয়ন ও বিকাশে যৌথ সমীক্ষা চালাতে এবং যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণেও সম্মত হয়েছে।

৭ নম্বর অনুচ্ছেদ-

চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় আর্ট, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সম্পর্ক বৃদ্ধি করবে।

৮ নম্বর অনুচ্ছেদ-

দুদেশের মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অনুযায়ী চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকে ঘোষণা করছে যে, সে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোন সামরিক বন্ধনে যোগদান কিংবা অংশগ্রহণ করবে না। চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের আগ্রাসন থেকে বিরত থাকবে এবং অপরপক্ষ সামরিক দিক দিয়ে ক্ষতি কিংবা নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টি হতে পারে এমন যে কোন ধরনের কার্য্যের জন্য নিজস্ব ভূখণ্ড ব্যবহার করার অনুমতি দিবে না।

৯ নম্বর অনুচ্ছেদ-

চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকে অপরপক্ষের বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের সামরিক সংঘর্ষে অংশগ্রহণকারী কোন তৃতীয় পক্ষকে যে কোন প্রকারের সহায়তা প্রদান থেকে নিবৃত্ত থাকবে। এই চুক্তি স্বাক্ষরকারী দুই পক্ষের মধ্যে কোন এক পক্ষ যদি কখনও আক্রান্ত হয় তবে অথবা আক্রমণের হুমকির সম্মুখীন হয়, তাহলে সেই হুমকি নির্মূলের উদ্দেশ্যে যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় অবিলম্বে পারস্পারিক সলাপরামর্শে মিলিত হবে এবং এইভাবে তাদের দুই দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

১০ নম্বর অনুচ্ছেদ-

চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকে ঘোষণা করছে যে, সে গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে, এক বা একাধিক রাষ্ট্রের সাথে এমন কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবে না- যা এই চুক্তির সাথে অসংগতিপূর্ণ।

১১ নম্বর অনুচ্ছেদ-

এই চুক্তি পঁচিশ বছর মেয়াদের জন্য স্বাক্ষরিত হলো এবং চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের পারস্পারিক সম্মতিক্রমে তা নবায়নযোগ্য।

স্বাক্ষরিত হওয়ার তারিখ থেকে এই চুক্তি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

১২ নম্বর অনুচ্ছেদ-

এই চুক্তির কোন অনুচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদসমূহের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন মতানৈক্যের সৃষ্টি হলে তা পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও সমঝোতার চেতনায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করতে হবে।

উনিশশ' বাহাত্তর সালের উনিশে মার্চ তারিখে সম্পাদিত।

ইন্দিরা গান্ধী	শেখ মুজিবুর রহমান
প্রধানমন্ত্রী	প্রধানমন্ত্রী
ভারত প্রজাতন্ত্রের পক্ষে	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ- এর পক্ষে

(দুর্জন রাজনীতিকদের কিছু চালচিত্র, পৃষ্ঠা- ১১৩)

পরিশিষ্ট- ২

মীর জাফরের চুক্তি

"আমি আল্লাহর নামে ও আল্লাহর রাসূলের নামে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমার জীবনকালে আমি এই চুক্তিপত্রের শর্তাবলী মানিয়া চলিব।

ধারা- ১ : নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে শান্তিচুক্তির যেইসব ধারা সম্মতি লাভ করিয়াছিল, আমি সেইসব ধারা মানিয়া চলিতে সম্মত হইলাম।

ধারা- ২ : ইংরেজদের দুশমন আমারও দুশমন, তারা ভারতবাসী হোক অথবা ইউরোপীয়।

ধারা- ৩ : জাতিসমূহের স্বর্গ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় ফরাসীদের সকল সম্পত্তি এবং ফ্যাক্টরীগুলি ইংরেজদের দখলে থাকিবে এবং আমি কখনো তাহাদিগকে (ফরাসীদেরকে) এই তিনটি প্রদেশে আর কোন স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করিতে দিব না।

ধারা- ৪ : নবাব সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা দখল ও লুণ্ঠনের ফলে ইংরেজ কোম্পানী যেইসব ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছে তাহার বিবেচনায় এবং তন্নিমিত্ত মোতায়েনকৃত সেনাবাহিনীর জন্য ব্যয় নির্বাহ বাবদ আমি তাহাদিগকে এক ক্রোড় তঙ্কা প্রদান করিবো।

ধারা- ৫ : কলিকাতার ইংরেজ অধিবাসীদের মালামাল লুণ্ঠনের জন্য আমি তাহাদিগকে পঞ্চাশ লক্ষ তঙ্কা প্রদান করিতে সম্মত হইলাম।

ধারা- ৬ : কলিকাতার জেন্টু (হিন্দু) মূর (মুসলমান) এবং অন্যান্য অধিবাসীকে প্রদান করা হইবে বিশ লক্ষ তঙ্কা। (ইংরেজরা হিন্দুদেরকে 'জেন্ট' এবং মুসলমানদেরকে 'মূর' ও 'মেহোমেডান' বলে চিহ্নিত করত।)

ধারা- ৭ : কলিকাতার আর্মেনীয় অধিবাসীদের মালামাল লুণ্ঠণের জন্য তাহাদিগকে প্রদান করা হইবে সাত লক্ষ তঙ্কা। ইংরেজ, জেন্টু, মূর এবং কলিকাতার অন্যান্য অধিবাসীকে প্রদেয় তঙ্কার বিতরণ- ভার ন্যস্ত রহিল এডমিরাল ওয়াটসন, কর্ণেল ক্লাইভ,

রজার ড্রেক, ইউলিয়াম ওয়াটস, জেমস কিলপ্যাট্রিক এবং রিচার্ড বীচার মহোদয়গণের উপর। তাঁহারা নিজেদের বিবেচনায় যেমন প্রাপ্য তাহা প্রদান করিবেন।

ধারা- ৮ : কলিকাতার বর্ডার বেষ্টনকারী মারাঠা ডিচের মধ্যে পড়িয়াছে কতিপয় জমিদারের কিছু জমি; ওই জমি ছাড়াও আমি মারাঠা ডিচের বাইরে ৬০০ গজ জমি ইংরেজ কোম্পানীকে দান করিব।

ধারা- ৯ : কল্পি পর্যন্ত কলিকাতার দক্ষিণস্থ সব জমি ইংরেজ কোম্পানীর জমিদারীর অধীনে থাকিবে এবং তাহাতে অবস্থিত যাবতীয় অফিসাদি কোম্পানীর আইনগত অধিকারের থাকিবে।

ধারা- ১০ :আমি যখনই কোম্পানীর সাহায্য দাবি করিব, তখনই তাহাদের বাহিনীর যাবতীয় খরচ বহনে বাধ্য থাকিব।

ধারা- ১১ :হুগলীর সন্নিকট গঙ্গা নদীর নিকটে আমি কোন নতুন দুর্গ নির্মাণ করিব না।

ধারা- ১২ : তিনটি প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইবা মাত্র আমি উপরি উক্ত সকল তঙ্কা বিশ্বস্তভাবে পরিশোধ করিবে।

পরিশিষ্ট- ৩

'৭১-এর স্মৃতি প্রসঙ্গে

অধ্যাপক আবু জাফরের লেখা থেকে-

দেশের স্বাধীনতাযুদ্ধ যখন শুরু হলো আমি কলকাতা চলে যাই। আমার সঙ্গে ছিলেন কুষ্টিয়া আওয়ামী লীগের একজন বিশিষ্ট কর্মী (স্বাধীনতা- উত্তরকালে নেতা) মরহুম জনাব আবুদল মজিদ এবং আমার একজন আত্মীয় জনাব আবুল কাশেম। শেষোক্ত ব্যক্তি খুলনা বিভাগের অতিরিক্ত কমিশনার হিসেবে অবসর গ্রহণ করেছেন। তিনি একজন প্রত্যক্ষ মুক্তিযোদ্ধা; রণাঙ্গণের অভিজ্ঞতা- সমৃদ্ধ তাঁর একটি বইও প্রকাশিত হয়েছে; বইটির নাম 'বংশীতলার যুদ্ধ : আগে ও পরে'। আমরা তিনজনই প্রায় একই বয়সী তখন টগবগে যুবক। অন্য দু'জনের কথা বলাই বাহুল্য, আমার নিজের মধ্যেও, পর্যাপ্ত যুদ্ধভীতি সত্ত্বেও, পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে শুধু বাংলাদেশ থেকে নয়, পৃথিবী থেকেই উৎখাত ও বিতাড়িত করবার এক অদম্য- উদগ্র কামনা

তখন সর্বদা সক্রিয়। অন্য কোনো কথা মাথায়ই আসতো না; শুধু একটাই চিন্তা, একটাই স্বপ্ন, বাংলাদেশ কবে স্বাধীন হবে, পাকিস্তান থেকে মুক্ত হয়ে বাংলাদেশ কবে বুকভরা নিঃশ্বাস নিতে পারবে।

আমরা প্রথমে গেলাম কলকাতা বেতারে। দেবদুলাল বন্দোপাধ্যায়ের সঙ্গে আমার অনেকদিন থেকে পত্র- যোগাযোগ ছিল। তিনি আমাদের তিনজনকেই প্রভূত সমাদর করলেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে উপেন তরফাদারকে বলে আমাদের একটি সাক্ষাৎকার রেকর্ড করে নিলেন। সাক্ষাৎকারটি পরবর্তী সপ্তাহে উপর্যুপরি দু'বার প্রচারিত হয়। বেতার থেকে বিদায় নিয়ে আমরা গেলাম কবি বুদ্ধদেব বসুর নাকতলার বাসাতে। তাঁকে পূর্বে দেখিনি, কিন্তু তাঁর সঙ্গেও যেহেতু ঘনিষ্ঠ পত্র- যোগাযোগ ছিল। অনেকটা চেনা মানুষের মতোই বুদ্ধদেবের 'কবিতা ভবনে' গিয়ে হাজির হলাম। কোনরূপ সংকোচ বা আড়ষ্টতা ছিল না। আর যেহেতু আমরা লড়াইরত বাংলাদেশের বাসিন্দা, ভেতরে ভেতরে আমাদের বরং একটু সপ্রতিভ অহংকারই ছিল।

বুদ্ধদেব এবং প্রতিবা বসু, দুজনের কাছে আমরা আশাতীতভাবে সমাদৃত ও আপ্যায়িত হলাম। প্রতিভা এবং বুদ্ধদেব উভয়েই তাঁদের শৈশব- কৈশোর ও যৌবনের একটি বড় অংশ অতিবাহিত করেছেন ঢাকায়। অতএব ঢাকা ও বাংলাদেশের সম্পর্কে তাদের আগ্রহ ও কৌতূহল খুব স্বাভাবিক কারণেই সীমাহীন। আর এ- রকম দু'জন উন্মুখ ও উৎসাহী শ্রোতা পেয়ে আমার দু'জন সহযাত্রী অবিরলভাবে স্বাধীনতা- যুদ্ধের বর্ণনা দিয়ে চলেছেন। কিন্তু হঠাৎই একটু ছন্দপতন ঘটলো। কথার ফাঁকে বুদ্ধদেব বললেন, 'কী- এমন হলো যে, তোমরা হঠাৎ পাকিস্তান থেকে আলাদা হতে চাইছো! তোমাদের কত দিকে কত উন্নতি হচ্ছিলো, ভালোই তো ছিলে। আমরাও তো দিল্লীর অনেক অন্যায়- অবিচারের শিকার, তাই বলে কি আলাদ হয়ে যাবো? এখন হয়তো আর ফেরার পথ নেই, কিন্তু আমার বিশ্বাস, তোমরা সবাই ভুল করেছো। আমি তোমাদের লড়াইকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু সমর্থন করি না।' আমরা তিনজনেই হতবাক, মানুষটি বলে কী! কথা আর এগোলো না। আমরা খুবই মুনঃক্ষুন্ন হয়ে ফিরে এলাম আমাদের প্রিয় কবির 'কবিতা ভবন' থেকে। বেলাল ভাই অর্থাৎ ভারত বিচিত্রার প্রাক্তন সম্পাদক কবি বেলাল চৌধুরী এবং কবি আল মাহমুদ দু'জনেই বুদ্ধদেব ও বুদ্ধদেব-

পরিবারের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। আমার ধারণা, তাঁরা উভয়েই বুদ্ধদেব বসুর এই প্রতিক্রিয়ার কথা জানেন। আর জ্যোতির্ময় দত্ত (বুদ্ধদেব বসুর জামাতা ও বিশিষ্ট সাংবাদিক) তাঁর সম্পাদিত মাসিক 'কলকাতা' পত্রিকায় বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে যে একটি বাক্যও লেখেননি, একারণে সুনীল গঙ্গোপাথ্যায়, শঙ্খ ঘোষ ও অন্য অনেকের সঙ্গে কলকাতা' পত্রিকাতেই তাঁকে অনেক বিদগ্ধ- বাদানুবাদে লিপ্ত হতে হয়। বাংলাদেশের সেদিনের সেই জীবন- মরণ লড়াইয়ের প্রশ্নে জ্যোতির এই নিস্পৃহ- নিরাসক্তির কথাও বেলাল ভাই ও আল মাহমুদ নিশ্চয়ই বিস্মৃত হননি।

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরের একটি ঘটনা। আমাকে ও আমার পূর্বোক্ত আত্মীয় আবুল কাসেমকে দেবদুলাল তাঁর বালিগঞ্জের বাসায় একদিন খুব আদর করে সকালের নাশতা খাওয়ালেন। আমরা পরিতৃপ্ত উদরে যখন চা খেতে শুরু করেছি, দেবদুলাল অনেকটা উষ্মার সঙ্গে বললেন, 'কিছুমনে করো না, তোমরা আসলেই স্বাধীনতার যোগ্য নও।' আমরা দুজনেই স্তম্ভিত। স্বাধীনতা পেতে না- পেতেই এতোবড় অপবাদ! তিনি বললেন, 'দেখ, এতো বড় একটা যুদ্ধের তাণ্ডব বয়ে গেলো, এতো প্রাণহানি, এতো ক্ষয়ক্ষতি,; তোমাদের এখন কতো কাজ, কতো দায়িত্ব। অথচ কয়েকদিন আগে তোমাদের কিছু নেতা এসেছিলো, কলকাতা থেকে নামকরা কিছু গায়ক ও নর্তকী ভাড়া করে দিতে হবে। তারা সপ্তাহব্যাপী বড় রকমের ফাংশন করবে ঢাকায়। একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে এইরকম অকথ্য অমার্জনীয় দায়িত্বহীনতা কল্পনাও করা যায় না। দুঃখ হয়, অনুতপ্ত হই, তোমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমারও কিছু অবদান ছিলো।

দেবদুলাল একজন সংবেদনশীল মানুষ। বুঝলাম, তিনি যথার্থই কষ্ট পেয়েছেন। তার কষ্ট, উষ্মা ও অভিমান কিছুটা স্তিমিত করবার জন্য বললাম, 'দাদা, রণাঙ্গণে যুদ্ধে যুদ্ধে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খেয়ে- না- খেয়ে দিন কেটেছে। বিজয়ীর বেশে ঘরে ফেরার পর একটু আনন্দ- উৎসবের আয়োজন করলে দোষ কী?' কিন্তু এ- কথায় দেবদুলালের উত্তেজনা হ্রাস- না- পেয়ে আরো বেড়ে গেলো। তিনি সরোষে বললেন, 'দেখো আবু জাফর, যারা এসেছিলো তাদের অনেককে আমি জানি, তাদের যুদ্ধ ছিলো গড়ের মাঠে হাওয়া- সেবন আর কলকাতার হোটেলে হোটেলে আনন্দ- ফূর্তি করা। তারাই এখন তোমাদের দেশবিখ্যাত মুক্তিযোদ্ধা ও নেতা। আশঙ্কা হয়,

তোমাদের কপালে অনেক দুর্ভোগ আছে।' সেই যুদ্ধ- শুরুর প্রাক্কালে 'কবিতা ভবনে' যেমন কষ্ট পেয়েছিলাম, সেদিন আবার একইরকম কষ্ট পেলাম দেবদুলালের কথায়। মনের কষ্ট মনে রেখে দেবদুলালের দোতলার ফ্ল্যাট থেকে আমরা নীরবে নিঃশব্দে পথে নেমে এলাম। কাছেই উডবার্ন স্ট্রীট, সেখানে শ্যামল মিত্র থাকেন। ইচ্ছে ছিলো, কথাও ছিলো তাঁর ওখানে যাওয়ার, কিন্তু প্রাগুক্ত কষাঘাতের পর সেই ইচ্ছে কোথায় যে হারিয়ে গেলো, শ্যামলের কাছে আর যাওয়া হলো না।

অনেকে নিশ্চয়ই স্মরণ করতে পারেন, অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর একটি লেখায় উল্লেখ করেছে যে, তীব্র আকর্ষণ ও অনুরাগ নিয়ে তিনি গিয়েছেন শেখয়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। শেখ মুজিব এক সময় তাঁকে বললেন, 'দাদা, আপনারা এখনো বসে আছেন কেন? দিল্লীর নাগপাশ থেকে বেরিয়ে আসুন।' বাঙ্গালী ভেবে আবেগে অকপটে কথাটা ভালোই বলেছিলেন শেখ মুজিব। কিন্তু অন্নদাশঙ্কর বলেছেন অন্য কথা : তিনি তখন নীরবে নিঃশব্দে ভাবমগ্ন হয়ে ভাবছেন পাহাড়ঘেরা হিমাচল, কৃষ্ণা- কাবেরী কাঞ্চনজঙ্ঘা কন্যাকুমারিকা, ইলোরা অজন্তা বেনারস হরিদ্বার, সবকিছু নিয়ে বিশাল ভারতবর্ষের যে- পরাক্রান্ত বৈভব, যে বিশাল ভৌগোলিক ঐশ্বর্য ও বিস্তার, তাকে সেচ্ছায় বিদায় জানিয়ে জয়নগরের মোয়া, বর্ধমানের মিহিদানা, নবদ্বীপ আর গেরুয়া- মাটির বোলপুরের জন্য বিচ্ছিন্নতার কথা চিন্তা করাও কি সম্ভব না সংগত! অন্নদাবাবুর এই লেখাটি যেদিন পড়লাম, আমার মনে হলো, প্রবীণ ও বহু গুণান্বিত এই লেখেক- মানুষটির মধ্যে দৃষ্টি ও দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তার থাকলেও তিনি বাঙ্গালী নন, সর্বভারতীয় অখণ্ড- হিন্দুত্বের মধ্যেই তাঁর প্রকৃত পরিচয়। অতএব তিনি দিল্লীর কাছে বশ্যতাকেই সর্বাংশে তিহকর ও উপাদেয় জ্ঞান করেন।

অপর একটি ঘটনা, ১৯৮৬ কি ১৯৮৭ সালে হবে। 'মেঘে ঢাকা তারা' ছায়াছাবিতে নায়কের ভূমিকায় অভিনয়খ্যাত অনিল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে একবার দিল্লীতে আয়োজিত দুর্গোৎসবে সাক্ষাৎ হয়েছিলো। দিল্লীর কালীবাড়িতে দ্বৈপ্রহরিক আহারের পর আমরা উভয়ে একসঙ্গে বেশকিছু সময় গল্পে গল্পে কাটিয়েছিলাম। মানুষটি খুব সরস ও সহৃদয় রাজ্জাক তাঁর অত্যন্ত পরিচিত ও প্রিয়; এবং রাজ্জাক- যে অভিনয় করে খুব ধনাঢ্য হয়েছেন, এতে অনিল তাঁর খুশির কথা জানালেন। আমার ভালো লাগলো।

এক পর্যায়ে অনিল হঠাৎ প্রশ্ন করলেন, 'এখন তো আর পাকিস্তান নেই; বাংলাদেশে আমাদের সিনেমা তোমরা যেতে দাও- না কেন? দেবদুলালের কথাগুলো মনে পড়লো। আমি অনিলকে বললাম, 'দেখুন, বাংলাদেশ সিনেমা দেখার জন্য স্বাধীন হয়নি, স্বাধীন হয়েছে জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য।' অনিল একটু অপ্রস্তুত কণ্ঠে বললেন, "সংস্কৃতির মানোন্নয়ন এবং আদান- প্রদানও তো একটা বড় কাজ।' তখন যেহেতু আমি নিজে মুশরিকী- সংস্কৃতির মধ্যে আপাদমস্তক নিমজ্জিত একজন তাওহীদ- বিচ্ছিন্ন 'হাফ হার্টেড' মুসলমান, আমি শুধু বললাম, 'আপনার এই কথাটা অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ।' অথচ বলা উচিত ছিলো, এবং আজকে হলে অবশ্যই বলতাম, 'অনিল, আমাদের উভয়ের সংস্কৃতি ও বিশ্বাস এবং জীবনদর্শন সম্পূর্ণরূপে বিপরীতমুখী। একদিকে তাওহীদ অন্যদিকে অংশীবাদ। এই দুই সংস্কৃতির মিলনে আপনাদের কী হয় না- হয় জানি না, কিন্তু আমাদের পঁচাশি শতাংশ তাওহিদী জনতার জন্য বড়ই বিপজ্জনক।'

যাই হোক, অনেকদিনের কথা, কিন্তু স্বাধীনতার কথা উঠলেই আবার কেন যেন ভুলে যাওয়া ঘটনাগুলো মনে পড়ে যায়। কেন মনে পড়ে তাও ব্যাখ্যা আছে; কিন্তু সেই ব্যাখ্যা অনেকের কাছে খুবই অপ্রীতিকর মনে হতে পারে, অতএব তা পরিহার করাই উত্তম। শুধু কয়েকটি অপরিহার্য প্রশ্ন সামনে রাখা জরুরী মনে করি। প্রশ্নগুলো এ- রকম : আমরা কি আমাদের বহুকষ্টে অর্জিত স্বাধীনতাকে যথেষ্ট অর্থবহ করে তুলতে সক্ষম হয়েছি? দেবদুলাল যা- বলেছিলেন, আমাদের মধ্যে সেই দায়িত্ববোধ কি জাগ্রত হয়েছে? অথবা অনিলকে যা বলেছিলাম, 'সিনেমা দেখা নয়, দেশ স্বাধীন হয়েছে জনগণের জীবনমান উন্নয়নের জন্য' সেই কথার কোনো বাস্তব প্রতিফলন কি প্রতিভাত হয়? কোনো প্রশ্নেরই কোনো গ্রহণযোগ্য সদুত্তর নেই। অনেক মূষিক নিশ্চয়ই ক্ষমতা ও অর্থবিত্তে এক- একটি বিশালাকায় ঐরাবতে পরিণত হয়েছে, কিন্তু আপামর মানুষের জীবনে শুধু অন্ধকার, গাঢ় নি- িদ্র অন্ধকার। কিন্তু কেন এমন হলো, কেন এই সমূহ ব্যর্থতা, তারও যুক্তিযুক্ত ব্যাখ্যা আছে, কিন্তু সেই ব্যাখ্যাও প্রীতিকর নয়।

স্বাধীনতার তেত্রিশ বছর অতিক্রান্ত হতে চললো। সময়টা কম নয়, এর চেয়ে অনেক কম সময়ে অনেক দেশ আশাতীত উন্নতি লাভ করেছে। অথচ আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই অবস্থান করছি। আর এ নিয়ে কারো

মধ্যে কোনো উদ্বেগই নেই, বরং যা দৃশ্যমান বাস্তব তা খুবই হতাশ্যাব্যঞ্জক। সবাই নিশ্চয়ই একমত হবেন যে, এই দীর্ঘ সময়ে স্বাধীনতার পক্ষ- বিপক্ষ নিয়ে যতো কথা হয়েছে, কাজের কাজ তার এক- সহস্রাংশও হয়েছে কিনা সন্দেহ। মিল- মহব্বতহীন কলহপ্রিয় পরিবারে যেমন সুখ- শান্তি ও উন্নতি ধরা দেয় না, আশাও করা যায় না; আমাদের দেশ ও জাতির ললাটেও এই একই দুর্ভাগ্যের লাঞ্ছনা। ঝগড়াই থামছে না, সুখ ও সচ্ছলতা আসবে কোথা থেকে? অথচ এই আত্মবিনাশী ঝগড়ার অবসান হওয়া প্রয়োজন, অন্যথায় স্বাধীনতার অর্থ ও অস্তিত্ব দুটোই ক্রমে ক্রমে বিলীন হয়ে যেতে পারে। সাধারণ মানুষ যা- ই ভাবুক, অন্তত নেতা- নেত্রীর উচিত বিষয়টি সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করা; এবং এটাও অনুধাবন করা উচিত যে, মসনদ ও মসনদে উপবেশন- লিপ্সা যদি স্বাধীনতার গরিমা ও দেশপ্রেমকে পরাভূত করে, তাহলে দেশ ও জাতির জীবনে স্বাধীনতার মতো একটি মহার্ঘ বস্তু প্রহসনে পরিণত হতে বাধ্য। স্বাধীনতা আর স্বাধীনতা থাকে না, কিছু প্রেমহীন আদর্শহীন মানুষের ভোগ্যপণ্যে পরিণত হয়।

বস্তুতই মনে রাখা আবশ্যক যে, স্বাধীনতা আল্লাহপাকের একটা অত্যন্ত বড় নেয়ামত। অথচ আল্লাহপাকের কথা ভুলে গিয়ে এই নেয়ামতকে আমরা কদর তো করছিই না, বরং পদে পদে শুধু অমর্যাদা করছি। এই রকমের না- শোকরি আল্লাহপাক বেশিদিন বরদাশত করেন না। আর এজন্যই অবস্থা আজ এমন কুৎসিত পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, খুন রাহাজানি সন্ত্রাস অপহরণ চাঁদাবাজি ধর্ষণ অশ্লীলতা উৎকোচ কালোবাজারী, এসব নিয়ে বাঙলাদেশ এখন দুর্নীতির শীর্ষে অবস্থানকারী একটি জ্বলন্ত জাহান্নাম। আসলে এরকমই হয়। মানুষের মধ্যে থেকে, বিশেষ করে নেতা- নেত্রীদের মধ্যে থেকে আখিরাতের ভয়, দেশপ্রেম ও মানুষের প্রতি দায়িত্ববোধ বিলুপ্ত হয়ে যখন মসনদপ্রীতি ও ধনলিপ্সা একমাত্র মাকসুদ হয়ে দাঁড়ায়, তখন এই লোভী ও দায়িত্বহীন মানুষদের দ্বারা শাসিত- পরিচালিত দেশ ও সমাজ কখনো শান্তির জনপদ হতে পারে না। এরকম দেশে ও সমাজে আল্লাহ সার্বক্ষণিক ভয় ও নিরাপত্তাহীনতার লেবাস পরিয়ে দেন।

প্রসঙ্গত একটি ক্ষুদ্র উদাহরণ পেশ করতে চাই। কত দলের কত নেতা- নেত্রীর মধ্যে কত মতবৈষম্য ও অনৈক্য বিদ্যমান; অবস্থা এমন যে, একদল কিছু বলতে না- বলতেই, ভালো- মন্দ যা- ই হোক, অন্য দল তার

প্রতিবাদ করবেই। এমনকি কেই যদি বলে, সবার জন্য জীবানুমুক্ত নির্মল জলের ব্যবস্থা করা আবশ্যক, কোনো- না কোনোভাবে তারও প্রতিবাদ হবে। অথচ পার্লামেন্টে যখন সংসদ সদস্য ও মন্ত্রী- মিনিস্টারদের জন্য নানামুখী আর্থিক ও বৈষয়িক সুবিধা- প্রদানের বিল উত্তাপিত হয়, একটি ক্ষীণকণ্ঠের প্রতিবাদী আওয়াজও কোথাও শোনা যায় না যে, দারিদ্র্যসীমার বহুনিম্নে অবস্থানকারী শতকরা ৬৫ ভাগ মানুষের এই হতদরিদ্র দেশে দেশসেবকদের জন্য এটা গ্রহণযোগ্য নয়, এটা মানবতার সমূহ অপমান। সত্যই কী রোমাঞ্চকর এই ঐক্যবোধ! মদের লাইসেন্স এবং হান্টার- ক্রাউন নিয়ে অনেক আলেম- উলামা প্রায় 'অনাথ শিশুদের' মতো পথে পথে যদিও প্রতিরোধের কথা বলেন, কিন্তু যথাস্থানে বিশেষ কোনোরূপ প্রতিবাদ উচ্চারিত হয় না। বেগম জিয়ার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে এসব নিষিদ্ধ হয় বটে, কিন্তু আমাদের প্রীতিভাজন নেতা- নেত্রীদের মধ্যে এ নিয়ে উল্লেখযোগ্য কোনো পেরেশানি লক্ষ করা যায় না। এটা একটা দুর্ভাগ্য। আর এতদসঙ্গে এটাও দুর্ভাগ্য যে, মদ্যপান ওহান্টার- ক্রাউনকে নিয়ে যারা সওদাগরি করতে চায়, তারা কেউ দরিদ্র নয়, তারা অভাবনীয় সম্মদের অধিকারী অথচ তারাই আরো এবং আরো অর্থের নেশায় দিগি¦দিক জ্ঞানশূন্য ও উন্মত্তপ্রায়। আর এই উন্মত্ততা এই স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে একটি সর্বগ্রাসী রূপ লাভ করছে। অথচ আল্লাহর রাসূল (সাঃ) বলেছেন : যারা অর্থের দাসত্ব করে তারা অভিশপ্ত।

কেউ কেউ কষ্ট পাবেন, কেউ কেউ ক্রুদ্ধ ও হতে পারেন, কিন্তু না-বলে উপায় নেই, এই অভিশপ্ত ব্যক্তিরাই এখন আমাদের প্রিয় স্বদেশভূমির প্রকৃত চালক ও নিয়ন্ত্রক। অতএব আল্লাহ তাঁর সকল বরকতের দ্বার যদি এখানে রুদ্ধ করে দেন, সেটা অস্বাভাবিক নয়। কারণ, অনাহারক্লিষ্ট মানুষের সঙ্গে তামাশা করবার জন্য স্বাধীনতা অর্জিত হয়নি; অথচ এই তামাশাই আজ দেশ ও সমাজের দৃশ্যমান সবাকচিত্র। আর এই দুঃখেই আমাদের এক বন্ধু কবি রফিক আজাদ প্রায় তিরিশ বছর আগে তাঁর একটি কবিতায় বলেছিলেন, 'ভাত- দে হারামজাদা, নইলে মানচিত্র খাবো'। বড় তীব্র, বড় মর্মন্তুদ এই অভিব্যক্তি! হযরত উমর ফারুক (রাঃ) বলেছেন, 'শাসকগোষ্ঠী যদি অযোগ্য ও দুর্নীতিপরায়ন হয়, তখন সাধারণ মানুষ ও পাল্লা দিয়ে বিগড়ে যায়, তারাও চরিত্রহীনতার পথে দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে। আর সর্বাপেক্ষা অসভ্য নেতা সেই, যার ভ্রান্ত নীতির কারণে অনাচার বিস্তার লাভ

করে। স্বাধীনতার যে- তেত্রিশ বছরের ইতিহাস, সবাই একবাক্যে স্বীকার করবেন, সেই ইতিহাস, কিছু ব্যতিক্রম বাদে, আদৌ সুখকর নয়; প্রায় পুরোটাই অযোগ্য অসভ্য নেতৃত্বের ইতিহাস!

কোন সন্দেহ নেই, সকল নেতানেত্রীসহ আপামর জনগণ, আমরা সবাই আমাদের দেশকে ভালোবাসি, দেশের স্বাধীনতাকে ভালোবাসি। কিন্তু ভালোবাসাই সব নয়, ভালোবাসা যদি আত্মস্বার্থের পোষকতা ও বাণিজ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়, সেটা পরিষ্কার মোনাফেকি বা স্বার্থতাড়িত কপটতা। আমাদের অন্তত এটুকু বোঝা উচিত, দেশের উন্নতি মানে কিছু হাইরাইজিং বিল্ডিং নয়, রিক্সা- চলাচল নিষিদ্ধ কিছু ভিআইপি গমনাগমনের সড়ক নয়, আইএমএফ ও বিশ্বব্যাংক থেকে ধার করা অর্থ দিয়ে কিছু মানুষের ঘৃত-সেবনের ব্যবস্থা করা নয়, জনগণের অর্থ আত্মসাৎ করে দেশে- বিদেশে নির্লজ্জ অট্টালিকা নির্মাণ নয়- এ- সবই এক একটা নির্মম তামাশা। আমাদের দেশপ্রেমকে যদি প্রকৃত অর্থবহ করে তুলতে হয়, তাহলে দেশ-বিদেশের কুলকার্ণি- ঋতুপর্ণাদের নিয়ে নৃত্যগীতের আসর সাজানো নয়, কতিপয় কুহকতাড়িত ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবীর মনরক্ষা করা নয়, আমাদের উচিত হবে দেশের পঁচাশি শতাংশ তাওহিদী মানুষের আকাঙ্খা ও হৃৎস্পন্দনকে অনুভব করা; অর্ধাহারে অনাহারে ক্ষুধিত জঠরে যারা দিবারাত্রি কাজ করে যায়, তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়নো, তাদের বিপন্ন বিষন্ন জীবনমানের উন্নয়নকল্পে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি উদ্যোগ গ্রহণ করা। কিন্তু এসব কোনোকিছুই কি সম্ভব, যদি আমাদের মধ্যে আখেরাতের ভয় ও নৈতিকতার বিকাশ ঘটানো না যায়! বাংলাদেশ নামক এই হাড্ডিসার কামধেনুটি আর পারচ্ছে না। দুধ নয়, দেশের দশ শতাংশ লোভী মানুষের নিষ্ঠুর দোহনে এই হতভাগা দুধেল গাভীর বাঁট থেকে এখন শুধু রক্তক্ষরিত হচ্ছে। এই মুহূর্তে অন্যকিছু নয়, নির্দয় স্বাথান্ধ মানুষের অতিরিক্ত লোভ থেকে আমাদের এই বাংলাদেশরূপী অবলা কামধেনুটিকে বাঁচানো এবং তার এই রক্তক্ষরণ বন্ধ করার নামই দেশপ্রেম। (অসহিষ্ণু মৌলবাদীর অপ্রিয়- কথা, পৃষ্ঠা, ১৪- ২০)

পরিশিষ্ট- ৪

গণ জিজ্ঞাসা

শেখ মুজিব তার মনিব রুশ- ভারত অক্ষ শক্তির মদদে পুষ্ট হয়ে এই জাতির স্কন্ধে যে নির্মম স্বৈরতন্ত্রের জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দেয়, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তার অবসান ঘটানো ছিল অসম্ভব এবং অকল্পনীয়। বাংলার অমিত তেজী, চিরজাগ্রত ও মুক্তিপাগল মানুষ যখন একদিকে রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসছিল এবং অন্যদিকে এই শাসরুদ্ধকর অবস্থার হাত থেকে মুক্তির আকুতি নিয়ে আল্লাহর দরবারে আহাজারি করছিল, ঠিক তখনি ইতিহাসে মহান বিপ্লব সংঘটিত হয়। সূচিত হয় ইতিহাসের নবতর অধ্যায়। কিন্তু তারপর, তারপরও গণ মানুষের অন্তরে বয়ে গেল অনন্ত জিজ্ঞাসা। সে জিজ্ঞাসার জবাব হয়তো কেউ পেয়েছেন অথবা পাননি। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিলের জিজ্ঞাসা, একটি গণ জিজ্ঞাসা এ জিজ্ঞাসার জবাব দেবে কে?

"স্বাধীনতার ১৭ বছর পরেও আমার মত একজন সাধারণ লড়াকু মুক্তিযোদ্ধার মনে এ প্রশ্নগুলো নিভৃতে উঁকি- ঝুঁকি মারে এ কারণেই যে, ২৫ মার্চ সেই ভয়াল রাতের হিংস্র ছোবলের সাথে সাথেই পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী এবং পূর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যবর্গ কি করে পাকিস্তানের শত্রু হিসেবে পরিচিত ভারতের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণের জন্য ছুটে যেতে পারল? কোন সাহসে, কিংবা কোন আস্তার উপর ভর করেই বা তারা দলে দলে ভারতের মাটিতে গিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল? তাহলে কি গোটা ব্যাপারটিই ছিল পূর্ব পরিকল্পিত? তাহলে কি স্বাধীনতা বিরোধী বলে পরিচিত ইসলামপন্থী দলগুলোর শঙ্কা এবং অনুমান সত্য ছিল? তাদের শঙ্কা এবং অনুমান যদি সত্যই হয়ে থাকে তাহলে দেশেপ্রেমিক কারা? আমরা মুক্তিযোদ্ধারা না রাজাকার- আলবদর হিসেবে পরিচিত তারা? এ প্রশ্নের মীমাংসা আমার হাতে নয়, সত্যের উৎঘাটনই কেবল এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর নির্ধারণ করবে।

(মেজর (অবঃ) এম এ জলিল : অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, পৃঃ ৭- ৮)

পরিশিষ্ট- ৫

ম্যাসেজ

"এ দেশের পঞ্চমবাহিনী দেশকে বিক্রি করছে, সীমান্তরেখা ইরেজার দিয়ে মুছে ফেলতে চাইছে। কিন্তু আমরা প্রতিবাদ করতে পারছি না। আমাদের সর্বশক্তি যেন হারিয়ে গেছে। আজকে ভাঙা ভাঙা অবস্থায় বিরাজমান জনগণের খণ্ডিত শক্তিসমূহকে জোড়া দিয়ে জনগণের মূলশক্তিকে যদি সুসংহত না করতে পারি, তাহলে এদেশকে গোলাম বানাতে কামান বন্দুকের দরকার পড়বে না। ঘরের শত্রু-বিভীষণরা রাতের অন্ধকারে ডেকে আনবে আমাদের শত্রুপক্ষকে। সকালে উঠেই দেখবেন আপনার হাত- পা গোলামীর শিকলে বাঁধা।

... দালাল চরিত্রের ভীরু- কাপুরুষ নেতা ও নেত্রীর দিকে তাকিয়ে কোন লাভ হবে না। তারা অতীতেও যেমন নিরাশ করেছে, আগামীতেও একইভাবে নিরাশ করবে। এখন এই দেশের ভাগ্যাহত মানুষের একমাত্র ভরসা 'লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এই একটি মাত্র সম্পদই মুসলমানদের ভারতীয় আধিপত্যের কবল থেকে মুক্ত করতে পারে।"

জাতীয় বীর (কর্ণেল অবঃ) সৈয়দ ফারুক রহমান।

পরিশিষ্ট- ৬

শেখ মুজিবের উত্থান- পতন

এনায়েতউল্লাহ খান

শেখ মুজিবের অকাল পতন আমাকে অবাক করেছে একথা বললে অত্যুক্তি হবে। ঘটনার আকস্মিকতায় হয়তো বা আপাত বিস্ময়ে চমকিত হয়েছি। বৈরিতা সত্ত্বেও বেদনার অঙ্কুরে বিদ্ধ হয়েছি, দূরদূর ভবিষ্যৎ চিন্তায় অকারণে উদ্বেলিত হয়েছি। কিন্তু এ সবই নিছক রাজনৈতিক ভাবনা, মধ্যবিত্ত মানসের স্বভাবগত প্রতিক্রিয়া। এই মুহূর্তের বিমূঢ়তা পরক্ষণে স্বস্তির আশ্বাসে উচ্চকিত হয়েছে ; কালান্তরের ঘণ্টাধ্বনি শৃঙ্খলিত চেতনাকে উজ্জীবিত করেছে। কথাগুলো অপ্রিয় এবং প্রকারান্তরে নিষ্ঠুর; কিন্তু নিদারুণ সত্যও বটে। যেমন সত্য নিয়তির অমোঘ বিধান কিম্বা ইতিহাসের নির্মম বিচার। এ

দু'এর তফাৎ মৌল। প্রথমটি সংস্কার, দ্বিতীয়টি বিজ্ঞান। কেউ বলে ভবিতব্য কেউ বলে ডায়ালেকটিস। কিন্তু উভয়েরই পরিণাম অবশ্যম্ভাবিতায়। শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় তাঁর অধিষ্ঠান এবং পরিশেষে 'স্বর্গ হতে বিদায়'- এই অবশ্যম্ভাবিতারই বিয়োগান্ত আলেখ্য। শেখ মুজিবুর রহমনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড একদিকে নাটকীয়তায় চমকপ্রদ অন্যদিকে দ্বৈততায় খণ্ডিত। তাঁর ক্ষমাতারোহণের অভিযাত্রা বিগত এক দশকে অপ্রতিহত গতিতে এগিয়ে চলেছিল। অগণিত আত্মদান এবং এক ঝুড়ি রূপকথা মিলিয়ে তৈরি হয়েছিল তাঁর স্বর্গের সিঁড়ি। ব্যক্তিত্বের অপরিমিত শৌর্য ও অনুকূল ইতিহাসের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল তাঁর রাজ- কাহিনী। তিনি ছিলেন রূপকের রাজা। সত্যিকারের মুকুটের ভার তাই তিনি বইতে পারেননি। বরং মুকুটের ভারে তিনি ন্যুজ হয়েছেন। 'রক্ত করবীর' আত্মবিমোহিত রাজার মত দুঃশাসনের অচলায়তন প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন। যারা প্রাণ দিল, ষড়যন্ত্রের রাজনীতিকে পদাঘাত করে নির্দ্বিধায় অস্ত্র তুলে নিল, যারা দেশপ্রেমের সুমহান অঙ্গীকারের রক্ত দিয়ে মাতৃভূতির ঋণ শোধ করলো তাদেরই রক্ত- মাংস হাড়ের বিনিময়ে তিনি গড়তে চেয়েছিলেন এক অলৌকিক ক্ষমতার দেউল। সেখানে দেবতা একক, কিন্তু পূজারী নেই। মানুষকে বাদ দিয়ে শুরু হলো বিগ্রহের রাজনীতি পুতুলের খেলা। পরদেশী পটুয়ার হাতে সৃষ্টি হলো পুতুলের রাজা শেখ মুজিবুর রহমান। আমার এ কথা নিষ্করুণ জানি, কিন্তু ইতিহাস আরো বেশি নির্মম। এবং তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ ১৫ই আগস্ট ১৯৭৫। হঠাৎ দ্রিম দ্রিম শব্দে বিদীর্ণ হলো নিস্তব্ধ প্রভাত। একঝাক আগ্নেয় শীসের লক্ষ কোটি মানুষের সীমাহীন রোষের আকস্মিক বিস্ফোরণের মতো নিপাত করলো পুতুলের রাজত্ব। এই পুতুল নাচের ইতিকথা রাজনীতি বা ইতিহাস বিযুক্ত নয়, এর সঙ্গে জড়িয়ে আছে গোত্রীয় ক্ষমতার অভিলাষ এবং সাম্রাজ্যবাদী, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী পরিকল্পনার ইতিবৃত্ত। সে এক বিচিত্র কাহিনী। সাড়ে সাত কোটি মানুষ যখন একাত্তরে চরমতম জাতিগত নিপীড়ন ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছিল তখনও পর্দার আড়ালে চলছিল আপোষের জুয়াখেলা। উনসত্তরের গণ- অভ্যুত্থানে ও একাত্তরের গণপ্রতিরোধকে নিবৃত্ত করবার জন্য শুরু হয়েছিল প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্র ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত। কিন্তু ইতিহাস তো স্থবির নয় যে, জাতকের ইচ্ছের উপর তার গতিধারা নিয়ন্ত্রিত হবে। তাই জাতীয় মুক্তির বিভ্রম সৃষ্টির হীন প্রচেষ্টা সত্ত্বেও স্ফূর্ত

হয়েছিল গণবিদ্রোহ। একাত্তরের পঁচিশে মার্চ সেই সর্বব্যাপী গণ- বিদ্রোহকে বিধ্বংস করবার রক্তক্ষয়ী প্রচেষ্টা মাত্র। সেই আত্মদান বাংলার মানুষের ব্যক্তির নয়। দলমত নির্বিশেষে সর্বশ্রেণীর দেশপ্রেমিকদের, গোষ্ঠীর নয়। পক্ষন্তরে সেই ব্যক্তি কিম্বা গোষ্ঠী ক্ষমতার রাজনীতির যুপকাঠে লক্ষ আবাল বৃদ্ধ বণিতাকে বলি দিয়েছে, পলাতক রাজনীতির প্রচ্ছায়ায় গণবিপ্লব ও প্রতিরোধকে ঠেকাতে চেয়েছে। সেবারও চট্টগ্রামের অবরোধ, জয়দেবপুরের সেনা বিদ্রোহ, পাবনার বৈপ্লবিক সমাবেশ, কুমিল্লা ও ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার ঐতিহাসিক প্রতিরোধ, তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ভবনের গোপন আলাপনীকে নস্যাৎ করে ঘন- বিদ্রোহের প্রেক্ষিত সৃষ্টি করেছিল। কিন্তু আপোষকারী নেতৃত্ব জনগণের বীরোচিত রক্তদানকে অস্বীকার করে গোল টেবিলে দেশ বিভাজনের স্বপ্ন দেখেছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান পঁচিশে মার্চ সন্ধ্যায়ও তাই মনস্থির করতে পারেননি। তাঁর শেষ অহবান ছিল সাতাশে মার্চের হরতাল, স্বাধীনতা যুদ্ধের নয়, সেই সংকটকালও এগিয়ে এসেছিল সামরিক বাহিনী এবং বিপ্লবী চেতনায় উদ্বুদ্ধ তরুণ ও যুবকদের দল। তবুও সেই যুদ্ধ গণযুদ্ধে রূপায়িত হতে পারেনি। কেননা বৈদেশিক চক্র এই সংগ্রামকে নিজ খাতে প্রবাহিত করবার জন্য বদ্ধপরিকর ছিল। মুক্তি বাহিনীর প্রতি চরম অবিশ্বাস হেতু সৃষ্টি হলো তথাকথিত মুজিব বাহিনী। জনযুদ্ধে অভিযাত্রাকে রুখবার জন্য করা হলো সামরিক হস্তক্ষেপ। এই চক্রান্ত্রের ইতিহাস সুদীর্ঘ। যখন মুক্তি বাহিনীর বীর সেনানীরা গেরিলা বাহিনীর তরুণেরা এবং দেশের অভ্যন্তরের বিপ্লবী যোদ্ধারা জন- যুদ্ধের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়ে জাতীয় মুক্তির অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্যে যুদ্ধ করছিল তখনই মুজিব নগরের রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে এই চক্রান্ত দানা বেঁধে উঠে। এই চক্রান্ত মুক্তি যুদ্ধকে নিয়ন্ত্রিত করবার চক্রান্ত, পরাভূত নেতৃত্বকে ক্ষমতায় অভিষিক্ত করবার চক্রান্ত। যাঁরাই তখন এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছেন তাদেরই কপালে জুটেছে অপপ্রচারণা ও রাজনৈতিক নিগ্রহ। পরলোকগত দুর্গা প্রসাদের (ডি.পি.ধর) অংগুলী হেলনে পরিচালিত মুজিবনগর সরকারের বশংবদ নেতৃত্ব ও প্রশাসন এবং সম্প্রসারণবাদের সৃষ্ট মুজিব বাহিনীর প্রতিবিপ্লবী কার্যক্রম একাত্তরের সংগ্রামের সবচাইতে মসীলিপ্ত অধ্যায়। ইতিহাস এর সাক্ষ্য দেবে জাতীয় মুক্তির প্রত্যাশী এবং সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদ বিরোধী লক্ষ কোটি দেশপ্রেমিক জনগণ। এরই ফলশ্রুতি ১৬ই ডিসেম্বর ১৯৭১। ত্রিশ লক্ষ প্রাণ (যদিও তা সত্য নয়)

ও আকাঙ্খিত জাতীয় মুক্তির পরিবর্তে দেশবাসী পেল এক পুতুল সরকার। এবং সংক্ষেপে এটাই হচ্ছে পুতুল নাচের ইতিকথা। শেখ মুজিবুর রহমান এই ইতিকথার নেপথ্য নায়ক। আগরতলার কুখ্যাত ষড়যন্ত্রের মামলা এবং একাত্তর মুজিববাহিনীর অভ্যুদয় কোন বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, বরং বিছিন্নতাবাদী প্রতিক্রিয়াশীল আন্দোলনের পর্যায়ক্রমিক ঘটনাপঞ্জী। সাড়ে সাত কোটি বাঙ্গালীর জাতীয় মুক্তির সংগ্রাম, জাতিগত নিপীড়নের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ এবং সম্প্রসারণবাদ বিরোধী সংগ্রামের সঙ্গে এ মৌলিক তফাৎ রয়েছে। প্রথমটি বাঙ্গালী বুর্জোয়ার সব চাইতে ঘৃণ্য ও মেরুদণ্ডবিহীন অংশের ক্ষমতা দখলের চক্রান্ত এবং দ্বিতীয়টি বাঙ্গালী জাতীয় বুর্জোয়ার অংশসহ সকল শ্রেণীর মানুষের জাতীয় ও অর্থনৈতিক মুক্তির চূড়ান্ত সংগ্রাম। আমার বেদনাবোধ হয় এই জন্য যে, শেখ মুজিবুর রহমানের প্রতি সমগ্র দেশবাসীর অকুণ্ঠ সমর্থন সত্ত্বেও তার সংকীর্ণ শ্রেণী- চেতনা বিদেশী প্রভুর দায়বদ্ধ রাজনীতির শৃংখল মোচন করতে পারেনি। বরং পুতুলের মত হয়ত বা অনিচ্ছুক পুতুলের মত প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে তাঁর দ্বৈত ভূমিকা পালন করে গেছেন।

তিনি ছিলেন দক্ষ নট। অভিনয়ের চাতুর্যে প্রতিটি নাটকীয় মুহূর্তে দর্শকবৃন্দের তুমুল করতালি কুড়িয়েছেন, বাগ্মিতার সম্মোহন ও বিভ্রমের মায়াজাল রচনা করেছেন। জাতীয় স্বাধীনতার মহানায়কের শিরোপা পরিধান করেছেন। কিন্তু বারবার ষড়যন্ত্রের ঋণ শুধতে গিয়ে বাংলার মুক্তিকামী মানুষের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। সেখানেই তার ট্রাজেডী।

শেখ মুজিবুর রহমানের অনুপস্থিতিতেও এ কাহিনীতে ছেদ পড়েনি। সুপরিকল্পিত ভাবে সৃষ্ট প্রতিবিপ্লবী মুজিব বাহিনী একাত্তর সালে তার পক্ষ হয়ে প্রতিনায়কের ভূমিকা পালন করেছে, এই বিকল্প বাহিনীর সেই ষড়যন্ত্রী রাজনীতির অন্যতম হাতিয়ার মুজিববাদের তথাকথিত ভাবদর্শন, তত্ত্ব, ভাষা ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের ইতিহাসের নির্লজ্জ বিকৃতি এই একই পরিকল্পনার অংশ বিশেষ।

মুজিবাদ ও মুজিব বাহিনীর কাহিনী আজো ইতিহাসে অনুল্লিখিত। এই প্রতিবিপ্লবী তত্ত্বও সংগঠন শুধুমাত্র ব্যক্তি শাসন কায়েম করবার জন্যই সৃষ্টি করা হয়নি, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনপুষ্ট সম্প্রসারণবাদী

আধিপত্যকে নিরংকুশ করবার জন্য উদ্ভাবন করা হয়েছিল। স্বাধীনতা পরবর্তীকালের রক্ষীবাহিনী মুজিববাদ ও মুজিব বাহিনীরই সাংগঠনিক রূপ।

মুজিববাদ ও মুজিববাহিনী সৃষ্টির মূল লক্ষ্য ছিল ত্রিবিধ।

(ক) মুক্তিযুদ্ধ দীর্ঘায়িত হলে মুক্তিবাহিনীর ক্রমবর্ধমান শক্তি ও আধিপত্যকে খর্ব করা, (খ) গেরিলাযুদ্ধের মাধ্যমে সৃষ্ট দেশপ্রেমিক বিপ্লবী সামাজিক শক্তির মোকাবেলা করা এবং (গ) প্রয়োজনবোধে শেখ মুজিবুর রহমানের অবর্তমানে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করা। প্রথম দু'টো কারণের জন্য মুক্তিবাহিনীর সংগে মুজিব বাহিনীর তীব্র দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হয়েছিল এবং তৃতীয় কারণের জন্য সম্প্রসারণবাদের বশংবদ মুজিবনগর সরকারের নেতৃত্ব ও প্রশাসনের সংগেও সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল।

একটি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত এই 'এলিট ফোর্স' সৃষ্টির ইতিহাস আরও বিচিত্র। মুজিব বাহিনীর নেতৃবৃন্দের পরিকল্পনা অনুযায়ী শেখ মুজিবুর রহমানের স্বহস্তে লিখিত পত্রের উপর ভিত্তি করে এবং তাঁরই নির্বাচিত উত্তরাধিকারীদের নেতৃত্বে এই রাজনৈতিক বাহিনী গঠন করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, দেরাদুনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই বিশেষ প্রতিবিপ্লবী সংগঠন জেনারেল ওসমানীর নেতৃত্বে পরিচালিত মুক্তি বাহিনী, এমন কি তাজউদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে গঠিত মুজিবনগর সরকারেরও নিয়ন্ত্রণাধীনে ছিল না। জনৈক ভারতীয় রাজনৈতিক উদ্দেশ্য, সাংগঠনিক কাঠামো এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে এ কথাই নিঃসন্দেহে যে, জাতীয় মুক্তির আন্দোলনের সংগে এই বাহিনীর মৌলিক বিরোধ ছিল। বিরোধের সম্ভাব্য কারণ আমি আগেই উল্লেখ করেছি।

যদি শেখ মুজিবুর রহমানের পত্রের কথা সত্যি হয়ে থাকে তবে এ কথাও প্রতীয়মান হয় যে, আগতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উদ্দেশ্যের সঙ্গে মুজিব বাহিনীর গভীর যোগসূত্র রয়েছে। দুঃখজনক হলেও এ কথা, সত্য যে, শেখ মুজিবুর রহমানের পর্দান্তরালের ভূমিকা পূর্ব নির্ধারিত ছিল। মঞ্চ- সফল নায়কের মত তিনি নেপথ্যের কুশলী পরিচালকের ইংঙ্গিত প্রতি পদে পালন করে গেছেন। তিনি ছিলেন ভাগ্যের বরপুত্র। কিন্তু এচিলিসের গোড়ালীর মত তাঁর অজেয় ভাগ্য ১৫ই আগস্ট মুহূর্তের যন্ত্রণায় নিঃশেষিত হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ্য যে, মুজিবনগর সরকার ও প্রশাসন, মুজিব বাহিনী এবং তথাকথিত কাদেরীয়া বাহিনীর মধ্যকার দ্বন্দ্বে

আন্তঃস্বার্থের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বীর ক্ষমতার প্রসাদপ্রাপ্তির লড়াই। একাত্তরের যুদ্ধের অনিশ্চিয়তা, দীর্ঘসূত্রিতার আশংকা এবং শেখ মুজিবুর রহমানের অনিশ্চিত ভবিষ্যত উপরোক্ত দ্বন্দ্বকে তীব্রতর করে তোলে। কিন্তু তাঁর স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের সাথে সাথে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। কেননা সব পুতুলের মাঝে তিনি পুতুলের রাজা। রূপকের মাধ্যম সৃষ্টি তাঁর ভাবমূর্তি, দুচারণার স্পর্শমণিতে উদ্দীপ্ত। তাঁর আত্মদানের রূপকাহিনী এবং সর্বোপরি তাঁর ব্যক্তিত্বের অপরিমিত শৌর্য ও ঐতিহাসিক নির্বন্ধ জাতীয় স্বাধীনতার বিভ্রম সৃষ্টিতে অনেক বেশী কার্যকর। জনগণের বিমূর্ত ভালবাসার বর্ণচ্ছটায় আলোকিত ভাবমূর্তি তাঁর শ্রেণী চরিত্রের রংগীন প্রচ্ছদ মাত্র। বাংগালী বুর্জোয়ার নিকৃষ্টতম ও মেরুদণ্ডবিহীন মুৎসুদ্দীন শ্রেণীর তিনি ছিলেন যোগ্যতম, শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি।

পুতুলনাচের ইতিকথার পরের কথা তাই বিচিত্রতর। এই উৎপাদনবিমুখ, লুণ্ঠনপ্রিয়, পরাভূত শ্রেণী স্বাভাবিকভাবেই সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ ও সম্প্রসারণবাদের ওপর নির্ভরশীল হবে। ঐতিহাসিক কারণে এবং উপমহাদেশের বর্তমান প্রেক্ষিতে উপরোক্ত শক্তিত্রয়ের সমন্বয় ও দ্বন্দ্ব পৌনঃপুনিকভাবে বাংলাদেশের ক্ষমতাসীন মুৎসুদ্দীন বুর্জোয়ার আন্তর্জাতিক নির্ভরতার নিক্তিকে প্রভাবিত করছে। বিগত সাড়ে তিন বছর এই পরান্মুখতার মূলস্তম্ভ ছিল সামাজিক সাম্রাজ্যবাদের সমর্থনপুষ্ঠ ভারতীয় সম্প্রসারণবাদ। বাংলাদেশের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপট তাদেরই নির্দেশে নির্ণীত হয়েছে। সমাজতান্ত্রিক গণচেতনাকে পায়ে মাড়িয়ে, সার্বভৌমত্বের জাতীয় আকাংখাকে বিসর্জন দিয়ে, জাতীয় অর্থনীতি উন্নয়নের স্বার্থকে ধ্বংস করে সংস্কৃতি ও শিক্ষাকে এই শক্তিজোটের স্বার্থে অবদমিত করে শুরু হয়েছিল পরিকল্পনার দ্বিতীয় অধ্যায়। এরই ফলশ্রুতি একদল, একনেতা, একদেশ। এরই পরিণাম রাজনৈতিক, অর্থ- নৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক নৈরাজ্য। এরই অবশেষে লুণ্ঠিত, লাঞ্ছিত, মৃত্যুকীর্ণ বাংলাদেশ।

শেখ মুজিবুর রহমান নাটকের নিরূপায় ক্রীড়নক। তাঁর অসহায়তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি, দেখেছি দায়বদ্ধ মানুষের নিষ্ফল ইচ্ছের বিলাপ। এখানেই ছিল তার দ্বৈততা, তিনি ছিলেন কিংবদন্তীর নায়ক। তার রাজনীতির প্রক্রিয়া দ্বিচারণে অতুল্য। কিন্তু ঋণগ্রস্ততার দায় পরিশোধ করতে গিয়ে

বারবার চক্রবৃদ্ধি হারে তিনি মূল্যে কড়ি গুণছিলেন। তার প্রাপ্য ছিল শুধুমাত্র ক্ষমতার ময়ুর সিংহাসন।

আমি এ প্রসংগের দীর্ঘ অবতারণা করেছি শুধুমাত্র একথা বলবার জন্যে যে, বাংলাদেশের সমাজ বিন্যাস, সামাজিক স্তর এবং ইতিহাসিক পটভূমির প্রেক্ষিতে ব্যক্তিদৌর্বল্য কিংবা ব্যক্তি- দুঃশাসন, ব্যক্তি ও গোষ্ঠী দুর্নীতি এবং প্রশাসনিক স্থবিরতা শেখ মুজিবুর রহমানের অকাল পতনের প্রধান কারণ হতে পারে না। কেননা রাজনীতি ও ইতিহাস নিজস্ব গতিবেগে এগিয়ে চলে। সেখানে ব্যক্তি গৌণ, মুখ্য শুধু ঘটনাপ্রবাহের ডায়নামিক্স। শেখ মুজিবুর রহমানের রাজনৈতিক উত্থান এবং পতন এই ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে নিহিত ছিল। তাঁর সম্রাটের স্বপ্ন উপজাতীয় গোষ্ঠী- প্রিয়তা, আকাশচুম্বী অহম এবং আত্মবিমোহন তারই দায়বদ্ধ আত্ম ও শ্রেণীসঞ্জাত অপূর্তির আগ্রাসী অভিব্যক্তি। যতই তিনি হাজারো সুতার বাঁধনে জড়িয়ে গেছেন ততই বৃদ্ধি পেয়েছে তার বিভ্রম। ইংরেজীতে যাকে বলা হয় পারা নাইয়া।

আমার কারামুক্তির পর ২৯শে জুলাই তার সাথে দেখা হয়েছিল। বিক্ষিপ্ত পদচারণায় অস্থির শেখ মুজিবুর রহমান বলেছিলেনঃ 'I am sorry for what happened to you, but my hands were tied."

... তার রাজনীতির দ্বিচারণ সত্ত্বেও আমি তার অসহায়তার কথা বিশ্বাস করেছিলাম। কেননা, আমি জানি পুতুলের রাজনীতি কতো নিষ্করুণ যে সেখানে রাজা সাজা যায় কিন্তু ইচ্ছামত রাজ্য শাসন করা যায় না। নিপুণ ক্রীড়া তাকে গরিমা দিয়েছিল কিন্তু প্রাণ দেয়নি, পোশাকী বৈভবে বিভূষিত করেছিল কিন্তু স্বাধীনতা দেয়নি। একনেতা একদলঃ এই প্যান্টোমাইন প্রদর্শনীর সর্বশেষ পর্ব।

বিগত সাড়ে তিন বছর বাংলাদেশের দুঃখী জনগণ এই অবাক প্রদর্শনীর মৌন দর্শক ছিলেন। তাদের নিঃশব্দ আতিতে ধ্বনিত হচ্ছিল কতিপয় লুটেরার অট্টরোল। আর তাতে ইন্ধন যুগিয়েছে একটি জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রকারী চক্র যারা সমাজতন্ত্রের ছলে, মৈত্রীর ছদ্মবেশে এবং আন্তর্জাতিকতাবাদের আবডালে বাংলাদেশকে বৈদেশিক স্বার্থের অবারিত লীলাক্ষেত্রে পরিণত করবার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিল। অন্যদিকে বাংগালী বুর্জোয়ার নিকৃষ্টতম মেরুদণ্ডবিহীন মুৎসুদ্দীকুল দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তিকে ধ্বংসকল্পে পরদেশী বাণিজ্যিক পুঁজির সেবাদাসের

ভূমিকায় নিয়োজিত ছিল। এরই সাংগঠনিক রূপ ছিল "দেশপ্রেমিক" (?) দের ত্রিদলীয় ঐক্যজোট। এই ঐক্যজোটের নীল নকশা পরিশেষে একদলীয় শাসন প্রবর্তনের মাধ্যমে রূপায়িত হয়।

ফলতঃ বাংলাদেশ এক দিকে সামাজিক সাম্রাব্যবাদের প্রভাববলয়ে আপতিত হয় এবং অন্যদিকে পূর্ব ভারতের ধ্বংসোন্মুখ শিল্পকেন্দ্রের প্রায় ঔপনিবেশিক পশ্চাৎভূমিতে পরিণত হয়। দেশের উৎপাদিকা শক্তিকে সুপরিকল্পিতভাবে ধ্বংস করার ইতিহাস বিংশ শতাব্দীতে বিরল। অষ্টাদশ শতকের ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর আমলের লুটেরা বাণিজ্যিক পুঁজির অবাধ লুণ্ঠনের সঙ্গে এই প্রক্রিয়ার সাদৃশ্য লক্ষনীয়।

এই দ্বৈতচক্র কখনো এককভাবে, কখনো যুগ্মভাবে তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য কায়েম করবার চেষ্টা করেছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি ও অর্থনীতির গতিধারা নিয়ন্ত্রণ এবং জাতীয় স্বাধীনতাকে বৈদেশিক প্রভুদের স্বার্থে নস্যাৎ করবার জন্য এই চক্র- জোট পৌত্তলিকতার রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করেছে, মুবিজবাদের ফ্যাসিবাদী দর্শনকে নিপীড়নমূলক পৌত্তলিক রাজনীতির তত্বগত ভিত্তি হিসেবে দাঁড় করিয়েছে। আর তার যোগান দিয়েছে দেশপ্রেমিকদের ঐক্যজোটের অপর দু'টো রাজনীতি ও বৈদেশিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত রাজনৈতিক দল।

একনেতা, একদল শেখ মুজিবুর রহমানের একক আত্মচিন্তা নয়। বিগত সাড়ে তিন বছরের দেশপ্রেম বিরহিত রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার ফলশ্রুতি। আর সে জন্যেই তার পতন শুধুমাত্র অবাধ দুর্নীতি, লুণ্ঠন, দুঃশাসন, গোষ্ঠীপ্রিয়তা ও পারিবারিক শাসন প্রতিষ্ঠার কারণজনিত নয়। এর মৌল কারণ পূর্বে উল্লিখিত রাজনীতি ও ইতিহাসের মধ্যে নিহিত।

আমি বারবার একই কথায় ফিরে আসছি। কারণ আমার দৃষ্টিতে রাজনীতিই মুখ্য, ব্যক্তি নয়, ইতিহাস প্রধান, ঐতিহাসিক চরিত্র নয়। শেখ মুজিবুর রহমান জুডাসের সিংহ নন অথবা দেব বংশোদ্ভব কুলনায়ক নন। তিনি বাংলাদেশের সমাজ বিন্যাস ও পরিমণ্ডলে লালিত একজন নশ্বর মানুষ।

ব্যক্তিকেন্দ্রিক বিশ্লেষণই অরাজনৈতিক এবং ভ্রমাত্মক বলে আমি মনে করি। তিনি ছিলেন মাধ্যম এবং তারই নেতৃত্বে গড়ে উঠেছিল। আসল

মুৎসুদ্দী শ্রেণীর অসার রাজত্ব। সাম্রাজ্যবাদী ও সম্প্রসারণবাদী শক্তি সর্বদাই এই ধরনের মেরুদণ্ডহীন শ্রেণীর উপর ভিত্তি করে তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করে। আর সে জন্যই তারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অভিষিক্ত হয়েছিল আলোচ্য ব্যক্তির মাধ্যমে। বাংগালী বুর্জোয়াদের হীনতম অংশ প্রশাসন যন্ত্রে প্রধান ছিল আর বাংগালী বুরোক্রেসির সবচাইতে দুর্নীতিপরায়ণ ও তাবেদার অংশ এবং অর্থনীতির ক্ষমতাবান ছিল পরদেশী লুটেরা পুঁজির দেশীয় সেবাদাস। একদলীয় শাসন সেই ঘৃণ্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক জোটকে কায়েম করবার জন্যেই প্রবর্তন করা হয়েছিল।

এই চক্রজোটের এক বছরের প্রতিভু হিসেবে শেখ মুজিবুর রহমান তার ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের ঋণ শোধ করছিলেন। গণতন্ত্র হরণ, নির্মম নিপীড়ন, কন্ঠরোধ এবং হত্যা এই প্রতিক্রিয়ারই অন্যতম পর্যায়। আজও ৬২ হাজার রাজনৈতিক কর্মী বিপ্লবী ও মুক্তিযোদ্ধা শেখ মুজিব কর্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হয়ে মুক্তির আকাঙ্খায় দিন গুনছেন। আর সেই প্রক্রিয়াকে পরমোল্লাসে উস্কানি দিয়েছে কম্যুনিষ্ট নামধেয় একদল সংকলিত পরজীবী। কেননা দেশপ্রেমে উজ্জীবিত গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী শক্তিকে নির্মূল না করা পর্যন্ত তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হতে পারতনা।

শেখ মুজিবুর রহমানের তিন বছরের দুঃশাসন সহস্র জননীর বুক ভেংগে দিয়েছে, শত শত বীর দেশপ্রেমিকের রক্তে রঞ্জিত হয়েছে, দেশীয় সম্পদ পাচারের নয়া ইতিহাস রচনা করেছে, মনন ও সংস্কৃতিকে হত্যা করেছে এবং সর্বোপরি সার্বভৌমত্বকে বিকিয়ে দিয়েছে। অর্থনীতির আর কানাকড়িও অবশিষ্ট নেই। অতএব কালান্তরের এই সন্ধিক্ষণে যদি আমরা সেই রাজনীতিকে পরাস্ত না করতে পারি, শেকল ভাংগার সংগ্রামে অবতীর্ণ না হতে পারি এবং দেশপ্রেমিক বুর্জোয় মধ্যবিত্ত প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী ও কৃষক শ্রমিকের ঐক্যজোট না গড়তে পারি তবে আবার পুতুলরাজ কায়েম হবে। পুতুল রাজাকে যদি খুঁজে না পাওয়া যায় তবে আবার পরদেশী পটুয়া নতুন আদলে পুতুল গড়বে। পরিশেষে তবুও বলব শেখ মুজিবুর রহমান আমার চোখে গ্রীক ট্রাজেডীর করুণ চরিত্র- শ্রেণী চেতনার সংকীর্ণ ঈর্ষার বিদ্বিষ্ট, ভালবাসার অকৃত্রিম; কিন্তু দুর্বলতায় আকীর্ণ একজন নশ্বর মানুষ। ক্ষমতার অংগনে তার সদম্ভ পদচারণা কখনো করুণার সৃষ্টি করেছে। সত্য ভাষণে তিনি ভ্রুকুটি করেছেন, প্রতিবাদীকে রোষাণলে ভস্ম করতে

চেয়েছেন। দেশকে ভাল বাসতে গিয়েও তিনি দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। জীবন দিয়ে তাকে সেই মূল্য শোধ করতে হয়েছে। বাংলাদেশ অমর হোক, স্বাধীনতা দীর্ঘজীবী হোক।

(দুঃশাসনের ১৩৩৮ রজনী, পৃষ্ঠা, ৯০- ১০১)

পরিশিষ্ট- ৭

সোনার বাংলায় পলাশীর অশনি সঙ্কেত

অব: মেজর জেনারেল আ ল ম ফজলুর রহমান

আপনারা সবাই অবগত আছেন যে, মহান মুক্তিযুদ্ধের সময় ভারত বাংলাদেশকে সামরিক সহায়তা প্রদান করে। সেই সুবাদে ভারতীয় বাহিনী স্বাধীন বাংলাদেশে প্রবেশ করে। ওই সময় আমি একজন অফিসার ক্যাডেট হিসেবে যুদ্ধের মাঠ থেকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য ভারতের মুরতি একাডেমিতে যাই। সম্ভবত ডিসেম্বর মাসে আমি সেখানে ভারতীয় সেনানিবাসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ব্যহৃত জিপি এম- ৩৮ এবং সিজে- ৫ ভারতীয় সেনাদের দ্বারা ব্যবহৃত হতে দেখে স্তম্ভিত হয়ে যাই। দেশে ফিরে ১৯৭১ সালে ফেব্রুয়ারি/মার্চ মাসে এবং বর্তমানে যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে ভারতীয় বাহিনী ওই সময় স্বাধীন বাংলাদেশে যে ধ্বংসাত্মক পদক্ষেপ গ্রহণ করে এবং অবাধ লুটপাট চালায় তার কিছু নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

ক. মুক্তিযুদ্ধ শেষে ভারতীয় বাহিনী প্রায় ৬০ হাজার কোটি টাকার সম্পদ ও মিল কারখানার যন্ত্রপাতি লুট করে। এর উদ্দেশ্যে ছিল সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশকে পঙ্গু করে ভারত নির্ভর করা। তদুপরি ২৫ বছরের ও সাত বছরের মৈত্রী চুক্তি তো ছিলই। আমি ভারত কর্তৃক বাংলাদেশকে লুণ্ঠন চালানোর তথ্য উদঘাটনের জন্য কমিশন গঠনের জোর সুপারিশ করছি। যাতে ভারতকে ভবিষ্যতে বিচারের সম্মুখীন করা সম্ভব হয়।

খ. কৃষি ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে ধ্বংস করার জন্য চালু করা হয় ফারাক্কা বাঁধ। এই মরণ ফাঁদ ফারাক্কার প্রভাবে আজ দেশের এক- তৃতীয়াংশ অঞ্চলের পরিবেশ ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে দাঁড়িয়েছে। দেশের অনেক নদী নাব্যতা হারিয়ে মরা নদীতে পরিণত হয়েছে। ফলে নৌ চলাচল বিঘ্নিত হওয়ায় জনজীবনের দুর্ভোগ নেমে এসেছে। চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ওই

অঞ্চলে ব্যবসায়- বাণিজ্য। দেশের দক্ষিণ- পূর্বাঞ্চলে ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে লবণাক্ততা। ফলে জমি উর্বরতা হারিয়ে বন্ধ্যা জমিতে শুধু পরিণত হচ্ছে না, ইতোমধ্যে অনেক প্রজাতির গাছ মরতে শুরু করেছে। দক্ষিণ- পূর্বাঞ্চলের ভুগর্ভস্থ পানির স্তর অসম্ভব নিচে নেমে যাওয়ায় ভূগর্ভস্থ পানিতে আর্সেনিকের মাত্রা চরমভাবে বৃদ্ধি পাওয়ায় ওই অঞ্চলের প্রায় পৌনে ২ কোটি মানুষ আর্সেনিকে আক্রান্ত হয়ে ধুঁকে ধুঁকে মৃত্যুর দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই অঞ্চলে মরুকরণ প্রক্রিয়া প্রকট আকার ধারণ করেছে। সাম্প্রতিক সময়ে সিডরের আঘাত এরই ফল।

গ. এর পর প্রতিবেশী দেশটি এ দেশীয় সেবাদাসদের দ্বারা আরম্ভ করে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র। যার যুপকাষ্ঠে বলি হয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, চার জাতীয় নেতা, রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান, জেনারেল খালেদ মোশাররফসহ আরো অনেক নেতা। উদ্দেশ্যে বাংলাদেশকে নেতাশূন্য করা। সংঘটিত হয় পরপর সেনাবিদ্রোহ, যার মূল পরিকল্পনা ছিল দেশের সেনাবাহিনীকে সমূলে বিনাশ করা।

ঘ. দেশের এই নাজুক পরিস্থিতিতে পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রতিবেশী দেশের প্রত্যক্ষ মদদে আরম্ভ হয় শান্তিবাহিনীর সশস্ত্র সন্ত্রাসী কার্যকলাপ। যা আজো শান্ত হয়নি।

ঙ. একটি সুদূরপ্রসারী ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে প্রতিবেশী দেশ বাংলাদেশের সার্বভৌম অংশ তালপট্টি দ্বীপ দখল করে নিয়েছে। এর ফলে বাংলাদেশ তার সমুদ্র সীমান্তস্থ মহীসোপান ও ইকোনমিক জোনের বিপুল সমুদ্রসম্পদ আহরণ থেকে ভবিষ্যতে বঞ্চিতই হবে না শুধু আখেরে আমরা একটি স্থলবেষ্টিত দেশে পরিণত হয়ে অর্থনৈতিকভাবে পঙ্গু হয়ে যাব।

চ. চলমান ধারাবাহিকতায় তথাকথিত বঙ্গভূমি আন্দোলনকে আলাদা করে দেখার কোনো অবকাশ নেই। এর পেছনে ধর্মীয় বিশ্বাস ভিত্তিক গোষ্ঠীগত বিভাজনের মাধ্যমে ভবিষ্যতে বাংলাদেশকে খণ্ডিত করার অপপ্রয়াস নিহিত রয়েছে।

ছ. প্রতিবেশী দেশটির সীমান্ত ঘিরে ১০- ১২ কিলোমিটার অভ্যন্তরে শত শত ফেনসিডিল তৈরির কারখানা স্থাপিত হয়েছে। যার একমাত্র উদ্দেশ্য, আমাদের কোমলমতি তরুণদের নেশাগ্রস্ত করে দেশের ভবিষ্যৎ

প্রজন্মকে ধ্বংস করা, যাতে দেশ ও জাতি মেধা ও নেতৃত্বশূন্য হয়ে পড়ে।

জ. ইসরাইলের সাথে ভারতের সামরিক সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরের পর থেকে খুব জোরে এবং অব্যাহতভাবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদের অভিযোগ উত্থাপিত হচ্ছে। যাতে প্রচারের তোড়ে বাংলাদেশকে একটি সন্ত্রাসী দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা যায়। এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য, সন্ত্রাসবাদের অভিযোগে ভবিষ্যতে বাংলাদেশ প্রতিবেশী দেশের হস্তক্ষেপ জায়েজ করা। যেমনটি ইরাক ও আফগানিস্তানে করা হয়েছে।

ঝ. বর্তমানে বাণিজ্য আগ্রাসন কী পর্যায়ে পৌঁছেছে তা নতুন করে বলার প্রয়োজন নেই। বাজারে গেলেই এর ব্যাপকতা লক্ষ্য করা যাবে। এভাবে চলতে থাকলে পাট শিল্পের মতো অন্য সব সেক্টরে বন্ধত্ব নেমে আসতে বেশি দেরি হবে না। ফলে আমাদের অমিত সম্ভাবনার দেশ প্রতিবেশী দেশটির করুণার পাত্রে পরিণত হবে। বর্তমানে চাল রফতানি নিয়ে ভারতের অমানবিক সিদ্ধান্ত আমাদের চালের বাজারকে কিভাবে অস্থিতিশীল করেছে এবং তার ফলে দেশের মানুষ কী সমস্যা মোকাবেলা করছে তার বর্ণনার দরকার আছে বলে মনে হয় না। এর পরও ভারত প্রতিবেশী বন্ধু দেশ, কী নিষ্ঠুর পরিহাস! প্রতিবেশী দেশটি বাংলাদেশের অভিন্ন ৫৪টি নদীর মধ্যে ৫৩টিতে আন্তর্জাতিক আইন লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে বাঁধ, গোয়েন ও স্পার নির্মাণ করে একতরফা পানি প্রত্যাহার আরম্ভ করেছে। ফলে দেশ আক্রান্ত হচ্ছে প্রবল খরা ও বন্যায়। তদুপরি ২০১৬ সালের মধ্যে আন্তঃনদী সংযোগ পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করে বাংলাদেশের উজান দিয়ে অভিন্ন আন্তর্জাতিক ৫৪টি নদীর পানি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ভারত নিয়ে যাবে বাংলাদেশকে তার পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে অতীব নিষ্ঠুরভাবে বঞ্চিত করে। এটা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারত কর্তৃক পারমাণবিক যুদ্ধ শুরুর চেয়েও ভয়াবহ। এটা বাস্তবায়িত হলে আগামী ৩০-৪০ বছরের মধ্যে বাংলাদেশ মরুভূমিতে পরিণত হয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে।

ট. রাজনৈতিক অঙ্গনে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ ও বিপক্ষ ধারার সৃষ্টিতে পরোক্ষ সহায়তা দিয়ে প্রতিবেশী দেশটি অতীব দক্ষতার সাথে জাতিকে বিভক্ত করতে সক্ষম হয়েছে। সক্ষম হয়েছে বাঙালী ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের বিভক্তির সৃষ্টিতেও। যার অপনোদন প্রায় অসম্ভব।

বাঙালি ও বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদের বিভাজনের দুর্লঙ্ঘ্য দেয়ালকে ভেঙে জাতি একদিন একই মঞ্চে দণ্ডায়মান হবে। এমন আশা বর্তমানে এমনকি অদূর ভবিষ্যতেও প্রায় অসম্ভব বলে মনে হয়। বিষয়টির প্রতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। জাতীয়তাবাদের বাধার বিন্ধাচলকে অতিক্রম করতে হলে রাজনৈতিক অংশগ্রহণে নির্দলীয় জননীতির প্রয়োগ নিশ্চিত করতে একটি দল নিরপেক্ষ জননীতিকেই প্রাথমিকভাবে অবলম্বন হিসেবে গ্রহণ সমধিক সমীচীন হবে বলে আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে প্রতিভাত হয়েছে। সর্বশেষ সামনে এসেছে যুদ্ধাপরাধীদের বিচার। এর মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশকে উপমহাদেশে বন্ধুহীন করে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রতিবেশী দেশটি তার চরম এবং শেষ অস্ত্র যে প্রয়োগ করতে চায় না তাই বা বলি কী করে। যেমন বাংলাদেশ সরকার পক্ষ হয়ে যুদ্ধপরাধের বিচার আরম্ভ করলেই স্বভাবতই পাকিস্তানও বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় হবে। সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান উপমহাদেশের দু'টি মুসলিম দেশ পরস্পরের শত্রুতামূলক মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড়ানোর কারণে বাংলাদেশ উপমহাদেশে বন্ধুহীন হওয়ায় এবং বাংলাদেশ আক্রান্ত হলে পাকিস্তান বাংলাদেশের পাশে দাঁড়াবে না, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চরম ব্যবস্থা গ্রহণের আগে আমাদের চরম ও পরম শত্রু যুদ্ধাপরাধীদের বিচারের ডামাডোলে এমনি একটা মোক্ষম সুযোগের অপেক্ষায় যে নাই তা কি হলফ করে বলা যাবে? নিশ্চয়ই না। তাই বিষয়টির প্রতি সব সচেতন নাগরিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। এবং বিষয়টি নিয়ে একটি নির্মোহ ও গভীর চিন্তার আবেদন জানাচ্ছি।

একটু গভীরভাবে লক্ষ করলে প্রতিভাত হবে যে, ৭১'-এর মহান মুক্তিযুদ্ধের পরম উদাহরণকে সামনে রেখেই ঠিক একই পন্থায় '৭১-এর মতো করে জাতিকে একই বেদিতে ইস্পাত দৃঢ় অবস্থান নিয়ে ভারতীয় আগ্রাসনকে এবং বহির্বিশ্বের আগ্রাসনকেও মোকাবেলা করতে হবে। এ বিষয়ে জাতিকে সচেতন করা একান্ত প্রয়োজন। আমি মনে করি, জাতীয় প্রত্যাশা পূরণে এটাই হবে শেষ লড়াই, যাতে আমাদের অবশ্যই জয়লাভ করতে হবে, যা আমরা সর্বতোভাবে অর্জন করতে সক্ষম। আমাদের আছে ১৩.৫০ কোটি এক ভাষা সংস্কৃতির জনগোষ্ঠী। তন্মধ্যে ১২ কোটি মুসলমান। এক ভাষা, এক ধর্ম ও এক জাতি। আমাদেরকে পরাজিত করতে পারে এমন শক্তি কোনো দেশের নেই। অনাগতকালে সোনার বাংলাকে রক্ষা করতে হলে হিমালয় থেকে

বঙ্গোপ সাগরের মধ্যস্থিত ৫৪টি নদীবিধৌত অঞ্চল সমন্বয়ে গঠন করতে হবে স্বাধীন রাষ্ট্রপুঞ্জের কমন ওয়েলথ। আসুন এর মাধ্যমে সোনার বাংলায় পলাশীর অশনি সঙ্কেতকে চিরতরে সমাধিস্থ করি।

লেখক : সাবেক মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রাইফেলস।

(দৈনিক নয়াদিগন্ত, ২৬ মার্চ, ২০০৮ প্রকাশিত)

পরিশিষ্ট- ৮

সাক্ষাৎকার

হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের দিল্লী মিশন-প্রধান, স্বাধীনতার পর দিল্লীতে বাংলাদেশ হাই কমিশনার, পরে পররাষ্ট্র মন্ত্রী স্পীকার এবং এক সময় জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের সভাপতি।

প্রশ্নঃ তিনজন সংখ্যালঘু নেতা ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে দেখা করেন এবং তার কাছে বাংলাদেশকে ভারতের একটি অংশ করে রাখার

প্রস্তাব দেন। আপনি এ সম্পর্কে কতটুকু জানেন ?

হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীঃ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের যোগাযোগ রক্ষা করার দায়িত্ব আমার ওপর অর্পিত ছিল। সেই সূত্রে প্রধানমন্ত্রীর ব্যক্তিগত স্টাফদের সঙ্গে আমার হার্দিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রধানমন্ত্রীর এক ব্যক্তিগত স্টাফ আমাকে ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৭১- এ জানান যে, আগের দিন অর্থাৎ ২৮ ডিসেম্বর তিনজন সংখ্যালঘু নেতা, যাদের মধ্যে চিত্তরঞ্জন সুতার ছিলেন একজন,- প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেন। তারা তার কাছে বাংলাদেশকে ভারতের অংশ করে রাখার প্রস্তাব রাখেন। প্রধানমন্ত্রী তাদের প্রস্তাবের জবাবে বলেন, "ইয়ে না মুশকীল হ্যায়।" প্রধানমন্ত্রীর ওই ব্যক্তিগত স্টাফ সেই সময় সেখানে ছিলেন। তিনিই ওই সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে দেন।

পরে আমি বাংলাদেশ সরকারকে বিষয়টি অবহিত করি। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। আসলে তারা, কিছু সংখ্যালঘু নেতা চেয়েছিলেন বাংলাদেশকে সিকিম ধরনের ভারতীয় অংশ করতে।

প্রশ্নঃ ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী শেখ মুজিবুর রহমান পাকিস্তানী বন্দীদশা থেকে মুক্ত হয়ে লণ্ডন- দিল্লী হয়ে ঢাকা আসেন। তিনি লণ্ডন থেকে দিল্লী আসেন বৃটিশ বিমান বাহিনীর একটি বিমানে। দিল্লী থেকে নিজস্ব বিমানে তাকে ঢাকায় পৌঁছে দেবার প্রস্তাব রাখে ভারত সরকার। কিন্তু শেখ মুজিব ওই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। সত্য কী ?

হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীঃ কথাটি সত্য। ভারত সরকারের তৎকালীন প্লানিং কমিশনের চেয়ারম্যান ডি, পি ধর,- তার ওপর অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার সংক্রান্ত বিষয়াবলী দেখা শোনার দায়িত্ব ছিল অর্পিত। তিনিই আমাকে ভারত সরকারের ওই প্রস্তাবটি জানিয়ে বলেন, "বৃটিশ সরকার এখনো

বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়নি। সেখানে শেখ সাহেব কী করে তাদের বিমানে ঢাকা যাবেন।" অস্থায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী তাজউদ্দীন আহমদ আমাকে একদিন বলেছিলেন, "ডি, পি ধর যা বলবেন, সেটাকে বাংলাদেশ সরকারের আদেশ বলে মনে করতে হবে।" তাজউদ্দীন আহমদের সে কথা মনে রেখেও আমি বঙ্গবন্ধুকে (শেখ মুজিব) ভারত সরকারের ওই প্রস্তাবের বিষয় জানাতে সাহস পাইনি। শেষ পর্যন্ত আমারই অনুরোধে তৎকালীন পররাষ্ট্র মন্ত্রী আবদুস সামাদ আজাদ বঙ্গবন্ধুকে ওই প্রস্তাবের কথা জানান। বঙ্গবন্ধু তাতে বলেছিলেন, "আমি ভারতীয় বিমানে ঢাকা যাব না। এটাই আমার শেষ কথা। ওদের বলে দিও।" আমি বঙ্গবন্ধুর এ জবাবে অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছিলাম। স্বস্তি বোধ করেছিলাম ।

প্রশ্নঃ ইতালীয় ফ্রি- ল্যান্স মহিলা সাংবাদিক ওরিয়ানা ফালাসিকে দেয়া সাক্ষাৎকারে জুলফিকার আলী ভূট্টো বলেছেন যে, শেখ মুজিব তার সামনে পবিত্র কোরান শরীফ স্পর্শ করে বলেছিলেন তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সম্পর্ক রাখবেন। শেখ মুজিবকে এ বিষয়ে আপনি কখনো কী কোন প্রশ্ন করেছিলেন ?

হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীঃ ওরিয়ানা ফালাসিকে দেয়া জুলফিকার আলী ভূট্টোর ওই সাক্ষাৎকারটি আমি ১৯৭২ সালেই পড়ি। আমি বঙ্গবন্ধুর কাছে এ নিয়ে প্রশ্ন রেখেছিলাম একবার। তিনি অস্বীকার করেছিলেন। বলেছিলেন, ভূট্টোকে তিনি এ ধরনের কোন কথা দেননি। আর ১৯৭৬ সালে জেদ্দায় আমার সঙ্গে ভূট্টোর দেখা হয়। আমি তখন সউদী আরবে বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত। ভূট্টো ওই সময় সউদী আরব সফরে যান। আমি ওরিয়ানা ফালাসিকে দেয়া তার সাক্ষাৎকারে তাকে দেয়া শেখ মুজিবের প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করে বলি যে, শেখ মুজিব আমাকে বলেছেন তেমন কোন প্রতিশ্রুতি আপনাকে তিনি দেননি। ভূট্টো আমার কথায় বার বার জোর দিয়ে বলেন যে, শেখ মুজিব তার কাছে ওয়াদা করেছিলেন। তিনি এও বলেন যে, তিনি মিথ্যা বলছেন না।

প্রশ্নঃ বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়ার আগে সোভিয়েত ইউনিয়ন লিখিতভাবে জানতে চায় যে, বাংলাদেশ পাকিস্তানের সঙ্গে কোন কাঠামোগত সম্পর্ক রাখবে কী না ? ঘটনাটি কতটুকু সত্য ?

হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীঃ ঘটনাটি সত্য। প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান সোভিয়েত ইউনিয়নকে লিখিতভাবে জানান যে, বাংলাদেশের সঙ্গে পাকিস্তানের কোন কাঠামোগত সম্পর্ক রাখার কোনই সুযোগ নেই।

বাংলাদেশ একটি স্বাধীন, সার্বভৌম রাষ্ট্র। এরপরই সোভিয়েত রাশিয়া বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেয়। প্রধানমন্ত্রীর ওই চিঠি আমি নিজে দিল্লীস্থ সোভিয়েত রাষ্ট্রদূতের হাতে দেই।

প্রশ্নঃ অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার ভারতের সঙ্গে যে গোপন সাত দফা চুক্তি করে, প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠনের পরিকল্পনা কী সেই সাত দফার মধ্যেই একটি ? রক্ষীবাহিনীই কী সেই প্যারামিলিশিয়া বাহিনী ?

হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীঃ ১৯৭১ সালের অক্টোবর মাসে ভারত সরকারের সঙ্গে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার এক লিখিত চুক্তিতে, প্যাক্ট নয়,- এগ্রিমেন্টে আসেন। ওই চুক্তি বা এগ্রিমেন্ট অনুসারে দু'পক্ষ কিছু প্রশাসনিক, সামরিক ও বাণিজ্যিক সমঝোতায় আসেন। প্রশাসনিক বিষয়ে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার ভারতের যে প্রস্তাবে রাজী হন, তা হলোঃ যারা সক্রিয়ভাবে মুক্তিযুদ্ধ করেছে, শুধু তারাই প্রশাসনিক কর্মকর্তা পদে নিয়োজিত থাকতে পারবে। বাকীদের চাকুরীচ্যুত করা হবে এবং সেই শূন্য জায়গা পূরণ করবে ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তারা।

স্বাধীনতার পর বেশকিছু ভারতীয় প্রশাসনিক কর্মকর্তা বাংলাদেশে এসেও গিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু (শেখ মুজিব) এসে তাদেরকে বের করে দেন।

সামরিক সমঝোতা হলোঃ বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর প্রয়োজনীয় সংখ্যক ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে (কতদিন অবস্থান করবে তার সময়সীমা নির্ধারণ করা হয় না।) ১৯৭২ সালের নভেম্বর মাস থেকে আরম্ভ করে প্রতি বছর এ সম্পর্কে পুনরীক্ষণের জন্য দু'দেশের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

বাংলাদেশের নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী থাকবে না।

অভ্যন্তরীণ আইন- শৃংখলা রক্ষার জন্য মুক্তি বাহিনীকে কেন্দ্র করে একটি প্যারামিলিশিয়া বাহিনী গঠন করা হবে।

ওই লিখিত সমঝোতাই হচ্ছে বাংলাদেশে রক্ষী বাহিনীর উৎস। আর ভারত- পাকিস্তান সর্বাত্মক যুদ্ধ বিষয়ক সমঝোতাটি হলোঃ সম্ভাব্য ভারত- পাকিস্তান যুদ্ধে অধিনায়কত্ব দেবেন ভারতীয় সেনাবাহিনী প্রধান, মুক্তি বাহিনী সর্বাধিনায়ক নন। এবং যুদ্ধকালীন সময়ে মুক্তি বাহিনী ভারতীয় বাহিনীর অধিনায়কত্বে থাকবে।

চুক্তির এই অনুচ্ছেদটির কথা মুক্তি বাহিনী সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীকে জানানো হলে তীব্র ক্ষোভে তিনি ফেটে পড়েন। এর প্রতিবাদে

রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে তিনি উপস্থিত ছিলেন না।

১৯৭২ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে কোলকাতা সফরে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাধারণ কথাবার্তার মাঝে প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে অপ্রস্তুত করে দিয়ে বলেন, "আমার দেশ থেকে আপনার সেনাবাহিনী ফিরিয়ে আনতে হবে।" শেখ মুজিব এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় এত সহজভাবে বলতে পারেন, ভাবতেও পারেননি ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী। তার ওই অপ্রস্তুত অবস্থার সুযোগ নিয়ে শেখ মুজিব নিজের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন, "এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রীর আদেশই যথেষ্ট।" অস্বস্তিকর অবস্থা পাশ কাটাতে মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে রাজী হতে হয় এবং জেনারেল মানেকশকে বাংলাদেশ থেকে সৈন্য প্রত্যাহারের দিন- ক্ষণ নির্ধারণের নির্দেশ দেন।

বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে যে চুক্তি হয়, সেটা খোলা বাজার (ওপেন মার্কেট) ভিত্তিক। খোলা বাজার- ভিত্তিতে চলবে দুদেশের বাণিজ্য। তবে বাণিজ্যের পরিমাণের হিসেব- নিকাশ হবে বছর- ওয়ারী এবং যার যা প্রাপ্য, সেটা ষ্টার্লিং- এ পরিশোধ করা হবে।

স্বাধীনতার পর পরই চুক্তি অনুসারে খোলা বাজারভিত্তিক বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। দু'দেশের সীমান্তের তিন মাইল খুলে দেয়া হয়। শেখ মুজিব এটা বন্ধ করে দেন।

বৈদেশিক বিষয়ে প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার যে চুক্তিতে আসেন,- সেটা হলঃ বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্কের প্রশ্নে বাংলাদেশ পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলবে এবং যতদূর পারে ভারত এ ব্যাপারে বাংলাদেশকে সহায়তা দেবে। মূলত বাংলাদেশের প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র বিষয়ের দায়িত্ব গ্রহণ করে ভারত। এই চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম। চুক্তি স্বাক্ষরের পর মুহূর্তেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন।

ভারত সরকারের সঙ্গে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার গৃহীত এই পুরো ব্যবস্থাকেই অগ্রাহ্য করেন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবর রহমান। এ কারণে আমি বিনা দ্বিধায় বলতে পারি যে, ১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১- এ বাংলাদেশ পাকিস্তান সৈন্য মুক্ত হয় মাত্র। কিন্তু স্বাধীন, সার্বভৌম হয় ১৯৭২ সালের ১০

জানুয়ারীতে- যেদিন শেখ মুজিব পাকিস্তান জেল থেকে মুক্ত হয়ে ঢাকা আসেন। বস্তুতঃ শেখ মুজিব ছিলেন প্রকৃত সাহসী এবং খাঁটি জাতীয়তাবাদী।

হুমায়ুন রশিদ চৌধুরী
২৭ ডিসেম্বর ১৯৮৯
(বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ- মাসদুল হক, পৃষ্ঠা- ১৬২- ১৬৬)

পরিশিষ্ট- ৯

আবদুর রাজ্জাক

(বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে 'র' এবং সিআইএ,পৃষ্ঠা, ১৭১- ১৮৯)

সাধারণ সম্পাদক, বাংলাদেশ কৃষক- শ্রমিক লীগ (বাকশাল), মুজিব বাহিনী নেতা চতুষ্টয়ের অন্যতম।

প্রশ্নঃ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ কবে গঠিত হয় ? বিপ্লবী পরিষদের প্রস্তাবটি কে উত্থাপন করেন এবং সদস্য কে কে ছিলেন ?

আবদুর রাজ্জাকঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা আমরা চিন্তা- ভাবনা শুরু করি ১৯৬০- '৬২ সাল থেকে ১৯৬২ সালে আমরা একটি লিফলেট পাই স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের ; যে লিফলেটটি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের কাছ থেকে এসেছিল এবং লিফলেট বিলি করার দায়িত্ব ছিল আমাদের। সেখান থেকে আমরা অনুপ্রাণিত হই।

প্রশ্নঃ আপনি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছিলেন ?

আবদুর রাজ্জাকঃ আমি তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র। সেই সময় থেকে আমরা চিন্তা- ভাবনা শুরু করি কী করে স্বাধীনতা লাভ করা যায়। তবে স্বাধীনতার জন্য সশস্ত্র বিপ্লবের প্রয়োজন, এই চিন্তাটা আমাদের ছিল। এবং ১৯৬৪ সালে আমরা স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ গঠন করার সিদ্ধান্ত নিই। প্রথমে এ ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন সিরাজুল আলম খান। তিনিই প্রথম আলাপ করেন।

প্রশ্নঃ কোন্ সালে ?

আবদুর রাজ্জাকঃ এর শুরু ১৯৬২ সাল থেকে। কিন্তু সশস্ত্র বিপ্লব করার জন্য একটি সংগঠন তৈরী করতে হবে, এ বিষয়টি আলাপ- আলোচনা হয় ১৯৬৪ সালে।

প্রশ্নঃ প্রস্তাবটা প্রথম তোলেন সিরাজুল আলম খান ?

আবদুর রাজ্জাকঃ প্রস্তাবটা তিনিই প্রথম তোলেন। বলেন, "এসো আমরা একটা কিছু করি।" কারণ, তিনি ছিলেন তখন দলের (ছাত্রলীগ) সাধারণ সম্পাদক আর আমি ছিলাম সহ-সাধারণ সম্পাদক। আমরা আলাপ-আলোচনা করতাম ইকবাল হলের মাঠে বসে। তখন চিন্তা করা হলো আরেকজন কাকে নেব। ঠিক করা হলো কাজী আরেফ আহমেদকে আমরা আমাদের সঙ্গে নিতে পারি। কাজী আরেফের সঙ্গে তার (সিরাজুল আলম খান) আগেই আলাপ হয়েছিল। অবশেষে কাজী আরেফকে নিয়ে নেয়া হয়।

প্রশ্নঃ মূল ছিলেন আপনারা তিনজন ?

আবদুর রাজ্জাকঃ আমরা তিনজন এবং সেটাই স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন স্বাধীনতার প্রশ্নটি কাছাকাছি এসে গেল অর্থাৎ ১৯৭১ সালে, তখন আমরা চিন্তা-ভাবনা করলাম যে, আরো কিছু লোক আমাদের সঙ্গে আনতে হবে এবং স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদে তাদেরকে না নিয়ে একটা ব্যাপক সংগঠন করা যায় কীনা, সেই চিন্তা-ভাবনা থেকেই আমরা শেখ ফজলুল হক মণি ও তোফায়েল আহমদকে নিই।

প্রশ্নঃ শেখ ফজলুল হক মণি ও তোফায়েল আহমদ স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদ সম্পর্কে কিছুই জানতে না।

আবদুর রাজ্জাকঃ না, জানতেন না। জানানো হয়নি।

প্রশ্নঃ ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চের আগ পর্যন্তও জানানো হয়নি ?

আবদুর রাজ্জাকঃ আগে এবং পরেও জানতেন না। তাদেরকে পরেও আমরা জানতে দেইনি। এটা জানাজানি হয় স্বাধীনতার পর পর যখন মত পার্থক্যটা শুরু হয়ে যায়। এর আগে জানতে দেইনি।

প্রশ্নঃ কেন জানতে দেননি ?

আবদুর রাজ্জাকঃ কেননা, এটা তো আমাদের সংগঠন ছিল। গোপন সংগঠন।

প্রশ্নঃ তাদেরকে বিশ্বাস করতে পারেননি বলেই কী স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের অস্তিত্বের কথা তাদেরকে জানাননি ?

আবদুর রাজ্জাকঃ আমরা তাদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করিনি বিভিন্ন কারণে। যেমন, শেখ ফজলুল হক মণি ও সিরাজুল আলম খানের মধ্যে একটা ঠাণ্ডা লড়াই ছিল- যেটা অতীতেও ছিল। আর তোফায়েল আহমদের তখনো অতটা রাজনৈতিক পরিপক্কতা আসেনি। যাহোক, স্বাধীনতা সংগ্রাম যাতে এগিয়ে নেয়া যায়, এই চিন্তা থেকে ব্যাপকতম ঐক্যের জন্য তাদেরকে

আমরা নিয়েছি। এবং আমরা চারজনে মিলে ১৮ই জানুয়ারী, ১৯৭১-এ ফাইনাল কথা বলি। কী করতে হবে না হবে, সেটা বঙ্গবন্ধু বলে দেন।

প্রশ্নঃ শেখ মুজিবুর রহমানকে স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের কথা কখন জানান ?

আবদুর রাজ্জাকঃ ১৯৬৯ সালে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা তুলে নেবার পর বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান আইউব খানের জেল থেকে বেরিয়ে এলে আমি আর সিরাজুল আলম খান তার কাছে যাই এবং আমাদের পরিকল্পনা তাকে খুলে বলি। স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের অস্তিত্বের কথা তখনই জানাই। বলি, আপনিই আমাদের সর্বাধিনায়ক।

প্রশ্নঃ ১৯৭০ সালের ১২ আগস্ট পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ কেন্দ্রীয় কমিটি স্বাধীন বাংলাদেশের যে প্রস্তাব নেয়, শেখ মুজিব তার বিরোধিতা করেছিলেন, সত্য কি ?

আবদুর রাজ্জাকঃ হাঁ, কথাটা ঠিক। তবে, তিনি বলেছিলেন কৌশলগত কারণে। বলেছিলেন, তোমরা এমন একটি প্রস্তাব নাও, যাতে সবটাই বোঝায়- আমরা স্বাধীনতার পক্ষে এটা যেমন বোঝায়, তেমনি ছাত্রলীগ নিষিদ্ধ যাতে না হয়, সে ব্যবস্থাও রাখ। এর মানে এই নয়, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা করা হয়েছে।

প্রশ্নঃ ১৮ জানুয়ারী আপনাদের চারজনকে শেখ মুজিব কী বলেছিলেন ?

আবদুর রাজ্জাকঃ তিনি পরিষ্কার বুঝিয়ে বললেন যে, স্বাধীনতার প্রশ্নে সংগ্রাম করতে হবে এবং সশস্ত্র বিপ্লব করতে হবে। আমি তোমাদের জন্য সে ব্যবস্থা করে রেখেছি। তোমাদের চারজনকে কো-অরডিনেটর হিসেবে ঠিক করে যাব এবং সময় মতো যাতে সাহায্য পাও, অস্ত্র পাও- যাতে যুদ্ধ করতে পারো, সে ব্যবস্থা করবো। তিনি আরো বলেছিলেন, তাজউদ্দীন আহমদকে সঙ্গে নেবে। একথা তিনি আরো বলেছিলেন। ২৫ মার্চ রাতে যখন ক্রাকডউন হয়ে যায়, তখন আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাই। আমাদের কাছে একটা ঠিকানা ছিল। আমার কাছেও ছিল। তাজউদ্দীন আহমদের কাছেও ছিল- যেখানে ভারতে কোলকাতায় গিয়ে দেখা হবে। ভাবলাম নিশ্চয়ই তাজউদ্দীন আহমদ সেই ঠিকানায় চলে গেছেন। কোলকাতায় গিয়ে শুনলাম তিনি দিল্লী চলে গেছেন। ভাবলাম জায়গামত যাই। জায়গামত যেয়ে দেখি শেখ ফজলুল হক মণি ও তোফায়েল আহমদ।

প্রশ্নঃ সেই জায়গাটা কোথায় ?
আবদুর রাজ্জাকঃ সে জায়গাটা কোলকাতায়, ২১, রাজেন্দ্র রোড ; যেখানে চিত্তরঞ্জন সুতার বঙ্গবন্ধুর রিপ্রেজেনটেটিভ হিসেবে ছিলেন। ভেবেছিলাম নিশ্চয়ই তাজউদ্দীন আহমদ চিত্তরঞ্জন সুতারের সঙ্গে যোগাযোগ করেই (দিল্লী) গেছেন। গিয়ে শুনলাম যে, কোন যোগাযোগই করেননি। তাকে (চিত্তরঞ্জন) জিজ্ঞেস করা হলো। তিনি বললেন বঙ্গবন্ধুর বিশ্বস্ত তিনি। তার কাছে ওই নামটাও (তাজউদ্দীন আহমদ) আছে। বিশ্বস্ত লোক- বিশ্বাস করা যাবে। এ কথা বঙ্গবন্ধু বলে দিয়েছেন।

ইতোমধ্যে আমরা খবর পেয়ে গেলাম যে, তিনি সরকার গঠন করেছেন নিজেকে প্রধানমন্ত্রী করে। প্রধানমন্ত্রী তিনি নিজেকে ঘোষণা করলেন, এই হলো বিক্ষুব্ধতার কারণ। কারণ, বঙ্গবন্ধু ১৮ই জানুয়ারীতে আমাদের সঙ্গে বসলেন ; পরবর্তীতে তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে বসে যে কথা বলে দিলেন ; বলেছিলেন কমাণ্ড কাউন্সিল হবে এবং কমাণ্ড কাউন্সিলের মাধ্যমে স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালিত হবে। এমন কী তিনি বলেছিলেন স্বাধীনতার পরেও এই কমান্ড কাউন্সিলের মাধ্যমে দেশ পরিচালিত হবে পাঁচ বছর পর্যন্ত। পাঁচ বছর পর গণতন্ত্র এবং বহুদল ব্যবস্থা চালু হবে। পাঁচ বছরের মধ্যে নির্বাচন হবে না। কারণ, অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, সশস্ত্র বিপ্লবের পর দেশে অস্ত্র থাকে বিভিন্ন রকমের লোকের কাছে। অথচ আমরা দেখলাম এটা কেমন হলো ! বঙ্গবন্ধু যা বলেছিলেন সে অনুযায়ী কাজ হচ্ছে না। দ্বিতীয় কারণ হলো, প্রধানমন্ত্রী যদি কেউ হন তো বঙ্গবন্ধুই হবেন। বঙ্গবন্ধুকে প্রধানমন্ত্রী করে তিনি উপ- প্রধানমন্ত্রী হতে পারেন। আর উপ- প্রধানমন্ত্রী হলে তো সৈয়দ নজরুল ইসলামই হবেন। কেননা, বঙ্গবন্ধু ছিলেন পার্লামেন্টের নেতা। আর সৈয়দ নজরুল ছিলেন উপনেতা। তাজউদ্দীন আহমদ ছিলেন তৃতীয় ব্যক্তি। তিনি এটা কেন করলেন ? কমাণ্ড কাউন্সিল না করে তিনি নিজেকে প্রধানমন্ত্রী ঘোষণা করলেন। বঙ্গবন্ধু যদি সরকার প্রধান না হন, সেই সরকার দুর্বল সরকার হয়ে যাবে।
প্রশ্নঃ তাজউদ্দীন আহমদ শুধুমাত্র প্রধানমন্ত্রী হবার জন্যই এটি ষড়যন্ত্রটি করেছিলেন ?
আবদুর রাজ্জাকঃ আমার ধারণা, তিনি মনে করেছিলেন বঙ্গবন্ধু আর ফিরে আসবেন না। সুতরাং তিনি প্রধানমন্ত্রী এবং মুক্তিযুদ্ধের নায়ক হিসেবে থাকবেন। এবং এই বুদ্ধিটা অন্য জায়গা থেকে দেয়া হয়েছিল।

প্রশ্নঃ বুদ্ধিটা কে দিয়েছিলেন ?
আবদুর রাজ্জাকঃ আমার ধারণা, আওয়ামী লীগের আমিরুল ইসলাম অথবা আরো কেউ এর পেছনে ছিলেন।
প্রশ্নঃ ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের স্বার্থটা কি ছিল ?
আবদুর রাজ্জাকঃ নিশ্চয়ই কোন একটা মটিভ ছিল।
প্রশ্নঃ সেটা কী আঁচ করতে পেরেছিলেন ?
আবদুর রাজ্জাকঃ পরবর্তীকালে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, তারা আমেরিকান লবির লোক। আর এই আমেরিকান লবি কীভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধকে দেখেছে, সে তো বুঝতেই পারেন। এবং আজ আমার কাছে এটা পরিষ্কার যে, তারা প্রথম থেকেই চেষ্টা করেছে বঙ্গবন্ধু এবং তাজউদ্দীন আহমদের মধ্যে মত- পার্থক্য সৃষ্টির। মত- পাথর্ক্যটা প্রথমে ওখান থেকেই শুরু হয়।
প্রশ্নঃ এখানে প্রচার আছে যে, তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে আমেরিকার কোন সম্পর্ক ছিল না। এটা কীভাবে সম্ভব ?
আবদুর রাজ্জাকঃ এখানেই কথা। তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে তখনও আমেরিকার কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু এই ব্যক্তিকে- এই আমিরুল ইসলামকে তিনি চিনতে ভুল করেছিলেন। তারপরেই এখান থেকে তার সঙ্গে (তাজউদ্দীন আহমদ) আমাদের চরম মতানৈক্য শুরু হয়ে যায়।
আমার চিন্তা হলো বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র হবে, আমি তার মধ্যে থাকবো না। যা হয় হবে, আমি ভেতরে চলে যাব। যুদ্ধ করবো। আমাদের তো স্বাধীন বাংলাবিপ্লবী পরিষদের কর্মীরা ভেতরেই আছে। তাদের সঙ্গে নিয়ে যুদ্ধ করবো। রবকে (আ স ম আবদুর রব) বললাম, 'আমার সঙ্গে যাবে তুমি ?' রব বললো, 'আপনার সঙ্গে আমিও আছি।' এরপর একটা পরিকল্পনা নিলাম যে, আমরা চলে যাব। শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান এবং তোফায়েল আহমদকে বললাম, "আপনারা থাকেন।" আমরা চলে আসবো, এটা ভেবে ওরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন।
প্রশ্নঃ আপনি ভেতরে এসে যদ্ধু করতে চেয়েছিলেন ? আপনি একা এবং আ স ম আবদুর রব ?
আবদুর রাজ্জাকঃ হাঁ, একদম ভেতরে এসে যুদ্ধ করতে চাইলাম। তখন ওরা আমাদেরকে নিয়ে রাতে চিত্তরঞ্জন সুতারের সঙ্গে বসলেন। কারণ, আমাদের মধ্যে মত- বিরোধ দেখা দিচ্ছে। চিত্ত সুতার বললেন, আপনাদের মধ্যে মত- পার্থক্য কেন হচ্ছে। আপনারা এক থাকেন। আপনারা সরকারের সঙ্গে কথা বলেন। ঠিক হলো, সরকারের সঙ্গে কথা বলবো।

প্রশ্নঃ মিটিংয়ে আপনারা চারজনই ছিলেন- শেখ ফজলুল হক মণি, সিরাজুল আলম খান, তোফায়েল আহমদ এবং আপনি ?

আবদুর রাজ্জাকঃ হাঁ, আমরা চারজনই ছিলাম। আ স ম রবও ছিলেন। তিনি বললেন, (চিত্তরঞ্জন সুতার) সরকার আপনাদেরকেই তো চেনে। বঙ্গবন্ধু আপনাদের চারজনের নাম দিয়েছেন। আপনারাই তো যুদ্ধ করবেন। সরকার তো আপনাদেরকেই চেনে।

প্রশ্নঃ এর আগে চিত্তরঞ্জন সুতারের সঙ্গে স্বাধীনতা সম্পর্কে কোন আলাপ-আলোচনা হয়েছিল ?

আবদুর রাজ্জাকঃ আমরা এর আগে তার কাছে লোক পাঠিয়েছিলাম। ডাঃ আবু হেনাকে পাঠিয়েছিলাম। ২৫শে মার্চের আগে পাঠানো হয় তাকে। জানতে চেয়েছিলাম, আমাদের অস্ত্রের কী হবে ? তখন তিনি (চিত্তরঞ্জন সুতার) বলেছিলেন যে, সব রেডি হচ্ছে। তা আমাদের ওই বৈঠকে তিনি (চিত্তরঞ্জন সুতার) প্রস্তাব দিলেন, বললেন, "তাহলে আপনাদের কথা বলি। আপনারা কী বলেন?" আমি বললাম, "আলাদা কিছু হলে আমি আছি। আমি ষড়যন্ত্রের সঙ্গে নেই।" তিনি বললেন, "সরকারকে জিজ্ঞেস করি।" তখন ভারত সরকারের সঙ্গে তিনি আলাপ করলেন। এ আলাপের প্রেক্ষিতে একজন অফিসার এলেন তিনি সিভিল ড্রেসেই এসেছিলেন। তখনও আমাদের পরিচয় হয়নি। জেনারেল উবানই এসেছিলেন।

প্রশ্নঃ কোলকাতার সেই বাড়ীতে ?

আবদুর রাজ্জাকঃ সেই বাড়ীতে।

প্রশ্নঃ কত তারিখে ?

আবদুর রাজ্জাকঃ এপ্রিলের সতের বা আঠারো- তারিখটা ঠিক মনে নেই। তিনি আমাদের সঙ্গে আলাপ- আলোচনা করলেন। বললেন, "আপনাদের কী পরিকল্পনা আছে।" তখন আমরা একট খসড়া পরিকল্পনা তৈরী করলাম- সামগ্রিক পরিকল্পনা। আমাদের পরিকল্পনা দেখে তিনি খুব খুশী হলেন। বললেন, "এ নিয়ে আলাপ করতে হবে।" তিনি গিয়ে রিপোর্ট করলেন যে, এরাই পারবে। তার বিষয় ছিল গেরিলা যুদ্ধ। তিনি গেরিলা যুদ্ধের লোক পেয়ে গেছেন। আমাদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা সম্বলিত রিপোর্ট ছিল। ভারত সরকার সেটা গ্রহণ করলেন। আমাদের পরিকল্পনার মূল কথাটা ছিল, এটা রাজনৈতিক যুদ্ধ এবং যুদ্ধটা রাজনৈতিকভাবে পরিচালিত করতে হবে, যাতে যুদ্ধটা আমাদের হাতে থাকে। যে কারণে আমরা অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারকে প্রস্তাব ও দিয়েছিলাম যে, রিক্রুটমেন্টটা আমাদের হাতে থাকবে।

রাজনৈতিক মটিভেশন আমরা দেব। ট্রেনিংটা আপনাদের। এই ছিল আমাদের প্রস্তাব। কিন্তু অস্থায়ী সরকার গ্রহণ করেননি। এইসব কারণেই আমাদের ভেতর মত- বিরোধ দেখা দেয়।

প্রশ্নঃ ভারতীয় সরকার আপনাদেরকে ট্রেনিং দিতে চাইলেন কেন ?

আবদুর রাজ্জাকঃ মূল কারণ হচ্ছে, আমরাই ছিলাম বঙ্গবন্ধু মূল লক্ষ্যের সৈনিক। সেই সৈনিক হিসেবে যাদের নাম তিনি দিয়ে গিয়েছিলেন, সে তো আমরা। শুধু আমাদেরকেই চেনে তারা,- এ হলো এক নম্বর কারণ। দুই নম্বর হচ্ছে- আমরা যে রাজনৈতিক যুদ্ধটা করতে চেয়েছি, সেটার ব্যাপারে তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছিলাম।

প্রশ্নঃ ভারত সরকার মুখে সমাজতন্ত্রী ছিল বটে, কিন্তু মূলত ছিল দক্ষিণপন্থী। সমাজতন্ত্রের ব্যাপারে আপনাদের যে রাজনৈতিক মটিভেশন ছিল, তাতে তারা আপনাদেরকে কেন গ্রহণ করলো ? তারা কি বুঝতে পারেনি ?

আবদুর রাজ্জাকঃ হয়তো তারা আমাদের লাইনটা এতটা চিন্তা করেনি। তারা ভেবেছে এরা শেখ মুজিবের অনুসারী। এরা যাতে রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়, সেটাও তাদের কাম্য ছিল। তাছাড়া তাদেরও তো নীতি ছিল সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

প্রশ্নঃ সমাজতন্ত্রে আপনি ও সিরাজুল আলম খান বিশ্বাসী ছিলেন। শেখ ফজলুল হক মণি এবং তোফায়েল আহমদও কী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন?

আবদুর রাজ্জাকঃ শেখ ফজলুল হক মণির পরবর্তীকালে যেসব লেখা দেখেছি তাতে তিনি এ ব্যাপারে পরিষ্কার ছিলেন। তোফায়েল আহমদ অতটা পড়াশোনা করতেন না। আমাদের ভেতর সবচেয়ে তরুণ ছিলেন তিনি। অতটা পরিকপক্কও ছিলেন না।

প্রশ্নঃ মেজর জেনারেল উবান তার বইতে বলেছেন, "যুব নেতারা বলেছেন যে, ভারত সরকার নকশালও মার্কসবাদীদের ট্রেনিং ও অস্ত্র দিচ্ছে- পঁচিশ বছরে তাদের অর্জিত সাফল্য নস্যাৎ করার জন্য।" আপনারা তাকে কী এ কথা বলেছিলেন?

আবদুর রাজ্জাকঃ এ কথা ঠিক নয়। এটা তার নিজের বক্তব্য হতে পারে। কিন্তু আমাদের কথায় আমরা পরিষ্কার ছিলাম। আমাদের রাজনীতি ছিল স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্র, এ ব্যাপারে আমরা পরিষ্কার ছিলাম। আরেকটা বিষয়- আন্তর্জাতিকভাবে আমাদের লাইনটা পরিষ্কার ছিল যে, সোভিয়েত ইউনিয়নই সাম্রাজ্যবাদ প্রতিহত করতে পারে। সেই লাইনটাও আমাদের কাছে পরিষ্কার ছিল। এবং দেখা গেছে, চীন আমাদের স্বাধীনতার বিরোধিতা

করেছে প্রত্যক্ষভাবে। সুতরাং; চীন বিরোধী মনোভাব আমাদের ছিল। এবং সেখানেই আলোচনায় নকশালদের কথা এসেছে। যেহেতু, নকশালপন্থীরা স্বাধীনতার বিরোধী, তারা আমাদের বাধা দিয়েছে অনেক জায়গায় এবং তারা চীনপন্থী। সুতরাং, সেখানে তাদের সঙ্গে কিছুটা মত- পার্থক্য আমাদের আছে। সে মত- পার্থক্য রাজনৈতিক।

প্রশ্নঃ নকশাল যাদের বলছেন বা চীনপন্থী যাদের বলেন, তারাও কিন্তু একই সময়ে ভেতরে থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছে।

আবদুর রাজ্জাকঃ এখানে পার্থক্যটা আপনাকে বুঝতে হবে- প্রথমে কিছু কিছু লোক নকশালরা নয়- চীনপন্থীদের মধ্যে কিছু লোক যুদ্ধ করেছে। কিন্তু পরবর্তীকালে চীন সরাসরি বিরোধিতা শুরু করলে তখন তাদের অবস্থানও ধীরে ধীরে পালটাতে শুরু করে। তখন তাদের সঙ্গে আরো ব্যাপক মত- পার্থক্য আমাদের শুরু হয়ে যায়। সেই কারণেই, প্রাথমিকভাবে শুরু করলেও তারা- যেমন, সর্বহারা পার্টি স্বাধীনতার পক্ষে কথা বলেছে, পরে কিন্তু তারা স্বাধীন বাংলাদেশকে গ্রহণ করেনি। তারা অর্থাৎ পূর্ববাংলা সর্বহারা পার্টি এবং সাম্যবাদীরা মানে পূর্ব পাকিস্তান কমিউনিষ্ট পার্টি (মার্কসবাদী- লেনিনবাদী) ; আব্দুল হক- মোহাম্মদ তোয়াহা যখন একই সঙ্গে ছিলেন,- তখন তারা পরিষ্কার বলেছিলেন দেশ স্বাধীন হয়নি অর্থাৎ স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে এবং চীনের নির্দেশেই তারা এসব কাজ করেছে।

প্রশ্নঃ কিন্ত এ তো সত্য যে, তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়েছে।

আবদুর রাজ্জাকঃ প্রথম দিকে লড়েছে। পরে কিন্তু তারা পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। পাক- বাহিনী অস্ত্র তো দিয়ে গেছে তাদের কাছে। আপনি শুনে অবাক হবেন, যে অস্ত্র দিয়ে গেছে মোহাম্মদ তোয়াহার গ্রুপের লোকদের হাতে- যারা এই গ্রুপের চীনপন্থী- তাদের কাছে, যাতে আমাদের সঙ্গে লড়াই বাধে। এই লাইনটাকেই তারা ঢোকানোর চেষ্টা করেছে। এবং এটা প্রমাণিত হয়েও গেছে। এখানে, স্বাধীনতার পর যখন জুলফিকার আলী ভূট্টো আসেন,- সঙ্গে নিয়ে আসেন চল্লিশজন লোক। বিমান থেকে নেমেই তারা বিভিন্ন জায়গায় গেছেন। তারা খোঁজ করেছেন মোহাম্মদ তোয়াহা কোথায় থাকেন। মশিহুর রহমান কোথায় থাকেন। তারা খোঁজ করেছেন অলি আহাদের। জানতে চেয়েছেন কোথায় থাকেন। বঙ্গবন্ধুর কাছে রিপোর্ট যায় এই লোকগুলোকে এরা খুঁজছেন। জুলফিকার আলী ভূট্টোর সম্মানে এক ভোজ দেয়া হয়। ভোজ সভায় আমার পাশে বসেছিলেন ভট্টোর এক মন্ত্রী। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন

এখন মোহাম্মদ তোয়াহার অবস্থাটা কী? মশিহুর রহমান, অলি আহাদের অবস্থাটা কী? এখন এদের সঙ্গে কী ধরনের আচরণ করছি- এইসব। তারা এই সমস্ত লোক সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। সরকারের কাছে এসবের ওপর বিপোর্ট আছে শুনেছি। কিন্তু আমি তো একটা সাক্ষী। আমার কাছে এসব প্রশ্ন করা হয়েছিল। এবং পরবর্তীকালে দেখা গেল, স্বাধীনতার পর আমাদের বিরুদ্ধে সোজা বিদ্রোহ ঘোষণা করলো যে অস্ত্র নিয়ে,- সেগুলো পাকিস্তানীরা পরিকল্পনা মাফিকই দিয়ে গেছে- যেগুলো ফেলে গেছে তারা, সে সম্পর্কে অন্য কথা। রাজশাহীর তানোর অঞ্চলে টিপু বিশ্বাসের সঙ্গে সরাসরি বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর যুদ্ধ হয়েছে। সুতরাং, এইখানে,- স্বাধীনতার বিরুদ্ধে তারা ছিল। আবশ্যি প্রাথমিকভাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিল। যেমন, মশিহুর রহমান ভারতে গিয়েছিলেন, আবার ফিরে আসেন। ফিরে এসে পাকিস্তানীদের সঙ্গে সহযোগিতা করেন। খোলাখুলি সহযোগিতা। এরা সব চীনের লোক পরবর্তীকালে চীন এদেরকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে একত্রিত করেছে। তারা বলেছে বাংলাদেশ ভারতের একটি আশ্রিত রাষ্ট্র হবে, ভারত গ্রাস করে নেবে। তোমরা ওদেরকে সহযোগিতা দিয়ো না অর্থাৎ পাকিস্তানী লাইনে তাদেরকে চালিত করেছে। সুতরাং, সেই দিক দিয়ে নকশালদের ব্যাপারে আমাদের অ্যালার্জী আছে ঠিকই যে, তারা স্বাধীনতার বিরুদ্ধে,- সেই কারণে নয় যে, তারা মার্কসাবাদী। আমরা মার্কসবাদ- লেনিনবাদের ওপর পড়াশোনা করেই সমাজতন্ত্র করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম। সেই কারণে মস্কোপন্থীদের সঙ্গে আমাদের কোন মতানৈক্য ছিল না। তবে বলতে পারেন, কেন আপনারা তাদেরকে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারে নিলেন না। সেটা অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের ব্যাপার, তাজউদ্দীন আহমদের সরকারের ব্যাপার। এখানে আমাদের করণীয় কিছুই ছিল না। মস্কোপন্থীদের সঙ্গে আমাদের সংঘর্ষও হয়নি।

প্রশ্নঃ কিন্তু জেনারেল উবান বলেছেন,- 'আপনারা তাকে বলেছেন যে, ভারত সরকার নকশাল ও মার্কসবাদীদের অস্ত্র দিচ্ছে পঁচিশ বছরে আপনাদের অর্জিত সাফল্য নস্যাৎ করার জন্য।' আপনারা তাকে কী এ কথা বলেন নি?

আবদুর রাজ্জাকঃ কথাটা আমরা তাকে কখনোই এভাবে বলিনি। আমরা আমাদের কথাটাই বলেছি। নকশালরা কিছু কিছু অস্ত্র নিয়েছে। সেটা নিয়ে তারা তো আমাদের বিরোধিতা করেছে। স্বাধীনতার বিরোধিতা করেছে।

প্রশ্নঃ মঈদুল হাসান তার "মূলধারা '৭১" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, আপনারা অর্থাৎ মুজিব বাহিনী নেতারা নাকি এই রকম প্রচারণা চালিয়েছেন যে, তাজউদ্দীন আহমদ অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রী থাকলে দেশ স্বাধীন হবে না। তাজউদ্দীন আহমদ শেখ মুজিবের গ্রেফতার হবার কারণ...

আবদুর রাজ্জাকঃ তিনি একজন বিভ্রান্ত মার্কসবাদী এটা প্রমাণিত এবং আজকেও হচ্ছে। এক সময় মার্কসবাদী ছিলেন। ছাত্র ইউনিয়ন করতেন এবং কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। পরবর্তীকালে যা দেখা যাচ্ছে তাতে তো তিনি বিভ্রান্তই বটে। তাজউদ্দীন আহমদের ওপর ভর করেছিলেন। তাকে দক্ষিণ দিকে নেয়ার চেষ্টা করেছেন। ব্যারিস্টার আমিরুল ইসলামের মতোই তিনি একজন। মঈদুল হাসানের পরিচয় তো এখন পরিষ্কার আমাদের কাছে যে, তিনি আমেরিকান লবির লোক। দক্ষিণপন্থী লবির লোক। যদিও ভাব- ভঙ্গিটা প্রগতিশীল। এ রকম অনেকেই কিন্তু ধরা পড়েননি। যেমন, এনায়েতুল্লাহ খান বহুদিন ধরা পড়েননি। এখন তো পরিষ্কার। এ ধরনের মার্কিনপন্থী কমিউনিষ্ট বাংলাদেশে অনেকেই আছেন। তার মধ্যে মঈদুল হাসানও একজন। তিনি তাজউদ্দীন আহমদের ওপর ভর করেছিলেন। তাজউদ্দীন আহমদ ও বঙ্গবন্ধুর মধ্যে বিভেদ সৃষ্টিকারীদের মধ্যে তিনিও একজন। মঈদুল হাসান, ব্যারিষ্টার আমিরুল ইসলাম এরাই মূল ভূমিকা পালন করেছে। তাজউদ্দীন আহমদকে এরা বলেছেন, 'আপনিই সব।' এমনকি তাকে এ ভাবে মটিভেট করা হয়েছে যে, "শেখ মুজিব ধরা দিয়েছেন। শেখ মুজিব আত্মসমর্পণ করেছেন। শেখ মুজিব রাজাকার।" এই ধরনের ঔদ্ধত্যপূর্ণ কথাবার্তা বলেছেন তারা। সেক্ষেত্রে এটা বোঝা যায় যে, শেখ মুজিবের প্রতি তাদের যে অতীত আক্রোশ,- সেটা এক সময় বিভ্রান্ত মার্কসবাদী হিসেবে যে রকমের অ্যাপ্রোচ (Approach) ছিল, পরবর্তীতে মার্কিনপন্থী লাইনেও ছিল সেই একই রকমের অ্যাপ্রোচ। সেটা হলো শেখ মুজিবকে খাটো করা, তার বিরুদ্ধাচারণ করা। বঙ্গবন্ধু এবং তাজউদ্দীন আহমদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্য খোন্দকার মোশতক, চাষী মাহবুবুল ইসলাম, তাহের উদ্দীন ঠাকুর যতটা দায়ী,- এরাও, এই আমিরুল ইসলাম, মঈদুল হাসান,- এই ধরনের মার্কিনপন্থী কমিউনিস্টরাও ততটা দায়ী।

প্রশ্নঃ তাজউদ্দীন আহমদকে হত্যার ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, মঈদুল হাসান তার "মূলধারা '৭১"-এ কথা বলেছেন। এ কথা কতটুকু সত্য?

আবদুর রাজ্জাকঃ এটা আমাদের জানা নেই এবং এ তার একটি বানোয়াট, কল্পিত ষড়যন্ত্র। এসব তিনি করেছেন যাতে আমাদের সঙ্গে অর্থাৎ বঙ্গবন্ধুর

অনুসারীদের সঙ্গে তাজউদ্দীন আহমদের দ্বন্দ্ব বাধে। তিনি যাতে আমাদের অবিশ্বাস করেন। বঙ্গবন্ধু এবং তাজউদ্দীন আহমদের ভেতরকার দ্বন্দ্ব এরাই সৃষ্টি করেছেন। তারা তাকে নিতে নিতে দক্ষিণপন্থী লবিতে নিয়ে গেছিলেন। যেখানে আমরা সবাই বাকশাল পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে যাত্রা শুরু করি, সেখানে তাজউদ্দীন আহমদ এলেন না।

প্রশ্নঃ তানদুয়া গেরিলা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র- প্রধান করা হয় হাসানুল হক ইনুকে। অথচ ইনু ওই সময় ছাত্রলীগের কোন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব ছিলে না। কেন তাকে কেন্দ্র- প্রধান করা হলো?

আবদুর রাজ্জাকঃ এটা করা হয়েছিল এইজন্য যে, হাসানুল হক ইনু আমাদের স্বাধীন বাংলা বিপ্লবী পরিষদের একজন ছিলেন এবং সেখানে যারা ছিলেন, তাদের মধ্যে সাংগঠনিক যোগ্যতা তার কমবেশী অধিক ছিল।

প্রশ্নঃ আপনাদের চারজনের মধ্যে অর্থাৎ মুজিব বাহিনী নেতা চতুষ্টয়ের ভেতর কোন মতাদর্শগত বিরোধ ছিল কি?

আবদুর রাজ্জাকঃ তখনকার অবস্থায় আমাদের মধ্যে মতাদর্শগত বিরোধ ছিল না। হাঁ, কিছুটা নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব ছিল এবং সেটা শেখ ফজলুল হক মণি ও সিরাজুল আলম খানের মধ্যে। আমি যতটা পারি সেই দ্বন্দ্বের নিরসন ঘটাবার চেষ্টা করেছি। আপনি জেনারেল উবানের বইতে দেখবেন যে, তিনি বলেছেন, রাজ্জাক সব সময় চেষ্টা করেছেন দু'জনের মধ্যে সমঝোতা স্থাপনের।

প্রশ্নঃ নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব না মতাদর্শগত দ্বন্দ্ব?

আবদুর রাজ্জাকঃ খুব একটা মতাদর্শগত নয়- নেতৃত্বের দ্বন্দ্ব।

প্রশ্নঃ তানদুয়ায় ট্রেনিং ক্যাম্পের সদস্যরা এক পর্যায়ে ট্রেনিং বন্ধ করে দেন,- এ সম্পর্কে কি জানেন?

আবদুর রাজ্জাকঃ ট্রেনিং বন্ধ হয়ে যায় অন্য কারণে। একবার হয়েছিল খাবার- দাবার নিয়ে একটা গোলমালের কারণে।

প্রশ্নঃ আমি যেটা শুনেছি, তা হলো রাজনৈতিক মটিভেশন দেয়ার প্রশ্নে- সমাজতন্ত্রের ওপর প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য রাখা নিয়ে।

আবদুর রাজ্জাকঃ পরবর্তীকালে এটা হয়েছিল। আমরা গিয়ে বলেছি, তোমাদের সঙ্গে আমাদের যে শর্ত- তোমাদের কাজ ট্রেনিং দেয়া আর মটিভেশন কি হবে,- সেটা আমাদের। মেজর মালহোত্রা সমাজতন্ত্রের ওপর বক্তব্য রাখতে নিষেধ করেছিলেন।

প্রশ্নঃ নূরে আলম সিদ্দিকীকে মুজিব বাহিনীর নেতৃত্বে নিলেন না কেন?

আবদুর রাজ্জাকঃ ওটা তো একটা লস্ট কেস (Lost Case) ছিল।
প্রশ্নঃ কোলকাতার হিন্দুস্তান ইন্টারন্যাশনাল হোটেলে ভারতীয় কর্তৃপক্ষ, অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার এবং মুজিব বাহিনী নেতাদের মধ্যে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ওই বৈঠক সম্পর্কে বলুন।
আবদুর রাজ্জাকঃ আমরা যখন দু'তিন ব্যাচের ট্রেনিং দিয়ে দিয়েছি, এই বৈঠকটি তখন অনুষ্ঠিত হয়।
প্রশ্নঃ কোন্ মাসে?
আবদুর রাজ্জাকঃ বৈঠক দুটো হয়। একটা আগষ্ট '৭১- এ এবং আরেকটি সেপ্টেম্বর '৭১- এ। এর আগে অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকার কিছুই জানতেন না। তখন অস্থায়ী সরকারের সঙ্গে আপোষ করার জন্য ডি.পি. ধর মধ্যস্থতা করলেন। একটা পর্যায়ে এসে তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে বৈঠক করালেন। আমরা বললাম, ঠিক আছে। আমরা তো আগেই বলেছি সরকারকে আমরা মানি। কিন্তু সরকারের সব কার্যক্রম আমরা মানতে পারি না। আমরা আমাদের মতো আছি।
প্রশ্নঃ এই বৈঠকেই কী শাহজাহান সিরাজকে মুজিব বাহিনী এবং অস্থায়ী সরকারের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষার জন্য লি'য়াজো অফিসার করা হয় ?
আবদুর রাজ্জাকঃ না, লিয়াজোঁ নয়। এসব সিরাজুল আলম খানের কার্যকলাপের একটি অংশ। তখন থেকে তার কিছু কিছু সন্দেহজনক কাজ শুরু হয়ে গেছে। তিনি তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে শাহজাহান সিরাজকে দিয়ে রেখেছিলেন। মুজিব বাহিনী নেতাদের সম্মতিতেই তিনি এটা করেছিলেন।
প্রশ্নঃ কেন সিরাজুল আলম খান এটা করেছিলেন।
আবদুর রাজ্জাকঃ তিনি তাজউদ্দীন আহমদের সঙ্গে একটা আলাদা লাইন রাখতে চেয়েছিলেন।
প্রশ্নঃ স্বাধীনতা যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে মুজিব বাহিনী সদস্যরা আওয়ামী লীগ বিরোধী এবং কমিউনিস্টদের হত্যা করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। আপনি কী বলেন ?
আবদুর রাজ্জাকঃ এ অভিযোগ সঠিক নয়। আমরা কমিউনিস্টদের হত্যা করার নির্দেশ দেইনি। আমাদের চারজনের বৈঠকে এ ধরনের কোন প্রশ্নই ওঠেনি। কোন সিদ্ধান্ত নেবার প্রশ্ন আসলে আমাদের চারজনের বৈঠক হতো। হাঁ, আমাদের সিদ্ধান্ত ছিল যদি অস্থায়ী বাংলাদেশ সরকারের বাহিনী আমাদের ওপর অক্রমণ করে, তাহলে প্রথমে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবো।

এড়াতে না পারলে প্রতিরোধ করবো। কিন্তু কমিউনিস্ট- বাহিনীর সঙ্গে কোন সংঘর্ষ হয়নি। আর কমিউনিস্ট- বাহিনী তো ভেতরে ঢুকতেই পারেনি। তখন তো তারা ট্রেনিং নিচ্ছে। কমিউনিস্ট- বাহিনী আসলে যুদ্ধে যেতেই পারেনি। আমাদের বাহিনী ট্রেনিং নিয়ে ভেতরে ঢুকছে। আজ কেবল শুরু করেছি। আমরা তো সর্বাত্মক যুদ্ধ করতে পারিনি। আমাদের পরিকল্পনা ছিল- মুজিব বাহিনী প্রথমে ভেতরে ঢুকবে। তারপর অস্ত্রশালা তৈরী করবে। এপর আশ্রয়স্থল গড়ে তুলবে। তারপর সংগঠন গড়ে তুলবে,- মুজিব বাহিনীর সংগঠন। এরপর থানা কমাণ্ড করবে। থানা কমান্ড করার পর প্রথম কার্যক্রমটা হবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সহযোগী অর্থাৎ রাজাকারদের ওপর হামলা চালাবে, তাদের সরবরাহ লাইনের ওপর হামলা চালাবে। গেরিলা কৌশলে ওদের দুর্বল করে দেবে। সর্বশেষ হলো, ওরা যখন দুর্বল হয়ে পড়বে, তখন পাকবাহিনীর ওপর আঘাত হানো। আমরা তখন এ কাজই করছি। প্রাথমিক কাজ আমাদের মোটামুটি হয়ে গিয়েছিল। সংগঠন আমাদের গড়ে উঠেছিল। আমাদের রিক্রুটমেন্ট হয়ে গিয়েছিল। আমাদের ট্রেনিং প্রাপ্ত সদস্যরা যেখানে যেতে পেরেছে, সেখানেই থানা কমাণ্ড হয়ে গেছে। আমরা জনগণের সাথে মিলে যুদ্ধ করছি। কিছু কিছু রাজাকারও খতম হচ্ছে। কিন্তু মূল জায়গাটা মানে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সামনে না পড়লে, যুদ্ধ করিনি। দু'চার জায়গায় সামনে পড়ে গেছি, লড়াই হয়েছে। আমরা তো যুদ্ধ শুরুই করিনি। আমাদের তো পাঁচ বছরের পরিকল্পনা। প্রথম বছরে কী করবো, দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ বছরে কি করবো। তারপর সরকার গঠন করবো। এই ছিল আমাদের সামগ্রিক পরিকল্পনা। আমরা যদি সফল হতাম তাহলে কোন আগাছা থাকতো না। সমাজদেহ থেকে আগাছা উপড়ে ফেলতাম। প্রতিবিপ্লবীদের থাকতে হতো না। হয় মটিভেট হয়ে এদিকে আসতে হতো, নইলে নিশ্চিহ্ন হতে হতো।
প্রশ্নঃ জাসদের লোকজন অভিযোগ করে যে, মুক্তিযদ্ধু চলাকালীন সময়ে চট্টগ্রামের ছাত্রলীগ নেতা মুক্তিযোদ্ধা স্বপন চৌধুরীকে শেখ ফজলুল হক মণি গ্রুপের লোকজন হত্যা করেছে। এ অভিযোগ সম্পর্কে আপনি কী বলেন ?
আবদুর রাজ্জাকঃ আমি নিশ্চিত ছিলাম যে, এটার মধ্যে শেখ ফজলুল হক মণির কোন হাত ছিল না। আমার কাছে এ রকম একটি খবর আছে যে, তাকে ধরিয়ে দেয়া হয়েছে। কিন্তু পাল্টাটাও শোনা যায় যে, ওখানকার রাজাকাররা ধরিয়ে দেয়। সেই ছেলেটা ছিল একটা ব্রিলিয়ান্ট ছেলে। সে আমার হাতের রিক্রুট ছিল। খুবই ভাল ছেলে ছিল।

প্রশ্নঃ তাকে কী ধরিয়ে দেয়া হয় ?
আবদুর রাজ্জাকঃ আমি এটা সঠিক বলতে পারবো না ; একটা অভিযোগ আছে যে, ধরিয়ে দেয়া হয়েছিল।
প্রশ্নঃ এই অভিযোগটা কেন ?
আবদুর রাজ্জাকঃ শেখ ফজলুল হক মণি ও সিরাজুল আলম খানের দ্বন্দ্বটা ততদিনে শুরু হয়ে গেছে- নেতৃত্বে দ্বন্দ্ব।
প্রশ্নঃ ১৯৭২ সালে শেখ মুজিবের কাছে মুজিব বাহিনী পুনর্জীবিত স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের মাধ্যমে এই প্রস্তাব রাখে যে, বাংলাদেশ সরকার ভেঙ্গে দিয়ে জাতীয় বিপ্লবী সরকার গঠন করা হোক এবং মুক্তিযুদ্ধের অংশগ্রহণকারী সকল শক্তিকে জাতীয় বিপ্লবী সরকারের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। শেখ মুজিব এ প্রস্তাব নাচক করেছিলেন, সত্য কী ?
আবদুর রাজ্জাকঃ আমরা জাতীয় বিপ্লবী সরকারের প্রস্তাব দিয়েছিলাম। এটা সিরাজুল আলম খান আর আমি মুজিব বাহিনীর পক্ষ থেকে দিয়েছিলাম। বঙ্গবন্ধু এ প্রস্তাব গ্রহণ করেননি, কারণ, এ প্রস্তাব গৃহীত হবার অনুকূল অবস্থা তখন ছিল না। কেননা, আগেই ভারতের সঙ্গে আমাদের একটা চুক্তি হয়েছিল। দুর্বলতা ওখানেই ছিল। সেই চুক্তি পার্লামেন্টারী সরকারের চুক্তি।
প্রশ্নঃ এরপর মুজিব বাহিনী শেখ মুজিবের কাছে ছ'টি প্রস্তাব রাখে, সেগুলো কী ?
আবদুর রাজ্জাকঃ এটা হলো যার যার বানানো কথা। মুজিব বাহিনীর তরফ থেকে আর কোন প্রস্তাব যায়নি। ওটাই মানে ওই জাতীয় বিপ্লবী সরকারের প্রস্তাবটি ছিল মূল প্রস্তাব। যদি কেউ আর কোন প্রস্তাব দিয়ে থাকে তো ব্যক্তিগতভাবে দিয়েছে।
প্রশ্নঃ সিরাজুল আলম খানের গ্রুপ থেকে একটা প্রস্তাব গিয়েছিল বলে কী মনে করেন ?
আবদুর রাজ্জাকঃ যেতে পারে। আমি তা জানিনা। যে কথা নিয়ে আমাদের ভেতর ভিবেদ দেখা দিল ; তা হলো, তিনি বললেন, আমরা বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে নই। অথচ ইতিমধ্যে বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে অপপ্রচার শুরু হয়ে গেছে এবং তিনি কিছু তরুণকে দিয়ে করাচ্ছেন। সেটা টের পেয়ে আমি তাকে ধরলাম। বললাম, "ঘটনা কী ? বসতে হবে আমাদের।" স্বাধীন বাংলা বিল্পবী পরিষদের হাই কমান্ড আমরা বসলাম, আমরা তিনজন- সিরাজুল আলম খান, কাজী আরেফ আর আমি। ঠিক করলাম আমরা বঙ্গবন্ধুর কাছে যাব। সিরাজুল আলম খান রাজী হলেন না। বললেন, "তোমরা থাক। আমি যেয়ে

বলে আসি।" আমরা বললাম "কেন ? আগে যখন যেতাম, সে সময় আমি ছাড়া আপনি যাননি। আমি ছাড়া কোন কথা বলেননি। আজকে আপনি একা একা কথা বলবেন কোন্ অধিকার বলে ?" বললাম, "আমিও থাকবো। আজকে আমি শুধু নয়, আরেফও থাকবে। আরেফ আগে তো যেতো না। আজ তিনজনে যাব।" অবশেষে আমরা যেহেতু দুই ভোট একসঙ্গে ; বাধ্য হয়ে মানতে হলো তাকে। আমরা তাকে প্রোগাম করতে বললাম। প্রোগ্রাম করার দায়িত্ব নিয়ে তিনি পালিয়ে গেলেন খুলনায়। কোথাও আর পাই না তাকে খুঁজে।
প্রশ্নঃ তাহলে প্রস্তাবটা দেবার একটা চিন্তা- ভাবনা করা হয়েছিল? সেটা তিনি করেননি।
আবদুর রাজ্জাকঃ করেনইনি শুধু- তিনি পালিয়ে গেলেন এবং এটাই হলো ষড়যন্ত্রের মূল। সাতদিন হয়ে গেলে তার খোঁজ নেই। তাকে খুঁজে না পাওয়া গেলে সিদ্ধান্ত তো আমাকে একটা নিতে হবে। কারণ, তখন তো ছাত্রলীগ ভাগ হয়ে যাচ্ছে। আমি কোন দিকে যাব ? আমি দেখছি তিনি আমাদের মধ্যে ভিবেদ সৃষ্টি করছেন। নিশ্চয়ই তিনি একটা মটিভ নিয়ে কাজ করছেন।
প্রশ্নঃ তার উদ্দেশ্যটা কি ছিল বলে মনে করেন ?
আবদুর রাজ্জাকঃ ইতিমধ্যে আমি খবর পেয়ে গেছি যে, তিনি ট্রটস্কী লাইন অনুসরণ করছেন। এবং ভারতে যতদিন ছিলেন, যুদ্ধে তিনি যাননি। কোলকাতাতেই অধিকাংশ সময় ছিলেন। ওখানে তার যে ক্যাম্প ছিল- শিলিগুড়ির পাংঙ্গ ক্যাম্প; সে ক্যাম্পের ইনচার্জ মনিরুল ইসলাম ওরফে মার্শাল মণি আর মান্নানকে দায়িত্ব দিয়ে তিনি এসে কোলকাতাতেই থাকতেন। কোলকাতায় কোথায় কী করতেন, কাউকে জানতে দিতেন না। পরবর্তীকালে খবর পাওয়া গেল তিনি নকশালদের সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। এস ইউসি'র (সোসালিস্ট ইউনিটি সেন্টার) সঙ্গে যোগাযোগ করেছেন। জয়প্রকাশ নারায়ণ, (সোসালিস্ট নেতা) যিনি মুখে বলতেন সমাজতন্ত্রের কথা, আসলে দক্ষিণপন্থী লোক ; তার সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। এসব খবর পরবর্তীকালে পেয়েছি।
প্রশ্নঃ তাহলে বলছেন যে, ১৯৭২ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের ভেতর ভারতে বসে জয়প্রকাশ নারায়ণ ও এস ইউসি'র শিবদাস ঘোষ এবং বামপন্থী বলে পরিচিত অন্যদের সঙ্গে সিরাজুল আলম খানের যোগাযোগ ছিল। সেটা কখনো আপনাদের জানাননি তিনি।
আবদুর রাজ্জাকঃ জানাননি।

প্রশ্নঃ ১৯৭২ সালে জুলাই মাসে স্বাধীন বাংলাদেশে ছাত্রলীগের প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছাত্রলীগ দু'ভাগ হয়ে যায়। এর কারণ কী ?

আবদুর রাজ্জাকঃ ছাত্রলীগের বিভেদের কারণ হচ্ছে, আমরা সবাই তাড়াতাড়ি চলে এলাম কোলকাতা থেকে কিন্তু সিরাজুল আলম খান এলেন বেশ কিছুদিন পর। তার আসার পরই হঠাৎ করেই কিছু কিছু কথা শুরু হয়ে গেল বঙ্গবন্ধুর বিরুদ্ধে,- ছাত্রলীগের ছেলেদের মধ্যে। সেটা হল, শেখ মুজিব সমাজতন্ত্র করতে পারবেন না। সুতরাং, আমাদেরকে নিজস্বভাবে করতে হবে। আ স ম আবদুর রব চৌমুহনীতে গিয়ে বক্তৃতা করলেন। বললেন, "পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়েছে। এবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হবে। সে বিপ্লবের নেতৃত্ব দেবেন একজন যুব নেতা। আপনারা তার অপেক্ষা করুন। তিনি আসবেন আপনাদের সামনে।" এই সব শুরু করলেন। আসলে তার নেতৃত্ব এবং ভাবমূর্তি তৈরীতে নেমে পড়লেন। আমি ধারণা করি, এর পেছনে একটা মটিভ আছে। সেই মটিভ ধরা পরে অনেক পরে। যখন দেখলাম পিটার কাসটারস- এর সঙ্গে তার সংযোগ, যখন দেখলাম পশ্চিম বাংলার অতি বামদের সঙ্গে তার যোগসূত্র- যাদের সঙ্গে ট্রটস্কীপন্থীদের যোগাযোগ,- শেষ পর্যায়ে যোগসূত্র রয়েছে আন্তর্জাতিক সোসালিস্টদের সঙ্গে ; যারা সিআইএ অরগানাইজড- তাদের সঙ্গে সম্পর্কিত। এই সবের সঙ্গে তার সম্পর্ক দেখা গেল পরবর্তীকালে। আমি তখন বুঝতে পারলাম তিনি একটা উদ্দেশ্য নিয়ে কাজ করছেন। আমার কাছে খবর এলো, কামরুদ্দিন আহমদ বললেন, "ও তো ট্রটস্কী লাইনের।" আর ট্রটস্কী লাইন সম্পর্কে আমার তো পরিষ্কার ধাণা আছে- এ তো সিআইএ- র লাইন। তখন আমি সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলাম। অবস্থা তখন এমন,- যুদ্ধ ফেরতা তরুণদের রক্ত টগবগ করছে। আর সেভাবে তো বিপ্লবী সরকার হয়নি। একটা সাধারণ পার্লামেন্টারী সরকার। সেখানেও কিছু গোলমাল শুরু হয়েছে। তখন ওই ছেলেদের বোঝাতে সহজ হয়েছে যে, এদেরকে দিয়ে হবে না। ছেলেরা কিন্তু অত্যন্ত সাচ্চা মনে সমাজতন্ত্র করার জন্য, সমাজ বিপ্লব করার জন্য তৈরী হয়েছিল। অথচ এই সিরাজুল আলম খান আর আমাকে ডেকেই বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন, "অস্ত্র জমা দিও না সব। যেগুলো রাখার দরকার সেগুলো রেখে দাও। কারণ, সমাজ বিপ্লব করতে হবে। প্রতিবিপ্লবীদের উৎখাত করতে হবে। সমাজতন্ত্রের দিকে যেতে হবে।" এটা আমাদেরকে পরিষ্কারভাবে বঙ্গবন্ধু বলেছিলেন।

প্রশ্নঃ আপনারা, চার যুব নেতা জেনারেল উবানকে বলেছিলেন যে, একটি ভারতীয় বিলাসবহুল হোটেলে নকশালপন্থীদের সঙ্গে ভারতীয় অফিসারদের আলাপ- আলোচনা করতে দেখেছেন। সম্ভবতঃ এই হোটেলে তাদেরকে রাখা হয়েছিল। তাদেরকে ট্রেনিং ও অস্ত্র দেয়া হয়েছিল। ট্রেনিং প্রদানের জায়গার নামও আপনারা উল্লেখ করেছিলেন জেনারেল উবাননের কাছে। এই নকশাল নেতারা কারা এবং ট্রেনিং প্রদানের জায়গাটা কোথায় ছিল ? কোন্ হোটেলে ছিল তারা ?

আবদুর রাজ্জাকঃ এ সম্পর্কে আমি কিছু জানি না। এই সময়টা হতে পারে যখন আমি ট্রেনিং ক্যাম্পে ছিলাম। আমি তো মূল ক্যাম্পে ছিলাম- যেখানে মুজিব বাহিনীর ট্রেনিং দেয়া হতো। আমি তেইশ দিন প্রথম ব্যাচের সঙ্গে ক্যাম্পে ছিলাম। সেই সময় এ কথা হয়তো হতে পারে।

প্রশ্নঃ আপনারা, চার নেতা কী ট্রেনিং নিয়েছিলেন ?

আবদুর রাজ্জাকঃ আমি নিয়েছিলাম পুরো ট্রেনিং। ওরা নিয়েছিলেন প্রাথমিক ট্রেনিং।

প্রশ্নঃ মুজিব বাহিনীর তহবিল ভারত সরকার কীভাবে দিতেন? আলাদা আলাদাভাবে সেক্টরভিত্তিক চারজনের হাতে, না একজনের হাতে ?

আবদুর রাজ্জাকঃ না, যার যার সেক্টরে তার তার হাতেই দিতেন।

টেপকৃতঃ ২ জুন, ১৯৮৯

পরিশিষ্ট- ১০

শেখ মুজিবুর রহমান

(ইন্টারভিউ উইথ হিস্টরী ওরিয়ানী ফালাচি)

রোববার সন্ধ্যাঃ আমি কোলকাতা হয়ে ঢাকার পথে যাত্রা করেছি। সত্যি বলতে কি, ১৮ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী তাদের বেয়োনেট দিয়ে যে যজ্ঞ চালিয়েছে তা প্রত্যক্ষ করার পর পৃথিবীতে আমার অন্তিম ইচ্ছা এটাই ছিল যে, এই ঘৃণ্য নগরীতে আমি আর পা ফেলবো না- এরকম সিদ্ধান্ত আমি নিয়েই ফেলেছিলাম। কিন্তু আমার সম্পাদকের ইচ্ছা যে, আমি মুজিবের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। ভূট্টো তাকে মুক্তি দেবার পর আমার সম্পাদকের এই সিদ্ধান্ত যথার্থ ছিল। তিনি কি ধরণের মানুষ? আমার সহকর্মীরা স্বীকৃতি দিলো, তিনি মহান ব্যক্তি, সুপারম্যান। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি দেশকে সমস্যামুক্ত করে গণতন্ত্রের পথে পরিচালিত করতে পারেন।

আমার স্মরণ হলো, ১৮ই ডিসেম্বর আমি যখন ঢাকায় ছিলাম, তখন লোকজন বলছিল, "মুজিব থাকলে সেই নির্মম, ভয়ংকর ঘটনা কখনোই ঘটতো না। মুজিব প্রত্যাবর্তন করলে এ ধরনের ঘটনা পুনরাবৃত্তি ঘটবে না" কিন্তু গতকাল মুক্তিবাহিনী কেন আরো ৫০ জন নিরীহ বিহারীকে হত্যা করেছে? 'টাইম' ম্যাগাজিন কেন তাকে নিয়ে বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে হেডলাইন করেছে? আমি বিস্মিত হয়েছি যে, এই ব্যক্তিটি ১৯৬৯ সালের নভেম্বরে সাংবাদিক অ্যালডো শানতিনিকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, আমার দেশে আমি সবচেয়ে সাহসী এবং নির্ভীক মানুষ, আমি বাংলার বাঘ, দিকপাল...এখানে যুক্তির কোন স্থান নেই...।" আমি বুঝে উঠতে পারিনি, আমার কি ভাবা উচিত।

সোমবার বিকেলঃ আমি হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে এবং আমার দ্বিধাদ্বন্দ্ব দ্বিগুণের অধিক। ঘটনাটা হলো, আমি মুজিবকে দেখেছি। যদিও মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। সাক্ষাৎকার নেয়ার পূর্বে তাকে এক নজর দেখার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু এই কয়েকটা মুহূর্তই আমার চিত্তকে দ্বিধা ও সংশয়ে পূর্ণ করতে যথেষ্ট ছিল? যখন ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করি, কার সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছিল। তিনি আর কেউ নন, মি. সরকার। আমার শেষবার ঢাকা অবস্থানকালে এই বাঙ্গালি ভদ্রলোক আমার দোভাষী ছিলেন। তাঁকে দেখলাম রানওয়ের মাঝখানে। আমি ভাবিনি, কেন? সম্ভবত এর চেয়ে ভালো কিছু তার করার ছিল না। আমাকে দেখামাত্র জানতে চাইলেন যে, আমার জন্যে তিনি কিছু করতে পারেন কিনা? তাকে জানালাম

যে, তিনি আমাকে মুজিবের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারেন। তিনি সোজা আমাকে নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং পনের মিনিটের মধ্যে আমরা একটা গেট দিয়ে প্রবেশ করলাম। গেটে মেশিনগানধারী মুক্তিবাহিনীর কড়া প্রহরা। আমরা রান্নাঘরে প্রবেশ করে দেখলাম মুজিবের স্ত্রী খাচ্ছেন। সাথে খাচ্ছে তার ভাগনে ও মামাত ভাইবোনেরা। একটা গামলায় ভাত- তরকারী মাখিয়ে আঙ্গুল দিয়ে মুখে পুরে দিচ্ছে সবাই। এদেশে খাওয়ার পদ্ধতি এরকমই। মুজিবের স্ত্রী আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন।

ঠিক তখনই মুজিব এলেন। সহসা রান্নাঘরের মুখে তার আবির্ভাব হলো। তার পরনে এক ধরনের সাদা পোশাক, যাতে আমার কাছে তাকে মনে হয়েছিল একজন প্রাচীন রোমান হিসেবে। পোশাকের কারণে তাকে দীর্ঘ ও ঋজু মনে হচ্ছিল। তার বয়স একান্ন হলেও তিনি সুপুরুষ। ককেশীয় ধরনের সুন্দর চেহারা। চশমা ও গোঁফে সে চেহারা হয়েছে আরো বুদ্ধিদীপ্ত। যে কারো মনে হবে, তিনি বিপুল জনতাকে নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি স্বাস্থ্যের অধিকারী।

আমি সোজা তার কাছে গিয়ে পরিচয় পেশ করলাম এবং আমার উদ্দশ্যে ব্যক্ত করলাম। মি. সরকার ভূমিতে পতিত হয়ে মুজিবের পদচুম্বন করলেন। আমি মুজিবের হাতটা আমার হাতে নিয়ে বললাম, "এই নগরীতে আপনি ফিরে এসেছেন দেখে আমি আনন্দিত, যে নগরী আশঙ্কা করছিল যে, আপনি আর কোনদিন এখানে ফিরবেন না।" তিনি আমার দিকে তাকালেন একটু উষ্মার সাথে। একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন, "আমার সেক্রেটারীর সাথে কথা বল।"

আমার দ্বিধা ও সন্দেহের কারণ উপলব্ধি করা সহজ। মুজিবকে আমি জেনে এসেছি একজন গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী হিসেবে। যখন আমি দম নিচ্ছিলাম, একজন যুবক আমার কাছে এসে বললো, সে ভাইস সেক্রেটারী। বিনয়ের সাথে সে প্রতিশ্রুতি দিলো, বিকেল চারটার সময় আমি 'সরকারী বাসভবনে' হাজির থাকতে পারলে আমাকে দশ মিনিট সময় দেয়া হবে। তাঁর সাথে যারা সাক্ষাৎ করতে চায় তাদের সাথে সেখানেই তিনি কথা বলেন। বিকেল সাড়ে তিনটায় নগরী ক্লান্ত, নিস্তব্ধ, ঘুমন্ত মধ্যাহ্নের বিশ্রাম নিচ্ছে। রাস্তায় কাঁধে রাইফেল ঝুলানো মুক্তিবাহিনী টহল দিচ্ছে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে একমাসেরও বেশি সময় আগে। কিন্তু এখনো তাদের হাতে অস্ত্র আছে। তারা রাতদিন টহল দেয়। এলোপাথাড়ি বাতাসে গুলী ছুঁড়ে এবং মানুষ হত্যা করে। হত্যা না করলে দোকানপাট লুট করে। কেউ তাদের

থামাতে পারে না- এমন কি মুজিবও না। সম্ভবত তিনি তাদের থামাতে সক্ষম নন। তিনি সন্তুষ্ট এজন্যে যে, নগরীর প্রাচীর তার পোস্টার সাইজের ছবিতে একাকার। মুজিবকে আমি আগে যেভাবে জেনেছিলাম, তার সাথে আমার দেখা মুজিবকে মিলাতে পারছি না।

সোমবার সন্ধ্যাঃ আমি যে তার সাক্ষাৎকার নিয়েছি এটা ছিল একটা দুর্বিপাক। তার মানসিক যোগ্যতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ ছিল। এমন কি হতে পারে যে, কারাগার এবং মৃত্যু সম্পর্কে ভীতি আর মস্তিষ্ককে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছে? তার ভারসাম্যহীনতাকে আমি আর কোনভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারি না। একই সময়ে আমি বলতে চাচ্ছি, কারাগার এবং মৃত্যুর ভয় ইত্যাদি...সম্পর্কে কাহিনীগুলো...আমার কাছে এখনো খুব স্পষ্ট নয়। এটা কি করে হতে পারে যে, তাকে যে রাতে গ্রেফতার করা হলো সে রাতে সকল পর্যায়ের লোককে হত্যা করা হলো? কি করে কি করে এটা হতে পারে যে তাকে কারাগারে এটি প্রকোষ্ট থেকে পলায়ন করতে দেয়া হলো, যেটি তার সমাধি সৌধ হতো? তিনি কি গোপনে ভূট্টোর সাথে ষড়যন্ত্র করেছিলেন? আমি যত তাকে পর্যবেক্ষণ করেছি, তত মনে হয়েছে, তিনি কিছু একটা লুকোচ্ছেন। এমন কি তার মধ্যে যে সার্বক্ষণিক আক্রমণাত্মক ভাব, সেটাকে আমার মনে হয়েছে আত্মরক্ষার কৌশল বলে।

ঠিক চারটায় আমি সেখানে ছিলাম। ভাইস সেক্রেটারী আমাকে করিডোরে বসতে বললেন, যেখানে কমপক্ষে পঞ্চাশজন লোকে ঠাসাঠাসি ছিল। তিনি অফিসে প্রবশ করে মুজিবকে আমার উপস্থিতি সম্পর্কে জানালেন। আমি একটা ভয়ংকর গর্জন শুনলাম এবং নিরীহ লোকটি কম্পিতভাবে পুনরায় আবির্ভূত হয়ে আমাকে প্রতীক্ষা করতে বললেন। আমি প্রতীক্ষা করলাম- এক ঘণ্টা, দুই ঘন্টা, তিন ঘন্টা, চার ঘন্টা- রাত আটটা যখন বাজলো, তখনো আমি সেই অপরিসর করিডোরে অপেক্ষামান। রাত সাড়ে আটটায় আমাকে প্রবেশ করতে বলা হলো। আমি বিশাল এক কক্ষে প্রবেশ করলাম। একটি সোফা ও দুটো চেয়ার সে কক্ষে। মুজিব সোফার পুরোটায় নিজেকে বিস্তার করেছেন এবং দু'জন মোটা মন্ত্রী চেয়ার দুটো দখল করে বসে আছেন। কেউ দাঁড়ালো না। কেউ আমাকে অভ্যর্থনা জানালো না। কেউ আমার উপস্থিতিকে গ্রাহ্য করলো না। মুজিব আমাকে বসতে বলার সৌজন্য প্রদর্শন না করা পর্যন্ত সুদীর্ঘক্ষণ নীরবতা বিরাজ করছিল। আমি সোফার ক্ষুদ্র প্রান্তে বসে টেপ রেকর্ডার খুলে প্রথম প্রশ্ন করার

প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু আমার সে সময়ও ছিল না। মুজিব চিৎকার শুরু করলেন, 'হ্যারি আপ, কুইক, আন্ডারষ্ট্যান্ড? নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?...পাকিস্তানীরা ত্রিশ লক্ষ লোক হত্যা করেছে, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার- আমি বললাম, "মি. প্রাইম মিনিস্টার ..."

মুজিব আবার চিৎকার শুরু করলেন, "ওরা আমার নারীদেরকে তাদের স্বামী ও সন্তানদের সামনে হত্যা করেছে। স্বামীদের হত্যা করেছে তাদের ছেলে ও স্ত্রীর সামনে। মা বাপের সামনে ছেলেকে ভাইবোনের সামনে ভাইবোনকে... "মি. প্রাইম মিনিস্টার .... আমি বলতে চাই...।"

"তোমার কোন কিছু চাওয়ার অধিকার নেই, ইজ দ্যাট রাইট?

"আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো। কিন্তু একটা বিষয় সম্পর্কে আমি আরো কিছু জানতে চাই।" বিষয়টা আমি বুঝতে পারছিলাম না। "মি. প্রাইম মিনিস্টার, গ্রেফতারের সময় কি আপনার উপরে নির্যাতন করা হয়েছিল?

"নো, ম্যাডাম নো। তারা জানতো, ওতে কিছু হবে না। তারা আমার বৈশিষ্ট্য, আমার শক্তি, আমার সম্মান, আমার মূল্য, বীরত্ব সম্পর্কে জানতো, আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?"

"তা বুঝলাম। কিন্তু আপনি কি করে বুঝলেন যে তারা আপনাকে ফাঁসিতে ঝুলাবে? ফাঁসিতে ঝুলিয়ে কি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়?

"নো, নো ডেথ সেন্টেন্স।"

এই পর্যায়ে তাকে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো এবং তিনি গল্প বলতে শুরু করলেন, "আমি এটা জানতাম। কারণ ১৫ই ডিসেম্বর ওরা আমাকে কবর দেয়ার জন্য একটা গর্ত খনন করে।"

"কোথায় খনন করা হয়েছিল সেটা?"

"আমার সেলের ভিতরে।"

"আমাকে কি বুঝে নিতে হবে যে গর্তটা ছিল আপনার সেলের ভিতরে?"

'ইউ মিস আণ্ডারস্ট্যাণ্ড।"

"আপনার প্রতি কেমন আচরণ করা হয়েছে মি. প্রাইম মিনিস্টার?"

"আমাকে একটা নির্জন প্রকোষ্ঠে রাখা হয়েছিল। এমনকি আমাকে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেয়া হতো না, সংবাদপত্র পাঠ করতে বা চিঠিপত্রও দেয়া হতো না, আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?"

"তাহলে আপনি কি করেছেন?"

"আমি অনেক চিন্তা করেছি।"

"আপনি কি পড়েছেন?"

"বই এবং অন্যান্য জিনিস।"
"তাহলে আপনি কিছু পড়েছেন।"
"হ্যাঁ কিছু পড়েছি।"
"কিন্তু আমার ধারণা হয়েছিল, আপনাকে কোনকিছুই পড়তে দেয়া হয়নি।"
"ইউ মিস আণ্ডারষ্টুড।"
"তা বটে মি. প্রাইম মিনিস্টার। কিন্তু এটা কি করে হলো যে, শেষ পর্যন্ত ওরা আপনাকে ফাঁসিতে ঝুলালো না।"
"জেলার আমাকে সেল থেকে পালাতে সহায়তা করেছেন এবং তার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন।"
"কেন, তিনি কি কোন নির্দেশ পেয়েছিলেন?"
"আমি জানি না। এ ব্যাপারে তার সাথে আমি কোন কথা বলিনি এবং তিনিও আমার সাথে কিছু বলেননি।"
"নিরবতা সত্ত্বেও কি আপনারা বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন?"
"হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে বহু আলোচনা হয়েছে এবং তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, আমাকে সাহায্য করতে চান।"
"তাহলে আপনি তার সাথে কথা বলেছেন?"
"হ্যাঁ, আমি তার সাথে কথা বলেছি।"
"আমি ভেবেছিলাম, আপনি কারো সাথেই কথা বলেননি।"
'ইউ মিস আণ্ডারস্টুড।"
"তা হবে মি. প্রাইম মিনিস্টার। যে লোকটি আপনার জীবন রক্ষা করলো আপনি কি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন না।?" এটা ছিল ভাগ্য আমি ভাগ্য বিশ্বাস করি।
এরপর তিনি ভূট্টো সম্পর্কে কথা বললেন। এ সময় তার কথায় কোন স্ববিরোধিতা ছিল না। বেশ সতর্কতার সাথেই বললেন তার সম্পর্কে। আমাকে মুজিব জানালেন যে, ২৬ শে ডিসেম্বর ভূট্টো তাকে খুঁজতে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য তাকে রাওয়ালপিণ্ডিতে নেয়া। তার ভাষায়, "ভূট্টো একজন ভদ্রলোকের মতই ব্যবহার করলেন। তিনি সত্যিই ভদ্রলোক।" ভূট্টো তাকে বলেছিলেন যে, একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে। অবশ্য মুজিব ব্লাক 'আউট ও যুদ্ধ বিমানের গর্জন থেকে বরাবরই যুদ্ধ সম্পর্কে আঁচ করেছেন। ভূট্টো তার কাছে আরো ব্যাখ্যা করলেন যে, এখন তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং তার কাছে কিছু প্রস্তাব পেশ করতে চান।

আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, "কি প্রস্তাব মি. প্রাইম মিনিস্টার?" তিনি উত্তর দিলেন "হোয়াই শুড আই টেল ইউ? এটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রাইভেট অ্যাফেয়ার।"
"আমার কাছে বলার প্রয়োজন নেই মি. প্রাইম মিনিস্টার, আপনি বলবেন ইতিহাসের কাছে।"
মুজিব বললেন, "আমিই ইতিহাস। আমি ভূট্টোকে থামিয়ে বললাম, যদি আমাকে মুক্তি দেয়া না হয়, তাহলে আমি আলাপ করবো না। ভূট্টো অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে উত্তর দিলেন, আপনি মুক্ত যদিও আপনাকে শীঘ্র ছেড়ে দিচ্ছি না। আমাকে আরো দুই বা তিনদিন অপেক্ষা করতে হবে। এরপর ভূট্টো পশ্চিম পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সম্পর্কে তার পরিকল্পনা তৈরী করতে শুরু করলেন। কিন্তু আমি অহংকারের সাথেই জানালাম, দেশবাসীর সাথে আলোচনা না করে আমি কোন পরিকল্পনা করতে পারি না।" এই পর্যায়ে তাকে প্রশ্ন করলাম, "তাহলে তো কেউই বলতেই পারে যে, আপনাদের আলোচনা খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে হয়েছিল।"
"তা তো বটেই। আমরা পরস্পরকে ভালোভাবে জানি। খুব বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা ছিল। কিন্তু তা হয়েছিল আমার জানার আগে যে, পাকিস্তানীরা আমার জনগণের বিরুদ্ধে বর্বরোচিত নিপীড়ন করেছে। আমি জানতাম না যে, তারা বর্বরোচিতভাবে আমার মা- বোনকে হত্যা করেছে।
আমি তাকে থামিয়ে বললাম, "আমি জানি মি. প্রাইম মিনিস্টার, আমি জানি।" তিনি গর্জে উঠলেন, "তুমি কিছুই জানো না; আমি তখন জানতাম না যে, তারা আমার স্থপতি, আইনবিদ, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, আমার চাকরকে হত্যা করেছে এবং আমার বাড়ি, জমি, সম্পত্তি ধ্বংস করেছে, আমার...।"
তিনি যখন তার সম্পত্তির অংশে পৌঁছলেন, তার মধ্যে এমন একটা ভাব দেখা গেল, যা থেকে তাকে এই প্রশ্নটা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলাম যে, তিনি সত্যিই সমাজতন্ত্রী কি না? তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ...।" তার কণ্ঠে দ্বিধা। তাকে আবার বললাম যে, সমাজতন্ত্র বলতে তিনি কি বুঝেন? তিনি উত্তর দিলেন, "সমাজতন্ত্র।" তাতে আমরা মনে হলো, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তার যথার্থ ধারণা নেই।
এরপর ১৮ই ডিসেম্বর হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি রাগে ফেটে পড়েন। নিচের অংশটুকু আমার টেপ থেকে নেয়া :
"ম্যাসাকার? হোয়াট ম্যাসাকার?"

"ঢাকা স্টেডিয়ামে মুক্তিবাহিনীর দ্বারা সংঘটিত ঘটনাটি।"
"ঢাকা স্টেডিয়ামে কোন ম্যাসাকার হয়নি। তুমি মিথ্যে বলছো।"
"মি. প্রাইম মিনিস্টার, আমি মিথ্যাবাদী নই। সেখানে আরো সাংবাদিক ও পনের হাজার লোকের সাথে আমি হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছি। আপনি চাইলে আমি আপানকে তার ছবিও দেখাবো। আমার পত্রিকায় সে ছবি প্রকাশিত হয়েছে।"
"মিথ্যেবাদী, ওরা মুক্তিবাহিনী নয়।"
"মি. প্রাইম মিনিস্টার, দয়া করে 'মিথ্যেবাদী" শব্দটি আর উচ্চারণ করবেন না। তারা মুক্তিবাহিনী। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল আবদুল কাদের সিদ্দিকী এবং তারা ইউনিফর্ম পরা ছিল।"
"তাহলে হয়তো ওরা রাজাকার ছিল যারা প্রতিরোধের বিরোধিতা করেছিল এবং কাদের সিদ্দিকী তাদের নির্মূল করতে বাধ্য হয়েছে।"
"মি. প্রাইম মিনিস্টার, কেউ প্রমাণ করেনি যে, লোকগুলো রাজাকার ছিল এবং কেউই প্রতিরোধের বিরোধিতা করেনি। তারা ভীতসন্ত্রস্ত ছিল। হাত পা বাঁধা থাকায় তারা নড়াচড়াও করতে পারছিল না।"
"মিথ্যেবাদী।"
"শেষবারে মতো বলছি, আমাকে "মিথ্যেবাদী" বলার অনুমতি আপনাকে দেবো না।"
"আচ্ছা সে অবস্থায় তুমি কি করতে?"
"আমি নিশ্চিত হতাম যে, ওরা রাজাকার ও অপরাধী। ফায়ারিং স্কোয়াডে দিতাম এবং এইভাবেই এই ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ড এড়াতাম।"
"ওরা ওভাবে করেনি। হয়তো আমার লোকদের কাছে বুলেট ছিল না।"
"হ্যাঁ তাদের কাছে বুলেট ছিল। প্রচুর বুলেট ছিল। এখানো তাদের কাছে প্রচুর বুলেট রয়েছে। তা দিয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গুলী ছোঁড়ে। ওরা গাছে, মেঘে, আকাশে, মানুষের প্রতি গুলী ছোঁড়ে শুধু আনন্দ করার জন্য।
এরপর কি ঘটলো : যে দুই মোটা মন্ত্রী ঘুমুচ্ছিলেন গোটা সাক্ষাৎকারের সময়টায়, সহসা তারা জেগে উঠলেন, আমি বুঝতে পারলাম না মুজিব কি বলে চিৎকার করেছেন। কারণ কথাগুলো ছিল বাংলায়।
সোমবার রাত : গোটা ঢাকা নগরী জেনে গেছে যে মুজিব ও আমার মধ্যে কি ঘটেছে। শমশের ওয়াদুদ নামে একজন লোক ছাড়া আমার পক্ষে আর কেউ নেই। লোকটি মুজিবের বড় বোনের ছেলে। এই যুবক নিউইয়র্ক থেকে এসেছে তার মামার কাছে। তার মতে মুজিব ক্ষমতালোভী এবং নিজের

সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা সম্পন্ন অহংকারী ব্যক্তি। তার মামা খুব মেধাসম্পন্ন নয়। বাইশ বছর বয়সে মুজিব হাইস্কুলের পড়াশুনা শেষ করেছেন। আওয়ামী লীগ সভাপতির সচিব হিসেবে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। এছাড়া আর কিছু করেননি তিনি। কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে মুজিব একদিন প্রধানমন্ত্রী হবেন। ওয়াদুদের মতে, আত্মীয়স্বজনের সাথে দুর্ব্যবহারের কারণ এটা নয়। আসলে একমাত্র ওয়াদুদের মাকেই মুজিব ভয় করেন। এই দুঃখজনক আচরণের জন্য তিনি পারিবারিকভাবে প্রতিবাদ জানাবেন। সে আরো জানালো যে, আমার সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছে তা সে তার মাকে জানাবে, যাতে তিনি এ ব্যাপারে মুজিবের সাথে কথা বলেন। সে আমাকে আরো বললো যে, সরকারী দফতরে গিয়ে এ ব্যাপারে আমার প্রতিবাদ করা উচিত এবং প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলা উচিত। কারণ প্রেসিডেন্ট খাঁটি ভদ্রলোক।

মুজিব সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যাবলী তার জন্যে বিপর্যয়কর। ১৯৭১ এর মার্চে পাকিস্তানীদের দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের কিছুদিন পূর্বে ইয়াহিয়া খান ও ভূট্টো ঢাকায় এসেছিলেন। ইয়াহিয়া খান যথাশীঘ্র ফিরে যান। কিন্তু ভূট্টো ঢাকায় রয়ে যান। তাকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে রাখা হয়। তার অ্যাপার্টনমেন্ট ছিল ৯১১- ৯১৩।

ইন্টারকন্টিনেন্টালের সর্বোচ্চ তলায় তখন ভূট্টোর ভূমিকা ছিল নিরোর মতো। নগরী যখন জ্বলছিল এবং এলোপাথাড়ি গুলীবর্ষণ চলছিল, ভূট্টো তখন মদপান করছিলেন আর হাসছিলেন। পরদিন সকাল ৭টায় তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন। আমি দেখেছি, যারা একসময় পাকিস্তানীদের ভয়ে ভীত ছিল, তারা এখন মুজিবকেই ভয় করে। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রচুর কথাবার্তা চলে এদেশে। কিন্তু সবসময়ই তা বলা হয় ফিসফিসিয়ে, ভয়ের সঙ্গে। লোকজন বলাবলি করে যে, এই সংঘাতে মুজিব খুব সামান্যই হারিয়েছেন। তিনি ধনী ব্যক্তি। অত্যন্ত ধনবান। তার প্রত্যাবর্তনের পরদিন তিনি সাংবাদিকদেরকে হেলিকপ্টার দিয়েছিলেন। কেউ কি জানে কেন? যাতে তারা নিজেরা গিয়ে মুজিবের সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি অবলোকন করে আসতে পারে। এখনো তিনি সমাজতন্ত্রের কথা বলেন, জাতীয়তাবাদের কথা বলেন। তিনি কি তার জমিজমা, বাড়ি, বিলাসবহুল ভিলা, মার্সিডিজ গাড়ি জাতীয়করণ করবেন?

ভূট্টোর সাথে মুজিবের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৬৫ সালে, যখন তিনি ভারতের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তকে অক্ষরিত রাখার কারণে পশ্চিম

পাকিস্তানকে অভিযুক্ত করেন। একজন নেতা হিসেবে তার মূল্য ছিল খুবই কম। তার একমাত্র মেধা ছিল মূর্খ লোকদের উত্তেজিত করে তোলার ক্ষেত্রে। তিনি ছিলেন কথামালার যাদুকর ও মিথ্যের যাদুকর- কিছুদিন আগে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি বলেছিলেন, করাচীর রাস্তা গুলো সোনা দিয়ে মোড়া। তা দিয়ে হাঁটলে চোখ ধাঁধিঁয়ে যায়। অর্থনীতির কিছুই বুঝতেন না তিনি। কৃষি ছিল তার কাছে রহস্যের মতো। রাজনীতি ছিল প্রস্তুতিবিহীন। কেউ কি জানে ১৯৭০ এর নির্বাচনে তিনি কেন বিজয়ী হয়েছিলেন? কারণ সব মাওবাদীরা তাকে ভোট দিয়েছিল। সাইক্লোনে মাওবাদীদের অফিস বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং তাদের নেতা ভাসানী আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। জনগণকে যদি পুনরায় ভোট দিতে বলা হয়, তাহলে মুজিবের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নতর হবে, যদি তিনি বন্দুকের সাহায্যে তার ইচ্ছাকে চাপিয়ে নিতে না চান। সেজন্যেই তিনি মুক্তিবাহিনীকে অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দিচ্ছেন না এবং আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, রক্তপিপাসু কসাই, যে ঢাকা স্টেডিয়ামে হত্যাযজ্ঞ করেছিল, সেই আবদুল কাদের সিদ্দিকী তার ব্যক্তিগত উপদেষ্টা। ভারতীয়রা তাকে গ্রেফতার করেছিল; কিন্তু মুজিব তাকে মুক্ত করেন।

এখন আমরা গণতন্ত্রের কথায় আসতে পারি। একজন মানুষ কি গণতন্ত্রী হতে পারে, যদি সে বিরোধিতা সহ্য করতে না পারে? কেউ যদি তার সাথে একমত না হয়, তিনি তাকে "রাজাকার" বলেন। বিরোধিতার ফল হতে পারে ভিন্নমত পোষণকারীকে কারাগারে প্রেরণ। তার চরিত্র একজন একনায়কের, অসহায় বাঙ্গালীরা উত্তপ্ত পাত্র থেকে গনগনে অগ্নিকুণ্ডে পতিত হয়েছে। বাঙ্গালী রমণীদের প্রতি সম্মান জানিয়েই বলছি, তাদের সম্পর্কে কথা না বলা উত্তম। তিনি নারীদের পাত্তাই দেন না...।

বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট আমাকে আবার মুজিবের সাথে দেখা করতে বললেন। সব ব্যবস্থা পাকা।

প্রেসিডেন্ট যে প্রচেষ্টা করেছিলেন তা খুব একটা সফল হয়নি। তিনি দুজন কর্মকর্তাকে পাঠিয়েছিলেন, যাতে তার নির্দেশ পালন করা হয়। মুজিবের কাছে একটা হুংকার ছাড়া তারা আর কিছু পায়নি। তবে এবার একটা করিডোরের বদলে একটা কক্ষে অপেক্ষা করার অনুমতি পেলাম। আমি বিকেল ৪টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। একজন বয় আমার চায়ের কাপ পূর্ণ করে দিচ্ছিল এবং এভাবে আমি আঠার কাপ চা নিঃশেষ করলাম। উনিশ কাপের সময় আমি চা ফ্লোরে ছুঁড়ে ফেলে হেঁটে

বেরিয়ে এলাম। আমাকে অনুসরণ করে হোটেলে এলো মুজিবের সেক্রেটারী ও ভাইস সেক্রেটারী। তারা বললো, মুজিব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং আগামীকাল সকাল সাড়ে সাতটায় আমার সাথে দেখা করতে চান।

পরদিন সকালে ঠিক সাতটায় আমি হাজির হলাম এবং সকাল সাড়ে নটায় মার্সিডিজ যোগে মুজিবের আগমন পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হলো। একটা কথাও না বলে তিনি অফিসে প্রবেশ করলেন। আমিও অফিসে ঢুকলাম। আমার দিকে ফিরে তিনি উচ্চারণ করলেন, "গেট আউট"। আমি কক্ষ ত্যাগ করতে উদ্যত। তিনি বললেন, "গেট ইন হিয়ার।" আমি ফিরলাম এবং তখনই তিনজন লোক পোস্টার আকৃতির একটি ছবি নিয়ে এলো দেখে তিনি বললেন, "চমৎকার।" এরপর তিনি বললেন, এই মহিলা সাংবাদিককে দেখাও। আমি 'চমৎকার' শব্দটি উচ্চারণ করলাম। এ ছিল এক মারাত্মক ভুল। তিনি বজ্রের মতো ফেটে পড়লেন। তিনি ক্ষিপ্ত। ছবিটি ফ্লোরে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "এটা চমৎকার নয়।" আমি কিছু না বুঝে নিঃশ্চুপ থাকলাম।

আমি তার উত্তেজনা হ্রাস করতে সক্ষম হলাম। যেহেতু আমি ভূট্টোর সাথে তার সত্যিকার সম্পর্কটা খুঁজে পেতে চাই, সেজন্য ভূট্টো সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। নামটা বলার মুহূর্তেই তিনি জ্বলে উঠলেন এবং বললেন যে, তিনি শুধুমাত্র বাংলাদেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিতে চান। আমি প্রশ্ন করলাম, "বাংলাদেশের সাথে পশ্চিমবঙ্গকে যুক্ত করার সম্ভাবনা আছে কিনা?" খানিকটা দ্বিধান্বিত হয়ে তিনি বললেন, "এ সময়ে, আমার আর কোন আগ্রহ নেই।" এই বক্তব্যে ইন্দিরা গান্ধীকেও বিস্মিত হতে হবে যে, মুজিব কোলকাতা করায়ত্ত করতে চায়। আমি বললাম, তার মানে আপনি বলতে চান, অতীতে আপনার আগ্রহ ছিল এবং ভবিষ্যতে পুনঃবিবেচনা করার সম্ভাবনা আছে।" ধীরে ধীরে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, আমি তাকে একটা ফাঁদে ফেলতে চাচ্ছি। নিজের ভুল সংশোধন করার বদলে তিনি টেবিলে মুষ্টাঘাত করে বলতে শুরু করলেন যে, আমি সাংবাদিক নই বরং সরকারী মন্ত্রী। আমি তাকে প্রশ্ন করছি না দোষারোপ করছি। আমাকে এখনই বের হয়ে যেতে হবে এবং পুনরায় আমি যেন এদেশে পা না দেই।

এই পর্যায়ে আমি নিজের উপর সকল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম এবং আমার মাঝে উত্তেজনার যে স্তূপ গড়ে উঠেছিল তা বিস্ফোরিত হলো। আমি বললাম যে, তার সবকিছু মেকি, ভুয়া। তার পরণতি হবে খুবই শোচনীয়। যখন তিনি মুখ ব্যাদান করে দাঁড়ালেন আমি দৌড়ে বেরিয়ে

এলাম এবং রাস্তায় প্রথম রিকশাটায় চাপলাম। হোটেলে গিয়ে বিল পরিশোধ করলাম। সুটকেসটা হাতে নিয়ে যখন বেরুতে যাচ্ছি, তখন দেখলাম মুক্তিবাহিনী নিচে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তারা একথা বলতে বলতে আমার কাছে এলো যে, আমি দেশের পিতাকে অপমান করেছি এবং সেজন্য আমাকে চরম মূল্য দিতে হবে। তাদের এই গোলযোগের মধ্যে পাঁচজন অস্ট্রেলিয়ানের সাহায্যে পালাতে সক্ষম হলাম। তারা এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে প্রবেশ করছিল। এয়ারপোর্টে দুজন ভারতীয় কর্মকর্তা আমাকে বিমানে উঠিয়ে নিলেন এবং আমি নিরাপদ হলাম। (২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২)

পরিশিষ্ট- ১১
ইন্দিরা গান্ধী

এই সেই অতি মানবী যিনি প্রায় অর্ধশত কোটি লোককে শাসন করেন এবং যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের বিরোধিতার মুখে একটি যুদ্ধে বিজয়লাভ করেছেন। তাকে দেখেই যে কেউ ভাববে গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিজয়ী হওয়ার কারণে কেউ তাকে আসনচ্যুত করতে পারবে না। অনেকে বলে, তিনি বিশ বছর ধরে ভারতের প্রধানমন্ত্রী থাকবেন। আমি তাকে পছন্দ করতাম একটি নজীর হিসেবে যে একজন ভালো নারী যখন দেশ শাসন করে তখন তিনি কেমন হতে পারেন। আমি তার প্রশংসা করতাম যারা তাকে সন্দেহ করে আমাকে সতর্ক করতো আমি তাদেরকে তার মেধা ও সাফল্যের কারণে ঈর্ষাকাতর ভাবতাম।

১৯৭৫- এর বসন্তকালে তিনি গণতন্ত্র পরিত্যাগ করে একনায়কতন্ত্র কায়েম করেন। তিনি তার পিতার ভূমিকা বিস্মৃত হয়েছিলেন। তার বিচার হয়েছিল, সাজা হয়েছিল নির্বাচনী অভিযানে বাড়াবাড়ি করার অভিযোগে। এক পর্যায়ে তাকে পদত্যাগ করার বিষয়ও বিবেচনা করতে হয়েছিল। পদত্যাগ অনিবার্য হয়ে পড়েছিল তবু তিনি পদত্যাগ করেননি। নিক্সন যা করেছিলেন তিনি তা করতে অস্বীকৃতি জানান এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা থেকে স্বেচ্ছাচারী ইন্দিরায় পরিণত হন। রাতারাতি সব বিরোধী নেতাকে গ্রেফতার করেন, সংবিধান লংঘন করেন এবং স্বাধীনতাকে হত্যা করেন।

অনেকে তাকে পছন্দ করতো না। অনেকে তার অন্ধভক্ত ছিল। আমি পছন্দ করতাম, কারণ ভারতের মতো একটি জটিল দেশ শাসন

সন্ন্যাসীর পক্ষে সম্ভব নয়। ক্ষমতা সম্পর্কে হেনরী কিসিঞ্জার যাই বলুন না কেন ("একজন রাষ্ট্র প্রধানের জন্যে বুদ্ধিমত্তা খুব গুরুত্বপূর্ণ নয়। যে যোগ্যতা একজন রাষ্ট্রপ্রধানের থাকা জরুরী তা হলো সাহস, ধূর্ততা এবং শক্তি") ভারতের মতো একটি দেশ শাসন যিনি করবেন তাকে অবশ্যই বুদ্ধিমান হতে হবে। ইন্দিরা গান্ধী খাঁটি সন্ন্যাসী ছিলেন না। জীবনের পেয়ালা থেকে কি করে পান করতে হবে সে বোধ তার পুরোপুরিই ছিল। তাকে বুঝার চেয়ে তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ সহজতর। আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে, ব্যক্তিগত প্রসঙ্গেও তিনি স্বতঃস্ফূর্ত। তিনি কিছুই গোপন করেন না। তার কণ্ঠে যাদু, মুখটাও সুন্দর। আয়ত সুন্দর চোখে যেন একটু বেদনার ছায়া। তাঁর চেহারাকে কারো সাথে মিলানো যায় না।

তিনি খুব সাধারণ মহিলা নন। প্রথমত তিনি জওয়াহের লাল নেহেরুর কন্যা। দ্বিতীয়ত তিনি মোহনদাস করমচাঁদ গান্ধীর শিষ্য। তাদের ছায়ায় তিনি বড় হয়েছেন, শিক্ষালাভ করেছেন এবং নিজেকে গঠন করেছেন। নেহেরু পরিবার, বংশপরম্পরায় রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। তার ঠাকুরদা কংগ্রেস পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। তার পিসী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত একমাত্র মহিলা যিনি জাতিসংঘে সভানেত্রীত্ব করেছেন। ইন্দিরা যখন শিশু তখন শুধু মহাত্মা গান্ধীর কোলেই নয়, যারা ভারতের জন্ম দিয়েছেন সেইসব সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির কোলে বসেছেন।

তার চোখের সামনে শুরু হয় স্বাধীনতা সংগ্রাম। এমন গল্পও আছে যে, বন্ধুদের জন্য বাড়ির দরজা খুলে তাকে বলতে হতো, "দুঃখিত বাড়িতে কেউ নেই। আমার বাবা মা, ঠাকুরদা, ঠাকুরমা, পিসী সবাই জেলে।" এ অবস্থার কারণে মাত্র আট বছর বয়সে পড়াশুনার জন্য তাকে সুইজারল্যান্ড পাঠানো হয়। কিন্তু তের বছর বয়সে দেশে ফিরে এসে তিনি ক্ষুদে গেরিলা বাহিনী গঠন করেন। তারা বার্তা বহন করতো- কখনো কখনো বৃটিশ ব্যারাকে হানা দিতো। জেল থেকে নেহেরু তাকে লিখতেন, "তোমার কি মনে পড়ে যখন প্রথম জোয়ান অব আর্কের গল্প পড়ে তুমি কতটা উৎসুক হয়েছিলে এবং তোমার লক্ষ্যও অনেকটা তার মতো ছিল।..... ভারতে আজ আমরা ইতিহাস গড়ছি এবং তুমি ও আমি ভাগ্যবান যে এ ইতিহাস সৃষ্টি হবে আমাদের চোখের সামনে।"

তিনি জেলে গেছেন- তের মাস। অক্সফোর্ডে পড়াশুনার সময় বোম্বের তরুণ আইনজীবী ফিরোজ গান্ধীর সাথে তার সাক্ষাৎ হয়। ১৯৪২ সালে দিল্লীতে তাদের বিয়ে হয়। এর ছ'মাস পর বৃটিশ সরকার দু'জনকেই

গ্রেফতার করেন এবং তাদের অসুখী দাম্পত্য জীবনের শুরু এখানেই। ১৯৪৭ সালে নেহেরু প্রধানমন্ত্রী হলে ইন্দিরা পিতার সাথে বসবাস করতে থাকেন। বিপত্নীক পিতার পাশে একজন নারীর উপস্থিতি তিনি অনুভব করছিলেন। ফিরোজ গান্ধী ১৯৬০ সালে তার মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত ইন্দিরার এই সিদ্ধান্তকে মেনে নেননি। পিতা- কন্যা একত্রে ভ্রমণ করতেন, রাষ্ট্রপ্রধানদের অভ্যর্থনা জানাতেন। ১৯৬৪ সালে পিতার মৃত্যুর পর ইন্দিরা তার স্থলাভিষিক্ত হলেন।

আমি সরকারী প্রাসাদে তার অফিসে সাক্ষাৎ করলাম। এ অফিসে তার পিতাও বসতেন- বিশাল শীতল ও মসৃণ। একটি শূন্য ডেস্কের পিছনে তিনি বসেছিলেন। আমি প্রবেশ করতেই তিনি উঠে এসে হাত বাড়িয়ে দিলেন। পুনরায় আসনে গিয়ে বসবার পর তাকালেন, মনে হলো তিনি বলছেন, তোমার প্রথম প্রশ্ন শুরু কর, সময় নষ্ট কর না। নষ্ট করার মতো সময় আমারও ছিল না। প্রথমে বেশ সতর্কতার সাথে উত্তর দিচ্ছিলেন। এরপর ফুলের মতো নিজেকে ছড়িয়ে দিলেন এবং আমাদের আলোচনার আর বাধা রইলো না। দুই ঘণ্টার উপর আমরা একত্রে ছিলাম। সাক্ষাৎকারটি যখন শেষ হলো, তিনি আমাকে ট্যাক্সিতে তুলে দেয়ার জন্য রাস্তা পর্যন্ত এলেন। আমার হাতটা ধরে রেখেছিলেন তিনি যেন আমার পূর্ব পরিচিত।

আটচল্লিশ ঘণ্টা পর আমি সাক্ষাৎকারে কিছু অসঙ্গতি দেখে আবার তার সাথে দেখা করতে চাইলাম এবং কোন আনুষ্ঠানিকতা ছাড়াই তার বাড়িতে গেলাম। এটা একটি মাঝারি মানের বাংলো। দুই ছেলে রাজীব ও সঞ্জয়ের সাথে এখানে থাকেন তিনি। এখানে তার সাথে সাক্ষাৎ করা খুব সহজ। সকালে তার কাছে বহুলোক আসে দরখাস্ত, প্রতিবাদ, ফুলের তোড়া নিয়ে। কলিং বেল বাজাতে সেক্রেটারী দরজা খুললো। জানতে চাইলাম প্রধানমন্ত্রী আমাকে আর আধ ঘণ্টা সময় দিতে পারবেন কিনা ? সেক্রেটারী ভিতরে গেলো এবং ইন্দিরা তার সাথে এলেন। আমরা বসলাম এবং আরো এক ঘণ্টা আলাপ করলাম। প্রশ্নের উত্তর ছাড়াও তিনি আমাকে ছেলে রাজীব সম্পর্কে বললেন, সঞ্জয় সম্পর্কেও বললেন। শেষে তিনি ছোট্ট বালককে ডেকে বললেন, "এ হচ্ছে আমার নাতি, একেই আমি পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসি।"

ওরিয়ানা ফালাচিঃ মিসেস গান্ধী আপনার জন্য আমার বহু ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক প্রশ্ন রয়েছে। ব্যক্তিগত প্রশ্নগুলো পরেই করবো-

এখনকার প্রশ্ন হচ্ছে, বহু লোক কেন আপনাকে ভয় করে এবং বলে আপনি খুব শীতল, বরফের মতো, কঠোর....।

ইন্দিরা গান্ধীঃ তারা বলে, কারণ আমি নিষ্ঠাবান। আমি শুধু সুন্দর কথা বলে সময় নষ্ট করি না, ভারতের লোকজন সাধারণত যা করে- প্রথম- আধঘন্টা ব্যয় করে সৌজন্য বিনিময়ের মাধ্যমে, 'আপনি কেমন আছেন, ছেলেমেয়ে কেমন আছে, নাতিনাতনীরা কেমন ইত্যাদি। আমি এসব এড়িয়ে চলি। আসল কাজ করার পর সৌজন্য বিনিময় হতে পারে। কিন্তু ভারতের লোকেরা এই দৃষ্টিভঙ্গি হজম করতে পারে না। যখন আমি বলি, তাড়াতাড়ি কাজের কথায় আস। তখন তারা আহত হয় এবং ভাবে আমি অত্যন্ত শীতল, কঠোর। আমি যা সেভাবেই আমি সকলকে বুঝতে দেই। যদি আমি সুখী হই, তাহলে আমাকে সুখীই দেখা যায়। রাগান্বিত হলেও তা আমি প্রকাশ করি। অন্যদের তাতে কি প্রতিক্রিয়া হয় সে ব্যাপারে আমি তোয়াক্কা করি না। আমার মতো কঠোর জীবন যাকে কাটাতে হয় তার পক্ষে অন্যের প্রতিক্রিয়ার ব্যাপারে ভাবা সম্ভব নয়।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ আমি কঠিন একটি প্রশ্ন দিয়ে শুরু করবো। আপনি একটি যুদ্ধ জয় করেছেন, জয়ের চেয়েও অধিক। কিন্তু আমাদের খুব কম লোকই এটাকে বিপজ্জনক বিজয় বলে মনে করেন। আপনি কি মনে করেন বাংলাদেশ আপনার কাঙ্খিত মিত্র হবে? বরং তার বদলে এক অস্বস্তিকর বোঝায় পরিণত হতে পারে বলে কি আপনি ভীত নন?

ইন্দিরা গান্ধীঃ দেখো, জীবন সবসময় বিপদে পরিপূর্ণ এবং আমি মনে করি না যে, কারো পক্ষে বিপদ এড়ানোসম্ভব। যা সঠিক মনে হয়, একজনের তাই করা উচিত এবং সেই যথার্থ কাজ করতে যদি বিপদ আসে তাহলে বিপদের ঝুঁকি অবশ্যই নিতে হবে। এটাই আমার সবসময়ের দর্শন। আমি পরিণতির কথা ভেবে কোন পদক্ষেপ নেই না। পরিণতিগুলো পরে পরীক্ষা করে দেখি। যখন কোন নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, আমি তা মোকাবেলা করি। তুমি এই বিজয়কে বিপজ্জনক বলছো, কিন্তু আমি বলছি, কেউ এ যাবত এটাকে বিপজ্জনক বলেনি। এবং ঝুঁকিও আমি দেখি না। যদি ঝুঁকি বাস্তবে পরিণত হয় তাহলে সে বাস্তবতার আলোকেই পদক্ষেপ নেব। আমি তোমার প্রশ্নের ইতিবাচক উত্তর দিতে চাই। আমি বলতে চাই, বাংলাদেশ ও আমাদের মধ্যে বন্ধুত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। অবশ্যই তা একতরফা বন্ধুত্ব হবে না। প্রত্যেকের কিছু দেবার ও নেবার থাকে। আমরা যদি বাংলাদেশকে কিছু দিতে চাই তাহলে স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশ আমাদের কিছু দিতে চাইবে

এবং বাংলাদেশ কেন তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারবে না। অর্থনৈতিকভাবে বাংলাদেশ সম্পদে পরিপূর্ণ এবং নিজ পায়ে দাঁড়াতে সক্ষম। রাজনৈতিকভাবে আমার মনে হয় দেশটা যোগ্য লোক দ্বারা পরিচালিত। শরণার্থী, যারা এখানে আশ্রয় নিয়েছিল তারা বাড়ি ফিরে যাচ্ছে...।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ তারা কি আসলে বাড়ি ফিরে যাচ্ছে ?

ইন্দিরা গান্ধীঃ হাঁ, ২০ লাখ ইতোমধ্যেই ফিরে গেছে।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ এক কোটির মধ্যে ২০ লাখ। খুব বেশি নয়।

ইন্দিরা গান্ধীঃ তা বেশি নয়, একটু সময় দাও। তারা দ্রুত ফিরে যাচ্ছে। দ্রুততার সাথে। এতে আমি সন্তুষ্ট। আমার ধারণার চেয়ে বেশি।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ মিসেস গান্ধী, আপনার বিজয়ের বিপদ বলতে আমি শুধু বাংলাদেশকে বুঝাইনি। আমি পশ্চিমবঙ্গকেও বুঝাতে চেয়েছি। যেটা ভারতের অংশ এবং পশ্চিমবঙ্গ এখন স্বাধীনতার কথা বলছে। কোলকাতায় আমি নকশালীদের কথা শুনেছি... এবং লেনিনের একটা কথা আছে, "সাংহাই ও কোলকাতা দিয়ে আন্তর্জাতিক বিপ্লব অতিক্রম করবে।"

ইন্দিরা গান্ধীঃ না, এটা সম্ভব নয়। বলতে পারো, কেন? কারণ ভারতে একটি বিপ্লব ঘটতে যাচ্ছে। সবকিছু বদলে যাচ্ছে। শান্তিপূর্ণ ও গণতান্ত্রিকভাবে। এখানে কমিউনিজমের আতঙ্ক নেই। এ বিপদ থাকতো আমার বদলে একটা দক্ষিণপন্থী সরকার থাকলে। যখন জনগণ ভেবেছে যে আমার পার্টি দক্ষিণ ঘেঁষা হচ্ছে তখন কমিউনিস্টরা শক্তি অর্জন করেছে। কিন্তু এখন জনগণ অনেক সচেতন। আমাদের প্রচেষ্টা সম্পর্কে তারা দেখছে আমরা সমস্যার সমাধান করছি। কমিউনিস্টরা তাদের শক্তি হারাচ্ছে। পশ্চিমবঙ্গের নকশালীদের তৎপরতা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং আমি নিশ্চিত যে বাংলাদেশেও এ ধরনের তৎপরতা নিয়ন্ত্রণে এসে যাবে। আমি কোন বিপদ আশঙ্কা করছি না।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ ইতোমধ্যেই তারা আপনার কিছু অসুবিধা করেছে। স্বাধীনতার পর ঢাকায় আমি ভীতিকর হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছি।

ইন্দিরা গান্ধীঃ প্রথম পাঁচদিনে এসব ঘটেছে এবং অপর পক্ষের হত্যাকাণ্ডের তুলনায় তা সামান্য। অপরপক্ষের দশ লাখ মানুষ হত্যার তুলনায় খুব কম। এটা সত্য যে, কিছু দুঃখজনক ঘটনা ঘটেছে এবং আমরা তা ঠেকাতে চেষ্টা করেছি। তুমি কি জানো, আমরা কত লোকের প্রাণ রক্ষা করেছি? আমরা তো সর্বত্র যেতে পারি না, সবকিছু দেখতে পরি না। সকল সমাজে কিছু গ্রুপ

থাকে, যারা অশিষ্ট। তাদেরকেও বুঝতে হবে। যথার্থ বুঝতে হলে প্রথম ক'দিনের মধ্যে কি ঘটেছে তা বিবেচনা করলে চলবে না। তারা বহু দিন, বহু মাস ধরে দেখেছে এবং দুর্ভোগ সহ্য করেছে।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ মিসেস গান্ধী, আপনি তো এ অভিযোগ সম্পর্কে অবগত যে, আপনারা ভারতীয়রা যুদ্ধের প্ররোচনা দিয়েছেন এবং আপনারাই প্রথম হামলা করেছেন। এ অভিযোগের প্রেক্ষিতে কি বলবেন?

ইন্দিরা গান্ধীঃ তুমি যদি পিছনের দিকে যেতে চাও, তাহলে একথা স্বীকার করে উত্তর দেবো যে, আমরা মুক্তিবাহিনীকে সাহায্য করেছি। সেই শুরুর মুহূর্ত থেকে ধরলে বলতে হয়, আমরাই শুরু করেছি। এ ছাড়া আর কিছু করার ছিল না। আমরা এক কোটি শরণার্থীকে আমাদের ভূখণ্ডে রাখতে পারি না, আমরা অনির্দিষ্ট সময়ে জন্যে এ ধরনের অস্তিতিশীল পরিস্থিতি সহ্য করতে পারিনা। শরণার্থীর ঢল কখনো বন্ধ হতো না। একটা চূড়ান্ত বিস্ফোরণ পর্যন্ত এটা চলতেই থাকতো। এসব লোকের আগমন রোধ করা অসম্ভব হয়ে পড়তো। আমাদের নিজেদের স্বার্থেই এটা করতে হতো। এ কথাটাই আমি মি. নিক্সন এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দকে বলেছিলাম যুদ্ধ এড়াবার লক্ষ্যে।

কিন্তু প্রকৃত যুদ্ধ সূচনার দিকে লক্ষ্য করলে বুঝা যাবে যে পাকিস্তানীরাই হামলা করেছিল। আমাদের উপর বিমান নিয়ে আক্রমণ করেছিল। বিকেল পাঁচটায় আগ্রায় প্রথম বোমা বর্ষিত হয়। আমরা খুবই বিস্মিত হয়েছিলাম। একমাত্র সপ্তাহান্তেই আমরা সরকারের দায়িত্বশীলরা দিল্লী ছাড়তে পারি। প্রায় কেউই দিল্লী ছিল না। আমি গিয়েছিলাম কোলকাতায়। প্রতিরক্ষামন্ত্রী ছিলেন পাটনায় এবং সেখান থেকে তার বাঙ্গালোরে যাওয়ার কথা। অর্থমন্ত্রী গিয়েছিলেন বোম্বে এবং সেখান থেকে তিনি পুনা যেতে প্রস্তুত। সশস্ত্র বাহিনী প্রধানও অন্যত্র ছিলেন। আমাদের সকলকে তড়িঘড়ি দিল্লী ফিরতে হলো। এর ফলে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে পাল্টা আঘাত হানার পরিবর্তে আমাদের বাহিনী পরের দিন আঘাত হানলো। এজন্যে পাকিস্তানীরা কিছু এলাকা দখলে সফল হয়েছিল। আমরা প্রস্তুত ছিলাম, জানতাম কিছু একটা ঘটবে। আমরা শুধু বিমান হামলার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। তা নাহলে পাকিস্তানীরা আমাদের পরাভুত করতো।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ মিসেস গান্ধী, আপনি বলেছেন, যুদ্ধ এড়ানোর জন্য ইউরোপ ও আমেরিকা সফর করেছেন। আপনি কি সত্যি বলবেন কি ঘটেছিল? নিক্সনের সঙ্গে কি আলোচনা হয়েছিল?

ইন্দিরা গান্ধীঃ আমি জেনে শুনেই সফরে বেরিয়েছিলাম যে আমার অবস্থা শিশুর মতো, গর্তে অঙ্গুলি প্রবেশ করাচ্ছি এবং সেখানে কি আছে আমি জানি না। সত্যটা হলো, আমি স্পষ্টভাবে নিক্সনকে বলেছি, সেই একই কথা যা আমি হীথ, পম্পিডো, ব্রাণ্ডটকে বলেছিল। আমি বলেছি আমাদের পিঠের উপর এক কোটি শরণার্থী নিয়ে আমরা আর পারছি না এবং এ ধরনের একটা অসহনীয় পরিস্থিতি আর সহ্য করা যায় না। মি. হীথ, মি. পম্পিডো এবং মি. ব্রান্ডট আমার কথা ভালোভাবেই উপলব্ধি করলেন; কিন্তু নিক্সন বুঝলেন না। অন্যেরা যা বুঝে নিক্সন তা বুঝেন না। আমি সন্দেহ করেছিলাম নিক্সন পাকিস্তানের সমর্থক অথবা বলা যায়, আমি জানতাম, আমেরিকানরা সবসময় পাকিস্তানের পক্ষে এবং ভারতের বিরুদ্ধে।

যা হোক, সাম্প্রতিককালে আমার মনে হচ্ছে, আমেরিকানরা বদলাচ্ছে- পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন কমছে তা নয়, ভারত বিরোধিতা কমছে। আমার ধারণা ভুল ছিল। নিক্সনের সাথে সাক্ষাতে আর যাই হোক যুদ্ধ এড়ানো যায়নি। এতে আমারই ভালো হয়েছে। অভিজ্ঞতায় আমি দেখেছি যখন কেউ তোমার বিরুদ্ধে কিছু করে, তাহলে তোমার পক্ষে কিছু সুবিধা চলে আসে। এটা জীবনের বিধান। আমি গত নির্বাচনে কেন বিজয় লাভ করেছি, জানো? কারণ জনগণ আমাকে ভালবাসে, আমি কঠোর পরিশ্রম করি। আরো একটা কারণ হলো, বিরোধী দল আমার প্রতি ন্যক্কারজনক আচরণ করে। যুদ্ধে কেন জিতেছি, জানো? কারণ আমার সশস্ত্র বাহিনী বিজয়ে সক্ষম ছিল এবং আমেরিকানরা পাকিস্তানের পক্ষে ছিল।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ তার মানে?

ইন্দিরা গান্ধীঃ বলছি, শোন। আমেরিকা সবসময় ভেবেছে যে তারা পাকিস্তানকে সাহায্য করছে। আমেরিকা যদি পাকিস্তানকে সাহায্য না করতো, পাকিস্তান একটি শক্তিশালী দেশে পরিণত হতো।

গণতন্ত্রের সামান্য নমুনাকে অস্বীকার করে এমন একটি সামরিক জান্তাকে সমর্থন করার অর্থ একটি দেশকে সাহায্য করা নয়। পাকিস্তানকে পরাজিত করেছে তার সামরিক জান্তা। এই জান্তা আমেরিকানদের সমর্থনপুষ্ট। কখনো কখনো বন্ধুরাই বিপজ্জনক। বন্ধুদের সাহায্য সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই সতর্ক থাকা উচিত।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ চীনাদের সম্পর্কে? চীনারাও তো পাকিস্তানের পক্ষে ছিল এবং আমার যদি ভুল না হয় তাহলে চীনারাই ভারতের সবচেয়ে বড় ও বিপজ্জনক শত্রু।

ইন্দিরা গান্ধীঃ না, চীন ও ভারত কেন শত্রু হবে, তা আমি বুঝিনা। আমরা তাদের শত্রু হতে চাই না। তারা যদি শত্রু হতে চায়, তাহলে আমরা কি করতে পারি। কারণ চূড়ান্ত বিশ্লেষণে দেখা যাবে যে এই শত্রুতায় তাদের কল্যাণ নেই। এই যুদ্ধে তাদের ভূমিকা সম্পর্কে বলতে গেলে....মনে হয়, আমেরিকানদের চেয়ে তারা দক্ষ এবং পাকিস্তানের জন্য আরো বেশি করতে পারতো। আমেরিকানরা বঙ্গোপসাগরে সপ্তম নৌবহর পাঠিয়েছিল, চীনারা নয়। তবুও আমি চীন সীমান্ত থেকে আমাদের সৈন্য সরিয়ে নেইনি এবং আমার কখনও বিশ্বাস হয়নি যে, চীনারা হস্তক্ষেপ করবে। অন্যভাবে বলা যায়, তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিপদ আমি বিশ্বাস করিনি। স্বাভাবিকভাবে, যদি আমেরিকানরা একটা গুলী ছুঁড়তো, বঙ্গোপসাগরে বসে থাকা ভিন্ন সপ্তম নৌবহর যদি বেশি কিছু করতো...হ্যাঁ, তাহলে তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বেঁধে যেতে পারতো। কিন্তু আমার সে ভয় আসেনি।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ আপনার সাথে যুদ্ধ সম্পর্কে আলাপ করতে খুব অবাক লাগছে, কারণ আপনি অহিংস মন্ত্র পাঠ করেই বড় হয়েছেন। আমার আরো অবাক লাগে, যুদ্ধের দিনগুলোতে আপনি কেমন অনুভব করেছেন।

ইন্দিরা গান্ধীঃ তোমার মনে রাখতে হবে যে, এটা আমার প্রথম যুদ্ধ ছিল না। অন্যদেরকেও মোকাবেলা করতে হয়েছে। 'অহিংসা' সম্পর্কে ছোট্ট একটা গল্প বলবো। ১৯৪৭ সালে ভারত সবে স্বাধীন হয়েছে, তখনই পাকিস্তান কাশ্মীরে অভিযান চালালো। কাশ্মীর তখন এক মহারাজা শাসন করতেন। মহারাজা পালিয়ে গেলেন এবং শেখ আবদুল্লাহর নেতৃত্বে কাশ্মীরীরা ভারতের সাহায্য চাইলেন। লর্ড মাউণ্ট ব্যাটেন তখনো ভারতের গভর্নর জেনারেল। তিনি উত্তর দিলেন যে, পাকিস্তান যুদ্ধ ঘোষণা না করা পর্যন্ত তার পক্ষে কাশ্মীরে কোন সাহায্য দেয়া সম্ভব নয় এবং পাকিস্তানীরা যে জনগণকে হত্যা করছে তাতে তিনি বিচলিত হয়েছেন এমনও বোধ হলো না। আমাদের নেতৃবৃন্দ একটি দলিলে সই করার সিদ্ধান্ত নিলেন যার দ্বারা তারা নিজেদেরকে পাকিস্তানের সাথে যুদ্ধ করতে বাধ্য করলেন। অহিংস মন্ত্রের প্রবক্তা মহাত্মা গান্ধীও সই করেছিলেন। তিনি যুদ্ধ চেয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, এছাড়া আর কিছু করার ছিল না। যখন কেউ কাউকে রক্ষা করবে তখন যুদ্ধ অনিবার্য।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ এই যুদ্ধ দেখে আমার মনে হয়েছে এটা দুই ভাইয়ের মধ্যে যুদ্ধ। একথা আমি জেনারেল আরোরা এবং জেনারেল নিয়াজীকেও বলেছি। উভয়েই উত্তর দিয়েছেন, "মূলত আমরা ভাই।"

ইন্দিরা গান্ধীঃ মূলত নয়- বরং পুরোপুরি ভাই। ভারতীয় ও পাকিস্তানীরা ভাই। আমি জানি, ঢাকার পতনের পর পাকিস্তানী ও ভারতীয় সামরিক কর্মকর্তাদের করমর্দন করতে দেখে তোমরা অবাক হয়েছো। কিন্তু ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত আমাদের বাহিনী ও পাকিস্তানী বাহিনীতে সৈনিক থেকে জেনারেল পর্যন্ত পরস্পর ভাই ছিল। রক্ত সম্পর্কের ভাই একই পিতা ও মায়ের সন্তান। অথবা তুমি একপক্ষে চাচাকে, অপর পক্ষে ভাতিজাকে দেখতে। একই ভাই ভারতীয় বাহিনীতে আরেক ভাই পাকিস্তানী বাহিনীতে। এখনো এ অবস্থাটাই সত্য। আমি তোমাকে আরো কিছু বলবো। এমনও সময় ছিল সুইজারল্যাণ্ডে ভারত ও পাকিস্তানের রাষ্টদূত দুই সহোদর ভাই। বৃটিশের চাপিয়ে দেয়া দেশ বিভাগ সত্যিই অমানবিক ছিল। এর ফলে শুধু পরিবার বিভক্ত হয়েছে, ভেঙ্গে গেছে। আমি এখনো সেই ভয়াবহ ঘটনাগুলো স্মরণ করি। অনেক লোক দেশ ত্যাগ করেছে। অনেকে দেশ ত্যাগ করতে চায়নি। বহু মুসলিম ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে যেতে চায়নি। কিন্তু সুযোগ সুবিধা লাভের প্রোপাগাণ্ডায় তারা দেশ ছেড়েছে। অপরদিকে বহু হিন্দু পাকিস্তান ছাড়তে চায়নি। তাদের সম্পর্ক সেখানে ছিল, সম্পত্তি ছিল। অতএব তারা রয়ে গেছে।

আমরা যে শত্রু হয়েছি এটা অসম্ভব মনে হয়। যখন তুমি ভাববে যে, হিন্দু ও মুসলমানরা একত্রে স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালনা করেছে তখন এই শত্রুতাকে অসম্ভব মনে হবে। একথা সত্যি যে, বৃটিশদের সময়েও বিবদমান কিছু গ্রুপ ছিল। সংঘর্ষ হয়েছে। পরে আমরা দেখেছি, যারা চায়নি যে আমরা একত্রে বাস করি তারাই সংঘর্ষের প্ররোচনা দিয়েছে। আমাদেরকে বিভক্ত করার নীতি বিদেশীদের, দেশ বিভাগের পরও সে ষড়যন্ত্র রয়েছে। ভারতীয় ও পাকিস্তানীরা যদি একত্রে থাকে....আমি কনফেডারেশনভুক্ত দেশের কথা বলছি না, সৎ প্রতিবেশী ও বন্ধুত্বপূর্ণ দেশ হিসেবে... ইতালী ও ফ্রান্সের মতো...বিশ্বাস করো আমাদের উভয়ের আরো অগ্রগতি হতো। কারো স্বার্থে আমরা সবসময় যুদ্ধ করেছি। পাকিস্তানীদের দোষ আমি দেই না। আমাদেরকে আক্রমণ করতে কেউ তাদেরকে উৎসাহিত করেছে। অস্ত্র দিয়ে তারা আমাদের আক্রমণ করেছে।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ ভূট্টো বলেছেন যে, তিনি ভারতের সাথে কনফেডারেশন গঠনে প্রস্তুত। সে সম্পর্কে আপনার বক্তব্য কি মিসেস গান্ধী।

ইন্দিরা গান্ধীঃ তুমি জানো- ভূট্টো ভারসাম্যপূর্ণ লোক নয়। যখন তিনি কথা বললেন, তুমি বুঝবে না তিনি কি বুঝাতে চান। এখন তিনি কি বুঝাতে

চেয়েছেন? আমাদের বন্ধু হতে চান? আমরা তো কিছুদিন তার সাথে বন্ধু হতে চেয়েছিলাম। আমি সবসময়ই তা চেয়েছি। পাশ্চাত্যের লোকেরা কিছু বিষয় জানে না। পাশ্চাত্যের সংবাদ মাধ্যমগুলো সবসময় প্রচার করছে যে, ভারত পাকিস্তানের শত্রু এবং পাকিস্তান ভারতের। তারা জানে না যে, আমরা দুটি দেশে বিভক্ত হয়ে যাওয়ার পর থেকে আমার পার্টি এই দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে লড়াই করছে। তখন থেকে আমরা নীতি গ্রহণ করেছি যে ধর্মীয় বিদ্বেষ ভ্রান্ত এবং অবাস্তব। সংখ্যালঘুদের একটি দেশ থেকে নির্মূল করা যেতে পারে না। বিভিন্ন ধর্মের লোকজন অবশ্যই এক সাথে বাস করবে।

কিন্তু বর্তমান বিশ্বে কি করে সম্ভব যে, ধর্মীয় কারণে পরস্পরকে হত্যা করার ঘটনা চলতেই থাকবে? এখন আমরা যে সমস্যায় ভুগছি তা ভিন্ন। এসব সমস্যা হচ্ছে দারিদ্র্য, ব্যক্তি অধিকার এবং প্রযুক্তি পরিবর্তন। এগুলো ধর্মের চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এসব বিশ্বজনীন সমস্যা। পাকিস্তান এবং আমরা একই সমস্যায় জর্জরিত। যখন লোকজন উত্তেজিত হয়ে চিৎকার করে যে, ধর্ম বিপদগ্রস্ত- আমি খুব গুরুত্ব দেই না। দুঃখজনক হলেও সত্য যে, ভারতে বহুলোক একথা বলছে। তারাই বলে যে, "আমরা কোনদিন পাকিস্তানীদের অস্তিত্বকে মেনে নিইনি। যেহেতু পাকিস্তান আছে। অতএব তাকে ধ্বংস করতে হবে।" কিন্তু এ ধরনের গুটিকয়েক উন্মাদের জনগণের মধ্যে কোন ভিত্তি নেই।

ভারতে তুমি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে প্রচারণা দেখবে না। যুদ্ধের সময় সামান্য প্রচারণা ছিল, স্বাভাবিক। তবু নিয়ন্ত্রিত ছিল। পাকিস্তানীরা এতে বিস্মিত হয়েছে। বন্দী শিবিরের হাসপাতালে বন্দীরা আশ্চর্য হয়ে বলেছে, "তুমি হিন্দু চিকিৎসক হয়ে আমাকে সারিয়ে তুলবে?" আমি ভূট্টোকে শুধু এটুকু বলতে চাই যে, তিনি যদি জানেন যে, তিনি কি বলছেন? তিনি বলছেন, যা বলা উচিত। তিনি যদি তা বলে না থাকেন, তাহলে তার ভবিষ্যত কি হবে? আমাকে বলা হয়েছে ভূট্টো উচ্চাভিলাষী। আমি তার উচ্চাভিলাষ আশাও করি। উচ্চাশা তাকে বাস্তব অনুধাবনে সহায়তা করবে।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ মিসেস গান্ধী, আপনি তো ধার্মিক নন? আসলে কি?

ইন্দিরা গান্ধীঃ ভালো কথা, এটা নির্ভর করে, তোমার কাছে ধর্ম শব্দটির অর্থ কি? আমি অবশ্যই মন্দিরে যাইনা, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি না। কিন্তু ধর্ম দ্বারা যদি শুধু ভগবান ছাড়া মানবতার প্রতি বিশ্বাস বুঝি, যার দ্বারা মানুষের কল্যাণ হবে, তাহলে আমি ধার্মিক।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ তাহলে আমার প্রশ্নটা বিরক্তিকর ছিল না?

ইন্দিরা গান্ধীঃ না, তা কেন হবে।
ওরিয়ানা ফালাচিঃ কিন্তু এবারে প্রশ্নটা বিরক্তিকর। আপনি সবসময় জোট নিরপেক্ষ নীতি ঘোষণা করেছেন। তাহলে গত আগস্টে আপনি ভারত-সোভিয়েত মৈত্রী চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছেন কেন? এ দু'য়ের মধ্যে কি কোন দ্বন্দ্ব নেই?
ইন্দিরা গান্ধীঃ না, আমি তা বলবো না। জোট নিরপেক্ষ অর্থ কি? এর অর্থ আমরা কোন সামরিক জোটভুক্ত নই এবং স্বাধীনভাবে যে কোন দেশের সাথে বন্ধুত্ব করার অধিকার আমাদের আছে। ভারত-সোভিয়েত চুক্তি স্বাক্ষরের পরও সকল নীতি অপরিবর্তিত রয়েছে। অন্যেরা যা বলুক বা ভাবুক, সোভিয়েত ইউনিয়নের কারণে আমাদের নীতির পরিবর্তন হবে না। আমরা ভালোভাবেই জানি, আমাদের লক্ষ্য বিশ্ব শান্তির সাথে জড়িত। আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানটা লক্ষ্য করলে দেখবে সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্য ভারত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই চুক্তির ফলে আন্তর্জাতিক কোন বিষয়ই বদলে যায়নি। এর দ্বারা অন্য দেশের বন্ধু হওয়ার পথ রুদ্ধ হয়নি। জোটনিরপেক্ষ থাকার শর্তেও কোন বাধা আসেনি এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স এবং অন্য কেউ খুশী হবে কি হবে না তা তোয়াক্কা না করেই আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত নিতে থাকবো। চুক্তি স্বাক্ষরের মাসখানেক পরে কেউ একজন চৌ এন লাইকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে বললে তিনি বলেছিলেন, "এর দ্বারা কোন কিছু বদলে যায়নি বা পার্থক্য সৃষ্টি হয়নি।
ওরিয়ানা ফালাচিঃ নিকট ভবিষ্যতে হ্যানয়ে ভারতীয় দূতাবাস খুললেই পার্থক্যটা লক্ষ্য করা যাবে। আপনি তো ভিয়েতনামের জন্য আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশনের প্রধান। এর অর্থ কি? আপনি কি কমিশনারের সদস্যপদ ও চেয়ারম্যানের দায়িত্ব ত্যাগ করবেন?
ইন্দিরা গান্ধীঃ আমি জানি না। স্পষ্টত কিছু সমস্যা হচ্ছে....। এখনো ভাবিনি কিভাবে সমাধান করবো। এ ব্যাপারে বলবোই বা কি। শোন তাহলে, আন্তর্জাতিক নিয়ন্ত্রণ কমিশন কিছুই করছে না, কখনো কিছু করেনি। হ্যানয়ে দূতাবাস খোলার পূর্বে আমাকে ভাবতে হবে, কিন্তু এটা খুব বেদনাদায়ক সিদ্ধান্ত নয়। সায়গনে পরিস্থিতি স্বাভাবিক নয় এবং আমি যা করেছি তাতে আমি সন্তুষ্ট।
ওরিয়ানা ফালাচিঃ তাহলে জনগণের ধারণাই যথার্থ যে আপনার পিতার চেয়ে আপনি অনেক বাম ঘেঁষা?

ইন্দিরা গান্ধীঃ পৃথিবী যে ডান ও বামে বিভক্ত হয়ে গেছে আমি এমন কিছু দেখি না। কে ডানে বা কে বামে বা মধ্যস্থলে তারও তোয়াক্কা করি না। আমরাও যদি শব্দগুলো ব্যবহার করি, হ্যাঁ আমি নিজেও করি- কিন্তু এগুলোর তেমন তাৎপর্য নেই। কোন চিহ্নে আমার আগ্রহ নেই- আমি শুধু সুনির্দিষ্ট সমস্যার সমাধান করতে চাই। আমি একটা লক্ষ্যে পৌঁছতে চাই। আমার পিতার যে লক্ষ্য ছিল তা থেকে আমার লক্ষ্য ভিন্ন নয়- জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, দারিদ্র্যের ক্যান্সার বিদূরণ, অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতার পরিণতি নির্মূল। আমি সফল হতে চাই এবং সম্ভাব্য উত্তম পন্থায় সফল হতে চাই, তাতে জনগণ আমাকে বামপন্থী বা ডানপন্থী বললে এ আমি তোয়াক্কা করি না।

আমরা যখন ব্যাংক জাতীয়করণ করি তখনো এই প্রশ্নটা ছিল। জাতীয়করণের মুখরোচক কথার জন্যে জাতীয়করণ নয় বা জাতীয়করণ সকল অবিচার দূর করবে সে কারণেও নয়; যেখানে প্রয়োজন আমি সেক্ষেত্রে জাতীয়করণের পক্ষে। যখন প্রথম আমরা জাতীয়করণের কথা বিবেচনা করছিলাম, তখন আমার পার্টিতে কেউ পক্ষে, আবার কেউ বিপক্ষে ছিল। পার্টিকে ভাঙ্গন থেকে রক্ষা করতে আমি আপসের প্রস্তাব দিয়েছিলাম- ব্যাংকগুলোকে এক বছর সময় দেয়া হোক। এর মধ্যে যদি তারা দেখাতে পারে যে, জাতীয়করণ জরুরী নয় তাহলে সে প্রশ্নই আসবে না। বছর কাটলো এবং আমরা উপলব্ধি করলাম, ফলাফল ভালো নয়। অর্থ ধনী শিল্পপতি বা ব্যাংকারদের বন্ধুদের হাতে চলে যাচ্ছে। ফলে জাতীয়করণ করলাম। এটা সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ বা সমাজতন্ত্র বিরোধী তা বিবেচনার বদলে প্রয়োজনটাকেই অধিক গুরুত্ব দিয়েছি। এজন্যে কেউ আমাকে বামপন্থী ভাবলে সে বোকা।
ওরিয়ানা ফালাচিঃ যা হোক, আপনি বহুক্ষেত্রেই সমাজতন্ত্র শব্দটি ব্যবহার করেন।
ইন্দিরা গান্ধীঃ হ্যাঁ, কারণ আমি যা করতে চাই, এটা তার কাছাকাছি এবং সকল সমাজে এক ধরনের সমাজতন্ত্র কার্যকর, একটি নির্দিষ্ট পর্যায় পর্যন্ত সামাজিক ও অর্থনৈতিক সাম্য অর্জিত হয় এর মাধ্যমে। কিন্তু আজকাল সমাজতন্ত্রের অর্থ অসংখ্য এবং ব্যাখ্যাও বিভিন্ন। রুশরা নিজেদেরকে সমাজতন্ত্রী বলে, সুইডিশরাও সমাজতন্ত্রী। এবং ভুললে চলবে না যে, জার্মানীতেও জাতীয় সমাজতন্ত্র আছে।
ওরিয়ানা ফালাচিঃ মিসেস গান্ধী, আপনার কাছে সমাজতন্ত্রের অর্থ কি?

ইন্দিরা গান্ধীঃ ন্যায় বিচার। হ্যাঁ, এর অর্থ ন্যায় বিচার। এর অর্থ সমতাপূর্ণ সমাজে কাজ করার চেষ্টা করা।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ কিন্তু বাস্তবে কোন প্রকার আদর্শ হতে বিমুক্ত হওয়া?

ইন্দিরা গান্ধীঃ হ্যাঁ। আমার নিজের একটা আদর্শ আছে- কেউ শূন্যে কাজ করতে পারে না। তোমাকে অবশ্যই কোন কিছুতে বিশ্বাসী হতে হবে। আমার বাবা বলতেন, তোমার মনটাকে অবশ্যই খোলা রাখতে হবে, কিন্তু মনের মধ্যে কিছু রাখতে হবে। তা না হলে ধ্যানধারণাগুলো আঙ্গুলের ফাঁক দিয়ে বালির মতো গড়িয়ে পড়বে। কথা হলো, আমার একটা আদর্শ আছে, কিন্তু আমি গোঁড়া নই। এখন গোঁড়া থাকা যায় না। বিশ্ব দ্রুত বদলাচ্ছে। এমনকি কুড়ি বছর আগে তুমি যা চাইতে, এখন তা সঙ্গতিহীন, পরিত্যক্ত। ভারত এখনো দারিদ্র্য পীড়িত। স্বাধীনতার কোন সুফল জনগণের বিরাট অংশ আজো পায়নি- তাহলে মুক্ত হয়ে কি লাভ? আমরা কেনই বা মুক্ত হতে চেয়েছিলাম? শুধু কি বৃটিশকে তাড়াতে? এ ব্যাপারে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট। আমরা সবসময় বলেছি যে, উপনিবেশবাদের প্রতিনিধি বৃটিশের বিরুদ্ধেই শুধু আমাদের সংগ্রাম নয়, আমাদের সংগ্রাম ভারতে বিরাজমান সকল অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে। সমস্ত ব্যবস্থার ত্রুটি, বর্ণ প্রথা বা অর্থনৈতিক অবিচারের ফলে সৃষ্ট সমস্যা ভারতে মারাত্মক দুষ্টগ্রহ। এসব কিছুই নির্মূল হয়নি। কুড়ি বছর পর আমরা রাজনৈতিকভাবে মুক্ত হয়েছি। কিন্তু আমরা যে লক্ষ্য স্থির করেছিলাম তার অর্জিত হয়নি।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ তাহলে আপনি কোন পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছেছেন?

ইন্দিরা গান্ধীঃ এটা বলা শক্ত। তুমি কি কখনো পবর্তারোহণ করেছো? কোন পর্বতের শিখরে উঠলে মনে হবে তুমি সর্বোচ্চ শিখরে উঠছো। কিন্তু সে ধারণা বেশিক্ষণ টিকে না। শীঘ্রই দেখবে, তুমি যে শিখরে উঠছো তা খুব নিচু। উঁচু শিখরে উঠতে হলে বহু পর্বতে আরোহণ করতে হবে। উঁচুতে উঠতে ইচ্ছা হবে।

আমি বলতে চাই, ভারতে দারিদ্র্যের বহু দিক রয়েছে। শুধু শহুরে দারিদ্র নয়, উপজাতিগুলোর মধ্যে দারিদ্র্য রয়েছে, বনে-জঙ্গলে, পার্বত্য এলাকায় বহু দরিদ্র লোকের বাস। শহরের দরিদ্র লোকেরা ভালো আছে বলে কি আমরা তাদের অবহেলা করতে পারি? যখন কেউ একটা দেশ শাসন করে, বিশেষ করে ভারতের মতো বিশাল ও সমস্যাপূর্ণ দেশে কিছুই হাসিল করা যায় না। যখনই তুমি ভাববে কিছু অর্জিত হয়েছে, তখনই

উপলব্ধি করবে কিছুই অর্জিত হয়নি। এরই মধ্যে একটা স্বপ্নের দিকে এগুতে হবে এতদূর যে কোনদিন সে পথের শুরু বা শেষ হয়নি।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ মিসেস গান্ধী, আপনি সে পথের কোথায় উপনীত হয়েছেন?

ইন্দিরা গান্ধীঃ খুব গুরুত্বপূর্ণ এক পর্যায়ে। ভারতীয়রা যে কিছু করতে পারে সে ব্যাপারে আমি আশ্বস্ত। প্রথমে লোকজন আমাদের বলতো, "আপনারা কি এটা করতে পারবেন?" আমরা চুপছাপ থাকতাম, কারণ আমরা নিজেদের বিশ্বাস করতাম না, আমরা যে কিছু করতে পারবো সে বিশ্বাস আমাদের ছিল না। এখন আর কেউ বলে না, "পারবেন কি?" বরং বলে, "কখন কাজটা করবেন?" ভারতীয়রা শেষ পর্যন্ত নিজেদের বিশ্বাস করছে যে, তারা কিছু করতে পারে। "কখন" শব্দটি একজন মানুষের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোন ব্যক্তি যদি কখনো ভাবে যে সে কিছু করতে পারবে না, তাহলে তার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হবে না।- সে যদি খুব বুদ্ধিমান বা মেধাসম্পন্ন হয়, তবুও না। সামর্থ্য হবার শর্ত হলো নিজের উপর আস্থা। জাতি হিসেবে আজ আমরা নিজেদের উপর আস্থাশীল হতে পেরেছি। ভাবতে আমার ভালো লাগে যে, আমিই আস্থাশীল করতে পেরেছি। তারা এখন গর্বিত। কেউ এই গর্ব আরোপ করতে পারে না এবং সহসা ভেঙ্গেও যায় না। এটা এক ধরনের অনুভব যা ধীরে ধীরে জন্মায়। আমাদের যা গর্ব- অহংকার তা জানাচ্ছ গত পঁচিশ বছরে। অন্যেরা এটা বুঝতে না পেরে ভুল ধারণা পোষণ করে। পাশ্চাত্যের লোকেরা ভারতীয়দের প্রতি কখনো উদার ছিল না। ধীরে ধীরে সবকিছু বদলাচ্ছে তা নিশ্চয়ই দেখতে পাচ্ছো। কিন্তু একটা ঘটেছে- খুব বেশি নয়, কিন্তু কিছু।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ মিসেস গান্ধী, আপনি নিজেই তো যথেষ্ট অহংকারী।

ইন্দিরা গান্ধীঃ না, আমি অহংকারী নই।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ অবশ্যই আপনি অহংকারী। ১৯৬৬ সালের দুর্ভিক্ষের সময় বিশ্ব যে সাহায্যের প্রস্তাব করেছিল তা নিতে অস্বীকৃতি জানানো অহংকার নয়? আমার মনে আছে একটি জাহাজ শস্য, খাদ্য বোঝাই করা হয়েছিল, কিন্তু সেটি নেপলস বন্দর ত্যাগ করেনি এবং সব সামগ্রী পচে গেছে। অন্যদিকে ভারতের লোকজন মারা যাচ্ছিল।

ইন্দিরা গান্ধীঃ এ ঘটনা আমি কখনো শুনিনি। আমি জানিনা যে, জাহাজটা বোঝাই করে ছাড়ার জন্যে প্রস্তুত ছিল- তাহলে হয়তো নিতে অস্বীকার করতাম না। তবে এটা সত্য যে আমি বিদেশী সাহায্য নিতে অস্বীকার

করেছিলাম। এটা আমার ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত ছিল না। গোটা দেশই এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। বিশ্বাস করো, এটা ঘটেছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। জনগণ, সকল রাজনৈতিক দল পার্লামেন্টের ডেপুটিরা পর্যন্ত বিদেশী সাহায্যের বিরোধী ছিল। ভিক্ষুকের জাতি হিসেবে পরিচিত হওয়ার চেয়ে ক্ষুধায় মৃত্যুবরণ উত্তম- এই ছিল চেতনা। যারা আমাদের সাহায্য দিতে চেয়েছে তাদের কাছে এই চেতনা ব্যাখ্যা করেছি। আমি জানি এতে তোমরা আহত হয়েছ। অনেক সময় কিছু না বুঝে আমরা একে অন্যকে আহত করি।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ আমরা আপনাকে আহত করতে চাই নি।

ইন্দিরা গান্ধীঃ আমি জানি এবং বুঝি তোমাকেও অবশ্যই আমাদেরকে বুঝতে হবে। বিশ্বাস করতে হবে তোমরা বলেছ, "সংঘাত ছাড়া কি করে যুদ্ধ সম্ভব?" আমরা তো কোন সংঘাত ছাড়াই স্বাধীনতা অর্জন করেছি। তোমরা বলেছ, 'অশিক্ষিত জনগণ, যারা ক্ষুধায় মরছে, সেখানে কি করে গণতন্ত্র চর্চা হবে?" কিন্তু আমরা সেই জনগণ দিয়েই কার্যকর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছি। তোমরা বলেছ, "পরিকল্পনা হয় কমিউনিস্ট দেশের জন্য। গণতন্ত্র ও পরিকল্পনা পাশাপাশি চলতে পারে না।" কিন্তু সকল ভুলভ্রান্তির মধ্যে আমাদের পরিকল্পনা সফল হয়েছে। এরপর আমরা ঘোষণা করেছি, ভারতে মানুষ আর অনাহারে থাকবে না। তোমাদের সাড়া ছিল, "অসম্ভব। তোমরা কখনো সফল হবে না।" কিন্তু আমরা সফল হয়েছি। এখন ভারতে না খেয়ে কেউ মরে না। খাদ্য উৎপাদন চাহিদা অপেক্ষা অধিক। সবশেষে আমরা জন্মাহার সীমিত রাখতে প্রতিজ্ঞা করেছি। তোমাদের তাও বিশ্বাস হয় না, অবজ্ঞার হাসি হাসো। গত দশ বছরে আমাদের জনসংখ্যা বেড়েছে সাত কোটির উপরে। কিন্তু এই হার অনেক দেশের চেয়ে কম।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ সাধারণতঃ কি ভয়াবহ পদ্ধতিতে, পুরুষের নিবীর্যকরণের মতো। আপনি কি তা অনুমোদন করেন?

ইন্দিরা গান্ধীঃ সুদূর অতীতে ভারতে যখন জনসংখ্যা কম ছিল, তখন নারীকে আশীর্বাদ করা হতো, "তোমার অসংখ্য সন্তান হোক।" আমাদের অধিকাংশ মহাকাব্য ও সাহিত্যে এর উপর জোর দেয়া হয়েছে এবং আজো নারীর যে অসংখ্য সন্তান কামনা করে তাই হওয়া উচিত। কিন্তু এটা ভ্রান্ত ধারণা। আমাদের সহস্র বর্ষ ধরে লালিত অনেক ধারণার মতো এ ধারণারও মূলোচ্ছেদ করতে হবে। পরিবার, সন্তানদের রক্ষা করতে হবে। শিশুদের দৈহিক ও মানসিক পরিচর্যা করতে হবে। তুমি কি জানো, এখনো দরিদ্র লোকেরা সন্তানের জন্ম দেয় তাদের দায়িত্ব নেয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু কি করে

এই প্রাচীন ব্যবস্থাকে সহসা বলপূর্বক পরিবর্তন করা সম্ভব? একমাত্র উপায় পরিকল্পিত জন্ম। পুরুষকে নিবীর্যকরণ জন্ম নিয়ন্ত্রণের একটি পদ্ধতি। অত্যন্ত নিরাপদ ও উন্নত পদ্ধতি। তোমার কাছে ভয়ংকর। যথাযথভাবে এটা করলে মোটেই ভয়ংকর নয়। যে লোকটি আট বা দশটি সন্তানের জন্ম দিয়েছে তাকে নিবীর্যকরণের মধ্যে দোষের কিছু দেখিনা। বিশেষ করে এর ফলে সেই আট বা দশটি সন্তানের জীবন যদি উন্নত হয়।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ আপনি কি কখনো নারীমুক্তির পক্ষে ছিলেন, মিসেস গান্ধী?

ইন্দিরা গান্ধীঃ না, কোনদিন না। আমার প্রয়োজন হয়নি। আমি যা করতে চেয়েছি, সবসময় তা করতে সক্ষম হয়েছি। আমার মা নারীমুক্তির পক্ষে ছিলেন। তিনি মনে করতেন নারী হওয়াটা সবচেয়ে ঝামেলার। তার নিশ্চয়ই যুক্তি ছিল। তার সময়ে নারীকে পর্দার অন্তরালে থাকতে হতো ভারতের প্রায় সকল রাজ্যেই তারা রাস্তায়ও বেরুতে পারতো না। মুসলিম নারীদের পর্দা প্রথা পালন করতে হতো। হিন্দু নারীদের ডোলীতে চড়ে বাইরে বেরুতে হতো। আমার মা অত্যন্ত তিক্ততার সাথে এসব বলতেন। দুইবোন ও দুই ভাইয়ের মধ্যে তিনি ছিলেন বড় এবং ভাইদের সাথে তিনি বড় হয়েছেন প্রায় দশ বছর পর্যন্ত। এর পর তাকে বাধ্য করা হলো নারীর লক্ষ্য অনুসরণ করতে- 'এটা করা ঠিক নয়' 'ওটা ভালো নয়'। "নারীর জন্যে কাজটা অনুচিত"-ইত্যাদি।

একটা বিশেষ সময়ে তার পরিবারকে জয়পুর চলে যেতে হলো। সেখানে নারীর পক্ষে পর্দা এড়িয়ে চলা সম্ভব ছিল না। তাকে সকাল হতে রাত অবধি ঘরের মধ্যেই থাকতে হতো- রান্নাবান্না করে অথবা কিছুই না করে। তিনি কিছু না করাকে ঘৃণা করতেন, রান্নার কাজও ঘৃণা করতেন। অতএব ফ্যাকাশে ও অসুস্থ হয়ে পড়লেন এবং তার স্বাস্থ্য সম্পর্কে উদ্বিগ্ন না হয়ে বরং ঠাকুর্দা বলতেন, "এখন কে ওকে বিয়ে করবে?" আমার ঠাকুরমা অপেক্ষা করতেন কখন ঠাকুর্দা বাইরে যায়। বাইরে চলে গেলেই তিনি মাকে ছেলের পোশাক পরিয়ে তার ভাইয়ের সাথে সাইকেল চালাতে দিতেন। ঠাকুর্দা কখনো এটা জানতে পারেননি এবং ঠাকুরমা একটুও না হেসে আমাকে গল্পটা বলতেন। এই অবিচারের স্মৃতি তার মন থেকে কখনো মুছে যায়নি। মৃত্যুর দিন পর্যন্ত মা নারীর অধিকারের জন্য সংগ্রাম করেছেন। নারী আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন তিনি। তিনি এক মহান নারী, বিরাট ব্যক্তিত্ব।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ আপনি তাদের সম্পর্কে কি ভাবেন, মিসেস গান্ধী? আমি বলতে চাই, তাদের মুক্তি আন্দোলন সম্পর্কে?

ইন্দিরা গান্ধীঃ এটা খুব ভালো। কারণ গুটিকয়েক লোক জনগণের নাম ভাঙ্গিয়ে জনগণের অধিকারের কথা বলেছে। কিন্তু এখন তারা প্রতিনিধির বদলে প্রত্যেকে নিজের কথা বলতে চায়, সরাসরি অংশগ্রহণ করে- একথা নিগ্রো, ইহুদী, নারী সবার জন্য প্রযোজ্য। নারী বিরাট এক বিদ্রোহের অংশ। নারীরা অনেক সময় বাড়াবাড়ি করে, এটা সত্য আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি কিছুটা শিখেছি। ভারতে নারী পুরুষদের মধ্যে কখনো দ্বন্দ্বপূর্ণ প্রতিযোগিতা ছিল না। যখনই কোন নারী নেতৃত্বে এসেছে, হয়তো রাণী হিসেবে- জনগণ তাকে গ্রহণ করেছে। এতে ব্যতিক্রম কিছু ছিল না। ভুললে চলবে না। যে, ভারতের শক্তি চিহ্ন হচ্ছে নারী। শুধু তাই নয়, স্বাধীনতা সংগ্রাম করেছে নারী ও পুরুষ সমানভাবে। স্বাধীনতার পর কেউ তা ভুলে যায়নি। পাশ্চাত্যে এ ধরনের কিছু ঘটেনি। নারীরা অংশগ্রহণ করেছে সত্য কিন্তু সেখানে বিপ্লব করেছে সবসময় পুরুষরা।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ আমরা এখন ব্যক্তিগত প্রশ্নে আসতে পারি। প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে, আপনার মতো একজন নারী কি নিজেকে পুরুষ বা নারীদের মধ্যে সচ্ছন্দ বোধ করেন?

ইন্দিরা গান্ধীঃ আমার জন্যে এতে কোন পার্থক্য নেই। আমি প্রত্যেককে একভাবে বিবেচনা করি। আমি দেখি ব্যক্তি হিসেবে- পুরুষ বা নারী হিসেবে নয়। এক্ষেত্রেও তোমাকে দেখতে হবে যে, আমি বিশেষ ধরনের শিক্ষালাভ করেছি। আমি আমার পিতার মতো একজন পুরুষ ও মায়ের মতো একজন নারীর কন্যা। ছেলের মতো আমি বড় হয়েছি। কারণটা ছিল আমাদের বাড়িতে যে শিশুরা আসতো, তাদের অধিকাংশই ছেলে। ছেলেদের সাথে আমি গাছে চড়েছি, দৌড়ের প্রতিযোগিতা করেছি, কুস্তি লড়েছি। ছেলেদের নিয়ে কোন জটিলতা বা হীনমন্যতা আসেনি আমার মধ্যে। একই সময়ে আমি পুতুল ভালোবাসতাম। অনেক পুতুল ছিল আমার। পুতুলগুলোর কোন সন্তান ছিল না বললেই চলে। তারা ছিল নারী ও পুরুষ। ব্যারাকে হানা দিতো। কারাগারে আবদ্ধ থাকতো ইত্যাদি। ব্যাপারটা হলো, শুধু আমার বাবা মা নয়, পুরো পরিবার প্রতিরোধ আন্দোলনে জড়িত ছিল। যখন তখন পুলিশ এসে নির্বিচারে তাদের ধরে নিয়ে যেতো।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ এছাড়া ছিল জোয়ান অব আর্কের গল্প তাই না?

ইন্দিরা গান্ধীঃ হ্যাঁ, সত্য। জোয়ান অব আর্ক ছিল আমার শৈশবের স্বপ্ন। দশ/বারো বছর বয়সে যখন ফ্রান্সে গেছি, তখন তাকে আবিষ্কার করেছি। আমার মনে পড়ে না, কোথায় তার সম্পর্কে পড়েছি। কিন্তু আমার জন্যে সে মুহূর্তে একটি সুনির্দিষ্ট গুরুত্ব সৃষ্টি করেছিল। দেশের জন্যে আমি প্রাণ বিসর্জন দিতে চেয়েছি। এটা বোকামির মতো মনে হলেও শৈশবে যা ঘটে আমাদের জীবনে তা চিরস্থায়ী হয়ে যায়।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ বাস্তবিকই তা হয়। আমি বুঝতে চাই, আপনি যে আজকের পর্যায়ে এসেছেন, তা কি করে মিসেস গান্ধী?

ইন্দিরা গান্ধীঃ আমার জীবন ছিল সমস্যাপূর্ণ, কঠোর। শৈশব থেকে আমি দুঃখ ভোগ করেছি। সমস্যার মধ্যে কাটানোটা আমার জন্যে মঙ্গলজনক ছিল এবং আমার সমসাময়িক বহু লোককে সমস্যায় কাটাতে হয়েছে। এখনকার নবীনেরা কি সে স্বপ্ন দেখে, যে স্বপ্ন আমাদের জীবনকে গঠন করেছিল। আমার শৈশবের জীবনটা সুখকর ছিল না। আমি শুকনো অসুস্থ এবং ভীতু বালিকা ছিলাম। পুলিশ যখন পরিবারের সদস্যদের ধরে নিয়ে যেতো, সপ্তাহের পর সপ্তাহ মাসের পর মাস আমাকে নিঃসঙ্গ থাকতে হতো। শীঘ্রই একা থাকতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেলাম। আট বছর বয়সে আমি ইউরোপে গিয়েছি। সে বয়সে আমি ভারত ও সুইজারল্যাণ্ডে, সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্সে, ফ্রান্স ও ইংল্যাণ্ডে। একজন বয়স্কের মতো নিজের অর্থের হিসেব নিকাশ করতাম।

লোকজন আমাকে জিজ্ঞেস করে। কে আপনাকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করেছে? আপনার পিতা? মহাত্মা গান্ধী? হ্যাঁ আমার ইচ্ছা অনিচ্ছা মূলত তাদের দ্বারা প্রভাবিত। সাম্যের চেতনায় তারা আমাকে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ন্যায়ের প্রতি আমার অনুরাগ এসেছে পিতার নিকট হতে এবং তিনি তা পেয়েছেন মহাত্মা গান্ধীর নিকট হতে। তবে একথা বলা ঠিক নয় যে, আমার উপর পিতার প্রভাব বেশি এবং আমার বলাও সম্ভব নয় যে, আমার কারো কথা মা, বাবা অথবা মহাত্মা গান্ধীর, অথবা যেসব বন্ধুরা আমার সাথে ছিলেন, তাদের। কারো একার প্রভাব নয়, সবার। কেউ কখনো আমার উপর কিছু চাপিয়ে দেয়নি। কেউ আমাকে দীক্ষা দেয়নি। আমি সবসময় স্বাধীনতার মধ্যে কিছু খুঁজতে চেষ্টা করেছি। আমার পিতা সাহসিকতার খুব গুরুত্ব দিতেন এবং ভীতুদের পছন্দ করতেন না। কিন্তু তিনি আমাকে কখনো বলেনি যে, "আমি তোমাকে সাহসী দেখতে চাই।"

যখনই কঠিন কাজ করেছি অথবা ছেলেদের সাথে দৌড়ে জয়ী হয়েছি, তখন গর্বে মৃদু হাসতেন।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ আপনি নিশ্চয়ই পিতাকে খুব ভালবাসতেন?

ইন্দিরা গান্ধীঃ অবশ্যই। আমার পিতা একজন সাধু ব্যক্তি ছিলেন। একজন সাধারণ মানুষের মধ্যে যে গুণ থাকে তা থেকে তিনি একজন সাধুর কাছাকাছি ছিলেন। তিনি এত ভালো, এত মহৎ ছিলেন। আমি সবসময় তার পক্ষে ছিলাম- শৈশবে এবং এখনো। তিনি কোন রাজনীতিবিদ ছিলেন না- কোন ব্যাখ্যায়ই না। তার কর্মের মধ্যেই তিনি টিকে থাকবেন- ভারতের ভবিষ্যৎ চিন্তা তাকে আচ্ছন্ন করে রাখতো। আমরা পরস্পরকে বুঝতাম।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ আর মহাত্মা গান্ধী?

ইন্দিরা গান্ধীঃ তার মৃত্যুর পর অনেক কথা হচ্ছে। তিনি একজন ব্যতিক্রমধর্মী লোক ছিলেন। অসাধারণ বুদ্ধিমান, জনগণের জন্যে অসম্ভব রকমের দরদ এবং ন্যায়ের পক্ষে দৃঢ় ভূমিকা গ্রহণের একাগ্রতা ছিল তার। তিনি বলতেন ভারতের প্রথম প্রেসিডেন্ট হওয়া উচিত একজন হরিজন অস্পৃশ্য মেয়ের। শ্রেণীর প্রথার বিরুদ্ধে তিনি কঠোর ছিলেন। নারীর উপর নির্যাতন তিনি সহ্য করতে পারতেন না। তিনি যখন আমাদের বাড়িতে আসতেন তখন তার সাথে মিশতাম। স্বাধীনতার পর তার সাথে বহু কাজ করেছি- হিন্দু- মুসলিম সমস্যা যখন চরমে তখন। মুসলমানদের প্রতি দৃষ্টি রাখার দায়িত্ব দিয়েছিলেন আমার উপর। তাদের রক্ষার দায়িত্ব। তিনি মহান ছিলেন। আমার পিতা ও আমার মধ্যে যে সমঝোতা ছিল, মহাত্মা ও আমার মধ্যে সে সমঝোতা ছিল না। তিনি সবসময় ধর্মের কথা বলতেন এবং সেটাই সঠিক বলে মনে করতেন। অনেক ব্যাপারেই আমরা তরুণরা তার সাথে একমত হতাম না।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ আবার আপনার প্রসঙ্গে ফিরে আসি মিসেস গান্ধী। এটা কি সত্য যে আপনি বিয়ে করতে চাননি?

ইন্দিরা গান্ধীঃ হ্যাঁ, আঠার বছর পর্যন্ত চাইনি। কারণ আমি আমার পুরো শক্তি নিয়োজিত করতে চেয়েছিলাম ভারত স্বাধীন করার সংগ্রামে। আমার ধারণা ছিল, বিয়ে করলে আমি সে দায়িত্ব পালন করতে পারবো না। কিন্তু ধীরে ধীরে আমার মন পরিবর্তন করলাম এবং আমার বয়স যখন আঠার তখন বিয়ের সম্ভাবনা বিবেচনা করতে শুরু করলাম। স্বামী পাবার জন্য নয়, সন্তান লাভের জন্য। আমি সব সময় সন্তান কামনা করতাম- যদি আমার

উপর নির্ভর করতো, তাহলে আমার ১১টা সন্তান হতো। আমার স্বামী চাইতেন মাত্র দুটো।

তোমাকে আরো একটা কথা বলি। আমার ডাক্তাররা পরামর্শ দিয়েছিল যাতে আমি একটা সন্তানও ধারণ না করি। আমার স্বাস্থ্য ভালো ছিল না এবং তারা বলতো, গর্ভধারণ করলে খুবই বিপজ্জনক হতে পারে। তারা যদি একথা না বলতো, তাহলে হয়তো আমি বিয়েই করতাম না। কিন্তু তাদের ব্যবস্থাপত্র আমাকে প্ররোচিত করলো। আমি বললাম, "তাহলে একথা কেন ভাবছেন যে বিয়ে করবো, অথচ সন্তান নিতে পারবো না। আমি শুনতে চাই না যে, আমার সন্তান হতে পারবে না। আমাকে বলুন সন্তান পাওয়ার জন্য আমাকে কি করতে হবে।" তারা কাঁধ ঝাঁকাল এবং মত ব্যক্ত করলো যে, এজন্য আমাকে কিছু ওজন বাড়াতে হবে। এত শুকনো অবস্থায় আমার পক্ষে কখনো গর্ভ টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না। আমি ওজন বাড়াতে থাকলাম। কডলিভার অয়েল খাওয়া শুরু করলাম। খাবার পরিমাণ দ্বিগুণ হলো। এক আউন্স ওজনও বাড়লো না। এরপর আমি স্বাস্থ্য নিবাস মুসুরীতে গেলাম এবং ডাক্তারদের নির্দেশ অগ্রাহ্য করলাম। নিজস্ব পদ্ধতি পালন করে আমার ওজন বাড়লো। অথচ এখন উল্টো করতে হচ্ছে। এখন শুকনো থাকাটাই সমস্যা হয়ে গেছে। কিন্তু আমার পক্ষে ম্যানেজ করা অসম্ভব হয় না। আমি খুব দৃঢ়চিত্তের লোক।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ হ্যাঁ আমি তা উপলব্ধি করেছি এবং আপনি বিয়ে করে আপনার দৃঢ়তা প্রদর্শন করেছেন।

ইন্দিরা গান্ধীঃ বাস্তবিক তাই। কেউ সে বিয়ে চায়নি। কেউ না। মহাত্মা গান্ধীও এতে সুখী হননি। আমার পিতা এই বিয়ের বিরোধিতা করেছিলেন, একথা সত্য নয়, তিনি খুব আগ্রহ দেখাননি। আমার মনে হয় যে সব পিতার মেয়ে একটাই তারা চান মেয়ের বিয়ে একটু দেরীতে হোক। যাহোক, আমার প্রেমিক ভিন্ন ধর্মাবলম্বী ছিলেন। তিনি একজন পার্সী। এটা কেউ সহ্য করতে পারেনি- গোটা ভারত আমাদের বিরুদ্ধে ছিল। তারা মহাত্মার কাছে, আমার পিতার কাছে লিখেছে। অপমান করেছে। হত্যার হুমকি দিয়েছে। প্রতিদিন ডাকপিয়ন আসতো বিরাট একটা বস্তা নিয়ে এবং মেঝের উপর চিঠির স্তূপটা রাখতো। আমরা চিঠি পড়াও বাদ দিয়েছিলাম। আমরা কিছু বন্ধুকে সেগুলো পড়ে আমাদের জানাতে বলতাম- "একজন তোমাকে টুকরো টুকরো করে কাটতে চেয়েছে। একজন তার স্ত্রী থাকার পরও তোমাকে বিয়ে করতে চেয়েছে কারণ সে হিন্দু।" এক পর্যায়ে মাহাত্মা গান্ধী এই বিতর্কে অংশ

নিলেন- তার পত্রিকায় এ ব্যাপারে একটা নিবন্ধ দেখেছিলাম তাতে তিনি লোকজনের প্রতি আবেদন জানিয়েছেন তাকে শান্তিতে থাকতে দেয়ার জন্য এবং সংকীর্ণ মানসিকতা পরিহার করার জন্য। এ সবের মধ্যে আমি ফিরোজ গান্ধীকে বিয়ে করলাম। আমার মাথায় একবার কিছু ঢুকলে দুনিয়ার কেউই তা আর বদলাতে পারবে না।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ আশা করি আপনার পুত্র রাজীব গান্ধী একজন ইতালীয় মেয়েকে বিয়ে করার কারণে সে ধরনের কিছু ঘটেনি?

ইন্দিরা গান্ধীঃ সময় বদলেছে। আমাকে যে ক্রোধ অতিক্রম করতে হয়েছে ওদের তা হয়নি। ১৯৬৫ সালে রাজীব লণ্ডন থেকে আমাকে লিখলো, "তুমি সবসময় আমাকে মেয়ের ব্যাপারে বলতে যে আমার কোন বিশেষ মেয়ে আছে কি না, ইত্যাদি। আমি একটি বিশেষ মেয়ের দেখা পেয়েছি। আমি তাকে প্রস্তাব দেইনি। কিন্তু এই সে মেয়ে, আমি যাকে বিয়ে করতে চাই।' এক বছর পর আমি যখন লণ্ডন গেলাম, মেয়েটির সাথে দেখা হলো। রাজীব ভারতে ফিরে এলে তাকে বললাম, "তুমি কি এখনো আগের মতোই মেয়েটিকে নিয়ে চিন্তা করো?" রাজীব হ্যাঁ বললো। কিন্তু একুশ বছর না হওয়া পর্যন্ত সে মেয়ে বিয়ে করতে পারবে না এবং যে পর্যন্ত না সে নিশ্চিত হয় যে সে ভারতে বাস করতে পারবে। আমরা তার একুশ বছর পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। সে ভারতে এলো এবং বললো ভারতকে তার ভালো লেগেছে। আমরা বিয়ের পাকা কথা ঘোষণা করলাম। দু'মাস পর তারা স্বামী- স্ত্রী হলো। সোনিয়া এখন পুরোপুরি ভারতীয় হয়ে গেছে, যদিও সে সবসময় শাড়ি পরে না। আমিও সবসময় শাড়ি পরিনা। আমি যখন লণ্ডনে ছাত্রী ছিলাম, কখনো কখনো পাশ্চাত্যের পোশাক পরতাম। ঠাকুর মা হওয়ার খুব সখ ছিল আমার এবং দু'জনের ঠাকুরমা আমি। রাজীব ও সোনিয়ার এক ছেলে ও এক মেয়ে।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ আপনার স্বামী বেশ ক'বছর পূর্বে গত হয়েছেন। আপনি কি কখনো পুনরায় বিয়ের কথা ভেবেছেন?

ইন্দিরা গান্ধীঃ না, কারো সাথে বসবাস করতে ভালো লাগবে এমন কারো সাথে যদি দেখা হতো, তাহলে হয়তো সমস্যাটার কথা ভাবা যেতো। কিন্তু তেমন কারো দেখা পাইনি আমি। আমি সুনিশ্চিত যে, আমি আর বিয়ে করবো না। আমি কেন আবার বিয়ে করবো, আমার জীবনতো পরিপূর্ণ। এ প্রশ্নই উঠে না।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ তাছাড়া, আমি আপনাকে একজন গৃহবধূ হিসেবে কল্পনা করতেই পারি না।

ইন্দিরা গান্ধীঃ তোমার ধারণা ভুল। আমি একজন খাঁটি গৃহবধূ। মা হওয়ার কারণে যে সব কাজ তা আমি সবসময় পছন্দ করতাম। মা হতে, গৃহবধূ হতে আমাকে কোন ত্যাগ করতে হয়নি। আমার ছেলেদের প্রতি ভালোবাসা বাড়াবাড়ি গোছের এবং আমার মনে হয় ওদের লালন পালন করে এক বিরাট দায়িত্ব পালন করেছি। এখন দু'জনই ভালো এবং দক্ষ মানুষ। আমি অনেক মেয়ে মামুষকে বুঝতে পারি না, যারা তাদের সন্তানদের কারণে নিজেদের অসহায় মনে করে না। তোমার সময়কে যদি গুছিয়ে নিতে পারো বুদ্ধিমত্তার সাথে তাহলে দুটো দিকের সমন্বয় সাধন খুব কঠিন নয়। আমার ছেলেরা যখন ছোট ছিল, তখনো আমি কাজ করেছি। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল ফর চাইল্ড ওয়েল ফেয়ারের একজন কর্মী ছিলাম আমি। একটা ঘটনা বলি তোমাকে। রাজীবের বয়স যখন মোটে চার বছর এবং কিণ্ডার গার্টেনে যাচ্ছিল তখন ওর এক ছোট্ট বন্ধুর মা আমাদের সাথে দেখা করতে এসে বললো, "এটা খুব দুঃখের ব্যাপার যে, ছোট্ট ছেলেটির সাথে কাটাবার মতো সময় আপনার নেই।" রাজীব সিংহের মতো গর্জে উঠলো, "আপনি আপনার ছেলের সাথে যতটা সময় কাটান, আমার মা তার চেয়ে অনেক বেশি সময়কাটান আমার সাথে। আপনার ছেলে তা বলে যে আপনি ওকে সবসময় একা রেখে ব্রিজ খেলতে যান।" যে নারী কিছু না করে বিব্রজ খেলে তাকে আমার পছন্দ নয়।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ তাহলে আপনার জীবনে দীর্ঘ একটা সময় ছিল যখন আপনি রাজনীতির বাইরে ছিলেন। আপনি কি তা বিশ্বাস করেন না?

ইন্দিরা গান্ধীঃ রাজনীতি..... দেখো, এটা নির্ভর করে কোন ধরনের রাজনীতি। আমার পিতার সময়ে আমরা যা করেছি সে ছিল কর্তব্য। এর লক্ষ্য ছিল স্বাধীনতা অর্জন। আমরা এখন যা করছি, তুমি মনে করো না যে, আমি এ ধরনের রাজনীতিতে উৎসাহী। আমার ছেলেদের এই রাজনীতির বাইরে রাখতে আমি সবকিছু করেছি এবং সফলও হয়েছি। স্বাধীনতার পর আমি রাজনীতি থেকে অবসর নিয়েছিলাম। আমার ছেলেদের প্রয়োজন ছিল আমাকে সমাজসেবী হিসেবে কাজ করতে আমি পছন্দ করতাম। যখন এটা আমার কাছে সুস্পষ্ট হলো যে আমার পার্টি ঠিকভাবে চলছে না, তখনই আমি রাজনীতিতে ফিরে আসার সিদ্ধান্ত নিলাম। আমি যুক্তি খুঁজতাম।আমার পিতার সাথে এবং সবার সাথে, যাদেরকে আমি শৈশব থেকে জানতাম।

১৯৫৫ সালের একদিন নেতাদের একজন অবাক হয়ে আমাকে বললেন, "তুমি তো সমালোচনা " ছাড়া আর কিছুই করছো না। তুমি যদি ভুল শোধরাতে পারো, তাহলে শোধরাও। " আমি কখনো চ্যালেঞ্জ উপেক্ষা করতে পারি না। অতএব আমি প্রচেষ্টা চালালাম। কিন্তু আমার মনে হলো এটা সামরিক এবং আমার পিতা, যিনি আমাকে তার কাজে জড়িত করার চেষ্টা করেননি, তিনিও আমার মতো অভিন্ন চিন্তা করতেন। লোকজন বলাবলি করতো, আমার পিতা আমাকে প্রধানমন্ত্রী পদের জন্যে প্রস্তুত করছেন। তিনি যখন আমাকে সাহায্য করতে বললেন, আমি তার পরিণতি সম্পর্কে ভাবিনি।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ সবকিছু তাহলে তার কারণেই শুরু হয়েছিল ?

ইন্দিরা গান্ধীঃ তা তো বটেই। তিনি ছিলেন প্রধানমন্ত্রী এবং তার বাড়ির দায়িত্ব পালন করা, তার সেবা করার মানেই রাজনীতিতে আমার হাত পড়া। সরাসরি অভিজ্ঞতার ফাঁদে আটকে যাওয়াও বুঝায়। ১৯৫৭ সালের এক সপ্তাহান্তে আমার পিতাকে উত্তরে যেতে হয়েছিল এক সমাবেশে। তার সাথে গিয়েছিলাম আমি বরাবরের মতো। আমরা চাম্বায় পৌঁছে দেখলাম আমাদের সময়সূচীর দায়িত্বে যে ভদ্রমহিলা তিনি ভিন্ন একস্থানে পৃথক একটা বৈঠকের ব্যবস্থা রেখেছেন। আমার পিতা যদি চাম্বার সমাবেশ বাদ দেন তাহলে আমরা চাম্বার নির্বাচনে হেরে যাবো। পাঠানকোটের কাছে অন্য এক শহরের সমাবেশ বাদ দিলে সেখানে আমরা হারবো। পরামর্শ দিলাম, "যদি আমি গিয়ে বলি যে, একই সময়ে দুটো জায়গায় বক্তৃতা দেয়া সম্ভব নয়। : তিনি উত্তর দিলেন যে, এটা অসম্ভব। আমাকে খারাপ রাস্তা দিয়ে তিনশ' মাইল যেতে হবে এবং এখন রাত ২টা। শুভরাত্রি বলে বিছানায় এলাম। ধারণাটা আমার কাছে ভালো লাগছিল। ভোর সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে জেগে দরজার নিচে একটা নোট দেখলাম। এতে বলা হয়েছে, "একটা বিমান তোমাকে পাঠানকোট নিয়ে যাবে। সেখান থেকে গাড়িতে তিন ঘণ্টা। যথাসময়েই তুমি পৌছবে।" যথাসময়ে পৌঁছে আমি সমাবেশে যোগ দিলাম। এটা সফল হল এবং আমাকে আরো সমাবেশের জন্যে ডাকা হলো। সেই ছিল সূচনা.....।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ আপনি কি তখন বিবাহিতা ছিলেন, নাকি ইতোমধ্যে বিচ্ছেদ ঘটেছিল ?

ইন্দিরা গান্ধীঃ আমি সব সময় বিবাহিতা অবস্থায়ই ছিলাম। সব সময়.....তার মৃত্যু পর্যন্ত। আমাদের বিচ্ছেদ হয়েছিল- এটা ঠিক নয়। আমার স্বামী থাকতেন লক্ষ্ণৌতে এবং পিতা থাকতেন দিল্লীতে। আমাকে

দিল্লী- লক্ষ্ণৌ দৌড়াতে হতো.... দিল্লীতে থাকতে আমার স্বামীর যখন প্রয়োজন হতো আমি তখন লক্ষ্ণৌ ছুটতাম। আমি লক্ষ্ণৌ থাকলে আমার পিতার যখন আমাকে প্রয়োজন হতো ছুটে আসতাম দিল্লীতে। না, এটা খুব স্বাভাবিক পরিস্থিতি ছিল না। দিল্লী ও লক্ষ্ণৌর মধ্যে বেশ দূরত্ব। হ্যাঁ, আমার স্বামী রাগ করতেন এবং ঝগড়া করতেন। আমরা উভয়ে ঝগড়া করতাম। বহু ঝগড়া করেছি আমরা- একথা সত্য। আমরা উভয়ে সমানভাবে কঠোর লোক ছিলাম- কেউ হারতে চাইতাম না। আমার মনে হয় ঝগড়া করে ভালোই হয়েছে, আমার জীবন প্রাণবন্ত হয়েছে। ঝগড়া ছাড়া আমাদের জীবনটা হতো স্বাভাবিক, একঘেঁয়ে ও বিরক্তিকর। আমাদের বিয়েটা তো চাপিয়ে দেয়া ছিল না, আমাকে সে পছন্দ করেছিল- আমি বলতে চাই, সেই আমাকে পছন্দ করেছিল, আমি করিনি। আমি জানি না বিয়ের কথা হওয়ার পর আমি ওর চেয়ে বেশি ভালোবেসেছিলাম কিনা? পরে আমার মধ্যে ভালোবাসা বৃদ্ধি পেয়েছে।

আমার পিতার জামাতা হওয়া তার পক্ষে সহজ ছিল না। কারো পক্ষেই তা সহজ ছিল না। এটা ভুললে চলবে না সেও পার্লামেন্টে ডেপুটি ছিল। এক সময় সে সিদ্ধান্ত নিলো যে লক্ষ্ণৌ ছেড়ে দিল্লিতে থাকবে, আমার পিতার বাড়িতে। কিন্তু পার্লামেন্টের ডেপুটি হয়ে সে প্রধানমন্ত্রীর বাড়িতে কি করে লোকজনের সাথে সাক্ষাৎ করবে ? খুব সহজে বুঝলো ব্যাপারটা এবং একটা ছোট্ট বাড়ি নিলো। খুব ভালো বাড়ি নয়। জীবন তার জন্যে খুব সহজ ছিল না।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ আপনি কি কখনো অনুতাপ করেছেন, দুঃখ করেছেন ? কিংবা ভয়?

ইন্দিরা গান্ধীঃ না, কখনো না। যে কোন ভয় আসলে সময়ের অপচয়, দুঃখবোধের মতোই। আমি যা কিছু করেছি, আমার ইচ্ছায় করেছি। যখন ছোট ছিলাম, বৃটিশের বিরুদ্ধে লড়েছি মাংকি ব্রিগ্রেডে অথবা যখন বালিকা ছিলাম, সন্তান চেয়েছি এবং নারী হিসেবে যখন পিতার সেবা করেছি কিংবা স্বামীকে যখন ক্রোধান্বিত করেছি- আমি সব সময় একটা বিশ্বাস থেকেই করেছি। যখন কোন সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তখন পরিণতিও মেনে নিয়েছি। এমনকি দেশের সাথে জড়িত নয়, সেক্ষেত্রেও একই ভূমিকা আমার। আমার মনে পড়ে, জাপান যখন চীনে অভিযান চালায় তখন আমি কেমন ক্রুদ্ধ হয়েছিলাম। আমি শীঘ্রই একটি কমিটিতে যোগ দিয়ে অর্থ ও ঔষধপত্র সংগ্রহ শুরু করি এবং একটি আন্তর্জাতিক ব্রিগ্রেডের জন্য স্বাক্ষর করি।

জাপানের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাই। আমার মতো একজন লোকের প্রথমে ভীতি ও পরে অনুতাপের কারণ থাকে না।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ তাছাড়া আপনি ভুল করেননি। অনেকে বলে যুদ্ধ জয়ের পর কেউ আপনার বিরুদ্ধাচরণ করতো না এবং আপনি কমপক্ষে কুড়ি বছর ক্ষমতায় থাকবেন।

ইন্দিরা গান্ধীঃ আমি কতদিন থাকবো এ সম্পর্কে আমার বিন্দুমাত্র ধারণা নেই। এটা জানারও কোন আগ্রহ নেই। আমি প্রধানমন্ত্রী থাকবো কিনা, তাও তোয়াক্কা করি না। আমি সব সময় ভালো কাজ করতে আগ্রহী, যতদিন আমি ক্লান্ত না হই। আমি ক্লান্ত নই। কাজ মানুষকে ক্লান্ত করে না। কোন কিছুই চিরদিন টিকে না। কেউ বলতেও পারে না সুদূর বা নিকট ভবিষ্যতে আমার কি ঘটবে। আমি উচ্চাভিলাষী নই। একটুও না। আমি জানি, আমার এসব কথায় মানুষ অবাক হয়। কিন্তু এটাই সত্য। সম্মান কখনো আমাকে উত্তেজিত করে না।

প্রধানমন্ত্রীর কাজ আমি অবশ্যই পছন্দ করি। কিন্তু একজন বয়স্ক মানুষ হিসেবে আমার যা করার তার চেয়ে বেশি পছন্দ করি না। কিছু দিন আগে আমি বলেছিলাম, আমার পিতা রাজনীতিবিদ ছিলেন না। বরং আমি নিজেকে মনে করি রাজনীতিবিদ। রাজনৈতিক জীবন শুরু করতে আমার আগ্রহ ছিল না। আমি আমার স্বপ্নের ভারত গড়তেই আজ রাজনীতিতে। আমি যে ভারত চাই তা অতো দরিদ্র নয় এবং বিদেশী প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। যদি আমার মনে হয় দেশটা সেই লক্ষ্যেই অগ্রসর হচ্ছে, তাহলে আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব এবং প্রধানমন্ত্রীত্ব থেকে অবসর নেব।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ কি করবেন?

ইন্দিরা গান্ধীঃ যে কোন কাজ। তোমাকে বলেছি যে কাজ আমি করি, সেটা আমি ভালোবাসি এবং চেষ্টা করি ভালো করতে। প্রধানমন্ত্রী হওয়া জীবনের একমাত্র কাজ নয়। আমি একটা গ্রামে বাস করেও সন্তুষ্ট থাকতে পারি। যখন আমাকে দেশ পরিচালনা করতে হবে না, তখন আমি শিশুদের পরিচর্যা করবো। অথবা আমি নৃতত্ত্বে পড়াশুনা করবো। অথবা অক্সফোর্ড গিয়ে ইতিহাস পড়বো, যেখান থেকে আমি ইতিহাসের ডিগ্রি নিয়েছি। অথবা....আমি জানি না, উপজাতীয় সম্প্রদায় সম্পর্কে আমার যথেষ্ট আগ্রাহ। হয়তো তাদের সাথে ব্যস্ত থাকবো।

শোন, আমার জীবনটা নিশ্চয়ই শূন্য থাকবে না। ভবিষ্যত আমাকে ভীত করে না, যদি তা অন্যান্য সমস্যায় সংকুলও থাকে। ব্যক্তির, দেশের

সমস্যা থাকেই। ব্যাপার হলো, তা মেনে নেয়া সম্ভব হলে সমস্যা দূর করা অথবা সমস্যার মধ্যেই কাটানো। লড়াই করা সম্ভব হলে ভালো, অসম্ভব হলে আপোষ করাই উত্তম। যে সব লোক অভিযোগ করে তারা স্বার্থপর। তরূণ বয়সে আমি খুব স্বার্থপর ছিলাম। কিন্তু এখন আমি আর তা নই। অবাঞ্ছিত বিষয় এখন আর আমাকে বিরক্ত করে না। আমি জীবনের সাথে সব সময় সমঝোতায় আসতে চাই।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ আপনি কি একজন সুখী নারী মিসেস গান্ধী?

ইন্দিরা গান্ধীঃ আমি জানি না। সুখ এমন এক ধরনের চলমান অনুভব।- নিস্তরঙ্গ বা বাধাহীন সুখ বলে কিছু নেই। সুখ হলো মুহূর্তের অনুভব। তৃপ্তি থেকে সুখ। সুখ দ্বারা যদি তুমি সাধারণ পরিতৃপ্তি বুঝাতে চাও তাহলে খুব বেশী সুখী নই। সন্তুষ্ট নই- তবে তৃপ্ত। আমার দেশের জন্যে আমি কখনো সন্তুষ্ট হতে পারবো না। সেজন্যে আমি বিপদসংকুল পথই বেছে নেই। একটি পাকা রাস্তা ও পার্বত্য পথে চলার মধ্যে আমি পায়ে চলা পথই বেছে নেই। আমার দেহরক্ষীরা তা পছন্দ করে না।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ ধন্যবাদ মিসেস গান্ধী।

ইন্দিরা গান্ধীঃ তোমাকেও ধন্যবাদ এবং শুভেচ্ছা। সব সময় আমি যা বলি, তোমার জন্যে খুব সহজ সময় আশা করি না। কিন্তু তোমার যে অসুবিধাই থাকুক, আশা করি তুমি তা সমাধান করবে। (নয়াদিল্লী, ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২)

পরিশিষ্ট- ১২
জুলফিকার আলী ভূট্টো

চমকে দেয়ার মতো আমন্ত্রণ। এসেছিল জুলফিকার আলী ভূট্টোর তরফ হতে এবং বুঝে উঠার কোন উপায় ছিল না। আমাকে বলা হলো যত শীঘ্র সম্ভব আমাকে রাওয়ালপিণ্ডি যেতে হবে। অবাক হলাম, কেন? প্রত্যেকটা সাংবাদিক কমপক্ষে একবার তাদের দ্বারা আহূত হবার স্বপ্ন দেখে যাদেরকে তারা অনুসন্ধান করবে। সেই ব্যক্তিত্বগুলো হারিয়ে যায় বা নেতিবাচক সাড়া দেয়। কিন্তু স্বপ্ন যুক্তিহীন এবং সন্দেহে তার পরিসমাপ্তি। ভূট্টো কেন আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে চেয়েছেন। ইন্দিরা গান্ধীর জন্যে কি আমার কাছে বার্তা দিতে চান? ইন্দিরা গান্ধীকে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতির সাথে চিত্রিত করার কারণে আমাকে শাস্তি দেবেন? প্রথম ধারণা দ্রুত নাকচ করলাম। শত্রুর সাথে যোগাযোগ করার জন্যে তার বাহকের প্রয়োজন নেই- এজন্যে সুইস বা রুশ কূটনীতিক আছেন। দ্বিতীয় ধারণাও বাতিল করে দিলাম। শিক্ষিত ও ভদ্রলোক বলে ভূট্টোর সুনাম আছে। এ ধরনের লোকেরা সাধারণত তাদের আমন্ত্রিত অতিথিকে হত্যা করে না। আমার তৃতীয় অনুমানটা হলো, তিনি হয়তো চান আমি তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। আমার হৃদয় চমৎকারিত্বে পূর্ণ হলো। বাংলাদেশের হতভাগ্য প্রেসিডেন্ট মুজিবুর রহমান সম্পর্কে আমার নিবন্ধ পাঠের পরই ভূট্টোর মনে হয়তো বিষয়টা উদয় হয়েছিল। আমার সন্দেহের উপর বিজয়ী হলো আমার অনুসন্ধিৎসা এবং আমি আমন্ত্রণ গ্রহণের সিদ্ধান্ত নিলাম। আমন্ত্রণ গ্রহণ করেও তাকে জানতে দিলাম যে, তার অতিথি হলেও আমি সবার ক্ষেত্রে যে স্বাধীন বিচার বিবেচনায় লিখি, এক্ষেত্রেও তার কোন হেরফের হবে না এবং যে কোন ধরনের সৌজন্য বা তোষামোদে আমাকে কিনে ফেলা সম্ভব হবে না। ভূট্টো জবাব দিলেন : অবশ্যই, তাই হবে। এবং মানুষটি সম্পর্কে আমার প্রথম ধারণা হলো তাতেই।

এ মানুষটি সম্পর্কে পূর্ব ধারণা করা যায় না। অসম্ভব গোছের। নিজের মর্জিতে এবং অদ্ভূত সিদ্ধান্তে পরিচালিত হন। তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমান। ধূর্ত শিয়ালের মতো বুদ্ধিমান। মানুষকে মুগ্ধ করতে, বিভ্রান্ত করতেই যেন তার জন্ম। সংস্কৃতি, স্মরণশক্তি ও ঔজ্জ্বল্য দ্বারা লালিত তিনি। শহুরে আভিজাত্য তার জন্মাবধি। রাওয়ালপিণ্ডি বিমানবন্দরে দু'জন সরকারী অফিসার আমাকে স্বাগত জানিয়ে অত্যন্ত আবেগের সাথে বললেন যে, প্রেসিডেন্ট

আমাকে এক ঘণ্টার মধ্যে স্বাগত জানাবেন। তখন সকাল দশটা। গত আটচল্লিশ ঘণ্টা আমি বিনিদ্র কাটিয়েছি। আমি প্রতিবাদ করলাম; না এক ঘণ্টার মধ্যে নয়। আমার একটা ভালো গোসল এবং সুনিদ্রা প্রয়োজন। অন্য কারো কাছে এটা খুব অপমানজনক মনে হতো। তার কাছে নয়। তিনি সন্ধ্যা সাতটা পর্যন্ত সাক্ষাৎ মূলতুবী রাখলেন এই বলে যে, রাতে আহারটা আমার সাথেই করবেন বলে আশা করছেন। বুদ্ধিমত্তার সাথে সৌজন্য যোগ হলে তা অবদমনের সেরা অস্ত্র হয়ে দাঁড়ায়। এটা অনিবার্যই যে তার সাথে সাক্ষাৎ আন্তরিকতাপূর্ণ হবে।

ভূট্টো আমাকে অভ্যর্থনা জানালেন হাসি ছড়িয়ে খোলা হাত বাড়িয়ে। তিনি দীর্ঘ, মেদবহুল। তাকে দেখতে একজন ব্যাংকারের মতো, যে কাউকে পেতে চায় তার ব্যাংক একাউন্ট খোলার জন্যে। চুয়াল্লিশ বছর বয়সের চেয়েও অধিক বয়স্ক মনে হয় তাকে। তার টাক পড়ছে এবং অবশিষ্ট চুল পাকা। ঘন ভুরুর নিচে তার মুখটা বিরাট। ভারী গাল, ভারী ঠোঁট, ভারী চোখের পাতা। তার- দু'চোখে রহস্যজনক দুঃখময়তা। হাসিতে কিছু একটা লাজুকতা।

বহু ক্ষমতাধর নেতার মত লাজুকতায় তিনি দুর্বল ও পঙ্গু। তিনি আরো অনেক কিছু, ইন্দিরা গান্ধীর মতো। সবারই নিজের মধ্যে দ্বন্দ্ব। যতই তাকে পাঠ করা হোক, ততই অনিশ্চিত হতে হবে। দ্বিধায় পড়তে হবে। একটু ঘুরালে ফিরালে প্রিজমে যেমন একই বস্তু বিভিন্ন রূপে দেখা যায়, তিনি সেরকম। অতএব তাকে বহুভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। এবং তার প্রতিটিই যথার্থ উদার, কর্তৃত্ববাদী, ফ্যাসিস্ট, কম্যুনিস্ট, নিষ্ঠাবান ও মিথ্যুক। নিঃসন্দেহে তিনি সমসাময়িককালের সবচেয়ে জটিল নেতাদের একজন এবং তার দেশে এযাবত জন্মগ্রহণকারী নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে আকর্ষণীয়। শুধুই একজন। যে কেউ বলবে, ভূট্টোর কোন বিকল্প নেই। ভূট্টো মরলে পাকিস্তান মানচিত্র হতে মুছে যাবে।

তার ব্যক্তিত্ব ইন্দিরা গান্ধীর চেয়ে বাদশাহ হোসেনকেই বেশি মনে করিয়ে দেবে। বাদশাহ হোসেনের মতো তিনি কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট একটি দেশকে পরিচালনা করছেন বলে অভিযোগ উঠে। বাদশাহ হোসেনের মতো তিনি মাটির পাত্র হিসেবে লৌহপাত্র দ্বারা, অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়ন, ভারত, চীন, যুক্তরাষ্ট্রের মত দেশ দ্বারা দলিত মথিত। বাদশাহ হোসেনের মতো তিনি আত্মসমর্পণ না করতে বা কোন কিছু ছেড়ে না দিতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। কোন প্রতিরক্ষা ব্যূহ ছাড়াই বন্দী শিল্পীর মতো সাহসিকতার সাথে তিনি

সবকিছু প্রতিরোধ করেন। অন্যভাবে তাকে দেখে জন কেনেডির কথা মনে পড়বে। কেনেডির মতো তিন প্রাচুর্যের মধ্যে বড় হয়েছেন, সে কারণে তার কাছে কিছুই অসম্ভব ছিল না। এমনকি রাজনৈতিক ক্ষমতাকে বিজয় করাও নয়। এজন্যে ব্যয় যাই হোক না কেন। কেনেডির মতো তার একটি স্বচ্ছন্দ, মধুর ও সুবিধাভোগের শৈশব ছিল। কেনেডির মতো ক্ষমার দিকে তার যাত্রা শুরু হয়েছিল জীবনের প্রারম্ভেই।

অভিজাত জমিদার পরিবারে তার জন্ম। তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ইউনির্ভাসিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া- বার্কেলীতে এবং পরে বৃটেনে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেন। তিনি ডিগ্রি নিয়েছেন আন্তর্জাতিক আইনে। ত্রিশ বছর বয়সের পরই তিনি আইয়ুব খানের একজন মন্ত্রী হন, যদিও পরে তাকে অপছন্দ করেন। যখন তার বয়স চল্লিশের কিছু কম তখন আগা মোহাম্মদ ইয়াহিয়া খানের মন্ত্রীদের একজন ছিলেন। বেদনাদায়ক ধৈর্যের সাথে তিনি প্রেসিডেন্ট পদ পর্যন্ত পৌঁছেন। কিছু সহযোগীর দ্বারা এ পর্যন্ত আরোহণকে তিনি নিষ্কণ্টক রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ক্ষমতা প্রেমের চেয়েও অনেক বেশি আবেগের বস্তু। যার ক্ষমতা ভালোবাসা তাদের পেট শক্ত, নাকটা আরো শক্ত। বদনামে তাদের কিছু আসে যায় না। ভূট্টোও বদনামের তোয়াক্কা করতেন না। তিনি ক্ষমতা ভালোবাসেন এ ধরনের ক্ষমতার প্রকৃতি আন্দাজ করা শক্ত। ক্ষমতা যে তার কাছে কি তা বুঝা যায় না। যারা সত্য বলে এবং বয়স্কাউট সুলভ নৈতিকতা প্রদর্শন করে এমন রাজনীতিবিদদের থেকে সতর্ক থাকার উপদেশ দেন তিন। তার কথা শুনে এ বিশ্বাস হবে যে তার লক্ষ্য অত্যন্ত মহৎ এবং তিনি সত্যি সত্যি একনিষ্ঠ ও নিঃস্বার্থ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চান। কিন্তু করাচীতে তার সমৃদ্ধ জাঁকজমকপূর্ণ লাইব্রেরী দেখলেই বুঝা যাবে যে, মুসোলিনী ও হিটলার সম্পর্কিত গ্রন্থাবলী সম্মানের সাথে রূপালী বাঁধাই এ সমৃদ্ধ। যে যত্নের সাথে এগুলো সংরক্ষিত তাতে উপলব্ধি করার সহজ যে এগুলোর উপস্থিতি শুধু গ্রন্থ সংগ্রাহকের আগ্রহের কারণেই নয়। সন্দেহ ও ক্রোধ দানা বেঁধে উঠবে। তাকে জিজ্ঞেস করলেই জানা যাবে, তার সত্যিকার বন্ধু ছিলেন সুকর্ণ ও নাসের- এই দুই ব্যক্তিই সম্ভবত সদিচ্ছা দ্বারা পরিচালিত হয়েছিলেন, কিন্তু তারা উদারনৈতিক ছিলেন না। ভূট্টোর গোপন স্বপ্ন একনায়ক হওয়া। রূপালী বাঁধাই এর গ্রন্থগুলো থেকেই তিনি কি একদিন তার জ্ঞান আহরণ করবেন ? স্বাধীনতা, গণতন্ত্র এবং বিরোধীদলের কোন রাজনৈতিক অর্থ কখনো ছিল না- এমন একটি দেশ সম্পর্কে অজ্ঞ

পাশ্চাত্যের লোকেরাই এধরনের প্রশ্ন করে থাকেন। এ সবের বদলে সে দেশে বিরাজ করেছে দারিদ্র্য, অবিচার এবং নিপীড়ন।

ভূট্টোর সঙ্গে সাক্ষাৎকার সমাপ্ত হয়েছে ছয় দিনে পাঁচটি পৃথক বৈঠকে। তার অতিথি হিসেবে তার সাথে কয়েকটি প্রদেশও সফর করেছি এ সময়ে। পাঁচটি বৈঠকে আলাপের সূত্রও হয়েছে কিছুটা বিচ্ছিন্ন। প্রথম সাক্ষাৎকার বৈঠক হয় রাওয়ালপিণ্ডিতে, আমার উপস্থিতির দিন সন্ধ্যায়। দ্বিতীয় আলোচনা লাহোরের পথে বিমানে। তৃতীয় বৈঠক সিন্ধুর হালা শহরে। চতুর্থ এবং পঞ্চম বৈঠক করাচীতে। আমি সবসময় তার পাশে বসেছি, টেবিলেই হোক আর যাত্রাপথেই হোক এবং চাইলে আমি তার একটা চিত্রও আঁকাতে পারতাম। ভূট্টোকে অধিকাংশ সময়ই দেখেছি পাকিস্তানী পোশাকে, হালকা সবুজ জামা এবং স্যাণ্ডেল পায়ে। সমাবেশে বক্তৃতার সময় মাইক্রোফোনের সামনে তিনি কর্কশভাবে চিৎকার করেন, প্রথমে উর্দু পরে সিন্ধীতে। বক্তৃতার সময় দু'হাত আকাশে ছুঁড়তে থাকেন। সবকিছুর মাঝে প্রকাশ করেন তার কর্তৃত্ব। হালার জনসমাবেশে অসংখ্য লোক যখন তার কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করছে, শহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গও সেখানে। কিন্তু তিনি কক্ষে বসে লিখছেন। যখন সভাস্থলে পৌঁছলেন তখন রাত। কার্পেটের উপর দিয়ে রাজপুত্রের মতো পা ফেলে তিনি এগিয়ে মঞ্চে উঠলেন। রাজপুত্রের মতই আসন গ্রহণ করলেন এবং আমিও তার পাশে বসলাম- বেশ কিছু গোঁফওয়ালা লোকের পাশে আমিই একমাত্র মহিলা, যেন সুপরিকল্পিত একটা প্ররোচণা। আসনে বসে তিনি দলের নেতাদের, অভ্যর্থনা জানালেন। সবশেষে একজন দরিদ্র লোক, তার সাথে নিয়ে এলো রঙ্গিন কাপড় ও মালায় সজ্জিত একটি বকরী। এটি তার সম্মানে কোরবাণী করা হবে।

ইনিই হচ্ছেন আভিজাত্যের প্রতীক জুলফিকার আলী ভূট্টো। মুসলমান ভূট্টো, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি যাকে মৌলিকভাবে বদলাতে পারেনি। এটা কোন দুর্ঘটনা নয় যে, তার স্ত্রী দু'জন। অথবা ভূট্টো যখন সামরিক হেলিকপ্টারে উঠে কোথাও যান, তখন তার মাথায় একটা ক্যাপ থাকে- চৌ এন লাইএর দেয়া। চৌ এন লাই তার দীক্ষাগুরু। যখন উড়ে যান তখন উপরে থেকে শুষ্ক অনাবাদী জমি দেখে, প্রাগৈতিহাসিক আমলের মতো মাটির কুড়েতে কৃষকের আবাস দেখে তার চোখ অশ্রুসিক্ত হয়। এসব দেখে তার হাত মুষ্ঠিবদ্ধ হয়, তিনি স্বগতোক্তি করেন, "আমাকে সফল হতেই হবে।" ইনি মার্ক্সবাদী ভূট্টো, যিনি পাকিস্তানকে দারিদ্র্য ও ক্ষুধার পীড়ন হতে

মুক্তি দিতে সচেষ্ট। সবশেষে ভূট্টো আমাকে তার করাচী ও রাওয়ালপিণ্ডির বাড়িতে আমন্ত্রণ করে তার অবস্থানের পক্ষে যুক্তিগুলো প্রদর্শন করেন- ইন্দিরা গান্ধী, শেখ মুজিব ও ইয়াহিয়া খানকে কঠোরভাবে আক্রমণ করে। তার বাড়িগুলো রুচিশীল সাজে সজ্জিত- প্রাচীন ইরানী গালিচা, মূল্যবান ধাতব পাত্রের সমাহার। শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত বাড়ির প্রাচীরে তার সবচেয়ে ক্ষমতাধর আন্তর্জাতিক সহকর্মীদের উদ্ধৃতি সম্বলিত ফটোগ্রাফ। শুরু হয়েছে মাও সে তুং দিয়ে। নৈশাহারের সময় আমরা মদ পান করলাম। সম্ভবত ক্যাভিয়ার। উপস্থিত ছিলেন তার দ্বিতীয় স্ত্রী নুসরাত, সুন্দরী এবং ভদ্র আচরণ তার। পরে এলো তার ছেলে। দীর্ঘ চুলবিশিষ্ট প্রাণবন্ত ছোট্ট বালক। এখন ভূট্টো আধুনিক, ধোপদুরস্ত, ইউরোপীয় কেতায়। ভূট্টো তুখোড় বক্তা, গ্রন্থ রচয়িতা, যিনি ইংরেজী জানেন উর্দুর চেয়েও ভালো। এবং পাশ্চাত্যের যে কোন লোককে আকৃষ্ট করার মতো।

ভূট্টোর সাথে সাক্ষাতকার কেমন এলোমেলো হয়ে গেল। ঠিক যেমনটা হয়েছিল কিসিঞ্জারের সাক্ষাতকারে- সাংবাদিকতার দৃষ্টিতে মানোত্তীর্ণ নয়, কিন্তু কূটনৈতিক চাতুর্যে পরিপূর্ণ ও আন্তর্জাতিক ধাচের। ইন্দিরা গান্ধী যে তাকে ভারসাম্যহীন লোক বলেছেন তা পাঠ করে তিনি ক্ষুব্ধ হয়েছেন। অতএব ইন্দিরাও ক্ষুব্ধ হয়েছেন। যখন তিনি পাঠ করলেন যে ভূট্টো তাকে একজন নগণ্য মহিলা, যার বুদ্ধিশুদ্ধিও অতি সাধারণ, উদ্যোগে ও কল্পনাশক্তি শূন্য এবং যে তার পিতার অর্ধেক মেধাও পায়নি- বলে উল্লেখ করেছেন। ভূট্টো তার সাথে সাক্ষাতেও হাত মিলানোর ধারণাকে বিরক্তিকর বলে মনে করেন। বলা নিস্প্রয়োজন যে, ইন্দিরাও ক্ষুব্ধ হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। তাকে মূল্যায়ন করতে ভূট্টো ঘৃণাকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। আমি নিজেও ভূট্টোর এ ধরনের মন্তব্যে অস্বস্তিবোধ করেছিলাম। এবং ভূট্টোকে নিবৃত্ত করতেও চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ভূট্টো আমার পরামর্শ নেননি এবং পরিবর্তে আরো আপত্তিকর মন্তব্য যোগ করেছেন। যা আমি প্রকাশ করিনি এবং আমার নিজের এই সেন্সরশীপে খুব ভালো ফল হয়নি। ফলটা ছিল নাটকীয়, বরং বলা যায় হাস্যকর। পরিণতিটা আমারই সৃষ্ট।

ভূট্টো ও ইন্দিরা গান্ধীর তখন সাক্ষাত হওয়ার কথা, ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের জন্য। নয়াদিল্লীর সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবরে বিশেষ কিছু বাক্যে তিনি সতর্ক হয়ে আমাকে অনুরোধ জানালেন সাক্ষাতকারের পুরোটা তার কাছে পাঠাতে এবং আমি রোম থেকে টেলিগ্রামে তা পাঠালাম। সেটা পাঠ করে তিনি ঘোষণা করলেন যে,

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর সাথে তার বৈঠকটি হবে না। ভূট্টো হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে আমাকে খুঁজতে লাগলেন। অবশেষে তার ইটালীস্থ রাষ্ট্রদূতের মাধ্যমে সন্ধান পেলেন আদ্দিস আবাবায়। সেখানে আমি গিয়েছি হাইলে সেলাসীর সাক্ষাতকারের জন্য। আমাকে সবচেয়ে আপত্তিকর অনুরোধটাই করা হলো।

হ্যাঁ আমাকে লিখতেই হবে। ভূট্টো আমাকে দ্বিতীয় রিপোর্ট লিখতে বলেছিলেন, যাতে আমি লিখি যে, ভূট্টোর সাথে কখনোই সাক্ষাতকার নেয়া হয়নি, বরং আমি এ ধরনের কল্পনা করেছিলাম। আমাকে বলতে হবে, ইন্দিরা গান্ধীর সম্পর্কে মন্তব্য আসলে ভূট্টোর নয় আমারই কল্পনা এবং আমি ভেবেছিলাম, ভূট্টো এরকমই বলতে পারেন। প্রথমে আমি বুঝতেই পারিনি ব্যাপারটা কি। 'আপনি কি বলেছেন মিঃ অ্যামব্যাসেডর?" "আমি বলছি, আপনার লিখা উচিত যে, আপনি নিজে এসব উদ্ভাবন করেছেন, বিশেষ করে ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কিত অংশটুকু।" আপনি কি পাগল, মি. অ্যামব্যাসেডর? আপনার প্রধানমন্ত্রীও কি পাগল হয়ে গেছেন?" "মিস ফালাচি, আপনি নিশ্চয়ই বুঝবেন। ষাট কোটি মানুষের জীবন নির্ভর করছে আপনার উপর, তারা আপনার হাতে।" আমি তাকে জাহান্নামে যাওয়ার অভিশাপ দিলাম। কিন্তু ভূট্টো হাল ছেড়ে না দিয়ে আমাকে খুঁজছিলেন। যেখানেই আমি গেছি সেখানেই একজন গুরুত্বপূর্ণ পাকিস্তানী আমাকে অনুরোধ করেছে সাক্ষাৎকারটা অস্বীকার করতে। বারবার তারা আমকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে ষাট কোটি মানুষ আমার হাতে। হতাশ হয়ে আমি উত্তর দিয়েছি যে ষাট কোটি মানুষকে ধারণ করার পক্ষে আমার হাত দুটো খুবই ছোট। আমি চিৎকার করে বলেছি যে, তাদের দাবী অসম্ভব এবং অপমানজনক। এ দুঃস্বপ্নের অবসান তখনই ঘটলো যখন ইন্দিরা গান্ধী মহানবুভবতার সাথে সিদ্ধান্ত নিলেন যে ভূট্টোর এ ধরনের ভুল আর ঘটবে না এবং তারা উভয়ে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর করলেন।

যখন তারা হাত মিলালেন ও হাসি বিনিময় করলেন, টেলিভিশনে তা দেখে আমার খুব মজা লাগছিল। ইন্দিরার হাসি ছিল বিজয়ের। ভূট্টোর হাসিতে অস্বস্তি।

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ আমার অবশ্যই বলা উচিত, কেন আমি আপনার সাথে সাক্ষাতের জন্য আকাঙ্খিত ছিলাম। কারণ, আপনি একজন সাংবাদিক যিনি শেখ মুজিবুর রহমান সম্পর্কে সত্যটা লিখেছেন। আপনার লেখাটা

আমি দারুণ উপভোগ করেছি। তাছাড়া..... দেখুন, মার্চ মাসে ঢাকায় অত্যাচারের ব্যাপারে আমার কিছু করার ছিল, এটা খুব সুখপাঠ্য ছিল না।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ কিছু করার ছিল মানে? মি. প্রেসিডেন্ট, ঢাকায় তারা সরাসরি বলছে যে, আপনিই ধ্বংসযজ্ঞটা চেয়েছিলেন। আপনি মুজিবের গ্রেফতার চেয়েছিলেন এবং সেজন্যেই আপনি ২৬শে মার্চ সকাল পর্যন্ত ঢাকায় ছিলেন।

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের উঁচু তলায় আমার স্যুটের জানালা পথে ধ্বংসের দৃশ দেখা, হুইস্কি পান এবং সম্ভবত নিরোর মতো বাঁশী বাজাতে। কিন্তু তারা কোন সাহসে একটি বর্বরোচিত ঘটনার সাথে আমাকে জড়াতে চায়, পুরো ঘটনাটা পরিচালিত হয়েছিল এক জঘন্য উপায়ে। তারা সকল নেতাকে নিরাপদে ভারতে পালিয়ে যেতে দিয়ে যাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে তারা কোন কিছুর জন্য দায়ী নয়। শুধু শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। একটু ভেবে দেখুন। আমি হলে আরো একটু চাতুর্যের সাথে কাজটা সম্পন্ন করতাম, আরো বৈজ্ঞানিকভাবে এবং কম নিষ্ঠুরতায়। টিয়ার গ্যাস, রাবার বুলেট ব্যবহার করতাম এবং সকল নেতাই গ্রেফতার হতো। কেবল প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের মতো একটি বিরক্তিকর মাতালের পক্ষে এত জঘন্যভাবে এবং রক্তপাত ঘটিয়ে এ ধরনের অপারেশন ঘটানো সম্ভব।

সে যাই হোক, এ ধরনের উন্মত্ততা হোক, এটা চাওয়ার পিছনে আমার কি স্বার্থ থাকতে পারে? আপনি কি জানেন যে, ইয়াহিয়া খানের প্রথম শিকার শেখ মুজিব না হয়ে আমার হওয়ার কথা ছিল? আমার পার্টির বহু লোক জেনে ছিল এবং ১৯৭০ সালের শেষদিকে, হ্যাঁ, ১৯৭০ এর ৫ই নভেম্বর তিনি শেখ মুজিবকে বলেছিলেন, "আমি ভূট্টোকে গ্রেফতার করবো কি করবো না?" একটি মাত্র কারণে তিনি তার সিদ্ধান্ত বদলেছেন, তা হলো পূর্ব পাকিস্তানে যেভাবে তিনি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেছেন পশ্চিম পাকিস্তানে তা পারতেন না। এছাড়া মুজিব কখনোই বুদ্ধিমান ছিলো না। সে নিজেকে কোণঠাসা করে রেখেছিল। ২৫ শে মার্চের দুঃখজনক ঘটনায় আমি হতভম্ব হয়েছিলাম। ইয়াহিয়া খান আমাকেও বোকা বানিয়ে ছেড়েছিল। পরের দিনের জন্য তিনি একটা এ্যাপয়েন্টমেন্ট দিয়েছিলেন এবং দিন শেষে জেনারেল মুহাম্মদ ওমর আমাকে জানালেন যে, ইয়াহিয়া খান চেয়েছিলেন আমি যাতে ঢাকায় অবস্থান করে 'সেনাবাহিনীর দক্ষতা প্রত্যক্ষ করি।' আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, এর সব কথাই সত্যি।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ অল রাইট মি. প্রেসিডেন্ট। কিন্তু আমার অবাক লাগে যে, সেই ভয়াবহ রাতে এবং পরবর্তী মাসগুলোতে আসলে কি ঘটেছিল ইতিহাস কখনো তার সঠিক ব্যাখ্যা দিবে কি না? শেখ মুজিবুর রহমান.....।

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ মুজিবকে তো আপনি দেখেছেন, আজন্ম মিথ্যুক। মিথ্যা ছাড়া কথাই বলতে পারে না.... এই অভ্যাসটা তার নিজের থেকেও শক্তিশালী। মর্জি হলে মুজিব ঢালাওভাবে কথা বলে। যেমন, সে বলে ত্রিশ লাখ মানুষ মরেছে। সে পাগল, বদ্ধ পাগল। ওরা সবাই পাগল। সংবাদপত্রগুলো আবার তার কথা পুনঃপ্রচার করে "ত্রিশ লাখ নিহত, ত্রিশ লাখ নিহত।" ভারতীয়রা সংখ্যাটা বলেছিল দশ লাখ। সে এটাকে দ্বিগুণ, এরপর তিনগুণ করলো। এই হলো লোকটির বৈশিষ্ট্য। জলোচ্ছ্বাসের সময় সে একই কাণ্ড করেছে। শুনুন, ভারতীয় সাংবাদিকদের মতে সে রাতে মারা পড়েছিল ৬০ থেকে ৭০ হাজার মানুষ। মিশনারীরা বলেছিল ত্রিশ হাজার। আমার পক্ষে যেভাবে সম্ভব হয়েছে সে বিচারে মৃতের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের মত। এটা অনেক বেশী, নৈতিকভাবে যদি কাজটা সমর্থনযোগ্যও হয়। আমি সংখ্যা কমাতে চাইনা, আমি তাদেরকে বাস্তবে ফিরিয়ে আনতে চাই- পঞ্চাশ হাজার ও ত্রিশ লাখের মধ্যে বিরাট পার্থক্য।

শরণার্থীদের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটেছে। মিসেস গান্ধী বলেন এক কোটি লোক। এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে, তিনি তার প্রতিরোধের পক্ষে যুক্তি দাঁড় করাতে এবং পূর্ব পাকিস্তানে অভিযান চালানোর জন্য তিনি এই সংখ্যা দিয়ে শুরু করেছিলেন। কিন্তু আমরা যখন বিষয়টা তদন্ত করার জন্য জাতিসংঘকে আমন্ত্রণ জানালাম, ভারতীয়রা তার বিরোধিতা করলো। কেন তারা বিরোধিতা করেছিল? সংখ্যাটা যদি সঠিকই হতো, তাহলে তো তদন্তের প্রশ্নে তাদের ভীত হওয়ার কথা নয়। ঘটনাটা হলো, আসলে এক কোটি নয়, বিশ লাখ লোক গিয়েছিল। নিহতের সংখ্যা বলায় আমার ভুলও হতে পারে, কিন্তু শরণার্থীদের সংখ্যার ক্ষেত্রে নয়। আমরা জানি কে দেশ ত্যাগ করেছিল। বহু বাঙ্গালী ছিল পশ্চিমবঙ্গের। ইন্দিরা গান্ধী তাদের পাঠিয়েছিলেন। বাঙ্গালীরা যেহেতু দেখতে একই রকম, সুতরাং কে তাদের চিনবে?

আরেকটা প্রসঙ্গ বলি, মহিলারা ধর্ষিতা ও নিহত হয়েছে। আমি এটা বিশ্বাস করি না। এটা তো নিশ্চিত যে, বাড়াবাড়ির কোন কমতি ছিল না। কিন্তু জেনারেল টিক্কা খান বলেছেন যে, ঐ দিনগুলোতে তিনি জনগণকে আহ্বান করেছেন দুর্ব্যবহার সম্পর্কে সরাসরি তার কাছে রিপোর্ট করতে। তার

এই আবেদন, লাউড স্পীকারে প্রচার করা হয়েছে এবং তার কাছে মাত্র চারটি ঘটনা রিপোর্ট করা হয়েছে। এটাকে কি আমরা দশ দিয়ে পূরণ করে চল্লিশ করতে পারি? মুজিব এবং গান্ধীর ছড়ানো সংখ্যা থেকে আমরা এখনো দূরে ওরিয়ানা ফালাচি না মি. প্রেসিডেন্ট। ওটাকে হাজারের সাথে পূরণ করুন, এমন কি দশ হাজারের সাথেও পুরণ করতে পারেন, তাহলে আপনি সটিক সংখ্যার কাছাকাছি আসবেন। মুজিবের ত্রিশ লক্ষ যদি ঢালাও বর্ণনা হয়, তাহলে টিক্কা খানের মাত্র চারটি ঘটনার বর্ণনা রীতিমতো ফাজলামো। চরম নারকীয়তা সংঘটিত হয়েছে। বলবেন কিভাবে? আমি এমন একজন আপনার সাথে কথা বলছি যে ঢাকায় বহু মৃতদেহ দেখেছে। আপনি কি একটা কথা বলেছেন, নৈতিকভাবে সমর্থনযোগ্য, অথবা সমর্থিত? আমি কি ঠিক ধরতে পেরেছি? আপনি কি যথার্থই বুঝতে চাচ্ছেন যে, এই ধ্বংসযজ্ঞটা নৈতিক দিক হতে সঠিক ছিল?

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ প্রত্যেক সরকারের, প্রত্যেক দেশের অধিকার রয়েছে প্রয়োজন হলে বলপ্রয়োগ করার। যেমন, ঐক্যের নামে। ধ্বংস ছাড়া আপনি সৃষ্টি করতে পারেন না। দেশ গড়ার স্বার্থে স্টালিন শক্তি প্রয়োগ ও হত্যা করতে বাধ্য হয়েছিলেন। মাও সে তুংও বলপ্রয়োগ ও হত্যা করেছেন বাধ্য হয়ে। বিশ্বের পুরো ইতিহাস তুলে না ধরে সাম্প্রতিক কালের দুটো ঘটনাই উল্লেখ করলাম। হ্যাঁ, এখন কোথায় রক্তপাত ঘটিয়ে দমন করা হবে এবং তা সমর্থনযোগ্য হবে কি হবে না সেটাই বিচার্য। মার্চ মাসে পাকিস্তানের ঐক্য নির্ভর করছিল বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নির্মূল করার উপর। কিন্তু যারা এর জন্য দায়ী তাদের বদলে জনগণের উপর এধরনের নিষ্ঠুরতা চালানোর কোন প্রয়োজন ছিল না। যে নিরীহ লোকদের বলা হয়েছিল যে, ছয় দফা আদায় হলেই আর কোন জলোচ্ছ্বাস হবে না, আর কোন বন্যা হবে না, খাদ্যাভাব হবে না- তাদেরকে বুঝানোর পন্থা এই নিষ্ঠুরতা নয়। আমি কঠোরভাবে এই পন্থা গ্রহণের বিরোধিতা করেছি- বিশেষ করে যখন কেউ মুখ খুলতে সাহস করেনি।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ তবু আপনিই টিক্কা খানকে সেনাবাহিনীর প্রধান নিয়োগ করেছেন- যে জেনারেল এই ধ্বংসযজ্ঞের নির্দেশ দিয়েছিল, তাই না?

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ টিক্কা খান একজন সৈনিক হিসেবে তার দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানে গিয়েছিলেন সুনির্দিষ্ট নির্দেশ নিয়ে এবং ফিরেও এসেছেন সেই নির্দিষ্ট আদেশে। তাকে যা করার নির্দেশ দেয়া হয়েছিল, তিনি তাই করেছেন, যদিও সবকিছুতে তার সম্মতি ছিল না। আমি

তাকে নিয়োগ করেছি, কারণ আমি জানি যে তিনি একই ধরনের শৃঙ্খলার সাথে আমার নির্দেশও পালন করবেন এবং তিনি কখনো রাজনীতিতে নাক গলাবার চেষ্টা করবেন না। আমি গোটা সেনাবাহিনীকে ধ্বংস করতে পারি না। তাছাড়া ঢাকার ঘটনা নিয়ে তার বদনাম আসলে অতিরঞ্জিত। এ ঘটনার জন্য একজনই কেবল দায়ী- ইয়াহিয়া খান। তিনি এবং তার উপদেষ্টারা ক্ষমতা নিয়ে এতেই মদমত্ত ছিলেন যে, সেনাবাহিনীর মর্যাদা কথাও বিস্মৃত হয়েছিলেন। তারা সুন্দর গাড়ি সংগ্রহ, বাড়ি তৈরী, ব্যাংকারদের সাথে বন্ধুত্ব করা, বিদেশে অর্থ পাচার করা ছাড়া আর কিছু ভাবার সুযোগ পাননি। ইয়াহিয়া খান দেশের সরকার সম্পর্কে উৎসাহী ছিলেন না। নিজের জন্য ক্ষমতা ছাড়া আর কিছুতে তার আগ্রহ ছিল না। ঘুম থেকে উঠেই যিনি মদপান শুরু করেন এবং ঘুমাতে যাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত মদপান বন্ধ করেন না। এ ধরনের একজন নেতা সম্পর্কে কি আর বলা যেতে পারে। তার সাথে কিছু করা যে কি বেদনাদায়ক, সে ধারণাও করতে পারবেন না। তিনি হচ্ছেন জ্যাক দ্যা রিপার।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ ইয়াহিয়া খান এখন কোথায়? তার ব্যাপারে আপনার কি সিদ্ধান্ত?

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ রাওয়ালপিণ্ডির কাছে এক বাংলোতে তিনি গৃহবন্দী। হ্যাঁ, বাংলোটা সরকারী। তাকে নিয়ে আমার বেশ সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে। ঘটনাটার দায়দায়িত্ব অনুসন্ধান করার জন্য আমি একটা ওয়ার কমিশন গঠন করেছি। ফলাফল পাবার অপেক্ষা করছি এবং তাতে সিদ্ধান্ত নিতে আমার সুবিধা হবে। কমিশন যদি তাকে দোষী দেখে তাহলে তার বিচার হবে। আমরা যে পরাজিত হয়েছি, এ পরাজয় ইয়াহিয়া খানের- মিসেস গান্ধী যদি সত্যিই যুদ্ধ জয় করে থাকেন, তাহলে প্রথমেই তাকে ধন্যবাদ দেয়া উচিত ইয়াহিয়া খান ও তার মূর্খ তোষামোদকারীদেরকে। এমনকি তাকে কিছু বুঝানোও মুশকিল- শুধু আপনার মেজাজ খারাপ হবে।

ঢাকার ঘটনার পর এপ্রিল মাসে তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন। তাকে সন্তুষ্ট মনে হচ্ছিল। নিজের উপর আস্থাশীল, পরিস্থিতি তার নিয়ন্ত্রণে। তিনি আমাকে মদপান করতে দিলেন। বললেন, "আপনারা রাজনীতিবিদরা আসলেই শেষ হয়ে গেছেন।" এরপর বললেন যে, শুধু মুজিবই নয়, আমাকেও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী বিবেচনা করা হয়েছে। আমিও নাকি পাকিস্তানের ঐক্যের বিরুদ্ধে একজন প্রবক্তা ছিলাম। "আপনাকে গ্রেফতার করার জন্য সবসময় চাপের মধ্যে ছিলাম জনাব ভূট্টো।" আমি এতটা

উত্তেজিত হয়েছিলাম যে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারিনি। উত্তর দিলাম যে, আমি কখনো তার অনুসারী হবো না। কারণ তার পথ দেশকে ধ্বংস করবে।

আমি হুইস্কির গ্লাসটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে কক্ষ ত্যাগ করলাম। জেনারেল পীরজাদা আমাকে থামালেন, আমার হাত ধরলেন। "আসুন, শান্ত হোন, বসুন এবং আবার কথা বলুন।" আমি শান্ত হয়ে আবার ভিতরে গেলাম। তাকে বুঝাতে চেষ্টা করলাম যে মুজিব ও আমার মধ্যে বিরাট একটা পার্থক্য রয়েছে। মুজিব একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী, আমি তা নই। নিষ্ফল প্রচেষ্টা। আমার কথা শোনার পরিবর্তে তিনি শুধু গ্লাসের পর গ্লাস মদ পান করছিলেন।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ প্রেসিডেন্ট আমরা কি একটু পিছনের দিকে ফিরে গিয়ে বুঝার চেষ্টা করতে পারি যে কিভাবে সেই ভয়াল মার্চের আগমন ঘটলো- সেটা নৈতিকভাবে সমর্থন করা যায় কিনা ?

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ ২৭শে জানুয়ারী মুজিবের সাথে আলোচনার জন্য ঢাকা যাই। আপনি যদি তার সাথে আলোচনা করতে চান তাহলে আপনাকে ঢাকায় তীর্থযাত্রা করতে হবে কারণ তিনি কখনো রাওয়ালপিণ্ডি আসতে সম্মত হন না। আমি গেলাম এমন এক পরিস্থিতিতে ঠিক যেদিন আমার বোনের স্বামী মারা গেছেন। লারকানায় আমাদের পারিবারিক গোরস্থানে তাকে দাফন করতে নেয়া হচ্ছিল। আমার বোন এতে খুবই মনক্ষুণ্ন হয়েছেন। নির্বাচনে মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেছিল এবং আমার সংখ্যাগরিষ্ঠতা ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে। কিন্তু তিনি ছয় দফার উপর খাড়া থাকতে চাচ্ছিলেন। ফলে আমাদেরকে একটা সমঝোতায় পৌঁছার চেষ্টা করতে হচ্ছিল। ইয়াহিয়া খানের দাবী ছিল চার মাসের মধ্যে আমাদেরকে সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে। তা না হলে জাতীয় পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে নতুন নির্বাচন দেয়া হবে। মুজিবকে বুঝানো, সে এক কঠিন কাজ। যার মাথায় ঘিলু নেই, তার কাছে তা আশাও করা যায় না। আমি যুক্তি দেখালাম, ব্যাখ্যা করলাম এবং তিনি একই সুরে বার বার বলেছেন: "ছয় দফা, আপনি কি ছয় দফা মানেন?" প্রথম, দ্বিতীয় এমনকি তৃতীয় বারও আমি আলোচনা চালাতে প্রস্তুত ছিলাম। কিন্তু চতুর্থ বৈঠকে জোর করা হলো যে, দুই প্রদেশের বৈদেশিক বাণিজ্য ও বৈদেশিক সাহায্যের বন্দোবস্ত তাদের স্ব স্ব পছন্দ অনুযায়ী স্থির করা হবে। তাহলে দেশের সার্বভৌমত্ব এবং ঐক্যের আর কি থাকে? তাছাড়া, এটা প্রায় জানাই ছিল যে, মুজিব

পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে পৃথক করতে চায় এবং তিনি এজন্য ১৯৬৬ সাল থেকেই ভারতের সাথে সম্পর্ক রেখে আসছিলেন। ফলে জানুয়ারীতে আমাদের আলোচনা বাধাগ্রস্ত হলো এবং 'মার্চে' উপনীত হলাম।

মার্চ মাসের মাঝামাঝি ইয়াহিয়া খান করাচীতে এলেন এবং আমাকে বললেন যে, তিনি ঢাকা যাচ্ছেন- আমি তার সাথে যেতেই চাই কিনা? আমি তাকে জানালাম যে, মুজিব যদি আমার সাথে আলোচনায় সম্মত হয় তাহলে যেতে পানি। ইয়াহিয়া খান স্বয়ং একটি টেলিগ্রামে আমাকে ঢাকা থেকে জানালেন যে, মুজিব আমার সাথে কথা বলতে রাজী। ১৯শে মার্চ আমি ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে এবং ২১শে মার্চ মুজিবের সঙ্গে দেখা করলাম, ইয়াহিয়া খানও সাথে ছিলেন। অবাক হলাম, মুজিব অত্যন্ত শান্ত এবং খোশমেজাজে। তিনি বললেন, "মি, প্রেসিডেন্ট আমি আপনার সঙ্গে সমঝোতায় পৌঁছাতে এসেছি। ভূট্টোর সাথে আমার করার কিছু নেই। সাংবাদিকদের আমি বলবো যে, প্রেসিডেন্টের সাথে আমি সাক্ষাৎ করেছি এবং ভূট্টো সাহেবও সেখানে ছিলেন," তার কণ্ঠে আনুষ্ঠানিকতার সুর। ইয়াহিয়া খান বললেন "না, না, মুজিব সাহেব। আপনি আপনার নিজের কথাই বলবেন।" মুজিব শুরু করলেন, "জলোচ্ছ্বাসে অসংখ্য লোক নিহত হয়েছে।" এই হলো লোকটি ধরন। হঠাৎ করে তার অসুস্থ মনে এমন একটি কথা বলে বসতেন, যার সাথে আসল কথার কোন সঙ্গতিই নেই। মতিভ্রষ্টের মতো বলতেই থাকবেন। এক পর্যায়ে আমার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো। আমি কিভাবে জলোচ্ছ্বাসের জন্য দায়ী? আমি কি এমন একজন যে জলোচ্ছ্বাস পাঠিয়েছি? মুজিবের উত্তর ছিল- হঠাৎ উঠে দাঁড়ানো এবং বলা যে, তাকে একজন মৃতের জানাযায় যেতে হবে।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ বলুন মিঃ প্রেসিডেন্ট।

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ কথা হলো, আপনি যখন মুজিবের প্রসঙ্গে বলবেন, সবকিছু অদ্ভুত মনে হবে। আমি বুঝি না কি করে বিশ্ব তাকে গুরুত্ব দিতে পারে। ভালো কথা, আমি উঠে দাঁড়ালাম, বাইরের কক্ষ পর্যন্ত এগিয়ে দিতে, যদিও তিনি তা চাচ্ছিলেন না। সে কক্ষে তিনজন ছিলেন, ইয়াহিয়া খানের উপদেষ্টা, মিলিটারী সেক্রেটারী এবং তার রাজনৈতিক কসাই; জেনারেল ওমর। মুজিব বলতে শুরু করলেন, "বাইরে যান, সবাই বাইরে যান। ভূট্টোর সাথে আমার কথা আছে।" তারা তিনজন চলে গেলেন। তিনি বসে আমাকে বললেন, "ভাই, ভাই। আমাদেরকে একটা সমঝোতায় আসতে হবে।

আল্লাহর দোহাই।" আমি রীতিমতো বিস্মিত। তাকে বাইরে নিয়ে এলাম, যাতে কেউ তার কথা শুনতে না পায়। বাইরে এসে তিনি উত্তেজিত কণ্ঠে বললেন যে, আমার অবশ্যই পশ্চিম পাকিস্তানটা নেয়া উচিত এবং তিনি (মুজিব) পূর্ব পাকিস্তান নেবেন। আরো বললেন যে, গোপন একটা বৈঠকের ব্যবস্থা তিনি করে ফেলেছেন। সন্ধ্যার পর তিনি আমাকে নিতে লোক পাঠাবেন। আমি তাকে বললাম যে, তার এ ব্যাপারে আমার কোন আগ্রহ নেই। আমি চোরের মতো অন্ধকারে কলা গাছের নিচে সাক্ষাৎ করার জন্য ঢাকা আসিনি। আমি পাকিস্তানকে ভাঙ্গতে চাই না। তিনি যদি বিচ্ছিন্নতা চান তাহলে তার সংখ্যাগরিষ্ঠতার উপর নির্ভর করে জাতীয় পরিষদে সে প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। কিন্তু এ যেন প্রাচীরের কাছে কথা বলা আমাদের মুখপাত্রদের মাধ্যমে আলোচনা পুনরায় শুরু করার ব্যাপারে আপোস হলো। কিন্তু ফল কিছুই হলো না। সেই দিনগুলোতে তিনি ক্ষ্যাপার মতো ছিলেন, যে কোন ব্যাপারে তার মাথা গরম হতো। এভাবে আমরা ২৫শে মার্চে পৌঁছলাম।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ ২৫শে মার্চ আপনি কি সন্দেহ হওয়ার মতো কিছু লক্ষ্য করেন নি ?

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ আমি একটু অস্বস্তির ভাব অনুভব করেছি, অদ্ভুত একটা অনুভূতি। প্রত্যেক সন্ধ্যায় আমি ইয়াহিয়া খানের কাছে গিয়ে রিপোর্ট করতাম যে, আমার ও মুজিবের মধ্যে আলোচনায় কোন অগ্রগতি হচ্ছে না। ইয়াহিয়া খান কোন আগ্রহ দেখাতেন না। বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকতেন, অথবা টেলিভিশন সম্পর্কে অভিযোগ করতেন অথবা ক্ষোভ প্রকাশ করতেন যে তার প্রিয় গানগুলো শুনতে পাচ্ছেন না- রাওয়ালপিণ্ডি থেকে রেকর্ডগুলো এসে পৌঁছায়নি। ২৫শে মার্চ সকালে তিনি আমাকে এমন কথা বললেন, যাতে আমি উদ্বিগ্ন হলামঃ "আজ মুজিবের সঙ্গে সাক্ষাতের কোন প্রয়োজন নেই। আগামীকাল আমরা তার সাথে দেখা করবো। আপনি এবং আমি। তবু বললাম, "ঠিক আছে" এবং রাত আটটায় আমি মুজিবের দূতের কাছে সবকিছু বললাম এবং তিনি বিস্ময় প্রকাশ করলেন, "ঐ কুত্তার বাচ্চাটা ইতোমধ্যে ঢাকা ত্যাগ করেছে।" আমার বিশ্বাস হলো না। প্রেসিডেন্টের বাসভবনে টেলিফোন করে বললাম যে, ইয়াহিয়ার সাথে কথা বলবো। তারা আমাকে বললো যে, তাকে ডিসটার্ব করা যাবে না। জেনারেল টিক্কা খানের সাথে তিনি নৈশভোজে বসেছেন। আমি টিক্কা খানকে ফোন করলাম। তারাও জানালো যে তাকে ডিসটার্ব করা যাবে না, কারণ ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে তিনি

নৈশাহারে বসেছেন। তখনই আমার উৎকণ্ঠা শুরু হলো এবং নিশ্চয়ই কোন কৌশল বলে সন্দেহ হলো। আমি রাতের খাবার খেতে গেলাম। এরপর ঘুমাতে। গুলীর শব্দে এবং অনান্য পক্ষে হতে দৌড়ে আসা বন্ধুদের গোলযোগে আমার ঘুম ভাঙ্গলো। দৌড়ে জানালার কাছে গেলাম, আল্লাহ আমার সাক্ষী, আমি কাঁদলাম। কেঁদে বললাম, "আমার দেশটা শেষ হয়ে গেল।"

ওরিয়ানা ফালাচিঃ কেন ? আপনি জানালা দিয়ে কি দেখলেন ?

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ আমি কোন নির্বিচার হত্যাকাণ্ড দেখিনি। কিন্তু দেখলাম সৈন্যরা 'পিপল' অফিসটি ভেঙ্গে ফেলার চেষ্টা করছে। বিরোধী দলীয় এই সংবাদপত্রটির অফিস ইন্টারকন্টিনেন্টালের ঠিক সামনেই ছিল। লাউড স্পীকারে সৈন্যরা লোকদের নির্দেশ দিচ্ছিল চলে যাওয়ার জন্য। যারা বাইরে বেরিয়ে এলো, তাদের একপাশের দাঁড় করানো হলো মেশিন গানের মুখে। আরো কিছু লোককে ফুটপাথের উপর দাঁড় করানো হলো। ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল ঘিরে রেখেছে বেশ কিছু ট্যাংক। যে কেউ আশ্রয় লাভের জন্য ছুটাছুটি করছে তারা সৈন্যদের হাতে ধরা পড়ছে। সকাল আটটায় জানাতে পারলাম, মুজিবকে গ্রেফতার করা হয়েছে। আমি খুশী হয়েছিলাম যে তিনি জীবিত আছেন এবং এটুকু ভাবনা হয়েছিল যে সৈন্যরা তার সাথে একটু দুর্ব্যবহারও করতে পারে। এরপর আমি ভাবলাম, তার গ্রেফতারে আপসের একটা পথে বেরুতে পারে। তারা নিশ্চয়ই মুজিবকে একমাস বা দু'মাসের বেশি কারাগারে রাখবে না এবং এরই মধ্যে আমরা আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পারবো।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ প্রেসিডেন্ট, শেখ মুজিব আপনাকে বলেছিলেন, "আপনি পশ্চিম পাকিস্তান নিন আর আমি পূর্ব পাকিস্তান নেই।" ফলটা শেষ পর্যন্ত তাই দাঁড়ালো। এজন্যে কি আপনি তাকে ঘৃণা করেন ?

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ মোটেও না আমি ভারতীয় ধরনে অর্থাৎ ভণ্ডামি করে বলছি না। আমি অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথেই বলছি। ঘৃণার বদলে আমি তার জন্যে দারুণ আবেগ অনুভব করি। তিনি অযোগ্য, বিভ্রান্ত, অশিষ্ট, বোধহীন। কোন সমস্যা। নিষ্পত্তির অবস্থায় তিনি ছিলেন না- তা রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক বা আন্তর্জাতিক যে সমস্যাই হোক না কেন। তিনি শুধু জানেন, কি করে গলাবাজী করা যায়, কথার তুবড়ি ছুটানো যায়। আমি তাকে চিনি সেই ১৯৫৪ সাল থেকে এবং আমি তাকে কখনো গুরুত্ব দেইনি। শুরু থেকেই বুঝেছিলাম যে তার মধ্যে কোন গভীরতা নেই, প্রস্তুতি নেই, শুধু

অগ্নিবর্ষণ করতে জানেন। কোন ধ্যানধারণা নেই তার। তার মাথায় একটি ধারণাই ছিল বিচ্ছিন্নতা। এ ধরনের একজন লোককে দেখে শুধু করুণাই হয়।

১৯৬১ সালে ঢাকায় এক সফরে গিয়ে আবার তার সাথে সাক্ষাৎ হলো। আমার হোটেলের লবিতে দেখেছিলাম। তার কাছে গিয়ে বললাম, "হ্যালো মুজিব। চলুন এক কাপ চা খাওয়া যাক।" তখন সবেমাত্র জেল থেকে ছাড়া পেয়েছেন তিনি। তিক্ততায় পরিপূর্ণ এবং সেদিনই কেবল তার সাথে শান্তভাবে আলোচনা করা সম্ভব হয়েছিল। তিনি বলেছিলেন, পূর্ব পাকিস্তান কিভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের দ্বারা শোষিত হচ্ছে, উপনিবেশের মতো দেখা হচ্ছে, এখানকার রক্ত শুষে নেয়া হচ্ছে- কথাগুলো সত্য। আমার একটা বইএ আমি এ কথাগুলোই লিখেছি। তিনি কোন উপসংহারে পৌঁছতে পারলেন না। তিনি ব্যাখ্যা করতে পারলেন না যে, ত্রুটিটা আসলে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও শাসকগোষ্ঠির মধ্যে। তিনি সমাজতন্ত্র ও সংগ্রামের কথা বলেননি। অপরদিকে তিনি বললেন, জনগণ সংগ্রামের জন্য প্রস্তুত নয় এবং কেউই সশস্ত্রবাহিনীর বিরোধিতা করে না। সশস্ত্র বাহিনীর পক্ষেই দেশে বিরাজমান অন্যায় অবিচার দূর করা সম্ভব। তার সাহস ছিল না- কোনদিনই ছিল না। তিনি কি আসলে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন- 'এই বাংলার বাঘটি?

ওরিয়ানা ফালাচিঃ তিনি একথাও বলেছেন যে, তার বিচারের সময় তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছিলেন এবং গ্রেফতারের পর তার আচরণ ছিল বীরোচিত। তিনি এমন একটা সেলে ছিলেন, যেখানে ঘুমানোর জন্য একটা মাদুর পর্যন্ত ছিল না।

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ আসল কথা শুনুন। তিনি কোন সেলে ছিলেন না। তাকে রাখা হয়েছিল একটা অ্যাপার্টমেন্টে যেটা গুরুত্বপূর্ণ রাজবন্দীদের জন্যই ছিল। মিয়ানওয়ালীর কাছে লায়ালপুরের পাঞ্জাব জেলে। একথা সত্য, তাকে সংবাদপত্র পড়তে ও রেডিও শুনতে দেয়া হতো না। কিন্তু পাঞ্জাবের গভর্নরের পুরো লাইব্রেরীটাই তাকে দেয়া হয়েছিল এবং বাস্তবিকপক্ষে তিনি খুব ভালোভাবে ছিলেন। এক পর্যায়ে তারা তাকে একজন বাঙ্গালী বাবুর্চিও দিয়েছিল, কারণ তিনি বাঙ্গালী খাবার খেতে চাইতেন। বিচারের তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন এবং কিভাবে ? তিনি তার পক্ষে দু'জন সেরা আইনবিদ চাইলেনঃ কামাল হোসেন ও এ কে ব্রোহী- তার আইন বিষয়ক উপদেষ্টা ও বন্ধু। কামাল হোসেন জেলে ছিলেন। ব্রোহী বাইরে। ব্রোহীকে

পাওয়ার অর্থ সর্বোত্তমকে পাওয়া। আপনাকে আরো কিছু কথা বলছি। প্রথমে ব্রোহী ব্যাপারটা হাতে নিতে চাননি। কিন্তু ইয়াহিয়া খান তাকে বাধ্য করলেন। তিনি চারজন আইনবিদ সহকারীকে নিয়ে বিচারে হাজির হলেন। রাষ্ট্র তাদের ফি দিয়েছে। এটাই স্বাভাবিক ছিল ব্রোহীর একমাত্র দোষ, বেশি কথা বলা, বাচালতা। সুতরাং লায়ালপুর থেকে করাচীতে ফিরে তিনি মুজিবের সাথে তার আলাপ আলোচনাগুলো ব্যক্ত করে বলতেন যে, তাকে দোষী সাব্যস্ত করা কঠিন- মুজিব পাকিস্তানের ঐক্য এবং ইয়াহিয়া খানের প্রতি তার শ্রদ্ধার কথা অত্যন্ত নমনীয়ভাবে বলেন। মুজিব বারবার ইয়াহিয়া খানের উল্লেখ করেন, চমৎকার মানুষ, দেশপ্রেমিক এবং আমিই নাকি তার এ অবস্থার জন্য দায়ী। জেনারেল পীরজাদাও আমার সম্পর্কে মুজিবের একই বক্তব্যের কথা বলেছেন। পীরজাদাকে আমি বলেছি, "তাকে আমার কাছে দিয়ে দেখুন, তিনি আমাকে চমৎকার মানুষ ও দেশপ্রেমিক বলবেন এবং আপনাকে অপমান করবেন।"

ওরিয়ানা ফালাচিঃ কিন্তু বিচারে তিনি অভিযুক্ত হয়েছিলেন এবং তার সাজা হয়েছিল।

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ না। বিশেষ ট্রাইবুনাল তাকে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তখন থেকে সামরিক আইন প্রশাসক হিসেবে সম্পূর্ণ ইয়াহিয়া খানের এখতিয়ারে ছিল তার সাজার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়ার বিষয়টি। এই শাস্তি পাঁচ বছর বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা মৃত্যুদণ্ডও হতে পারতো। কিন্তু ইয়াহিয়া কোন সিদ্ধান্তই নিলেন না। যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল এবং তার মনে আরো অনেক কিছু ছিল।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ মুজিব আমাকে বলেছিলেন যে, তারা তার কবর খুঁড়েছিল।

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ আপনি জানেন সেই কবরটা কি ছিল? এয়ার রেইড শেলটার। তারা কারাগারের চারপাশে প্রাচীর ঘেঁষে খুঁড় ছিল। বেচারী মুজিব। ভীত হয়ে সবকিছুর মধ্যে মৃত্যুর নিশানা দেখেছে। কিন্তু আমি মনে করি না যে ইয়াহিয়া তাকে হত্যা করার কথা ভাবছিলেন। ২৭শে ডিসেম্বর আমি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ গ্রহণ করে ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ করলাম। তিনি উন্মত্ত, মাতাল। তাকে দেখতে মনে হচ্ছিল ডোরিয়ান গ্রে'র পোর্ট্রেট। আমাকে বললেন, "আমার জীবনের সবচেয়ে মারাত্মক ভুল ছিল মুজিবর রহমানকে মৃত্যুদণ্ড না দেয়া। আপনি মনে করলে তা করতে পারেন।"

ওরিয়ানা ফালাচিঃ আপনি কি বললেন ?

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ আমি বললাম যে, আমি তা করবো না এবং অনেক ভেবেচিন্তে, আমি মুজিবকে মুক্তি দিতেই প্রস্তুত হলাম। সেনাবাহিনীর কথিত বর্বরতার কারণে সকলের দ্বারা নিন্দিত পাকিস্তানের জন্য কিছু সহানুভূতির প্রয়োজন হয়ে পড়েছিল। ভাবলাম ক্ষমাশীলতায় অনেক সহানুভূতি পাওয়া যাবে। এছাড়া আমি ভাবলাম যে এই উদারতায় যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে আনার কাজ ত্বরান্বিত হবে। অতএব বিলম্ব না করে লায়ালপুরে নির্দেশ পাঠালাম মুজিবকে রাওয়ালপিণ্ডিতে আমার কাছে নিয়ে আসতে। নির্দেশটা সেখানে পৌঁছলে মুজিব আতঙ্কিত হয়ে পড়লো। জড়ানো কথায় তিনি বলতে চাচ্ছিলেন যে তারা তাকে এখান থেকে বের করে মেরে ফেলবে। সফরের সময়টাতেও তিনি সুস্থির ছিলেন না, এমনকি তার জন্য নির্দিষ্ট বাংলোতে এলেও একই অবস্থা। গুরুত্বপূর্ণ অতিথিদের জন্য চমৎকার বাংলো। আমি যখন একটি রেডিও, একটি টেলিভিশন এবং বেশ কিছু কাপড় চোপড় নিয়ে সেখানে গেলাম তিনি অত্যন্ত উত্তেজিতভাবে বললেন, "আপনি এখানে কি করছেন?" আমি তাকে বিস্তারিত বললাম যে, আমি প্রেসিডেন্ট হয়েছি। তার সুর পাল্টে গেল সাথে সাথে। দু'হাত আমার গলা জড়িয়ে ধরে বললেন যে তার জীবনে এর চেয়ে আনন্দের কোন খবর নেই। আল্লাহ সবসময় আমাকে পাঠাচ্ছেন তাকে রক্ষা করার জন্য.....। এরপরই আমি যা ভেবেছিলাম, তিনি ইয়াহিয়া খানকে আক্রমণ করে আমাকে বললেন যে, আমি তার মুক্তির বিষয় বিবেচনা করতে পারি কিনা। লণ্ডন হয়ে ঢাকায় ফিরে যাওয়ার পূর্বে আমি আরো দু'বার তার সাথে সাক্ষাত করেছি। দু'বারই তিনি কোরান শরীফ বের করে কোরান স্পর্শ করে প্রতিজ্ঞা করেছেন যে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করবেন ভোর তিনটায় আমি যখন তাকে বিদায় জানাই তখনো বিমানে তিনি এই প্রতিজ্ঞা করেছেন। প্রতিজ্ঞার সাথে আমার বুকে বুক মিলালেন, আমাকে ধন্যবাদ জানালেন এবং বললেন, "চিন্তা করবেন না মি. প্রেসিডেন্ট, আমি শীঘ্রই ফিরে আসবো। আপনার সুন্দর দেশকে আমি আরো ভালোভাবে জানতে চাই। আপনার সাথে শীঘ্র আমার দেখা হবে, খুব শীঘ্র।"

ওরিয়ানা ফালাচিঃ তাকে মুক্তি দিয়ে আপনি কি কখনো অনুতাপ করেছেন?

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ না, কখনো না। তিনি যাই বলুন না কেন, আমার মতো তিনিও একজন পাকিস্তানী। একাধিকবার আমরা একই অভিযোগে অভিযুক্ত হয়েছি, একই শাস্তি লাভ করেছি- কিন্তু সবকিছুর উর্ধ্বে আমাদের

একটা বন্ধন রয়েছে। জানুয়ারীর একটি দিনে আমি তাকে যেমন দেখেছি সেভাবে তাকে সব সময় স্মরণ করি, তিনি আমার হাত ধরে অনুনয় করেছেন, "আমাকে বাঁচান, আমাকে বাঁচান।" তার জন্যে আমি আসলেই করুণা অনুভব করি। বেচারী মুজিব- বেশিদিন পারবে না। আট মাস, বড়জোর এক বছর- এরপরই তাকে অরাজকতা, বিশৃঙ্খলা ইত্যাদি হজম করতে হবে, যা তার নিজেরই সৃষ্টি। আপনিই দেখুন, বাংলাদেশ এখন ভারতের একটি স্যাটেলাইট। শীঘ্রই এটা সোভিয়েত ইউনিয়নের স্যাটেলাইট হবে। কিন্তু শেখ মুজিব কমিউনিস্ট নন। তিনি যদি গুছিয়ে উঠতে পারেন তাহলে তো কথা নেই, কিন্তু পারবেন বলে মনে হয় না। সে অবস্থায় তার পিঠের উপর দেখবেন মাওবাদীদের, যারা যুদ্ধের আসল বিজয়ী। এখনই তারা তার বোঝা হয়ে আছে।

রাজনৈতিকভাবে মুক্তিবাহিনী হিসেবের বাইরে। তাদের না আছে কোন আদর্শিক প্রস্তুতি, না আদর্শনিষ্ঠা অথবা শৃঙ্খলা। সামাজিকভাবে তারা গোলযোগের উৎস- তারা কেবল জানে কিভাবে শূন্যে গুলী করতে হবে। মানুষ আতঙ্কিত করে, চুরি করে, 'জয় বাংলা' ধ্বনি তোলে। 'জয় বাংলা' বলে চিৎকার করে কারো পক্ষে একটি দেশ চালানো সম্ভব নয়। অপরদিকে বাঙ্গালী মাওবাদীরা....যদিও তারা খুব প্রশিক্ষিত নয়- তবু মাওএর লাল বই এর অর্ধেক পাঠ করেছে। কিন্তু তারা সুস্পষ্ট একটি শক্তি এবং ভারতীয়রা তাদের ব্যবহার করতে পারবে না। তাছাড়া আমি এটাও মনে করি না যে, তারা পাকিস্তানের ঐক্যের বিরোধী ছিল। আল্লাহ ভালো জানেন, কিভাবে এই জটিল ও বিপজ্জনক সমস্যা মোকাবেলা করা সম্ভব- শুধু কল্পনা করুন, মুজিবকে এগুলো মোকাবেলা করতে হচ্ছে। তাছাড়া দেশটি বড়ই দুর্ভাগা। জলোচ্ছ্বাস, বন্যা, ঝড় লেগেই আছে। বলা যায় একটি দুর্ভাগা তারকার নীচে দেশটির জন্ম। আমাদের ভুললে চলবে না যে দেশটা সবসময়ই বিশ্বের সন্দেহ অবস্থানে ছিল। আপনি ১৯৪৭ সাল অথবা ১৯৫৪ সালের ঢাকা দেখে থাকবেন। একটি নোংরা গ্রাম, সেখানে একটা রাস্তাও ছিল না। আর এখন সবকিছু ধ্বংস করা হয়েছে। সেজন্যে মুক্তিবাহিনীর ডিনামাইটকেও ধন্যবাদ, বাংলাদেশ....।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ আমি অবাক হচ্ছি, আপনি বাংলাদেশ বলছেন।

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ অবশ্যই আমি বলছি রাগে এবং ঘৃণায়। যদিও এখনো এটি আমার কাছে পূর্ব পাকিস্তান। কিন্তু সঠিকভাবে অথবা ভুলেই হোক, কিংবা ভারতীয়দের দ্বারা সামরিক কার্যকলাপের ফলেই হোক

পঞ্চাশটি রাষ্ট্র এটাকে স্বীকৃতি দিয়েছে। আমাদের মানতে হবে। আমিও স্বীকৃতি দিয়ে প্রস্তুত, যদি ভারত আমাদের যুদ্ধবন্দীদের ফেরত দেয়, যদি বিহারীদের উপর নির্যাতন বন্ধ হয়, যদি পাকিস্তানের ঐক্যের পক্ষের লোকদের উপর নিপীড়ন না করা হয়। আমরা যদি নিজেদেরকে আবার একটি ফেডারেশনে যুক্ত করি, তাহলে প্রথমেই আমাদেরকে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এবং আমার মনে হয় দশ অথবা পনের বছরের মধ্যে পাকিস্তান ও বাংলাদেশ একটি ফেডারেশনে যুক্ত হতে পারে। হতে পারে এবং হওয়া উচিত। তা না হলে এ শূন্যতা কে পূরণ করবে। পশ্চিমবঙ্গ, ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায়। পূর্ববঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গের মানুষের মধ্যে অভিন্ন কিছুই নেই। পূর্ববঙ্গের বাঙ্গালী ও আমাদের মধ্যে ধর্ম অভিন্ন। ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের ধারণাটা ছিল চমৎকার।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ আপনি চমৎকার বলছেন? দুই হাজার কিলোমিটার দূরে দু'টি জায়গা নিয়ে একটি দেশের জন্ম এবং তার মাঝখান ভারত?

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ এই দু'টি ভুখণ্ডই পঁচিশ বছর একত্রে ছিল, সকল ভুলভ্রান্তির পরও। একটি রাষ্ট্র শুধু ভৌগোলিক বা ভূখণ্ডের ধারণা নয়। যখন পতাকা, এক, জাতীয় সঙ্গীত এক, ধর্ম এক দূরত্ব সেখানে কোন সমস্যাই নয়। মোঙ্গলরা যখন ভারতকে ঐক্যবদ্ধ করেছিল তখন এই অংশের মুসলমানরা একশ' দিনে দেশের অপর প্রান্তে যেতো। এখন বিমানে মাত্র দু'ঘণ্টার পথ। আমার কথা কি আপনি বুঝতে পারছেন।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ না, মি. প্রেসিডেন্ট। আমি বরং ইন্দিরা গান্ধীকে ভালো বুঝি যখন তিনি বলেন যে, ১৯৪৭ সালের দেশবিভাগ ছিল ভুল এবং ১৯৭০ এর দশকে ধর্মের নামে যুদ্ধ হাস্যকর।

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ মিসেস গান্ধীর স্বপ্ন একটাই- গোটা উপমহাদেশ দখল করা, আমাদেরকে শাসন করা। তিনি একটা কনফেডারেশন পছন্দ করেন, যাতে বিশ্ব থেকে পাকিস্তান মিশে যায় এবং সে কারণেই তিনি বলেন, আমরা ভাই- ইত্যাদি। আমরা ভাই নই। কখনো ভাই ছিলাম না। আমাদের ধর্ম আমাদের আত্মার গভীর পর্যন্ত, আমাদের জীবন ব্যবস্থার মধ্যে। আমাদের সংস্কৃতি ভিন্ন, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি ভিন্ন। জন্ম থেকে মৃত্যুর দিন পর্যন্ত একজন হিন্দু ও একজন মুসলিম আইন ও রীতির অধীন, যার মধ্যে কোন আপোষ নেই। দু'টিই শক্তিশালী ও আপোষহীন বিশ্বাস। ইতিহাসে দেখা গেছে দুটোর কোনটিই একে অপরের সঙ্গে আপোষে পৌঁছতে পারেনি। শুধু রাজতন্ত্রের একচ্ছত্র শাসনে- বিদেশী আধিপত্যের সময় অর্থাৎ

মোঙ্গল থেকে বৃটিশ পর্যন্ত কোন রকম জোড়াতালি দিয়ে আমাদেরকে এক রাখা সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু একটি ঐক্যবদ্ধ প্রীতির সম্পর্ক কোনদিন গড়ে উঠেনি।

ইন্দিরা গান্ধী আপনাকে যেভাবে বলেছেন, আসলে হিন্দুরা সেরকম শান্ত বা নম্র সৃষ্টি নয়। তাদের পবিত্র গুরু সম্পর্কে তারা শ্রদ্ধাশীল কিন্তু মুসলমানদের প্রতি নয়। তারা সবসময় আমাদের সাথে দুর্ব্যবহার ও অত্যাচার করেছে। ১৯৪৪ সালে আমার সাথে একটি ঘটনা আমি কোনদিন ভুলবো না। আমার আব্বা আম্মার সাথে কাশ্মীরে ছুটি কাটাতে গেছি। অন্য বালকরা যা করে আমিও তেমনি দৌড়ে পাহাড়ে উঠছিলাম নামছিলাম এবং এক পর্যায়ে আমি খুব পিপাসার্ত হলাম। অতএব আমি নিকটেই এক লোকের কাছে গেলাম। যে পানি বিক্রি করছিল। পানি চাইলাম। লোকটি পানির মগ ভরলো। আমার হাতে দিতে গিয়েও থেমে জিজ্ঞাস করলো, "তুমি কি হিন্দু, না মুসলমান ?" উত্তর দিতে আমার দ্বিধা হচ্ছিল- ক্ষিপ্ত হয়ে পানিটা চাইলাম। শেষে বললাম, "আমি মুসলমান।" লোকটি মাটিতে ফেলে দিল পানির মগ উপুড় করে। ঘটনাটা ইন্দিরা গান্ধীকে বলবেন।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ আপনারা দু'জন পাশাপাশি দাঁড়াতে পারেন না, পারেন কি ?

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ আমি তাকে শ্রদ্ধাও করি না। আমার কাছে তিনি একজন সাধারণ নারী, সাধারণ বুদ্ধিসম্পন্না। তার মধ্যে বড় কিছু নেই। শুধু যে দেশটা তিনি শাসন করেন সেটা বড় আমি বলতে চাই, সিংহাসনটার কারণে তাকে বড় মনে হচ্ছে, যদিও তিনি খুব ছোট এবং তার নামটাও। বিশ্বাস করুন, তিনি যদি শ্রীলংকার প্রধানমন্ত্রী হতেন, তাহলে আরেকজন মিসেস বন্দরনায়েক ছাড়া কিছুই হতেন না। যদি ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী হতেন...। অবশ্য আমি তাকে গোল্ডা মেয়ার এর সাথে তুলনা করতে চাই না। গোল্ডা মেয়ার তার থেকে অনেক উপরে। তার একটি সুন্দর মন আছে, সুস্থ বিচারশক্তি আছে এবং তাঁকে ইন্দিরা গান্ধীর চেয়ে আরো অনেক কঠিন সমস্যার মধ্য দিয়ে অতিক্রম করতে হয়। তাছাড়া গোল্ডা মেয়ার ক্ষমতায় এসেছেন তার নিজের মেধার বলে। অপরদিকে মিসেস বন্দরনায়েক ক্ষমতায় এসেছেন মি. বন্দরনায়েকের বিধবা স্ত্রী হওয়ার কারণে। ইন্দিরা গান্ধী ক্ষমতায় এসেছেন নেহেরুর মেয়ে হওয়ার কারণে। নেহেরুর মেয়ে না হলে, তার সকল শাড়ীতে, কপালের লাল টিপে, হাসি দিয়েও তিনি কখনো আমাকে আকৃষ্ট করতে সফল হতেন না। লণ্ডনে তার সাথে যখন প্রথম

সাক্ষাৎ তখন থেকেই তিনি আমাকে আকৃষ্ট করতে পারেননি। আমরা দু'জনই একটা ক্লাশে যেতাম এবং ইন্দিরা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিস্তারিত নোট নিতেন। তাকে বলতাম "আপনি কি নোট নিচ্ছেন, না থিসিস লিখছেন?" থিসিস সম্পর্কে বলতে হয়, আমি বিশ্বাস করি না যে, অক্সফোর্ডে হতে ইতিহাসে ডিগ্রী নেয়া তার পক্ষে সম্ভব হয়েছে। আমি অক্সফোর্ড তিন বছরের কোর্স শেষ করেছি দুই বছরে। তিন বছরেও তার পক্ষে কোর্স শেষ করা সম্ভব হয়নি।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ আপনি কি একটু বাড়াবাড়ি করছেন না, একটু অন্যায় ? আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে, তার মাঝে কিছু নেই অথবা দীর্ঘ সময় ধরে টিকে আছেন কি করে ? অথবা বলতে চান, তার মাঝে কোন যোগ্যতা নেই, কারণ তিনি নারী ?

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ না, না। রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে মহিলাদের বিরুদ্ধে আমার কোন বক্তব্য নেই, যদিও আমি মনে করি না যে, পুরুষের চেয়ে মহিলারা ভালো রাষ্ট্রপ্রধান হতে পারে। ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে আমার অভিমত নৈর্ব্যক্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ। জেনেভা কনভেনশনের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন না করে এবং আমাদের যুদ্ধবন্দীদের ফিরিয়ে না দিয়ে যে কঠোর আচরণ তিনি করেছেন। সে ঘটনা দ্বারা প্রভাবিত না হয়েই আমি তার সম্পর্কে বলছি। আমি তাকে সবসময় কিভাবে দেখি : একজন স্কুল বালিকার মতো সতর্ক ও পরিশ্রমী, কিন্তু উদ্যোগ ও কল্পনাশক্তিশূন্য একজন নারী। বলা যায় অক্সফোর্ডে পড়াশুনার সময় ও লণ্ডনে নোট নেয়ার সময় তিনি যেমন ছিলেন, এখন বরং তার চেয়ে ভালো। ক্ষমতা তাকে আত্মবিশ্বাস দিয়েছে। কিন্তু তার সাফল্যের মাঝে সফলতা নেই। সাফল্যের প্রশ্নটির সাথে কতটা মেধা যোগ হয়েছে তার অনুপাত দেখতে হবে। পাকিস্তান ও ভারত যদি কনফেডারেশনভুক্ত দেশ হতো তাহলে মিসেস গান্ধীর পদটা লাভ করা আমার পক্ষে কঠিন হতো না। তার সাথে বুদ্ধিবৃত্তিক দ্বন্দ্বে আমার কোন ভয় নেই। আমি বলতে চাই, তিনি যখন যেখানে চান সেখানেই তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আমি প্রস্তুত। এমনকি দিল্লীতেও, হ্যাঁ আমি দিল্লীতেও যেতে প্রস্তুত। ঠিক ভিয়েনার কংগ্রেসের পর ট্যালীব্যাণ্ডের মতো। যে বিষয়টি আমাকে পীড়া দেয় তা হলো ভারতীয় সেনাবাহিনীর নিকট হতে গার্ড অব অনার এবং সেই ভদ্রমহিলার সাথে দৈহিক সংস্পর্শ। এ ভাবনা আমাকে পীড়িত করে। হায় আল্লাহ। এটা যেন আমাকে ভাবতেও না হয়। বরং আমাকে বলুন, মিসেস গান্ধী আমার সম্পর্কে কি বলেছেন ?

ওরিয়ানা ফালাচিঃ তিনি বলেছেন, আপনি ভারসাম্যহীন একজন লোক। আজ এক কথা বলেন, আগামীকাল আরেকটা। কেউ বুঝতে পারে না আপনার মনে কি আছে ?

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ হ্যাঁ। আমি সরাসরি এর জবাব দিচ্ছি। দার্শনিক জন লকের একটি বক্তব্যই আমি উল্লেখ করছি : "ছোট মনের গুণই হলো সামঞ্জস্যবিধান।" অন্যভাবে বলা যায়, আমি মনে করি একটি মৌলিক ধারণায় অত্যন্ত দৃঢ় থাকা উচিত। মূল ধারণার মধ্যে একজন অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করতে সক্ষম হয়। একবার এই প্রান্তে, আরেকবার অপর প্রান্তে। একজন বুদ্ধিজীবী কখনো একটিমাত্র ও সংক্ষিপ্ত ধারণার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেন না- তার ভাবনার নমনীয়তা থাকা উচিত। তা না হলে একটি গণ্ডির মধ্যে গোঁড়ামির মধ্যে তিনি নিমজ্জিত হন। একজন রাজনীতিবিদও তাই। রাজনীতি একটি আন্দোলন- এবং রাজনীতিবিদকেও হতে হবে সচল। একবার তাকে ডানে, আরেকবার বামে যেতে হবে। তাকে আসতে হবে দ্বন্দ্ব ও সন্দেহ নিয়ে। অব্যাহতভাবে তার পরিবর্তন হবে, পরীক্ষা নিরীক্ষা করবেন, সবদিক থেকে আক্রমণ করবেন। ফলে বিরোধী দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে আঘাত হানতে পারেন। মূল ধারণার দিকে যিনি দ্রুত মনোযোগী হন, তার কাছেই শিখা যায়। তার কাছে শিখুন যিনি সত্য প্রকাশ করেন। দৃশ্যতঃ সামঞ্জস্যতা বুদ্ধিমান মানুষের প্রধান গুণ। মিসেস গান্ধী যদি তা না বুঝেন তাহলে তিনি তার পেশার সৌন্দর্য বুঝেন না। তার পিতা ও বিষয় খুব ভালোভাবে বুঝেছিলেন।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ ইন্দিরা গান্ধী বলেন, তার পিতা রাজনীতিবিদ ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন সন্ন্যাসী।

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ মিসে গান্ধী তার পিতা সম্পর্কে ভুল বলেছেন। বরং নেহেরু একজন রাজনীতিবিদ ছিলেন। পিতার অর্ধেক মেধা তার থাকা উচিত। দেখুন, যদিও তিনি পাকিস্তানের নীতির বিরোধী ছিলেন, তবু আমি সবসময় এই লোকটির প্রশংসা করি। আমি যখন তরুণ তখন তার দ্বারা প্রভাবিত ছিলাম। পরে অবশ্য বুঝতে পারি তিনি অনেক ভুল, হতাশা, কঠোরতা ইত্যাদি দোষে দুষ্ট এবং তার মধ্যে স্ট্যালিন, চার্চিল বা মাও সে তুং এর মতো যোগ্যতা ছিল না। মিসেস গান্ধী আর কি বলেছেন ?

ওরিয়ানা ফালাচিঃ তিনি বলেছেন, আপনারা পাকিস্তানীরাই যুদ্ধ শুরু করেছেন।

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ হাস্যকর। প্রত্যেকে জানে তারা আমাদেরকে আক্রমণ করেছিল। ২৬ শে নভেম্বর পূর্বাঞ্চলীয় ফ্রন্টে তারা আঘাত হানে। পূর্ব পাকিস্তান সম্ভবতঃ পাকিস্তান ছিল না। ভালো করে একটু ভেবে দেখুন। কেউ যদি পালেরমো আক্রমণ করে, তাহলে আপনি কি এ সিদ্ধান্তই নেবেন না যে ইটালী আক্রান্ত হয়েছে ? কেউ যদি মার্সেলীস আক্রমণ করে তাহলে কি আপনি ভাববেন না যে ফ্রান্স আক্রান্ত হয়েছে ? মিসেস গান্ধী বিতর্কিত ভূখণ্ড কাশ্মীরে আমাদের পাল্টা আক্রমণের কথা ভুলে যেতে চাইছেন। ৩রা ডিসেম্বর কাশ্মীরের উপর হামলা হয়। আমার মনে পড়ছে ২৯শে নভেম্বর ইয়াহিয়া খানের সাথে সাক্ষাৎ করে আমি পাল্টা হামলা করতে ব্যর্থতার ব্যাপারে তাকে বলি, "আপনি এমন ভাব দেখাচ্ছেন যে পূর্ব পাকিস্তানে কিছুই ঘটেনি। কোন পদক্ষেপ না নিয়ে আপনি ভারতের খেলায়ই অংশ নিচ্ছেন। মানুষকে আপনি এ বিশ্বাসই করতে দিচ্ছেন যে, পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান এক রাষ্ট্র নয়।" কিন্তু তিনি আমার কথা শুনলেন না। পাল্টা আক্রমণের নির্দেশ তিনি চারবার পরিবর্তন করেন। চতুর্থবারের সময় আমাদের জওয়ান ও অফিসারা অধৈর্য হয়ে ট্যাংকে মুষ্ঠাঘাত করছিল। ঢাকা সম্পর্কে আমি বলেছিলাম, আমাদের সকল ছাউনি ঢাকায় কেন্দ্রীভূত করা হোক এবং একটি শক্তিশালী অবস্থান নেয়া হোক দশ মাসের জন্য, এক বছরের জন্য- গোটা বিশ্ব আমাদের পক্ষে এসে যাবে। তার শুধু বক্তব্য ছিল ভারতীয়রা ক্ষুদ্র একটি ভুখণ্ড দখল ও বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলন করবে না। কিন্তু যখন তিনি নিয়াজীকে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দিলেন.... হে খোদা। আমি হাজার বার মৃত্যুবরণ করলেও এর চেয়ে ভালো বোধ করতাম। মনে পড়ে, আমি নিউইয়র্কে ছিলাম। তিনি আমাকে পাঠিয়েছিলেন একজন পর্যটক হিসেবে এবং আমি নিজেকে দেখলাম জাতিসংঘের এক অদ্ভূত অধিবেশনে।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ এবং আপনি সেখানে সেই দৃশ্যের অবতারণা করেন।

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ আমি স্বীকার করি। একটি বাস্তব দৃশ্য। আমি ক্রোধে, বিরক্তিতে পূর্ণ হয়েছিলাম। ভারতীয়দের আক্রমাণাত্মক ভাব, বৃহৎ শক্তি কর্তৃক ভীতি প্রদর্শন, যারা শুধু ভারতের অনুকরণ করতে চাচ্ছিল। আমি আমার ভাবাবেগেকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারিনি। আমার বক্তৃতায় সকলকে আমি জাহান্নামে যেতে বলেছি। আমি কেঁদেছি। হ্যাঁ, আমি মাঝে মাঝে কাঁদি। যখন কোন কিছু অন্যায়, অসম্মানজনক আবিষ্কার করি, আমি তখন কাঁদি। আমি খুবই আবেগপ্রবণ।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ আবেগপ্রবণ, দুর্বোধ্য, জটিল এবং....আরো অনেক কিছু বলা হয়। আমার মনে হয়, এখন আপনার ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন করার সময় হয়েছে। মি. প্রেসিডেন্ট, এই লোকটি সম্পর্কে একটু বলুন, যিনি অত্যন্ত ধনবান, অথচ একজন সমাজতন্ত্রী, পাশ্চাত্যের লোকের মতো বাস করেন অথচ তার দু'জন স্ত্রী রয়েছে।

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ আমার মধ্যে অনেক বৈপরীত্য রয়েছে- আমি সে সম্পর্কে সচেতন। আমি এসবের মধ্যে আপোষের চেষ্টা করি, সমস্যা কাটিয়ে উঠার চেষ্টা করি। কিন্তু আমি সফল হতে পারি না। ফলে আমি এশিয়া ও ইউরোপের অদ্ভূত মিশ্রণ হিসেবেই রয়েছি। আমার শিক্ষা খুব কম কিন্তু ইসলামী পরিবেশে বড় হয়েছি। আমার মনটা পাশ্চাত্যের কিন্তু আত্মা প্রাচ্যের। আমার দুই স্ত্রী সম্পর্কে আমি কি করতে পারি ? অভিভাবকরা আমার মামাত বোনের সাথে বিয়ে দিয়েছিলেন তের বছর বয়সে। আমার বয়স ছিল মাত্র তের, আর আমার স্ত্রীর তেইশ বছর। এমন কি আমি জানতামও না যে একজন স্ত্রী থাকার অর্থ কি। যখন তারা আমাকে এটা বুঝানোর চেষ্টা করলো, আমি রাগে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছিলাম। আমি কোন স্ত্রী চাইনি। আমি ক্রিকেট খেলতে চেয়েছিলাম। আমি ক্রিকেটের দারুণ ভক্ত। আমাকে শান্ত করতে আমাকে দু'টি নতুন ক্রিকেট ব্যাট দিতে হয়েছিল। অনুষ্ঠান শেষ হওয়া মাত্র আমি ক্রিকেট খেলতে যাওয়ার জন্য দৌড় দিয়েছিলাম। আমার দেশে এমন অনেক কিছু আছে, যা আমাকে অবশ্যই পরিবর্তন করতে হবে। আমাকে ভাগ্যবান বলতে হবে। তারা আমার এগার বছর বয়সী খেলার সাথীকে বিয়ে দিয়েছিল বত্রিশ বছর বয়সী এক রমণীর সঙ্গে। সে সবসময় আমাকে বলতো, "তুমি ভাগ্যবান।"

আমি যখন আমার দ্বিতীয় স্ত্রীর প্রেমে পড়লাম, তখন আমার বয়স তেইশ বছর। সেও ইংল্যাণ্ডে পড়াশুনা করছিল। যদিও সে একজন ইরানী অর্থাৎ তার দেশে বহুবিবাহ একটি রীতি, আমাকে বিয়ে করার জন্য তাকে রাজী করাতে বেশ বেগ পেতে হয়েছে। মাত্র দুটি কথা ছাড়া তাকে বুঝানোর মতো যুক্তি আমার ছিল না, "তাতে কি, ওসব বাদ দাও।" আমার প্রথম স্ত্রীকে তালাক দেয়ার ধারণা কখনো আমার মাথায় আসেনি। সে যে আমার মামাত বোন, সে কারণে নয়, কারণ তার প্রতি আমার একটি দায়িত্ব আছে। একটি বালকের সাথে এই অবাস্তব বিয়ের কারণে, এই অবাস্তব রীতি যেখানে আমরা বড় হয়েছি- সে কারণে তার গোটা জীবনটা বরবাদ হয়ে গিয়েছিল। সে আমার লারকানার বাড়িতে বাস করে। মাঝে মাঝে আমাদের

সাক্ষাৎ হয়। প্রায় সবসময় সে একা কাটায়। এমনকি তার কোন সন্তানও নেই- আমার চারটি সন্তান দ্বিতীয় স্ত্রীর। আমি খুব অল্পসময় তার সাথে কাটিয়েছি। বড় হওয়ার পরই পড়াশুনা করতে আমি পাশ্চাত্যে চলে যাই। এটা আসলে অবিচারের একটি কাহিনী। বহুবিবাহ নিরুৎসাহিত করতে আমার পক্ষে যা সম্ভব সবকিছু করবো। বহুবিবাহ অর্থনৈতিক সমস্যাও সৃষ্টি করে। কখনো স্ত্রীরা বিভিন্ন শহরে বা ভিন্ন বাড়িতে বিচ্ছিন্নভাবে বাস করে- যেমনটি আমার বেলায় হয়েছে। তাছাড়া আমার যা সাধ্য তা সবার নেই। যদিও যেমনটি আপনি বলেছেন, আমি তেমন বিত্তবান নই।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ না ?

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ আপনার কাছে বিত্তবান অর্থ ডুপন্ট বা একজন রকফেলার হওয়া। আমাদের কাছে আরো অনেক কম। এদেশে যারা ধনী তারা বিস্তর জমির মালিক, কিন্তু আসলে সে ইউরোপীয় ব্যারনদের চেয়ে ধনী নয়। ব্যারনদের জাঁকজমকপূর্ণ ভিলা থাকে এবং বেঁচে থাকার জন্য গিগোলো খেলে। আমার ভূমি শুষ্ক এবং এতে উৎপাদন হয় কম। অতএব ধনী বলার চেয়ে বলুন, আমি তুলনামূলকভাবে ধনী। আমি ভালোভাবে বাস করি। আমার বোনেরা ভালোভাবে থাকে, আমার ভাইদের অবস্থাও ভালো। অবস্থা ভালো হলেও আমরা অর্থ অপচয় করি না। আমি কখনো প্লেবয় ছিলাম না। যখন আমি আমেরিকায় এবং অক্সফোর্ডে ছাত্র ছিলাম, আমি কখনো গাড়ি কিনিনি। আমি বুদ্ধিমানের মতই অর্থ ব্যয় করেছি, যেমন ; গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের সাথে সাক্ষাত করতে ও বই কেনার মত কাজে। আপনি যদি আমার লাইব্রেরীটা দেখেন, তাহলেই দেখবেন আমার অর্থের টাকা একটা ভালো অংশ আমি কোথায় ব্যয় করেছিঃ বই কিনতে। আমার হাজার হাজার বই আছে। অনেক বই পুরোনো এবং সুন্দর। আমি সবসময় পড়তে দারুণ ভালোবাসি। খেলাধূলার মতো। ভালো পোশাক পরার জন্য অনেকে আমার দোষারোপ করে। কথাটা সত্য। কিন্তু তাদের অভিযোগ পোশাকে আমার অর্থ ব্যয়ের কারণে নয়, আমি পরিচ্ছন্ন থাকি সেজন্য। আমি গোসল করতে এবং পোশাক পাল্টাতে পছন্দ করি। আমার পক্ষে কখনো ভারতীয় ও পাকিস্তানী রাজপুত্রদের পাশে দাঁড়ানোর সম্ভব হয়নি- কারণ তারা নোংরা ও দুর্গন্ধযুক্ত। আমার বাড়িগুলো সুন্দর ও আরামদায়ক- এটাও সত্য। কিন্তু দীর্ঘদিন আমার বাড়িতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা ছিল না। আমি আপ্যায়ন করতে ভালোবাসি- কিন্তু কখনো বাজে লোককে নয়। আমি নাচতে জানি,

কারণ আমি সঙ্গীত পছন্দ করি এবং অন্যেরা যখন নাচে তখন দেয়ালে টানানো ফুলের মতো থাকতে ঘৃণা করি বলে। এবং.....

ওরিয়ানা ফালাচিঃ এবং একজন লেডীকিলার হিসেবে আপনার সুনাম আছে বলে- একজন ডন জুয়ান। এটা কি সত্য মি. প্রেসিডেন্ট ?

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ এ কথাটা একটু অতিরঞ্জিত। আমি একজন রোমান্টিক- আমি মনে করি না যে, রোমান্টিক হওয়া ছাড়া আপনার পক্ষে রাজনীতিবিদ হওয়া সম্ভব। একজন রোমান্টিক হিসেবে আমি মনে করি প্রেম ছাড়া অনুপ্রেরণামূলক আর কিছু হতে পারে না। প্রেমে পড়া এবং একজন রমণীর হৃদয় জয় করার মধ্যে দোষ কোথায়- তার জন্যে আমার দারুণ দুঃখ হয়, যে প্রেমে পড়ে না। আপনি শতবার প্রেমে পড়তে পারেন। আমিও প্রেমে পড়ি। কিন্তু আমি অত্যন্ত নৈতিক মানুষ এবং নারীদের শ্রদ্ধা করি। মানুষ ভাবে যে মুসলমানরা নারীদের শ্রদ্ধা করে না। এটা মারাত্মক ভুল। নারীকে শ্রদ্ধা করা ও তাদের রক্ষা করা নবী মুহাম্মদ (সাঃ) এর শিক্ষার অন্যতম। একবার আমি এক লোককে বেত্রাঘাত করেছিলাম, যদিও আমি নিজেকে দৈহিক নির্যাতনের পক্ষে মনে করি না কিন্তু খুব নির্দয়ভাবে বেত মেরেছিলাম, রক্তপাত না হওয়া পর্যন্ত। আপনি বলতে পারেন, কেন? কারণ সে একটি ছোট্ট বালিকাকে ধর্ষণ করেছিল। আজ সকালেও যখন আমি পড়লাম যে কয়েকশ' ছাত্র করাচীর সমুদ্র সৈকতে কিছু সংখ্যক ছাত্রীর উপর হামলা ও তাদের কাপড় খুলে ফেলেছে, আমি রাগে অন্ধ হয়ে গিয়েছিলাম। স্ক্রাউন্ড্রেল। আমি ওদেরকে সামরিক আইন বিধির আওতায় ফেলবো। আপনকে কথাটা বলতে চাই। আমি যদি নিশ্চিত হই যে, আমাদের সৈন্যরা সত্যি সত্যিই বাংলাদেশের নারীদের উপর অত্যাচার করেছে তাহলে আমি অবশ্যই তাদের বিচার করবো ও শাস্তি দেব।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ অন্য প্রসঙ্গে আসা যাক মিঃ প্রেসিডেন্ট। আপনার মার্ক্সবাদের কথাই বলি। আপনার যে সুযোগ সুবিধা এবং মুসলিম হিসেবে আপনার যে বিশ্বাস তার সাথে কি করে এর সাথে আপোষ করেন?

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ আমি অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে আমাকে মার্ক্সবাদী বলি। তাহলো, আমি মার্ক্সবাদের ততটুকুই গ্রহণ করেছি, যতটকু অর্থনীতির সাথে জড়িত। মার্ক্সের ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক ব্যাখ্যা, জীবন সম্পর্কিত তত্ত্ব, ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে প্রশ্ন- এসবকে আমি মানি না। মুসলিম হিসেবে আমি আল্লাহকে বিশ্বাস করি। সঠিক হোক আর ভ্রান্তই হোক- আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ আছেন। বিশ্বাস এমন একটি জিনিস তার অস্তিত্ব থাকুক আর নাই

থাকুক তার বিশ্বাসে দুর্বলতা নেই। যদি তিনি থাকেন, তাহলে এ নিয়ে তর্ক করা বৃথা। তিনি আমার মধ্যে। মার্ক্সবাদের দার্শনিক অথবা কাল্পনিক ব্যাখ্যায় আমি আল্লাহর নিন্দা করতে পারি না। একই সাথে আমি এটাও বিশ্বাস করি যে, একজন মার্ক্সবাদী এবং একজন মুসলিম পাশাপাশিই চলতে পারে বিশেষ করে পাকিস্তানের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশে, যেখানে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র ছাড়া আমি কোন সমাধান দেখি না।

আমি পাকিস্তান বলছি এজন্যে যে, আন্তর্জাতিক ক্রুসেড শুরু করার মতো কোন প্রসঙ্গ উত্থাপন করছি না। আমি অন্যের ব্যাপারে নাক গলাচ্ছি না। আমি শুধু আমার দেশের বাস্তবতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে চাই। না, আমি এও স্বীকার করছি যে, বিপ্লবের কোন প্রক্রিয়ায় নয়। আমি শপথ করে বলতে পারি আমি একজন বিপ্লবী। কিন্তু আমি হঠাৎ ও রক্তাক্ত একটি বিপ্লবের ভার বহন করতে পারি না। পাকিস্তান সে ধরনের বিপ্লবের ভার সইতে পারবে না, সেটা হবে বিপর্যয়। অতএব আমাকে অগ্রসর হতে হবে ধৈর্যের সাথে। সংস্কারের মাধ্যমে পরিমাপ করে ক্রমশ দেশকে নিতে হবে সমাজতন্ত্রের পথে। যখন সম্ভব হবে জাতীয়করণ করতে হবে এবং যখন প্রয়োজন হবে জাতীয়করণ বাদ দিতে হবে। বিদেশী পুঁজি যা আমাদের প্রয়োজন তাকে শ্রদ্ধা করতে হবে। আমার সময়ের প্রয়োজন। একজন সার্জনের মতো সয়ে সয়ে ছুরি চালাতে হবে সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। আমাদের সমাজটা অসুস্থ। যদি অস্ত্রোপচারে মরে না যায় তাহলে সতর্কতার সাথে তাই করতে হবে। একটি আঘাত সেরে উঠার জন্য অপেক্ষা করতে হবে। সংস্কারকে সংহত করতে হবে। বহু শতাব্দী আমরা ঘুমিয়ে ছিলাম। একটি ভূমিকম্পের আচমকা ধাক্কায় নিজেদের জাগাতে পারি না। লেনিনকেও শুরুকে আপোষ করতে হয়েছিল।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ মি. প্রেসিডেন্ট, বহু মানুষ আপনাকে বিশ্বাস করে না। তারা বলেন, আপনি শুধু ক্ষমাতই চান, আর কিছু নয় এবং ক্ষমতা ধরে রাখার জন্যে আপনি সবই করতে পারেন।

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ না, এটা সত্যি নয়। গত তিন মাসে আমি যে কৃষি সংস্কার করেছি তাতে আমার পরিবার পঁয়তাল্লিশ হাজার একর জমি হারিয়েছে। ব্যক্তিগতভাবে আমি হারিয়েছি ছয় থেকে সাত হাজার একর। আমাকে আরো জমি হারাতে হবে। আমার সন্তানরাও হারাবে। আল্লাহ সাক্ষী যে, আমি সমাজতন্ত্রের নামে খেলছি না এবং কোন সংকীর্ণ স্বার্থ সামনে রেখে আমি ধীরে ধীরে অগ্রসর হই না। যেদিন থেকে আমি মার্ক্স পড়েছি

সেদিন থেকে আমার মালিকানায় কোনকিছুই দান করতে আমি ভয় পাই না। এখনো তার স্থান ও সময় বলতে পারিঃ বোম্বে ১৯৪৫ সাল। আমি শুধু ক্ষমতার অভিলাষী এই অভিযোগ প্রসঙ্গে আমি বলতে চাই যে আসলে আমরা 'ক্ষমতা' শব্দটির দ্বারা কি বুঝি। ইয়াহিয়া খানের যে ক্ষমতা ছিল ক্ষমতা দ্বারা আমি তা বুঝি না। ক্ষমতা দ্বারা আমি বুঝি যা ব্যবহার করে পর্বতকে সমতল করা যায়, মরুভূমিকে পুষ্পিত করে তোলা যায়, এমন একটি সমাজ গড়ে তোলা যায় যেখানে জনগণ ক্ষুধা ও অত্যাচারে মারা যাবে না। আমার কোন অসৎ উদ্দেশ্য নেই। আমি একনায়ক হতে চাই না। কিন্তু যতটুকু আমি বলতে পারি, তাহলো আমকে অত্যন্ত শক্ত হতে হবে, এমনকি কর্তৃত্ববাদী হতে হবে। ভাঙ্গা জানালা আমি মেরামত করছি। জানালার ভাঙ্গা টুকরো আমি দূরে নিক্ষেপ করছি। অসতর্কভাবে যদি এগুলো নিক্ষেপ করি তাহলে আমি একটি দেশ পাবো না, আমি পাবো একটি বাজার।

সে যা হোক, শুধু হাসিঠাট্টা করার জন্যে কেউ রাজনীতি করে না। রাজনীতি করার উদ্দেশ্যই হলো ক্ষমতা হাতে নেয়া এবং তা রক্ষা করা। এর উল্টো যদি কেউ বলে তাহলে সে মিথ্যুক। রাজনীতিবিদরা সবসময় আপনাকে এ বিশ্বাস দিতেই সচেষ্ট যে তারা ভালো, নৈতিক এবং ভারসাম্যপূর্ণ। কিন্তু কোনদিন তাদের ফাঁদে পা দেবেন না। ভালো, নৈতিক ও ভারসাম্যপূর্ণ বলে কিছুই নেই। রাজনীতি হলো দেয়া নেয়ার বিষয়। আমার পিতা বলতেন, "কারো দ্বারা দু'বার আঘাতপ্রাপ্ত হবার প্রস্তুতি না নিয়ে কখনো কাউকে আঘাত করবে না।" এরপর কিছু শিখেছি বয়স্কাউট থাকাকালে। কিন্তু আমি অনেক কিছু ভুলেও গেছি।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ তারা বলে, আপনি মুসোলিনী, হিটলার ও নেপোলিয়ন সম্পর্কিত বইপত্রের একনিষ্ঠ পাঠক।

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ অবশ্যই। তাছাড়া দ্য'গল, চার্চিল, স্ট্যালিন এর উপর লিখিত বইও পড়ি। আপনি কি আমাকে এ কথা স্বীকার করাতে চান যে আমি একজন ফ্যাসিস্ট। না, আমি ফ্যাসিস্ট নই। একজন ফ্যাসিস্ট প্রথমত সংস্কৃতির শত্রু। কিন্তু আমি সংস্কৃতি দ্বারা পরিশীলিত একজন বুদ্ধিজীবী। একজন ফ্যাসিস্ট ডানপন্থী, কিন্তু আমি বামপন্থী। একজন ফ্যাসিস্টের চরিত্র পেটি বুর্জোয়ার। কিন্তু আমি এসেছি অভিজাত্য থেকে। কোন লোক সম্পর্কে পাঠ করার অর্থ তাকে আপনার নায়ক হিসেবে সৃষ্টি নয়। আমি যখন ছাত্র ছিলাম তখন আমার কিছু নায়ক ছিল। কারো মাঝে

নায়কের অস্তিত্ব চুইংগামের মতো- চিবিয়ে ফেলে দেয়া বা বিভিন্ন আকার দেয়ার মতো- বিশেষ করে আপনি যখন তরুণ। আপনি যদি জানতে চান কাদেরকে আমি দীর্ঘদিন চিবিয়েছি, জেনে নিন- চেঙ্গিস খান, আলেকজান্ডার, হ্যানিবল, নেপোলিয়ান। হ্যাঁ, নেপোলিনকেই সবচেয়ে বেশি ভালো লাগতো। কিন্তু আমার মনে মাজিনি, ক্যাভর, গ্যারিবল্ডিরও কিছু কিছু স্থান ছিল। রুশোর প্রভাব ছিল যথেষ্ট। আপনি নিজেই আমার মধ্যে বিস্তর স্ববিরোধিতার দেখতে পাচ্ছেন।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ তাই বলুন। আপনাকে আর একটু ভালোভাবে বুঝার জন্যে প্রশ্ন করতে চাই, আমাদের সময়ের কোন নেতাকে আপনি খুব ঘনিষ্ঠ বলে অনুভব করেন- যাদেরকে আপনি পছন্দ করেন অথবা যারা আপনাকে বেশি পছন্দ করে।

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ একজন সুকর্ণ। তিনি আমার ভক্ত এবং আমি তার ভক্ত। তার সকল দুর্বলতা সত্ত্বেও তিনি একজন ব্যতিক্রমধর্মী মানুষ। যেমন নারীর সাথে সম্পর্কটা অমার্জিত। এটা প্রয়োজনীয়ও নয়, কিংবা পৌরুষোচিতও নয়। কিন্তু তিনি সেটা উপলব্ধি করেন না। তাছাড়া তিনি অর্থনীতি বুঝেন না। দ্বিতীয়জন নাসের। তিনি অত্যন্ত উঁচু দরের ব্যক্তিত্ব। তার সাথে আমার ভালো সম্পর্ক ছিল। তিনি আমাকে ভালোবেসেছেন, আমিও তাকে ভালোবাসতাম। ১৯৬৬ সালে আমাকে যখন সরকার ত্যাগে বাধ্য করা হয়, তখন নাসের আমাকে মিসরে আমন্ত্রণ করেন এবং রাষ্ট্রপ্রধানের মর্যাদায় আমাকে স্বাগত জানান। তিনি বলেছেন, যতদিন আমার প্রয়োজন আমি সেখানে থাকতে পারি।

এরপর ধরুন স্ট্যালিনের কথা। হ্যাঁ স্ট্যালিন। তার প্রতি বরাবর আমার গভীর শ্রদ্ধা অন্তর থেকে অনুভব করি সে শ্রদ্ধা, ঠিক ক্রুশ্চেভের প্রতি যতটা বিদ্বেষ অনুভব করি সেরকম। ক্রুশ্চেভকে আমি কখনো পছন্দ করিনি। একথাটা বললেই বোধকরি আপনি ভালোভাবে বুঝতে পারবেন। আমি সবসময় তাকে ভেবেছি একজন দাম্ভিব হিসেবে। সবসময় তার সদম্ভ আচরণ, চিৎকার, রাষ্ট্রদূতদের প্রতি অঙ্গলি নির্দেশ, মদ্য পান.... এবং সবসময় আমেরিকানদের গালিগালাজকে আমি পছন্দ করিনি। ক্রুশ্চেভ এশিয়ার অনেক ক্ষতি করেছেন। সবশেষে বলতে চাই.....আমি জানি আপনি আমার থেকে মাও সে তুং সম্পর্কে কিছু শোনার প্রতীক্ষা করেছেন। কিন্তু মাও সে তুং এর মতো মহান ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে আমার কাছে কি শুনতে চান? রবং চৌ এন লাই সম্পর্কে আমার পক্ষে বলা সহজ। এমন একজন

যাকে আমি ভালোভাবে জানি। তার সাথে দীর্ঘসময় ধরে আমি কথা বলেছি, আলোচনা করেছি। অফুরন্ত আলোচনা, ভোর থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত দিনের পর দিন। কমপক্ষে বছরে একবার আমাদের সাক্ষাৎ হতো। ১৯৬২ সাল থেকে আমি চীনে যাচ্ছি এবং চৌ এন লাই এর সঙ্গে সাক্ষাৎ করছি। আমি তার প্রশংসা করি।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ মি. প্রেসিডেন্ট, যাদের কথা বললেন তাদের সকলকেই ক্ষমতা লাভের জন্য অনেক সংগ্রাম করতে হয়েছে। কিন্তু আপনি তো তা করেননি।

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ আপনি ভুল বলছেন। এখানে পৌঁছানোটা আমার জন্যে খুব সহজ ছিল না। আমি কারারুদ্ধ ছিলাম। অনেকবার আমার জীবনের উপর ঝুঁকি এসেছে। আইয়ুব খানের সময়ে, ইয়াহিয়া খানের সময়। তারা আমার খাবারে বিষ প্রয়োগ করতে হত্যার চেষ্টা করেছে, গুলীবর্ষণ করেছে। ১৯৬৮ সালে দু'বার আমার প্রাণনাশের চেষ্ট হয়, ১৯৭০ সালে একবার। দু'বছর আগে সংঘরে ইয়াহিয়া খানের প্রেরিত হত্যাকারীদের সাথে পাল্টা গোলাগুলী মধ্যে আমি ঘণ্টাখানেক আটকা পড়ে ছিলাম। আমাকে ঘিরে রাখা এক ব্যক্তি নিহত হয়। অন্যেরা গুরুতর আহত হয়। এছাড়া মানসিক পীড়নের কথাই ভাবুন- আপনার জন্ম হয়েছে ধনবান পরিবারে এবং রূপান্তরিত হয়েছে একজন সমাজতন্ত্রীতে- কেউ আপনাকে বিশ্বাস করবে না। আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও এনিয়ে হাসিঠাট্টা করবে। এমনকি দরিদ্র লোকজন আপনার নিষ্ঠার প্রতি আস্থাশীল হবে না। বুলেটের হাত বা বিষ থেকে রক্ষা পাওয়া আমার জন্যে কঠিন কাজ নয়। আমাকে যে কিছুলোক বিশ্বাস করছে না, সেটাই আমার কাছে গুরুতর। যে প্রাচুর্যের মধ্যে আমি জন্মগ্রহণ করেছি তা আমাকে আলাদিনের উড়ন্ত গালিচায় বসায়নি। রাজনীতিকে যদি আমার পেশা হিসেবে না নিতাম....।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ এ পেশার সূচনা হলো কিভাবে?

জুলফিকার আলী ভূট্টোঃ আমি যখন একজন বালক, তখন থেকেই এটা ছিল। কিন্তু আমরা যদি মনোবিশ্লেষক হিসেবে কাজ করতে চাই, তাহলে বলতে হয়, আমি এর উত্তরাধিকার পেয়েছি আমার পিতার নিকট থেকে। আমার পিতা একজন বিচক্ষণ রাজনীতিবিদ ছিলেন। কিন্তু বেশ আগেই তিনি রাজনীতি থেকে অবসর গ্রহণ করেন- একটি নির্বাচনে পরাজিত হবার পর। রাজনীতি সম্পর্কে তার জ্ঞান ছিল টনটনে- আভিজাতের রাজনীতি জ্ঞান। আমাকে এমনভাবে বলতেন, তাতে আমার মধ্যে অনুপ্রেরণা জাগত। তিনি

আমাকে লারকানায় ঘুরিয়ে আনতেন। প্রাচীন মন্দির, জাঁকজমকপূর্ণ বাড়ি, আমাদের সভ্যতার কীর্তি দেখাতেন এবং বলতেন, "রাজনীতি হচ্ছে একটি মন্দির বা ভবন নির্মাণের মত" তিনি আরো বলতেন যে, রাজনীতি সঙ্গীত রচনার মতো অথবা কবিতা লেখার মতো। তিনি ব্রাহমা, মাইকেল্যাঞ্জেলো'র কথা বলতেন। আমার মা ভিন্ন প্রকৃতির ছিলেন। তিনি এসেছিলেন দরিদ্র পরিবার হতে এবং অন্যান্য লোকের দারিদ্র্য তাকে পীড়িত করতো। তিনি বার বার শুধু বলতেন, "আমাদেরকে দরিদ্রের প্রতি যত্নবান হতে হবে, দরিদ্রকে সাহায্য করতে হবে; দরিদ্রকে পৃথিবীতে বাঁচতে দিতে হবে ইত্যাদি।

আমি যখন আমেরিকা গেলাম, তার এসব কথা আমার কানে বাজতো। আমি একজন সংস্করবাদী হলাম। আমি আমেরিকায় ইউনিভার্সিটি অব ক্যালফোনিয়া'য় পড়াশুনা করতে গিয়েছিলাম, যেখানে আন্তর্জাতিক আইনের একজন বিখ্যাত জুরিস্ট পড়াতেন। আমি আন্তর্জাতিক আইনে আমার ডিগ্রি নিতে চেয়েছিলাম। তখন যুগটা ছিল ম্যাকার্থিজমের। কমিউনিস্ট অনুসন্ধানের সময় আমার ইচ্ছা উবে গেল। সানসেট বুলভার্ড থেকে, লাল নেইল পরিশ করা মেয়েদের থেকে দূরে থাকার জন্যে আমি ম্যাক্সওয়েল স্ট্রীটে নিগ্রোদের সাথে বসবাস শুরু করলাম। এক সপ্তাহ, এক মাস। ওদের সাথে আমার ভালো লাগলো- তাদের মাঝে কৃত্রিমতা নেই। তারা জানতো কি করে হাসতে হয়। আমি যখন স্যান ডিয়েগোতে গেলাম, একটা হোটেলে থাকার জায়গা পেলাম না, কারণ তামাটে চামড়ার রং এ আমাকে একজন মেক্সিকানের মতই দেখতে। এরপর আমি ইংল্যাণ্ড গেলাম। তখন আলজিরিয়ার বিপ্লবের সময়। আলজিরীয়দের পক্ষ নিলাম আমি। কিন্তু ১০নং ডাউনিং স্ট্রীটের সামনে আমি শ্লোগান দিতে যেতাম না। হয়তো আমি কিছুটা লাজুক ছিলাম। জনতার মধ্যে মিশে যেতে আমি কখনো পছন্দ করতাম না, বিক্ষোভে অংশ নিতাম না। আমি সবসময় লেখার মাধ্যমে আলোচনাকে প্রধান্য দিয়েছি, রাজনীতির খেলায় সংগ্রাম করতে পছন্দ করেছি। এটা অনেক বুদ্ধিদীপ্ত এবং পরিশীলিত।

ওরিয়ানা ফালাচিঃ আমার শেষ প্রশ্ন মি. প্রেসিডেন্ট। এই নির্দয় প্রশ্নের জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন। আপনি কি ক্ষমতায় থাকতে পারবেন বলে মনে করেন?

জুলফিকর আলী ভূট্টোঃ জবাবটা এভাবে দেই। আমি আগামীকালই শেষ হয়ে যেতে পারি। কিন্তু এযাবত যারা পাকিস্তান শাসন করেছে আমি তাদের

যে কারো চেয়ে দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকবো বলেই মনে করি। প্রথমত আমি স্বাস্থ্যবান ও শক্তিতে পরিপূর্ণ। আমি কাজ করতে পারি, এমনকি দৈনিক আঠার ঘণ্টা কাজ করি। দ্বিতীয়ত আমি এখনো তরুণ- আমার বয়স বড়জোর চুয়াল্লিশ, মিসেস গান্ধীর চেয়ে দশ বছরের ছোট। তৃতীয়ত আমি জানি, আমি কি চাই। আমিই তৃতীয় বিশ্বের একমাত্র নেতা যে দু'টি বৃহৎ শক্তির বিরোধিতা সত্ত্বেও রাজনীতিতে ফিরে এসেছি। ১৯৬৬ সালে আমাকে বিপদগ্রস্ত দেখে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই খুশী হয়েছিল। আমি যে বিপদ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়েছি, তার কারণ আমি এই পেশার মৌলিক নীতি জানি। সে নীতিটি কি? রাজনীতিতে আপনাকে কখনো কখনো এমন ভাব করতে হয়, যাতে অন্যেরা বিশ্বাস করে যে, একমাত্র তারাই বুদ্ধিমান। কিন্তু এটা করতে একটু হালকা এবং শিথিল অঙ্গুলি থাকতে হবে এবং.....। আপনি কি কখনো পাখীকে তার বাসায় ডিমের উপর তা দিতে দেখেছেন? একজন রাজনীতিবিদের সেই হালকা আঙ্গুল পাখীর নিচের ডিমগুলো সরিয়ে আনার যোগ্যতা থাকতে হবে। একটি একটি করে। যাতে পাখীটি কিছুতেই টের না পায়। (করাচী, এপ্রিল ১৯৭২)

(ইন্টারভিউ উইথ হিস্টরী ওরিয়ানী ফালাচি
অনুবাদ : আনোয়ার হোসাইন মঞ্জু
পৃষ্ঠা : ৫- ৫৬)

পরিশিষ্ট- ১৩
আজাদের বাণী

দুনিয়ার বুকে রণাংগনের পরে সবচাইতে বেঈনসাফী আদালতেই ঘটে চলেছে। বিশ্বের পবিত্র ধর্মপ্রতিষ্ঠাদের থেকে শুরু করে এমন কোন জ্ঞানের সাধক তথা সত্যানুসারী দল নেই, যাদের অপরাধী সেজে এই আদালতের কাঠ- গড়ায় দাঁড়াতে হয়নি। এর বেঈনসাফীর দাস্তান বড়ই লম্বা। ইতিহাস আজও তার মাতম থেকে মুক্তি পায়নি।

আমরা তাতে ঈসার (আ)- এর মত পুণ্যাত্মাকেও দেখতে পাই চোরের সাথে একই সারিতে দণ্ডায়মান। সক্রেটিসের মত মনীষীকে তাতে এ অপরাধে বিষপানে প্রানদন্ডের আজ্ঞা দিতে দেখি যে, দেশের সব চাইতে খাঁটি মানুষ ছিলেন তিনি। আমরা সেখানে জ্ঞানের সাধক গ্যালিলিওকেও এ অপরাধে দণ্ড পেতে দেখি যে, তিনি নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যকে ভুয়া আদলতের ভয়ে মিথ্যা বলতে রাজী হননি।

পৃথিবীর শত শত এলাকায় অতীতের জাতিগুলোর ফেলে যাওয়া অজস্র শহর ও দালান- কোঠার ধ্বংসাবশেষ পড়ে রয়েছে। যাও, একবার সেগুলোর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস কর, পাপ করে কোন জাতি পৃথিবীতে টিকে থাকতে পেরেছে কি? খোদার কাছ থেকে পালিয়ে কোন জাতি বেঁচে থাকতে পেরেছে কি ?

তোমাদের খোদা তোমাদের কাছে কোন্ অপরাধ করেছেন, যার জন্যে তোমরা তাঁকে ছেড়েছ? তাঁকে ছেড়েই বা তোমরা এমন কোন্ অমূল্য ধন পেয়ে ধন্য হয়েছ? খোদার চাইতে রূপ- গুণের অধিকারী এমন আর কে রয়েছে, যার মোহে পড়ে তোমরা তাঁকে ভুলেছ? তার চাইতে বেশী প্রেম- প্রীতি আর কার রয়েছে যে, তার প্রেমের জিঞ্জীরে তোমাদের হাত পা বাঁধা পড়েছে? তোমরা পরের দুয়ারে প্রেম ভিখ্ মেগে ঝাঁটা খেয়ে ফিরছ। তথাপি যে খোদা তোমাদের ভালবাসা পেতে অধীর, তাঁর দুয়ারে যাচ্ছ না কেন?

তোমরা বলছ, পৃথিবীতে প্রাকৃতিক নির্বাচন বা যোগ্যতরের বাঁচার রীতি চলছে এবং সৃষ্টি- জগতের সব বিবর্তন- বিপ্লবের মূলে এ রীতিই কাজ করছে। সৃষ্টি ও লয়, জয় ও পরাজয়, জীবন- মরণ ইত্যাদি এ থেকেই ঘটে চলেছে। এ তো সত্যিই। কিন্তু তোমরা আরেকটু এগিয়ে দেখছ না কেন? এ রীতিই তো সত্যকে সুস্থ ও সবল বলে বাঁচিয়ে রাখে ও অসত্যকে অসুস্থ ও দুর্বল বলে ধ্বংস করে ফেলে।

এ তত্ত্ব ডারউইন খুঁজে পাননি। এ তত্ত্বের জন্যে তিনি অধীর ছিলেন, তবু তাঁর কাছে তা ধরা দেয়নি। এ তত্ত্ব মহাসত্যের বাহক বিজ্ঞ কুরআনই কেবল উদঘাটন করতে পেরেছে।

ইসলাম এসে ঘোষণা করল- শক্তি সত্যই সত্য। খোদার বান্দাকে দাস বানাবার অধিকার নেই আর কারুর। গোত্র, জাতি ও শ্রেণীভেদ চিরতরে ধুলিসাৎ করে ইসলাম জানিয়ে দিল, মানুষ মানুষের ভাই- সবারই সমান অধিকার। মর্যাদার মানদণ্ড বংশ জাতি বা বর্ণ নয়, কাজ। সে ভাল, যার কাজ ভাল।

মানবাধিকারের এ মহাসনদটি ফরাসী বিপ্লবের এগারশ' বছর আগেই ইসলাম দুনিয়াকে দিয়ে গেছে। ইসলাম কখনও একনায়কত্ব অথবা কতিপয় বেতনভুক্ কর্মচারী কিংবা মুষ্টিমেয় শাসক- মন্ডলীর স্বৈরাচারী শাসনের বৈধতা স্বীকার করে না। যদি আজ এ দেশে খাঁটি ইসলামী শাসন প্রবর্তিত হয়, অথচ তার পরিচালনায় একনায়কত্ব অথবা কতিপয় বেতনভুক কর্মচারী কিংবা মুষ্টিমেয় শাসকমন্ডলীর স্বৈরচারী ব্যবস্থা সক্রিয় থাকে, তাহলেও একজন মুসলমান হিসেবে সে সরকারকে জালেম ঘোষণা করে তার আশু পরিবর্তনের জন্যে আন্দোলন করা আমার ওপরে ফরজ। ইসলামের সত্যিকারের আলেম সমাজ সর্বদাই স্বৈরচারী শাসনের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে এসেছেন।

খোদার বিশ্বাস, সিরক- মুক্তি, পবিত্রতা, কৃচ্ছ- সাধনা, উপাসনা ও সচ্চরিত্রতা মানব- জীবনকে এক সুদৃঢ় ঐশী শক্তিতে মহীয়ান করে তোলে। এটাকেই শরিয়াত আধ্যাত্ম শক্তি ও মনোবিজ্ঞান আত্মিক শক্তি বলে আখ্যায়িত করেছে। যাদের ভেতরে এই আত্মিক শক্তি জন্ম নেয়, তাদের ভেতরে এরূপ অজেয় ক্ষমতার বিকাশ ঘটে, যার প্রভাব সৃষ্টি জগতে তীক্ষ্নতম তরবারি কিংবা জ্বলন্ত আগুনের চাইতেও তীব্রতর মনে হয়।

ধর্মীয় অনুশাসন ছাড়া যে কোন ধরনের অনুশাসনেরই মূলমন্ত্র হল অত্যাচার।

(*যে সত্যের মৃত্যু নেই, পৃষ্ঠা : ৩৭৩- ৩৭৬*)

"১৯৭২ সালে নব প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশে ফিরে এসে শেখ মুজিবুর রহমান বীরের সম্বর্ধনা পেয়েছিলেন। তিনি তখন সাড়ে সাতকোটি মানুষের অবিসংবাদিত নেত। গত সপ্তাতে এক সামরিক অভ্যুত্থানে তিনি নিহিত হয়েছে।

দু'টি ঘটনার মাঝখানের ক'বছরে তাঁর সম্পর্কে বাংলাদেশের মানুষের মোহ কেটে গেছে এবং সোনার বাংলার স্বপ্ন মিলিয়ে গেছে।...

মুজিবের ট্রাজেডি এই যে, চার বছরেরও কম সময়ে তিনি বঙ্গবন্ধু উচ্চ মর্যাদা হারিয়ে বঙ্গ দুশমনে পরিণত হলেন।"

এন্থনী মাসকারেন হাস, সানডে টাইমস,
লন্ডন, ১৭ আগস্ট, ১৯৭৫